॥ একটি রাজার কাহিনী ॥

PRIVATE LIFE

OF AN

INDIAN PRINCE

সমাজ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্যই ডাঃ মুলক্ রাজের এই উপন্যাস। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে ভারতীয় গণআন্দোলনে বিভিন্ন বিরোধী শক্তির যে সমাবেশ হয়েছিল, তারই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যেসব করদমিত্র রাজ্যের হিজ হাইনেস মহারাজারা "স্বাধীন" হবার জন্য সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদেরই একজন হলেন এই উপন্যাসের নায়ক। এঁদের চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এ-গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। মুলক্ রাজের অন্যান্য উপন্যাসের মতোই এখানাও মূলত একটি রাজনৈতিক উপন্যাস।

॥ মুল্করাজ আনন্দ ॥

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলিকাতা—১২

ম্যারিলিন, মেলপো এবং অমৃতকে

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই গ্রন্থে উত্তমপুরুষ একবচন নিরপেক্ষ "আমি" যেন স্বাধিকার বলেই একটা চরিত্রে পরিণত হ'তে চলেছে। অধিকাংশ লেখকই জানেন, কোন উপন্যাসে কেমন ক'রে একটা চরিত্র কখনো কখনো প্রাধান্য বিস্তার ক'রে সমস্ত বইখানাকেই জুড়ে বসে। গ্রন্থকার আপন খেয়াল-খুশী মতো ডাঃ শঙ্করকে সমগ্র আখ্যায়িকার কথয়িতারূপেই শুধু প্রকাশ করেন নি, ডন কুইক্সোটরূপী প্রিন্সের সাঙ্কো পাঞ্জার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ করিয়েছেন। কাজেই এই গ্রন্থের "আমি"কে গ্রন্থকার ব'লে ভুল বুঝলে গ্রন্থকারের প্রতি অন্যায় করা হবে। গ্রন্থকার ভারতীয় ঐতিহ্যের অশরীরী নামহীন সত্তায় পরিণত হ'য়ে মহাকালের তৃতীয় জ্ঞান-লোচনের মতোই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি গ্রহণ ক'রে এই বিয়োগান্ত-প্রহসনের উদ্‌ঘাটন অবলোকন করেছেন মাত্র।

প্রথম খণ্ড

॥ এক ॥

সমস্ত দিন ধরে ঝিরঝির বৃষ্টি। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর শ্যামপুর লজে আমার নির্দিষ্ট আবাসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে শুয়ে আছি, এমন সময় হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন মুন্সী মিথনলাল। এসে আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ধরে টানতে লাগলেন। তন্দ্রা টুটে গেল। হকচকিয়ে উঠে রক্তবর্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলাম মুন্সীজীকে। বিবর্ণ শুকনো চেহারা, অত্যন্ত অস্থির ভাব; মনে হোলো, অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর দুগ্ধ-শুভ্র পাটকরা পাগড়ীটা কোনমতে মাথায় জড়ানো। বৃষ্টিবিন্দু ও ঘামে চশমার মোটা কাঁচদুটো ঘোলাটে। বৃদ্ধের কম্পমান ব্রণক্ষত মুখ, কপাল ও ঘাড় বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে ঘাম পড়ছে তাঁর ভারী থপথপে দেহ-ঢাকা পোষাকে। জোরে জোরে নিশ্বাস টানছেন, দেখে মনে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহাড়-পথে ওঠা-নামা করেছেন। মুন্সী মিথনলাল হলেন হিজ হাইনেস মহারাজার ভূতপূর্ব গৃহশিক্ষক এবং বর্তমানের একান্ত সচিব।

মুন্সীজীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার সময় দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'কি ব্যাপার, মুন্সীজী ?' সচরাচর হিজ হাইনেসের যে সব ঘটনা

ঘটে থাকে তারই একটা কিছুর পুনরাবৃত্তি হয়েছে ব'লে আমার ধারণা হোলো। বিশেষ কি ঘটনা এবারে ঘটেছে, তা হয়তো সঠিক বলতে পারব না, তবে আমি বুঝেছিলাম যে ঐ জাতীয় হাজারো সম্ভাব্য ঘটনার একটা কিছু ঘটে থাকবে, যা আজকাল হরদম ঘটছে ; বিশেষ ক'রে, গত মাস ছ'য়েক হোলো যখন থেকে স্বাধীন ভারতে আমাদের মহারাজাকে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

একটু দম নিয়ে মুন্সীজী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'হিজ হাইনেসকে দেখেছ, ডাক্তার ? এখানে এসেছিলেন ?' চশমার ঘোলাটে কাঁচের পিছনে তাঁর সন্ত্রস্ত চোখ দুটো কাঁপছে।

'না। কেন, আবার কি হোলো ?'

'হিজ হাইনেসকে খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় হারিয়ে গেছেন।' হতাশ হ'য়ে হাত নাড়লেন মুন্সীজী।

'হুঁ, হারিয়ে গেছেন ঠিকই—' একটা চাপা বিদ্রূপ ফুটে উঠল আমার কণ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে মুন্সীজীর জন্যে কেমন যেন অনুকম্পা অনুভব করলাম আমার অন্তঃকরণে। প্রায়ই তাঁর উপস্থিতিতে আমার মনে এই অনুভূতি জাগে। ডষ্টয়েভস্কির 'আহাম্মক'-এর কিছুটা রয়েছে মুন্সীজীর মধ্যে। শ্যামপুর স্টেটে তিনি নিঃসঙ্গ একাকী, মহারাজার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বড়ই বেমানান। আমি অনুরোধ করলাম : 'বসুন মুন্সীজী।'

'হায় রে কপাল ! কী যে হবে !' বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে মুন্সী মিথনলাল বলতে লাগলেন : 'প্রাতবাশের পরে পরেই হিজ হাইনেস বেরিয়ে গেছেন। মনে করেছিলাম বোধহয় ঘোড়ায় চেপে বেরিয়েছেন। কিন্তু ভগীরথ বেয়ারা বললে যে হিজ হাইনেসকে সে দেখেনি। ভাবলাম, বোধহয় ক্যাপটেন পিয়ারা সিংয়ের ম্যাল কিংবা শৈলশিরে গেছেন বেড়াতে। কিন্তু পিয়ারা সিংকে তো দেখলাম নিচের বাজার থেকে

জিনিসপত্তর কেনাকাটা করে ফিরে এসে লাঞ্চে বসেছে। হিজ হাইনেসের খবর সে জানে না। দুপুরেও তিনি খেতে এলেন না দেখে বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়লাম। তোমার খাবার আনতে যখন খবর পাঠালে তখন একবার ভাবলাম তোমার কাছে আসি খোঁজ নিতে, কিন্তু তোমাকে উদব্যস্ত ক'রে তোমার খাওয়া নষ্ট করতে মন চাইল না। যে রকম বৃষ্টি নেমেছে তাতে তো হিজ হাইনেস ভিজে চুপসে গেছেন, বর্ষাতিও সঙ্গে নেন নি।...এদিকে আবার নিচের তলার মিসেস রাসেলও অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তার মেয়ে স্কুল থেকে এখনও ফেরে নি—'

'ও-অ—!' বালিসে আবার ভর দিয়ে মৃদু হেসে বললাম: 'তবে আর অত দুশ্চিন্তার কারণ নেই মুন্সীজী, হিজ হাইনেস বোধহয় বাণ্টি রাসেলকে নিয়ে একটু—'

'ঐ ছুঁড়ীটার সঙ্গে সত্যি সত্যিই যদি ছাই ভস্ম খাবার জন্য মহারাজা গিয়ে থাকেন তো তার বিপদটা বুঝতে পারছ ডাক্তার? ক্যাপটেন রাসেল তার মেয়ের অন্তর্ধানের কথা পুলিসকে ফোন করে জানিয়েছে...একটা যা তা ছি ছি ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে যে! এতো আর আমাদের শ্যামপুর নয়! প্রজা মণ্ডলের লোকগুলো তো ওত পেতে বসে আছে, একটা কিছু পেলেই হোলো, হিজ হাইনেসকে নিয়ে পড়বে, আর বিশেষ ক'রে এই সময় যখন ভারতে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন নাকের উপর ঝুলছে। পিয়ারা সিং গেছে খাদ অঞ্চলে দেখতে, লোক লস্কর পাঠিয়েছি অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানে খোঁজ নিতে—এন্নানডেল, লোয়ার বাজার, লাভারস লেন—, আর, এই বৃষ্টিও ছাই থামবে না!—'

'হুঁ', লাভারস্ লেন—প্রেম গলি—আমাদের মহারাজার তো কত অসংখ্য প্রেম গলি আছে! তা, কোন্‌টীতে গিয়ে খুঁজবে ওরা?' হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপরে প্ল্যাষ্টিকের বাক্স থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরাতে ধরাতে মুন্সীজীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম: 'মুন্সীজী, অত চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই—'

'আমি বাপু আর পারি না। এবার এই বেগার-খাটুনির চাকরির ইস্তফা দিয়ে অবসর নেব,' ধৈর্যহারা স্বরে মুন্সীজী বললেন। ইতিপূর্বে কোনদিন আমি মুন্সীজীকে এইরকম ধৈর্যহারা হতে দেখি নি। 'ঐ যে সার্জেনটা, ঐ ব্যাটা ক্যাপটেন রাসেল, চিৎকার আরম্ভ করেছে যে আমাদের সবাইকে গুলি ক'রে মেরে ফেলবে!'

ধর্মাভিমানীর নিঃসহায়তা ফুটে ওঠে মিথনলালের অবয়বে যার জন্য তাঁকে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা থেকেও আরও হাস্যাস্পদ মনে হয়। তাঁর সেই গুরুমশাই-ভাব, কৃপণতা, ধর্মান্ধতার বরাহ-গোঁ—সবকিছু নিয়েই তিনি বছরের পর বছর এই প্রশংসাহীন বেগার-খাটুনির চাকরি করে চলেছেন, যদিও তিনি জানতেন যে, হিজ হাইনেসের মনোজগতের স্ফূর্তি-হুল্লোড়ের চৌহদ্দির মধ্যে তার মত ধর্মভীরু ও নীতিশাস্ত্র বচনবাগীশদের স্থান বিশেষ নেই। মহারাজার কাছে মুন্সীজী হলেন কৌতুকের প্রতীক, চিরন্তনকালের রাজসভার ভাঁড়। এবং হিজ হাইনেস বিদ্রূপ ক'রে মুন্সীজীর বিকৃত নামকরণ ক'রে টিয়া পাখীর নামে ডাকেন 'মিঞা মিথু' বলে। কারণ, মুন্সীজী প্রায়ই পাখীর মত আওড়াতেন তাঁর বি-এ ডিগ্রী নেবার সময় যেসব বই পড়েছিলেন, তার থেকে। আরও আওড়াতেন রালফ ওয়ালদো ট্রিন, থোরু, রাস্কিন, গান্ধী এবং গীতার শ্রীকৃষ্ণকথামৃত থেকে। এগুলো তিনি অতিরিক্ত অধ্যয়ন হিসেবেই পাঠ করেছিলেন। উচ্চ শিক্ষার্থে আমি যখন শ্যামপুর স্টেট ছেড়ে বাইরে যাই,—প্রথমে লাহোর মেডিকেল কলেজে এবং তারপরে লণ্ডনে,—তখন থেকেই আমি জানি হিজ হাইনেসকে রাজকীয় নম্রতা ও রীতিসহবৎ শিক্ষা দিতে গিয়ে মুন্সীজীকে কতই না মুস্কিল পোয়াতে হয়েছে। তারপর আমি যখন মহারাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক হয়ে কাজে যোগ দিই, বিশেষ ক'রে তখন থেকে বুঝতে পারছি এই ভালমানুষ বৃদ্ধটিকে কতই না অদ্ভুত জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বৃদ্ধের তিনটি ছেলে বিলেতে পড়ছে: একজন ইঞ্জীনিয়ারিং, একজন

ব্যারিষ্টারী আর একজন ডাক্তারী। এদের বিদেশের সমস্ত খরচ-খরচার প্রত্যেকটি পাই-পয়সা এই বৃদ্ধটিকে আয় ক'রে পাঠাতে হয় এখান থেকে তাঁর মানসম্মান বিসর্জন দিয়ে, এমনকি হিজ হাইনেসের ঐ অশিষ্ট অপমানকর ঠাট্টা-বিদ্রূপ নীরবে সহ্য করে। বৃদ্ধ মিথনলালের অবস্থা দেখে হিজ হাইনেসের অধীনে আমার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ভেবে আমিও মাঝে মাঝে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি বৈকি। কিন্তু আমাকে তো আমার স্কলারশিপের টাকা পরিশোধ করতে হবে এইভাবে হিজ হাইনেসের পার্শ্বচর চিকিৎসকের চাকরি ক'রে। ইংলণ্ডে তিন বছর থাকবার সময় আমার গবেষণার খরচ হিসেবে এই টাকা আমাকে স্টেট দিয়েছিল। তারপর চোখের 'পরে দেখছি তো হাজার হাজার পাশকরা বেকার ডাক্তার ফেউ ফেউ ক'রে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থায় আমার এই চাকরি গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। তারপর মহারাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের মত একটি উচ্চপদে আমার নিয়োগ হওয়ায় স্টেটে আমাকে যে মহা সম্মান দেখানো হোতো, তাতে মনের কোণে গর্ব-উল্লাস যে অনুভব করতাম না, তা নয়।

মিঞা মিথু বললেন : 'আচ্ছা, একবার উঠে জামা কাপড় বদলিয়ে নাও তো ভাই, দেখি, দুষ্টু রাজাকে খুঁজে পাই কিনা।' বলতে বলতে জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেখলেন কালো মেঘের পুঞ্জ সমগ্র উপত্যকা ঢেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে। মিথনলাল উঠে দাঁড়ালেন, হাত কচলাতে কচলাতে বিড়বিড় করতে লাগলেন : 'হায় রাম, হায় ঈশ্বর, হায় পরমাত্মা!'

বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে আমি বললাম : 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন মুন্সীজী!' তারপর হিজ হাইনেসের এইসব হাজারো ছেনালী খেলার অঘটনের উপর মুন্সীজী যে-ভাষায় পর্দা টেনে দিয়ে চাপা দিতেন, আমিও সেই ভাষাতেই যোগ দিলাম : 'যাই বলুন, এসব ছেলেপিলেদের খেলা,

জেনানা মহলের খেলা…আর আমাদের শ্রীকৃষ্ণ মহারাজারও তো কত গোপী—'

'আমার ধর্ম নিয়ে এইভাবে অপমান করা উচিত নয় ডাক্তার', গর্ব-আহত কণ্ঠে মুন্সীজী বলে ওঠেন : 'মহারাজা কোথায় গেছেন তোমাকে যদি বলে গিয়ে থাকেন তো আমাকে বল—'

'আমায় তো কিছু বলে যাননি হিজ হাইনেস। তবে আমার মনে হয়, জলপ্রপাতের ধারের খাদে বান্টিকে নিয়ে গেছেন। কারণ তো বুঝতেই পারছেন মুন্সীজী। কিছুদিন ধরে দেখছিলাম মেয়েটির ওপর মহারাজার নজর পড়েছে আর মেয়েটিও তার পিছনে ঘুর ঘুর করছিল। যখন তখন অহেতুক ওপরে আসা…জীপসিদের মত সাজ‥ মেয়েটি নিমফোম্যানিয়াক!'

'নিমফোম্যানিয়াক মানে?' মুন্সীজী জিজ্ঞেস করলেন।

নিমফোম্যানিয়াকের বিশেষ আচার ব্যবহার বিশ্লেষণ করে পূর্ণ বিবরণ শুনিয়ে বৃদ্ধ মুন্সীজীকে আঘাত দেবার দুর্দমনীয় বাসনা আমায় পেয়ে বসল। হিজ হাইনেসের কেচ্ছাও জড়িয়ে থাকবে এই বিশ্লেষণে। ইচ্ছা হোলো বৃদ্ধকে শুনিয়ে দিই কি ভাবে তাঁর চোখের ওপরেই মিসেস রাসেল তার "প্রিয় মহারাজা সাহেবের'' সঙ্গে একই বিছানায় রাত্রি বাস ক'রে যায়। ভাবলাম বলি কি ভাবে ইশারায় সমর্থন জানিয়ে বান্টি রাসেলকে তার বাবা ক্যাপটেন রাসেল হিজ হাইনেসের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে। পরে নিন্দা অপমানের ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা মারবার সুযোগের অপেক্ষায় আছে ফিরিঙ্গী ক্যাপটেন। বাসনা হয় বৃদ্ধকে আঘাত দিয়ে বলি কি ভাবে "কুসঙ্গের প্রভাব থেকে হিজ হাইনেসকে রক্ষা করার মহান্ দায়িত্বের'' লম্বা বুলির আড়ালে তিনি আত্ম-প্রবঞ্চনা করছেন; মহারাজার অনুগ্রহ লাভের জন্য বৃদ্ধ মুন্সীজী আপনি নিজে, পিয়ারা সিং এ-ডি-সি, মিঃ বুলচাঁদ পলিটিক্যাল সেক্রেটারী এবং আমি নিজেও তো মহারাজার নানারকম

খেয়াল মর্জির পূর্ণ প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি। অকাজ-কুকাজ কিছু ক'রে বসলে আমরা প্রথমে না-দেখার ভান করে থাকি এবং পরে হিজ হাইনেস যদি কিছুতে জড়িয়ে পড়েন কিংবা কোনো অঘটন হিজ হাইনেসকে জড়িয়ে ফেলে, আমরা তখন অতি ব্যস্ততার মুখোস এঁটে ঘুরে বেড়াই। এক লহমায় এত কথা আমার মনের দুয়ারে ঘা দিয়ে গেল, কিন্তু বৃদ্ধকে কিছু বলতে পারলাম না, তাকে আঘাত দিতে পারলাম না। আমাদের দেশে বয়স যে সম্মান দাবী করে আমার শিক্ষাভিমানী মনও তাকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু এই অকাট মূর্খের সঙ্গে তর্ক ক'রে কি লাভ? বৃদ্ধের আত্মসন্তুষ্টির বুদবুদ ফাটিয়ে কি লাভ একথা বলে যে, যেদিন থেকে এইসব ডাকাত সর্দারেরা রাজার উপাধি গ্রহণ করে 'হার ব্রিটানিক ম্যাজেষ্টী' মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে বিশেষ চুক্তি সম্পাদন করেছে, যেদিন থেকে এরা পররাজ্য আক্রমণের জন্য যুদ্ধরথ জোড়া বন্ধ করেছে, (কারণ, চুক্তির ফলে এদের রাজ্য-সীমানা চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে,) সেদিন থেকে এদের সর্বকর্মের ইতি হয়ে গেছে। এদের জীবনটা কি? বাল্যকাল থেকে জেনানা মহলের আবেষ্টনে এরা এঁচড়ে পাকতে পাকতে বড় হয়ে কিশোর বয়সে শিক্ষা নিতে ভর্তি হয় রাজ-কলেজে; সেখানে দু'হাতে টাকা পয়সা ওড়ানো শিখে ফিরে এসে পড়ে আমাদের মত কতকগুলো গলগ্রহের তোষামোদ ও হীন চাটুবাদের মধ্যে। জয় করবার মত আর কিছুই খোলা থাকে না তাদের সামনে, শুধু থাকে একটি জিনিস, এবং তা হোলো জেনানা। আর আমাদের হতভাগ্য দেশে জেনানা জয় করাই তো সব থেকে সোজা, যেখানে সমাজে মেয়েদের স্থান এখন পর্যন্ত পরিচালিত হয় মনুস্মৃতি ও হিন্দু মিতাক্ষরা আইনের অনুশাসনে।...

॥ দুই ॥

আমার আবাস থেকে বেরিয়ে কাঁকর বিছানো পথ দিয়ে শ্যামপুর লজের প্রধান অট্টালিকার দিকে এগোলাম। সিমলা পাহাড়ের সেই শাশ্বত বৃষ্টিধারা ঝির ঝির ধারায় ঝরছে। পেঁজা তুলোর মত মেঘগুলো উপত্যকা থেকে উঠে পাহাড়ের কোমরে আছড়ে পড়ছে। তারপর গলে গলে শিশির বিন্দুর মত নিচের সবকিছু সিক্ত করে দিচ্ছে। পাহাড়ের উপরের অংশ ও চূড়া শুকনো খটখটে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ইংলিশ সুইস ও প্রাচ্য ধরণের বাংলো-'কুটির'গুলো এক এক বার মেঘের পর্দায় ঢাকা পড়ছে, আবার একটু পরেই পর্দা সরে গিয়ে চকচকে সুসজ্জিত হালফ্যাশানের চটক দেখাতে বেরিয়ে পড়ছে। এইসব বাড়িগুলোয় বাস করে বড় বড় অফিসর, রাজা মহারাজা ও দেশী-বিদেশী মেমসাহেবরা, যাদের অনুরক্ত স্বামীরা স্ত্রীদের মুখে-দেহে স্কুল-কিশোরীর নম্র ত্বকের সরলতা রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় দিনের পর দিন ভারতের উত্তপ্ত সমতল ভূমিতে ব্রিটিশ সরকারের 'সার্ভিসে' থেকে দগ্ধ হয়ে থাকেন।

মুন্সীজীর দুঃশ্চিন্তা লাঘব করার জন্য আমি কথা কইতে শুরু করলাম: 'যা মেঘ জমেছে চারদিকে মুন্সীজী, তাতে আমাদের ঐ দানবীয় চেহারার পিয়ারা সিংও আজ সিমলা পাহাড়ে হারিয়ে যাবে।'

মুন্সী মিথনলাল উত্তর দিলেন না, অজীর্ণ রোগের উদ্গীরণ সত্ত্বেও তিনি চোখ ঘুরিয়ে চারদিকে দেখলেন। বীথির দুপাশের কেয়ারিতে প্রস্ফুটিত রংবেরংয়ের ফুলের ওপর দিয়ে আমি হাত বুলিয়ে মৃদু স্পর্শ গ্রহণ করতে লাগলাম। বাগানের গাছ ও লতায় ফুটে রয়েছে কত শোনিমাভা ফুলের স্তবক···পাটল বর্ণের কত মনমাতানো ফুল, কলাই-মটর, পদ্ম-পপি ফুশিয়া ডালিয়া, ধূমল প্যানজি, রক্তবর্ণ জেরানিয়াম, গ্ল্যাডিয়লি, ফরগেট-মি-নট···

বৃষ্টির ছাঁটে ফুলগুলি নুয়ে পড়েছে নোয়ানো লতার উপরে, মনমাতানো রংগুলো কিছুটা ভোতা হয়ে গিয়েছে···আমার সমাদরের উত্তর দেবার মত মন-মেজাজ যেন ওদের এখন আর নেই। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমার মনের পুরোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হোলো। মনের মধ্যে সুমতি-কুমতির প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের ঝড় উঠল : 'তোমার ভবিষ্যত জেনেই তো তুমি হিজ হাইনেসের কাজে যোগ দিয়েছিলে ডাক্তার। তুমি তো জানতে যে প্রত্যেকটি ভারতীয় নবাব মহারাজার মতই তোমাদের এই মহারাজাও অত্যন্ত খামখেয়ালী। যখন তখন এরা হাজারো অদ্ভুত অঘটনের নায়ক হয়ে পড়ে এবং তাতে তুমি জড়ালে কিংবা মহারাজা নিজে জড়িয়ে পড়লেন কিংবা অন্য কাউকে তার ভাল সামলাতে হোলো, এঁরা তা ভাবেনই না। তোমাকে বিলেতে পড়ার জন্য মহারাজার স্টেট থেকে টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমার মনে কর্তব্য-বোধের পীড়ন স্বাভাবিক। সে-কতর্ব্যবোধের কথা ছেড়ে দিলেও, মহারাজার প্রিয়পাত্র, তার "সখা, সুহৃদ ও মন্ত্রণাদাতা" হিসেবে তাঁর ওপরে প্রভাব বিস্তার ক'রে ধীরে ধীরে সমগ্র স্টেটের ওপর তোমার প্রভাব বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন কি তুমি দেখ না? হুঁ: চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে স্টেট ছেড়ে যাবার জন্য স্যুটকেস-বাক্স সাজিয়ে সব সময়ই প্রস্তুত থাকতে হয় বটে, কিন্তু এই আশঙ্কার কথা তুমি কোনদিন ভাবও না! কারণ, তোমার ধারণা, মহারাজার আর যে দোষই থাকুক না কেন, তার বন্ধুপ্রীতি অনিন্দনীয়। তবে মহারাজার এই শেষ-খেলার জন্যে হয়তো এবারে সত্যিসত্যিই স্যুটকেস সাজাতে হবে। কারণ, এই ঘটনা তো একটা আকস্মিক কিছু নয়। ব্রাহ্মণকন্যা গঙ্গাদাসীর প্রতি মহারাজার যে গভীর আকর্ষণ আছে, তারই বিরুদ্ধে এবং তাকে বন্ধ করবার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে পাটরানী ইন্দিরা দেবীর আবেদন, এবং গঙ্গাদাসীর কারসাজির ফলে মহারাজাও দৈহিক সুখ ও কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য একের পর এক উন্মত্ত দুঃসাহসিক যৌনকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। ডাক্তার হিসেবে তো তুমি

জান যে হিজ হাইনেস কি ব্যারামে ভুগছেন এবং বারে বারে সে-রোগের প্রকাশ এইভাবেই হয়ে থাকে। মানুষ হিসেবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রয়োজন তো তোমার আছে। তাই আরও জড়িয়ে পড়বার আগে মহারাজার স্নেহ-বিশ্বাস, তার সর্বগ্রাসী সীমাহীন অহম বোধের শৃঙ্খল কেটে তোমাকে বেরিয়ে আসতে হবে, যা তোমার চারপাশে জালের মত ঘিরে রয়েছে; তোমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের আর একটি কণ্ঠ প্রতিবাদ জানায়: 'টাকা যখন ধার করেছ এবং সে-টাকা যখন এক্ষুনি তুমি পরিশোধ করতে পারছও না এবং তার পরিশোধের চুক্তি হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেছ, তখন তা ছেড়ে বেরোতে পার না, বিশেষ ক'রে, তুমি যখন ডাক্তার হিসেবে বিশ্বাস কর যে ঠিক মত সাহায্য করলে হিজ হাইনেসকে তার বর্তমানের অধঃপতনের রাস্তা থেকে সুপথে নিয়ে আসতে পারবে। আর, ডাক্তার হিসেবেও তো তোমার কর্তব্য যে মহারাজা যাতে তার নিজের উপরে আস্থা ফিরে পান, গঙ্গাদাসীর প্রভাবে যে-আস্থা যে-বিশ্বাস একেবারে ভেঙ্গে গেছে, তা ফিরে পেয়ে আবার স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে আসতে পারেন।'

অন্তরের দ্বন্দ্ব শেষ হবার পূর্বেই হঠাৎ নজরে পড়ল, ভগীরথ বেয়ারা প্যাগোডা আকারের দোতলা অট্টালিকার বারান্দা থেকে সোজা বাঁ দিকে যে-পথটি ঘুরে গেছে সেই পথ দিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। দু'হাত জুড়ে অভিবাদন জানাতে জানাতে ভীত কণ্ঠে ফিস ফিস ক'রে আমাদের জানালে: 'মহারাজা ফিরে এসেছেন!'

একজন পুলিস সাব-ইনস্পেক্টর ভগীরথকে তাড়া দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল: 'আয়, এধার আয়! ব্যাটা, বলেছি না হুকুম ছাড়া বাংলো ছেড়ে কেউ বেরুতে পারবি না!'

'ও এই রাজপ্রাসাদেরই চাকর।' মুন্সীজী বললেন।

ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম প্রাসাদের নানাস্থানে চাকর, বেয়ারাদের আশে পাশে ছোট ছোট দলে ভারতীয় পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে ফিস ফিস করে কি সব কথা বলছে তারা। নিচের তলায় ক্যাপটেন রাসেলের বারান্দায় একদল দাঁড়িয়ে, আর একদল দাঁড়িয়ে দোতলার ঝুল-বারান্দায়। ঝুল-বারান্দার ওপাশে ফরাসী কায়দায় জানালা ফিট করা তিন কোণা ছাদের ঘর। আবহাওয়াটাই যেন বদলে গেছে··· দু'মুখীন স্রোতের সংঘর্ষে সমস্ত বাড়িটাই যেন বিদ্যুৎপূর্ণ, কেবল ফিস ফিস আর গুঞ্জন। অধৈর্য হিজ হাইনেসের রাগ-চিৎকারে যে-প্রাসাদ সর্বসময়ে সরগরম থাকত, সেখানে এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা অবস্থাকে আরও ভয়ানক করে তুলেছে। যেন সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে, যেন বাড়ীর মাঝে কোথাও একটা অবিস্ফোরিত বোমা পড়ে আছে, যেন বোমাটি এখনও ফাটে নি এবং স্বাভাবিক ভাবে ফাটবেও না। কিন্তু কি জানি, হঠাৎ যদি দেবরাজ ইন্দ্র বংশোদ্ভূত ও শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর আমাদের হিজ হাইনেসের মস্তকের চারদিকে যে অদৃশ্য দেবজ্যোতি উদ্ভাসিত হয়, তারই সংস্পর্শে একটি ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর পাত এসে পড়ে, কিংবা যে কোনো পার্থিব-অপার্থিব দাহ্যবস্তুর সঙ্গে সেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ছোঁয়া লেগে যায়!

পুলিশ সাব-ইনস্‌পেক্টরের সঙ্গে মুন্সীজী কথা কইছিলেন, আমি পাশে প্রতীক্ষা করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম মিসেস রাসেল বারান্দায় এসে চিৎকার করে ডাকছে: 'বেরা! বেরা!' আমাকে সে দেখেছে কিন্তু না-দেখার ভান ক'রে অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। ভাবলাম, বাণ্টি কেমন আছে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু মিসেস রাসেলের মসৃণ লালসীক মুখের সেই স্বাভাবিক মোহিনী ও ছেনালী ভাবটা যেন এখন চোখে পড়ছে না। নাকটা উঁচিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে, তার শক্ত চোয়ালের ওপর রাজ্যের রাগ মুখ ভার করে চেপে বসেছে—হাবভাব সবকিছু মিলিয়ে মিসেস রাসেল যেন একটি নিষেধের প্রতীক, তর্জনি তুলে যেন নিষেধ করছে, কোনো

কথাবার্তা তার সঙ্গে চলবে না। মেম সাহেব চেঁচিয়ে বলছে : 'বেয়া, মিসি সাহেবকা ঘুসলকে লিয়ে গরম পানি ল্যা আও !' বুঝলাম, হিজ হাইনেসের সঙ্গে সিমলা পাহাড়ের প্রেম-গলিতে পালিয়ে যাওয়ার ফলে মিস বাশি রাসেলের আর কিছু হোক আর নাই হোক, ঠাণ্ডা লেগেছে।

'আঃ ডাক্তার! ঐ বহিন-চো— মেমনির দিকে তাকিয়ে দেখছ কি ?' চোস্ত পাঞ্জাবী ভাষায় পিয়ারা সিংএর কর্কশ কণ্ঠ ফেটে পড়ে : 'ঐ কুত্তিকে ছেড়ে একবার হিজ হাইনেসের নাড়িটা দেখ গিয়ে !'

মোহাবিষ্ট হয়ে যেন আমি এগিয়ে গেলাম। এই বিরাট দেহী পাঞ্জাবী শিখটির অশ্রাব্য অসভ্য ভাষা শুনে আমি ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলাম, এবং আমার ভদ্রতা-বোধে এত আঘাত লেগেছিল যে আমি সম্পূর্ণভাবে তার থেকে তখনও মুক্ত হতে পারি নি, যদিও এই লোকটির কদাকার তর্জন-গর্জনকে আমি সব সময়ই ভয় করতাম। মধ্য পাঞ্জাবের মাহ্‌জা জেলায় বাড়ি তার, এক পুরোনো জমিদার-পরিবারের বংশধর। লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে সাত সাত বার চেষ্টা করেও বি-এ ডিগ্রী নিতে সে সক্ষম হয় নি। তবে দৌড়-ঝাপ, একশ গজি দৌড়, বর্শা ছোড়া প্রভৃতি খেলায় সব কয়টি উপহারই সে জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টি বটে এই পিয়ারা সিং। সাত ফুট লম্বা। মুফতী কিংবা মিলিটারী পোষাকে সত্যিই সে যে-কোন রাজার দর্শনীয় সম্পত্তি বটে! পিয়ারা সিংএর কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন আবার হিজ হাইনেসের রাজ-কলেজের প্রিন্সিপালের বন্ধু। প্রিন্সিপালের অনুরোধে পিয়ারা সিং হিজ হাইনেসের এ-ডি-সির কাজে নিযুক্ত হোলো। কুৎসিত, দানব-বলিষ্ঠ, পিপে-মাতাল, পেটুক, মাথায় লম্বা চুলের ঝুটির নিচে মগজ বলে কিছু পদার্থ আছে বলে মনে হয় না, এমন একটি লোক হোলো এই পিয়ারা সিং। পিয়ারা সিং-এর খেলোয়ারী হাবভাব হিজ হাইনেসের খেলোয়ারী মনোবৃত্তির সঙ্গে খাপ খায়, যে-মনোবৃত্তি তাঁর মধ্যে লালিত পালিত হয়ে

বর্ধিত হয়েছে তাঁর বাল্যকালের শিক্ষা-স্থান সিমলা শহরের বিশপ কটন কলেজে এবং লাহোরের রাজ-কলেজে। পিয়ারা সিংএর অমার্জিত আচরণ ও মন্তব্য আমাদের রুচিবোধে ভীষণ আঘাত দিত; তবে তার সম্বন্ধে একটা কথা নিশ্চয়ই বলব যে তার দিলখোলা হাসি, তার ঔদার্য, তার সামাজিক গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়ে ভব্যতাবিহীন অপরিমিত আন্তরিকতা এত ব্যাপক ছিল যে তার ঐ শিষ্টতাবিহীন ব্যবহারের দাগ মন থেকে প্রায় মুছে দিত। বন্ধু হিসেবে সে যেমন বিশ্বাসী, শত্রু হিসেবেও তেমনি একগুঁয়ে। সুতরাং প্রথম দিকে আমার সঙ্গে দু'একটা ছোট খাট সংঘর্ষ হবার পরেই পিয়ারা সিংকে তার অমার্জিত রুচিবোধের দহে ডুবতে দিয়ে তার ও আমার মধ্যে একটা লম্বা ব্যবধান রক্ষা ক'রে আমি চলতে সুরু করলাম, তার অমার্জিত কথাবার্তা গায় না মেখে হেসে উড়িয়ে দিতাম।

বীথি ছেড়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'হিজ হাইনেস কোথায় হাওয়া হয়েছিলেন, পিয়ারা সিং?'

'অও বেয়াকুফ্, ঐ যে ছোট কুত্তিটা আছে না, ওকে নিয়ে একটু খাদে গিয়েছিলেন!' জবাব দিল পিয়ারা সিং তার স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠে, কিন্তু স্বরটা একটু উচ্চগ্রামে তুলে, যাতে আশেপাশের সকলেই শুনতে পায়। একই স্বরে সে বলে চলল: 'এই তো সেদিন এন্নানডেলে এক ধোপার হাত থেকে মহারাজাকে উদ্ধার করলাম! হঠাৎ সেদিন রজকিনী সহ হিজ হাইনেস একেবারে ধোপার কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন! কিন্তু এবারে বাপু হালচাল যা দেখছি তাতে তো মনে হচ্ছে সব কিছু আমার এই লম্বা হাতের আওতার বাইরে গিয়ে পড়েছে তোমাদের ঐ কলম ধরিয়েদের হাতে! এবারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফয়সলা করতে হবে ঐ ধূর্ত বানিয়া বুলচাঁদ কিংবা তোমার মত শিক্ষিত ডাক্তারকেই··· !'

এই বলে তার মনের ভয়ঙ্কর প্রফুল্লতার তাল সামলাবার জন্য আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হ-হ-হা-হা শব্দে হাসিতে ফেটে পড়ল। তার সেই মৃদু

চপেটাঘাতে আমি পড়তে পড়তে প্রায় কোনোমতে তাল সামলিয়ে নিলাম, আমার মনে হোলো পিঠ বুঝি আমার ভেঙে খান খান হয়ে গেল। বিরক্তিতে আমার মুখ দিয়ে একটা হিন্দুস্থানী লব্জ্ বেরিয়ে গেল।

'কাপটান সাহিব!' সুউচ্চ কণ্ঠে মুন্সী মিথনলাল চেঁচিয়ে উঠলেন। তার চোখে মুখে ভৎ'সনার চিহ্ন। পুলিস সাব-ইনস্পেক্টরের সঙ্গে তখনও তিনি কথা বলছিলেন।

'অ—, ডাক্তার তুমি শোন নি বুঝি? মুন্সীজীর মা মারা গেছেন!' পিয়ারা সিংএর বিশ্রী বিরক্তিকর হাসি-ঠাট্টা আবার সুরু হোলো।

সতর্ক দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে আমি হিজ হাইনেসের কক্ষের দিকে পা বাড়ালাম:

॥ তিন ॥

খাবার ঘর পেরিয়ে হিজ হাইনেসের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলাম। আমাকে দেখে হিজ হাইনেস চট ক'রে উঠে বসে শরীরটা একটু ঝুঁকে এগিয়ে দিয়ে ছেলেমানুষের মত আমার পা দু'টি জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দয়া ভিক্ষার করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। এটাই ছিল হিজ হাইনেসের মন ভিজানোর কায়দা। নরম মুক্তার মত তার চোখ দুটো চক চক করছে অপ্রশস্ত কপালের নিচে। তাঁর মুখটা অতি সাদাসিধে; গালদুটো ঈষদ ভাঙা, দীঘল নাক, পুরু ঠোঁট, ক্ষীণ হা, ছুঁচলো চিবুক, এবং কানদুটো একটু লম্বাটে।

'এবার বোধ হয় তুমিও মুন্সীজীর মত আমার ওপর রাগ করবে ডাক্তার—' নিরস্ত্র কণ্ঠে তিনি বললেন।

আমি নীরব রইলাম। তাই দেখে হিজ হাইনেস একটু সন্ত্রস্ত কণ্ঠে আবার বললেন: 'বল ডাক্তার, তুমি রাগ করনি···তুমি তো জান যে আমি

অসুস্থ। ও-রকম গুরু-গম্ভীর ভাব নিয়ে থেকো না ডাক্তার!...' সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল হাসি হেসে পিয়ারা সিংকে বললেন: 'কাপটান সাহিব, দেখেছ, ঐ পালের ষাঁড় মিঞা মিথুর প্রভাবে পড়লে আমাদের ডাক্তারও কেমন বোকা বনে যায়! এখনি দেখবে সুপথে চলবার জন্য বক্তৃতা সুরু হয়ে যাবে!

'না হাইনেস, সুপথ সম্বন্ধে আর আমি আপনাকে কি বলব। তবে বৃষ্টি বাদলের দিনে সিমলা পাহাড়ের আঁকাবাঁকা খাদখন্দে ওভাবে না যাওয়াই ভাল। একবার পা হড়কে গেলেই, ব্যাস্!'

'গর্দভদেরই শুধু পা হড়কায়!'

'হুঁ, তা ঠিক, একগুঁয়ে খচ্চররা খাদের পথে ঠিক চলতে পারে!' শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে আমি বললাম।

'আরে আমি তো আর খোজা খচ্চর নই!' নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসতে বসতে হিজ হাইনেস উত্তর দেন।

'বেশ, হাইনেস, আপনি তবে খুব তেজী ঘোড়া!' আমার স্পোর্টস্-সার্টের পকেটে থেকে থার্মোমিটার বের করতে করতে বলি: 'এবারে একবার শরীরের তাপটি দেখতে হবে।'

'আঃ ডাক্তার, আমার জিভের নিচে থার্মোমিটার লাগিয়ে কি করবে! আমার অসুখ তো এইখানে, এই বুকে!' ভাবপ্রবণ কাব্যকণ্ঠে হিজ হাইনেস বলেন। পরমুহূর্তে হঠাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে বলতে আরম্ভ করেন: 'আমার ওপর সবসময় এই ভাবে খবরদারী করতে পারবে না ডাক্তার! তা যদি কর, বুঝব, আমার ওপরে তুমি রাগ করেছ, মিঞা মিথুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছ আমার বিরুদ্ধে!'

তিরিশ বছর বয়স হতে চলল হিজ হাইনেসের, বয়স আন্দাজে তাকে দেখায় আরও বেশী, তাঁর ঐ বালসুলভ ঠোঁট উল্টোন দেখে আমার ভারি বিশ্রী লাগে।

'আচ্ছা, টুলিপ !'—আমি হিজ হাইনেসের সত্যিকারের নাম দলীপ সিং-এর সাহেবী বিকৃত নামেই ডাকলাম। নামের এই বিকৃতিটি করেছিলেন রাজ-কলেজের সাহেব প্রিন্সিপালের মেম, এবং এই বিকৃত নামেই মহারাজার বিদেশী বন্ধুরা তাঁকে ডেকে থাকে। বিশেষ করে ইদানীং বান্টি রাসেলের ঘনিষ্টতার জন্যে এই নামটি মহারাজার মনের সাগরে জোয়াড় তুলছে।

'আঃ, মাসের পর মাস ধরে আমাকে যখন তখন এসে কেবল ডেকেছে "টুলিপ, টুলিপ"···তোষামদ, আদর ক'রে শুধু ক্ষেপিয়ে গেছে। তারপর বিশেষ মুহূর্তে যখন এগিয়ে গেছি, শালী, চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলে!'

'হুঁ, তা সত্ত্বেও ঐ মাগীর বাপ-ব্যাটা এত হৈ হৈ করছে!' বলল পিয়ারা সিং : 'শালী ! খেলোয়ারী কুত্তি ! আর, কিভাবে আসত এখানে, সবসময়ে যেন পটের বিবি !'

'তুমি বলতে চাইছ জীপসি মেয়ের মতন সাজ করতো···কানে মাকড়ী, আঙ্গুলে আংটি, পায়ে ঘুঙুর, নাকে—'

'শালী খানকী !' মহারাজার কথার মাঝেই বলে ফেলে পিয়ারা সিং।

'চোপরাও কাপ্তান উল্লু সিং !' রাজকীয় ক্রোধে ফেটে পড়েন হিজ হাইনেস, কারণ, বান্টিকে গালাগাল দেবার অধিকার তো তারই শুধু আছে !

এবং, মুহূর্তের জন্য, তাঁর গালের মলিন গম-আভা হঠাৎ শোনিত-লাল হয়ে ওঠে, চোখ ঠিকরে যেন আগুন বের হয়, দীঘল নাক ক্রোধে ওঠে কেঁপে, তেল-চকচকে মসৃণ চুলের গোছা এসে পড়ে কানের লতির ওপরে। বক্রনলের মত লম্বা গলার কণ্ঠমণি উঁচু হয়ে ফুটে ওঠে। মনে হয়, ক্রোধে মহারাজা বুঝি ফেটে গিয়ে চুপসে পড়বেন। পিয়ারা সিং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং আমিও থার্মোমিটারটি তাঁর মুখের দিকে বাড়িয়েদি। শান্ত ভাবে দেহ এলিয়ে দিয়ে হিজ হাইনেস মৃদু হাসলেন। হাত-ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে আমি সেকেণ্ড গুনছি, এমন সময় প্রবেশ

করলেন মুন্সীজী। মহারাজার পাদু'টি জড়িয়ে একটু বাড়াবাড়ি সুরু করলেন।

'আঃ মহারাজ! কী যে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন! কি যে করব, কি যে হবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না! কোথায় যাব, কি করব!...আপনার মাথা এখনও ভিজে দেখছি। ঠাণ্ডা লাগে নি নিশ্চয়! এবারের মূলে আছে ঐ হারামী বেটি,—'

বাল্টির উল্লেখে ফাটতে ফাটতে কোন মতে চেপে গেলেন হিজ হাইনেস—মুখে যে থার্মোমিটার! তবুও অধৈর্য দেহটি তারই মধ্যে নড়েচড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বিছানায় বসে তাঁকে চেপে ধরে বসিয়ে দিলাম। মুন্সীজীকে ঘরের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করে বললাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত হিজ হাইনেসের শরীরের তাপ নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন তাঁকে উত্তেজিত করা না হয়। হিজ হাইনেসও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। মহারাজার মনোবস্থা বিচার করে মুন্সীজী তো তার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন না। তাঁর প্রকাশের ভঙ্গিমা হোলো গোদা গোদা হাত দুটো এক জায়গায় করে দাস-জনোচিত নাকি কান্নায় বিনীত নিবেদন করা। মুন্সীজীর স্থান পরিত্যাগ তো দূরের কথা, তিনি মহারাজার পা ছুঁয়ে বলতে লাগলেন:

'কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলেন আপনি। সমস্ত বিকেল ধরে পেটের গোলমালে ভুগছি।...বিশ্বাস না হয় ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন।...এখন আমরা এখানকার কর্তৃপক্ষকে কি বলি? পুলিশকেই বা কি বলব? এ তো আর আমাদের শ্যামপুর নয়।...মেয়েকে দেখে যাবার জন্যে সিভিল হাসপাতালের কর্ণেল জেভন্‌স্‌কে ফোন করেছে মিসেস রাসেল। এই ঘটনা তো চাপা থাকবে না, বাতাসের মুখে ছুটবে। হায়, কি যে করি এখন!...'

হিজ হাইনেসের মাথায় রক্ত টগবগিয়ে উঠছে। থার্মোমিটার সম্বন্ধে এখন সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি মুখ থেকে বের করে নিলাম।

'খুব বেশী জ্বর হয়েছে কি ?' প্রশ্ন করে মুন্সীজী আমাকে যেন ভালুকের মত আবৃত ক'রে ধরলেন।

হিজ হাইনেস আদেশ করলেন : 'মুন্সীজী অনুগ্রহ ক'রে বাইরে যান!'

'একশ এক—' একটু জোরেই বললাম যাতে সকলেই শুনতে পায়। তারপর আমি হিজ হাইনেসকে বললাম ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়তে। ভগীরথ বেয়ারাকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু মুন্সীজী তো চুপ করে থাকতে পারছেন না। তিনি বলে বসলেন : 'কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই ঘটনা নিয়ে কি করব আমরা ? ভাবছি, ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এখান থেকে পুলিশ অপসারণ সম্বন্ধে বলব কিনা।'

আমি বলিলাম : 'মুন্সিজী, পুলিশ যদি একটা বিবৃতি পেলেই খুশি হয়তো তা দিয়ে দিন। আর, তাছাড়া, ইতিমধ্যে বান্টির ঘটনা তারা নিশ্চয় জেনে গেছে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে পিয়ারা সিং প্রবেশ করে বলে : 'কর্ণেল জেভনস্ একতলায় অপেক্ষা করছেন। দায়িত্বশীল কোনো একজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

হিজ হাইনেস গর্জন ক'রে ওঠেন : 'ব্যাটাকে বলে দাও যেন ওর মার কাছে খোঁজ করে গিয়ে! নিজেকে কি মনে করেছে শালা! বাঁদর মুখো! হারামী ব্যাটা, জানেনা আমি কে ? বের করে দাও, প্রাসাদ থেকে দূর করে দাও, দূর করে দাও!' মূর্চ্ছাপ্রায় অবস্থায় হিজ হাইনেসের কর্কশ খিটখিটে স্বর পঞ্চমে উঠে গেল, তার কুঞ্চিত দৃঢ়-কঠিন মুখে কালসিটে পড়ে অদ্ভুত বিশ্রী দেখাতে লাগল, তার নমনীয় দেহটি বিষধর সাপের মত কুঁকড়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে সকলে তাঁর চারদিক ঘিরে ডাকতে লাগলাম :

'হাইনেস! হাইনেস!'

বিছানায় পড়ে হাত পা ছুড়তে থাকেন হিজ হাইনেস, মুখে ফেনা·

ঘোলাটে চোখ দুটো উপরের দিকে খোলা···নিষেধের নির্দেশ নিয়ে কোন্ সুদূরে দৃষ্টি যেন হারিয়ে গেছে।

'আরে, বাপ, শান্ত হোন, শান্ত হোন!' দু'হাত জুড়ে মুন্সী মিথনলাল প্রার্থনা করেন। তিনি বুঝতে পারেন না যে তাঁর এই তোষামদে হিজ হাইনেস আরও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠছেন।

মহারাজার বিছানার পাশে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম। হালচাল দেখে আর এদের হৈ চৈ চিৎকারে এত বিশ্রী লাগছিল যে আমি স্থান ত্যাগ করবার জন্য ফিরে দাঁড়ালাম।

'ও হরি, হরি, যেও না, যেও না!' কাষ্ঠ-কঠিন কৃত্রিম আবেগপূর্ণ কণ্ঠে হিজ হাইনেস চিৎকার করে ওঠেন। তারপরেই এক অদ্ভুত অমানুষিক উখা-ঘষা ঘর্ঘর শব্দে চিৎকার করে হাউ হাউ শব্দে কাঁদতে থাকেন, বিছানার চাদরে মুখ ঢেকে দু'হাত দিয়ে কপাল থাপড়াতে থাপড়াতে ধিক্কারজনক নাকীসুরে হিন্দুস্থানি ইংরেজী ভাষায় ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকেন: 'ও বান্টি, বান্টি, কেন আমায় এ ভাবে ধূলোয় টেনে নামালে ··ও বান্টি, তুলতুলে নরম কুমারী মেয়ে, ওগো বান্টি, তোমার চুমু···'

'আঃ,—হাইনেস!' বেশ একটু সু-উচ্চ কঠিন কণ্ঠেই আমি বললাম। এই উন্মত্ত নীচতা আমি ঠিক সহ্য করতে পারছিলাম না। দৃঢ় কণ্ঠেই আমি বললাম: 'শান্ত হোন হাইনেস। এইভাবে যদি বাড়াবাড়ি করেন তো আপনার স্বাস্থ্যের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। কর্ণেল জেভন্‌সের সঙ্গে আমি দেখা করছি। তাতে হয়তো তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে নাও চাইতে পারেন। সব শোনার পর তিনি 'সার্টিফাই'-ও করতে পারেন যে,—কিংবা···সে যাই হোক, আপনি চুপচাপ শান্ত হয়ে একটু ঘুমোন তো···কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।'

নিচুতলায় নামতে নামতে দেখি ভগীরথ বেয়ারা, ব্রাহ্মণ পাচক বদ্রিনাথ ও প্রাসাদের অন্যান্য চাকর বাকর ক্রীতদাসের মত হাত-জোড়

ক'রে দাঁড়িয়ে আছে হিজ হাইনেসের খবর জানবার জন্য, কিন্তু প্রশ্ন করে জানবার মত সাহস নেই তাদের। প্রথম যখন আমি চাকরিতে ঢুকি, তখন এদের এই ক্রীতদাসসুলভ হীনভাব দেখে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করতাম ; কিন্তু পরে আস্তে আস্তে একে রাজকীয় সমারোহের অঙ্গ হিসেবেই গ্রহণ করে নিয়েছি। তবে মহারাজার কিংবা তাঁর পারিষদবর্গের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তাদের যখন সম্মান প্রদর্শন করতে দেখতাম, তখন আমার আত্ম-সম্মানবোধে খচ্ খচ্ করে বিঁধতো।

নিচুতলার বারান্দায় পুলিশ সাবইনস্‌পেক্টর তখনও দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে এক ঝাঁক কনস্টেবল। চারিদিক থমথম। মুন্সী মিথনলালের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে আমি যখন এসেছিলাম তখন এরকমটি ছিল না। ভারতীয় পুলিশের যা বিশেষত্বঃ,—সেই নিয়মানুগ নিষ্ঠুরতা মাখানো কঠিন ও মূক আনন নিয়ে কনস্টেবলরা দাঁড়িয়ে আছে। দেখে কিছুটা ভগ্নোদ্যম হয়ে গেলাম।

কর্ণেল জেভন্‌স তখনও ক্যাপটেন রাসেলের ফ্ল্যাট থেকে বের হননি দেখে আমি বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে পায়চারী করতে করতে একটা বাঁকা থামের সামনে এসে দাঁড়ালাম। নিজেকে যেন বড় ছোট মনে হতে লাগল। আত্ম-সচেতনতা ও একাকী-বোধ বড় বেশী যেন নাড়া দিতে লাগল। নিজের আত্ম-সম্মানবোধ অত্যন্ত সচেতন ভাবে বছরের পর বছর ধরে জাগরুক রেখেছি, কিন্তু এখন কেন যেন এইসব পুলিশদের আমার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে হতে লাগল। আমার মনে হয়, শিশু-বয়সের প্রথম-ভীতি মন থেকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না, এবং আমি কখনও ভুলতে পারি না গর্বদ্যোত স্টেট-পুলিশ কর্তৃক চুরির অপরাধে রাজ-প্রাসাদের জনৈক চাকরকে সেই নিষ্ঠুর প্রহারের দৃশ্য। এই অবস্থায় আমার মনের সংগোপন কোণের সেই পুলিশ-ভীতি এখন কর্ণেল জেভন্‌সের সঙ্গে দেখা করার বিপদের সঙ্গে মিশে আমার

হৃদকম্প সৃষ্টি করছে। কারণ, পুরুষানুক্রমে ইংরেজদের কাছে লাথি-অপমান সহ্য করে আমাদের ভারতীয়দের মনে এক অদ্ভুত ইংরেজ-ভীতি বদ্ধমূল হয়ে যায়, যার প্রভাব আমাদের মনে ভারতীয়-কর্মচারী-ভীতি থেকেও অনেক বেশী। মানুষ হিসেবে ভারতবর্ষে ইংরেজ চিরকালই অজানা থেকে গিয়েছে। বহু দূরের উচ্চমার্গের জীব সে, নীরব গম্ভীর, তার মানবতাবোধের কোনো পরিচয়ই কেউ জানে না; তার ব্যবহার সর্বসময়েই কর্তৃত্বের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে থাকে। এবং ভারতবর্ষে সরকারী সীমাহীন ক্ষমতার প্রতীকও তো সে। তাছাড়া, তার রক্তহীন গাত্রবর্ণ ভারতের উষ্ণ আবহাওয়ায় লালচে বনে গিয়ে তার থেকে আর ঈশদ-পিঙলবর্ণ মুখের স্পর্শ-সুকোমল মোহিনীশক্তি বিচ্ছুরিত হয় না; তার পরিবর্তে তার বিশ্রী দগ্ধ মুখে ফুটে থাকে ঘৃণা-অপমান মাখানো মরু-শুকনো ঔদাস্য, ফুটে থাকে গলিত কুষ্ঠক্ষতের ভীতিপ্রদ মারাত্মকতার ছুঁয়োনা-ছুঁয়োনার মত ব্যবধানের কঠিন নির্দেশ।

মাথা তুলে আমি তাকালাম সামনের দিকে। এন্নানডেলের উপরের গহ্বরগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠচে। মেঘ ও কুজ্ঝটিকা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। রডডেনড্রন গুল্মের বেড়াজাল পেরিয়ে কনষ্টিটিউসন পাহাড়ের চড়াইয়ে দেবদারু ও পাইন গাছের পত্রপল্লবে মৃদু সমীরণের দোলা লেগেছে। এ-পাহাড়ের 'পৃথ্বীছত্র' উপাধি ঠিকই দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ী উপত্যকার শীতল বারিধারা নালা-খাদ চুইয়ে ঝরণা-প্রপাত বেয়ে নিম্নভূমির কঠিন গ্রীষ্মকালের উষ্ণতার উপরে জলসিঞ্চণ করবে।...

চারিদিকের হরিৎশ্রী তৃণাবৃত ভূমির সৌন্দর্যে আমি ডুবে থাকতে পারলাম না। কর্ণেল জেভনস বার্টি রাসেলের দেহে যদি চিহ্ন কিছু পেয়ে থাকেন তো মামলা অনেক দূর গড়াবে। আমাদের সকলকেই নিয়ে টানাটানি হবে। এইসব ভেবেই মন খিঁচড়ে আছে। ক্যাপটেন রাসেলের সজ্জাকক্ষের দিকে তাকিয়ে আমি কর্ণেলের প্রতীক্ষা করতে

লাগলাম। . বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না, সাহেব বেরিয়ে এলেন। তাঁর গোলাকৃতি মুখে মৃদু হাসি, তাঁর প্ল্যাটিনাম-শুভ্র ভ্রূর নিচে স্ক্যানডা-নাভিয়ানদের মত নীল চোখ দুটো দুষ্টুমিতে নাচছে, কাঠির মত পা দুটোর ওপরে তাঁর ভারী দেহটা অদ্ভুত চটপটে মনে হচ্ছে, বিশেষ করে লম্বা বুট ও ব্রীচেসের তৎপরতা-সৌষ্ঠব তার চটপটে ভাবকে আরও যেন বাড়িয়ে দিয়েছে।

'ওঃ, মিঃ হ্যারিশঙ্কার—!' বেশ আন্তরিকতা ফুটিয়ে কর্ণেল আমার হাত চেপে ধরলেন। আমাকে তিনি চিনতে পেরেছেন। কিছুদিন আগে হিজ হাইনেসকে সঙ্গে নিয়ে পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

'আমি শ্যামপুর মহারাজার ডাক্তার—' কর্ণেলের চিনতে-পারাকে নিশ্চিত করবার জন্যও বটে, আর অপরিচিত লোকদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের বাধা বাধা ভাবটা কাটাবার জন্যও বটে, একটু সময় নিয়ে আমি কথাটা বললাম।

'এম. ডি. ডিগ্রী না থাকলে আমরা চিকিৎসক ও অস্ত্রচিকিৎসকেরা ইংল্যাণ্ডে নিজেদের ডাক্তার বলে অভিভাষণ করি না,—মিষ্টার বলাই ঠিক!' আমার দিকে একটি নুইয়ে বেশ হাসিঠাট্টা বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠেই কর্ণেল বললেন। তবুও মনে হোলো তার মধ্যে একটা চাপা শ্লেষ রয়েছে, বিশেষ করে তাঁর ব্যবহারে অনুগ্রহ-দর্শনের ভাব তো অত্যন্ত পরিস্ফুট।

'তা বটে, তা বটে—' বিড়বিড় ক'রে আমি বললাম: 'আমাদের দেশে ডাক্তার পদবী ব্যবহার করা সহজ।'

একটু সামলে নেবার আগেই কর্ণেল জিজ্ঞেস করলেন:

'হাইনেস আছেন কেমন?'

আমার ইংরেজী বুলিতে তোতলামির ধাক্কা লাগল:

'তা, তা তিনি আছেন ভালই—'

'তা তো থাকবার কথা নয়,' কর্ণেল জেভন্‌স আমার কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে চুপি চুপি মন্তব্য ক'রে জোরে হেসে উঠে চোখ নাচালেন। এবারে আমার একটু ভয়ই হোলো।

তাড়াতাড়ি আমি বললাম : 'আমি তো ভালই দেখেছি, কর্ণেল। ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর হয়েছে, এই মাত্র। তা ছাড়া তিনি মোটামুটি ভালই আছেন।'

'স্বাস্থ্যের দিকে হাইনেসের বিশেষ নজর নেই, ঠিক না?' ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন কর্ণেল। তারপর আমার দিকে আর একটা চোরা চাহনি হেনে বিশ্বস্ততার ভাব ফুটিয়ে যোগ দিলেন : 'বড বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন হিজ হাইনেস—' কথায় একটু জোর দেবার জন্য মাথা নেড়ে বললেন : 'এতটা ভাল নয়, কি বলেন!'

বুঝলাম, "বড় বেশী বাড়াবাড়ি" বলে কর্ণেল জেভনস অপরাহ্নের ঘটনার ইঙ্গিত করছেন, এবং সেই ইঙ্গিতের পিছনে রয়েছে কামনাতুর মহারাজার প্রেমের স্বপ্ন দেখার রোগের ; যে-রোগের চিকিৎসার জন্য দিনকয়েক আগে কর্ণেলের কাছে পরামর্শ নিতে গিয়েছিলাম।

কি বলতে চান কর্ণেল জেভনস? মিস রাসেলের দেহে কি কোন চিহ্ন পেয়েছেন? সোজাসুজি সেকথা বলে আমার দুঃশ্চিন্তা লাঘব যদি করতেন কর্ণেল! সাহসে ভর করে সেকথা জিজ্ঞেস করবার আগেই, স্টেথিসকোপ পকেটে পুরে কর্ণেল হাঁটতে আরম্ভ করলেন। আমি অনুসরণ করলাম। বিথীর দিকে তাকাতে তাকাতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন :

'আচ্ছা, হিজ হাইনেসের সম্বন্ধে যে সব গুজব শোনা যায় তার কতটা সত্য?'

'গঙ্গী দাসী ব'লে একটি মেয়ের জন্য পাটরাণীর সঙ্গে হিজ হাইনেসের ঠিক বনিবনা হচ্ছে না···আর হাইনেসের ওপর সেই গঙ্গী দাসীর প্রভাবও

অত্যন্ত প্রখর। শুনলাম, তার ছেলের ও নিজের জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টে রাণী আবেদন করেছেন…'

সত্য ঘটনা বলা এবং হিজ হাইনেসের প্রতি বিশ্বস্ততা-বোধের মাঝে আমি দোলা খেতে লাগলাম। মহারাজার পক্ষে যুক্তি দেবার জন্য আমি তুলনামূলক উদাহরণ যোগ দিলাম : 'এই যেমন ধরুন, কর্ণেল, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রেমের মতন, ডিউক অব উইণ্ডসর ও মিসেস সিমসনের মতন, বুঝলেন? আমাদের হিজ হাইনেসও খুব বুদ্ধিমান, সব মহারাজাই খুব বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন—তবে, আমাদের হিজ হাইনেসের প্রথম যৌবনের মুখে একটু ব্যতিক্রম ঘটে গেছে…এই মেয়েটি তার মনকে সবসময়ে আবিষ্ট করে রেখেছে।'

কর্ণেল জেভনসের লালচে মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন : 'ইংরেজ রাজ-পরিবার নিয়ে এরকম উদাহরণ দেওয়া কিন্তু আপনার উচিত হয় নি। আপনি তো "হোমে" ছিলেন, আপনি জানেন আমাদের রাজার সঙ্গে আপনাদের ভারতীয় রাজ-রাজরার কত আকাশ পাতাল তফাৎ।'

'ও—,আমি দুঃখিত!'

'মিস রাসেলের ব্যাপার—' কর্ণেল বললেন : 'তা, একটু ঘোলাটেই হয়ে গেছে, যদিও বিশেষ কোন নিদর্শন আমি তার দেহে পাই নি, তবে, তার যে খুব চেষ্টা হয়েছে, বেশ বোঝা যায়!' ঠোঁট দুটো কুঞ্চিত করে একটু কটমট দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সাহেব ; এমন একটি বিষয় তাঁকে যে নিজের মুখে বলতে হোলো তার জন্য যেন তিনি বিশেষ লজ্জা অনুভব করছেন, একটু রেগেও গেছেন, এমনি ভাব।

যাক, কর্ণেল জেভনস তবে নিদর্শন কিছু পান নি! নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেললাম আমি এবং আমার সহজ ভাবটাও যেন ফিরে পেলাম।

'কর্ণেল, একবার হিজ হাইনেসকে দেখবেন কি?'

'নাঃ, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে···তিনি ভালই আছেন তো বললেন। তাঁকে আমার অভিবাদন জানাবেন। আর, আপনি তো তাকে দেখছেন—'

কর্ণেল জেভনসের গররাজী হওয়ায় আমি একটু আশ্চর্যই হলাম, কারণ, হিজ হাইনেসকে দেখতে গিয়ে, বিশেষ ক'রে, আজকের ঘটনার পরে, মহারাজার কাছ থেকে বেশ কিছু মোটা টাকা তিনি আদায় করতে পারতেন। বুঝলাম, জেভনসের আয়ের পথে বাণ্টি রাসেল কিছুটা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে। ইউরেশিয়ান হলেও বাণ্টি তো শ্বেতকায়া বটে! আর, এই ব্যাপার নিয়ে ক্যাপটেন রাসেলই বা কতদূর পর্যন্ত এগোবে, কি ভাবে তার মেয়ের অসম্মানের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, তাও তো এখনও বোঝা যাচ্ছে না। হিজ হাইনেসকে অভিবাদন জানাবার কথা বলাতে আমি বুঝলাম কর্ণেলের কামনাদৃপ্ত মনের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে উঠেছে! পরামর্শের জন্য যখন ইতিপূর্বে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, তখন কথাবার্তায় কর্ণেল তাঁর স্মরাতুর মনের যে পরিচয় দিয়েছিলেন, হিজ হাইনেসের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, তাঁর অন্দরমহল সম্বন্ধে যে উৎসুকতা দেখিয়েছিলেন, তাতে কর্ণেলের মনোবস্থা আমি আঁচ করতে পারছি।

'রিক্স্য়া!' কর্ণেল জেভনস হাঁকলেন।

চার মানুষ-টানা একটি সুন্দর রিকসায় যে মুহূর্তে তিনি উঠতে যাবেন, তখনই মিসেস রাসেলের কর্কশ চিৎকার কানে এসে লাগল :

'বাণ্টি! বাণ্টি আমার! ছিঃ, দুষ্টুমি ক'রো না!'

বারান্দার কাঠের সিঁড়ির দিকে মেয়ের পিছনে পিছনে মিসেস রাসেল দৌড়ে গিয়ে বাণ্টিকে ধরবার চেষ্টা করছেন। ছুটতে ছুটতে মেয়ে চেঁচিয়ে বলছে : 'আমাকে ছেড়ে দাও ম্যাম্ম, আমি টুলীপের কাছে যাব!' প্রায় ইটন-ফ্যাসনে কাটা কালো চুলের বব তার খোদাই-করা সুন্দর মুখের ওপর পড়েছে। রোমাঞ্চের ছোঁয়া পেয়ে বাণ্টি লাল হয়ে উঠেছে।

মিসেস রাসেল বলছেন : 'বার্টি যেও না বলছি, ফিরে এস, তোমার বাবা কি বলবেন ?'

সে-কথায় মেয়ে কর্ণপাত করে না, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

রিক্‌সা থেকে কর্ণেল জেভনস মুখ ঘুরিয়ে বলেন : 'মিস রাসেল, এ তো ঠিক নয়, তোমার মার কথা শোনা উচিত···ইয়াং লেডী, যাও বিছানায় শোও গিয়ে···এস, এস নিচে নেমে এস !'

পিতৃত্বের ছোঁয়া আছে যেন জেভনসের কণ্ঠস্বরে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছোট মেয়ের মত বার্টি ফিরে এল।

'বাঃ, এই তো ভাল মেয়ে !' কঠিন স্বরে ব'লে কর্ণেল জেভনস মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তাঁর লাল মুখের প্ল্যাটিনাম-শুভ্র ভ্রূ খোলা ছোরার মত সোজা হয়ে আছে, তাঁর সর্ব অবয়বে কেমন একটা বিহ্বল ভাব যেন ফুটে উঠেছে।

রিক্‌সা কুলিরা হাঁক দিয়ে বিথী বেয়ে গাড়ী টানতে সুরু করে।

॥ পাঁচ ॥

গভীর চিন্তামগ্ন হিজ হাইনেস তাঁর শয়নকক্ষে পায়চারী করছেন, পরনে ঢিলে টিউনিক আর টেমেত। ইংরেজী ধরণের ডোরাকাটা পায়জামা থেকে তিনি এই ঢিলে পরিচ্ছদই পছন্দ করেন। ভিতরের স্নায়বিক ঝড়ের ছোপ এসে পড়েছে হিজ হাইনেসের আননে, অত্যন্ত চড়া সুরে বাঁধা বেহালার মত —যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে। আমি ওপরে উঠে এসে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলাম। আমাকে উপেক্ষা করে তিনি আপন মনে আরও দ্রুত পায়চারী করতে লাগলেন। ঠোঁঠের কোণে মৃদু হাসির রেখা দেখে বুঝলাম, তাঁর এ-উপেক্ষা ও রাগ-প্রদর্শন সম্পূর্ণ নাটকীয়। আমার অনেক দিনই মনে হয়েছে যে মহারাজার মেজাজ ও রাগ-প্রদর্শন প্রায় সময়েই

ইচ্ছাকৃত···এসব তাঁর নিজের সহজাত প্রদর্শন-স্পৃহা থেকেই উদ্ভূত, তাঁর চারধারের সব দৃশ্যেরই অধিকর্তা হিসেবে, দর্শন-সামগ্রী হিসেবে জাঁকিয়ে থাকার মনের সংগোপন ইচ্ছারই অভিব্যক্তি মাত্র···যদিও রাজা হিসেবে, চলতি সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে, তিনি এমনিতেই যে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে থাকেন, তাতে তাঁর এই সব বিশেষ ভাবভঙ্গী ও বেশবিন্যাসের কোন প্রয়োজনই হতো না। কিন্তু টুলীপের ব্যক্তিত্ব সত্যই দুর্বোধ্য। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন থাকবার পরে, আমার চাকরির প্রায় শেষ দিকটায়, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত টুলীপের এই ইচ্ছাকৃত নাটুকেপনা স্বভাবের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়ে তাঁকে সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে কিছুটা সক্ষম হয়েছিলাম। সেকথা পরে।

আমার দিকে দৃষ্টি তুলে হিজ হাইনেস সানুনয়ে আবেদন জানালেন: 'আমার বাঁদরামীর জন্য আমায় চাবকানো উচিত!' কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলেন যে তাঁর এই নাটুকে-দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলছেন। গর্বোদ্ধত টুলীপ চাবুকের মত সপাং করে প্রশ্ন ছুড়ে মারলেন: 'জেভনস কি বললে?' উত্তরের জন্যে তিনি অপেক্ষা করলেন না। আমার উত্তর দেবার আগেই তিনি বলে চললেন: 'জেভনসের সঙ্গে দেখা করতে কেন গিয়েছিলে?' মুখ বিকৃত হয়ে উঠল তাঁর, যেন জেভনসের দেওয়া তিক্ত বটিকা গিলছেন। 'ও ব্যাটা ভেবেছে কি? ও-রকম দু'দশটা জেভনসকে কিনে আমি ট্যাঁকে গুঁজে রাখতে পারি। সেদিন শ্যামপুরে ওকে আমন্ত্রণের জন্য নানাভাবে ইঙ্গিত করেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, শিকারের সময়টা এবারে কাটাব কি ভাবে। জেভনস কি বলল না-বলল, তা দিয়ে আমাদের দরকার কি? এ্যাঁ? কোত্থেকে এসেছে এগুলো—যতসব বিলিতী ধাঙড়। পোঁছে কে এদের? হাতে দস্তানা না দিয়ে আমার বাবা কোনোদিন এদের হাতে হাত ছোঁয়াতেন না। তারপরে গিয়ে গঙ্গাজল ছিটোতেন। থোরাই কেয়ার করি এ ব্যাটাদের।···তা, বললে কি ব্যাটা?'

হিজ হাইনেসের বক্তৃতা যতই চড়া সুরে হোক না কেন, তাঁর মনের সংগোপন ভিতে যে ভীতির মৃদু কম্পন হচ্ছে, তা বুঝতে আমার অসুবিধা হয় না। ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সর্বশক্তিমান "আংরেজ সরকারকে" এবং অন্যান্য ইংরেজদের যখন তখন নানাভাবে সুযোগ সুবিধা দিতে হয়েছে হিজ হাইনেসকে, ভাইসরয় ও উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীরা যখন শিকারীর স্বর্গ শ্যামপুরে শিকার করতে আসত, তখন তাদের খানাপিনা ও অসংযত আদর আপ্যায়নে কলসি কলসি মুদ্রা অপব্যয় করতে হয়েছে তাঁকে। ভাইসরয়-পত্নীদের মন খুশীর জন্যে উপহার দিতে হয়েছে তাঁর রাজ্যের পূর্ব পুরুষদের সঞ্চিত সাবেকী দামী দামী ধনরত্ন ও মণি-মানিক্য। শুধু ভাইসরয়-পত্নীই নয়, তাঁর সংস্পর্শে যেসব ইংরেজী রমণী এসেছে তাদের প্রত্যেকেই তিনি এইভাবে সওগাত দিয়েছেন। ভারতীয় রাজ-রাজরাদের স্বভাবগত প্রভুভক্তির এতটুকু কমতি ছিল না তাঁর মধ্যে। কথাবার্তায়, ছোট ছোট বক্তৃতায়, নিয়ম মাফিক গদ গদ ভাষায় প্রভুভক্তির উচ্ছ্বাস জানিয়েছেন। আবার ইংরেজ রাজ-প্রতিনিধির সঙ্গে যখন মন কষাকষি হয়েছে কিংবা তাঁর খেয়াল-খুশী মত চলার পথে যখন কোন বাঁধা এসেছে, তখন তাঁর ঘনিষ্ট পারিষদদের কাছে নেতাজী সুভাষ বসু, ঝান্সির রাণী ও রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের অসম সাহসিকতা সম্বন্ধে গোপনে প্রশংসা করেছেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে জাতীয়তাবাদের দিকে হিজ হাইনেসও একটু ঝুঁকেছেন বটে, তবে ভারতীয় ইউনিয়নে তাঁর রাজ্য ভুক্তির প্রশ্নে সর্দার প্যাটেলের উপদেশ তিনি মেনে নিতে পারছেন না; এসব ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ব্যবস্থাই তাঁর মনঃপুত।

হিজ হাইনেসের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি চুপ করে রইলাম। হিজ হাইনেস আবার সুরু করলেন :

'ঐ কুত্তিকে আমার ভাল লাগে না! এই সব সাদা চামড়ার ফিরিঙ্গী মেয়েগুলোকে আমি মোটেই পছন্দ করি না—' তাঁর মুখ আবার বিকৃত

হয়ে উঠল: 'এদের বোকা বোকা কথা শুনলে আমার বিশ্রী লাগে, ঘেন্না করে। উঃ, মাগীদের গায়ে কি দুর্গন্ধ! জন্মে তো একদিন স্নান করে না…আর এই বাল্টিটা মেয়ে নাকি? ওটা তো একটা বখা ছোকরা! আমাকে দেশী মাল জোগাড় করে দাও…'

'হুঁ, দেশী মেয়ের ওপর সুবিধে বেশ সহজেই নেওয়া যায় বলে বোধহয়—' আমি মন্তব্য প্রকাশ না করে পারলাম না।

হঠাৎ মেজাজ চড়ে গেলে সময় সময় যে-স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, ধৈর্য হারিয়ে হিজ হাইনেস চেঁচিয়ে উঠলেন: 'য়ুরোপ তোমাকে একেবারে গাধ বানিয়ে দিয়েছে…আমার মাকে আমি সম্মান করি না!'

ভাবলাম বলি: 'তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার অপমানকর ব্যবহারের কথা মনে কর টুলীপ, তোমার উপপত্নী-প্রিয়া গঙ্গাদাসীকে তুমি কি ভাবো অবজ্ঞা কর—' কিন্তু বললাম না কিছু, মনের কথা মনেই চেপে রাখলাম। কারণ, ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষদের বিরুদ্ধে তাঁর যে বিষোদ্গার চলেছে, বাধা দিলে, হয়তো সেগুলো ঘুরে বর্ষণ হতে থাকবে আমারই ওপরে। হিজ হাইনেস আর একটি নাটকীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বলেন:

'সময় সময় ইচ্ছে ক'রে তোমাদের মত সব কয়টি বলদকে দিই এখান থেকে তাড়িয়ে…যত সব গর্দভ এসে জুটেছে।' তারপর নিজের হাত দুটো মোচড়াতে মোচড়াতে মাথা নেড়ে হতাশার মূর্তিমান প্রতীকের ভঙ্গীতে এবার যোগ দেন: 'তোমাদের পাল্লায় পড়ে আমি পাগল হয়ে যাব!'

'এখন একটু ঘুমুতে যান হাইনেস,' ডাক্তারী পরামর্শ হিসেবে আমি বলি।

'ও হরি, আমার অবস্থা যে দড়িতে বাঁধা ষাঁড়ের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে!' ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে হিজ হাইনেস আত্ম-বিশ্বাসহীন আধুত কণ্ঠে বলেন: 'এদিকে টিকিয়ালি রাণীর খুঁটিতে আমি আছি বাঁধা, আর ওদিকে তিনি তো কত সব মিথ্যা সাজিয়ে ভাইসরয়ের কাছে

আমার বিরুদ্ধে আবেদনের পর আবেদন পাঠিয়েছেন। এখন তো সেই সব কাগজপত্রগুলো সর্দার প্যাটেলের সামনে পড়েছে। আর রাণী সাহেবাও দিল্লীতে গিয়ে স্টেট-ডির্পাটমেণ্টে ধর্না দিয়ে পড়ে আছেন···রাণী সাহেবাকে ভালোবাসতে যদি আমি না পারি তো আমি কি করব?···ঝগড়াটে, নোংরা, ডাইনী—ওর বাঁধন না কাটতে পারলে আমি পাগল হয়ে যাব!' দু' হাত দিয়ে নিজের মাথাটা ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে আবার ফেটে পড়েন: 'আমার পেছনে সে লেগেই আছে, ধাওয়া করছে এখান থেকে ওখানে, এ কোণ থেকে ও কোণে···এ খুঁটি থেকে ও খুঁটিতে আমাকে বেঁধে ফেলছে!···রাণী সাহেবা যদি গঙ্গীদাসীর থেকে আমাকে আজ আলাদা না ক'রে দিত, তাহ'লে কি আমি ঐ ফিরিঙ্গী মাগীর পিছনে ছুটতাম! আমার আর গঙ্গীর বিরুদ্ধে যদি সব জায়গায় এত দরখাস্ত, আবেদন না যেত, তো আমি এখানেই তাকে নিয়ে থাকতে পারতাম! এখন, এখন কি হবে আমার? কোথায় যাব আমি? ডাক্তার, বল, কি করব আমি? তুমি আমায় কি করতে বল? বল, জলদি বল, আমি তোমার পরামর্শ চাই। আমাকে ওরা কেউ বুঝবে না, কেউ বুঝবে না··

পায়চারী করতে করতে হঠাৎ মেঝেতে পা ঠুকে দাঁড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে অদ্ভুত একটানা স্বরে প্রগাঢ়তার ছোঁয়াচ লাগানো কণ্ঠে শেলীর একটি কবিতা আবৃত্তি করতে সুরু করেন। আবৃত্তি শেষ ক'রে তিনি বলেন:

'একজন সাকী কিংবা একজন সাথী
ও-মহানাদর্শে আমি নহি বিশ্বাসী, বন্ধু!

এটাই হ'লো আমার জীবনাদর্শ···

ক'রেছ ভাগ ক'রো না রিক্ত।'

নিজের হৃদয় দিয়ে যেন শেলীর কবিতা উপলব্ধি করেছেন হিজ হাইনেস!

আবৃত্তিটি আমাকেও কিছুটা বিমোহিত ক'রে ফেলেছে। মহারাজার বিসদৃশ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে তাঁর অসংযত ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরোত

তার কারণও আমি বুঝেছিলাম। তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ফাঁক থেকে গেছে, বুদ্ধি দিয়ে তার পরিপূর্ণতা কোনমতেই করা সম্ভব হয় না, উল্টো সেখানে লেগে থাকে অহর্নিশ দ্বন্দ্ব। জীবনের পথে অনেক কিছুই তিনি আয়ত্ব করবার চেষ্টা করেন, নিজের মত ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে পূর্ণ স্বতন্ত্র কিছু একটা গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এই অসংলগ্ন পাঁচ মিশেলীর ফলে কল্পনা-খেয়াল অনুরাগ-বিরাগের ও নানা ঘটনার সংঘাতে এক অদ্ভুত বন্য ব্যক্তিত্বের মূর্ত প্রতীক হয়ে পড়েন হিজ হাইনেস। কিন্তু তবুও তাঁর চরিত্রের অসংলগ্নতা গঙ্গাদাসীর চরিত্রে অসংলগ্নতার মত অত তীব্র নয়, কারণ, গঙ্গাদাসীর চরিত্রের বেসামালতার বিরুদ্ধে হিজ-হাইনেসও প্রতিবাদ করতেন। হিজ হাইনেসের জীবনে এই যে গন্ধ ও পত্মের দ্বন্দ্ব; তাঁর আভিজাত্যের অহঙ্কার, তাঁর প্রাচীন রাজবংশের সব-কিছু-ভালোর গর্ববোধের সঙ্গে বর্তমান সমাজের পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব, নূতন সামাজিক মূল্য বোধের উপলব্ধির দ্বন্দ্ব···। তাঁর পূর্ব-পুরুষের স্মৃতি তাঁকে আকর্ষণ করে তাঁদের সেই জমকালো বৈভবের দিনগুলির দিকে···পূর্ব-পুরুষদের সেই দুর্দমনীয় ক্ষমতা, দৃঢ়তা, দক্ষতা, বদান্যতা, সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতি তাঁদের কর্তব্যবোধ, তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্বপূর্ণ কীর্তি গাথা—এক কথায় ক্ষত্রিয় রাজার কর্তব্য তাঁকে প্রাচীন স্মৃতি-সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে যায়; সেই সঙ্গে নতুন পিশাচেরা তাকে টেনে নিয়ে আসে আর একদিকে··· সহজ গা-ভাসানো পথে···চলতি হাল-ফ্যাশানের মহাসমুদ্রে। আর এই গা-ভাসানোর শিক্ষা-ব্যবস্থা তো সুরু হয়েছে তাঁর জীবনের গোড়াতেই। বাল্যকালে পিতার জেনানা মহলে সুরু হয় প্রথম পাঠ, তারপর কিশোর ও যুবা বয়সে "আংরেজী সরকারের" হস্তে সমাপ্ত হয় পরবর্তী শিক্ষা। জো-হুকুম ভৃত্য-পরিবেষ্টিত প্রাসদে রাজকুমার বেড়ে ওঠেন অশ্লীলতার পাঠ নিতে নিতে, আর সেই সঙ্গে তাঁর সরল মস্তকটি তরল হতে থাকে ভীত-সঙ্কুল রাজমাতার অতিরিক্ত স্নেহ ও আদরে।

কারণ, মতিভ্রষ্ট মায়ের তখন একমাত্র চিন্তা থাকে উপপত্নীদের জিঘাংসা থেকে পুত্রকে বাঁচানো। এইভাবে বাল্যকালে হাতে খড়ি হবার সঙ্গে সঙ্গেই যুবরাজ চলে আসেন লাহোরের ইংরেজ-চালিত কুইনমেরী স্কুলে এবং সিমলার বিশপ কটন কলেজে। তারপরে সুরু হয় লাহোরের খাস রাজ কলেজে রাজ-শিক্ষা। এখানে তাঁরা শেখেন বিশিষ্ট রাজকীয় ভাবভঙ্গী আয়ত্ব করার কলা-কৌশল···। বয়েজ-স্কাউটের শিক্ষা নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শেখেন ইংরেজ ভাইসরয়ের ভূলুণ্ঠিত রাজ-পোষাক বহনকারীর মহা-সম্মানিত কাজ, তাঁরা শেখেন খারাপ ক্রিকেট খেলা, হয়ে ওঠেন উদাসীন পোলো খেলোয়ার। এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁর ছোট্ট রাজ্যের রাংতা-মোড়া অধিকর্তা সেজে বসবার। তাঁরা শেখেন কি ভাবে তাঁদের হলদে তুলতুলে মুখ দিয়ে ইংরেজ প্রতিনিধির অফিসের কিংবা পলিটিক্যাল বিভাগের নির্বোধ বুড়ো সাহেবদের তোয়াজ ক'রে বক্তৃতা দিতে হয়, কিভাবে তাঁর রাজ্যের অর্ধ কোটি প্রজার দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী হিসেবে নতুন নতুন ফরমান জারী করতে হয়। হিজ হাইনেসের মনের নতুন-পুরোনোর এই যে দ্বন্দ্ব, তার যে শেষ কোথায়, তা তিনি নিজেই কিছু বুঝতে পারেন না। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এ অর্ন্তদ্বন্দ্ব চলেছে, বাড়ছে। এ দ্বন্দ্ব প্রসমিত হবার যে-পথ ছিল তাতো তার পিতামাতার শিক্ষা-ব্যবস্থা ও "আংরেজী সরকার" অনেকদিন আগেই বেশ অভিনিবেশ সহকারে চূর্ণ ক'রে দিয়েছে। এই তুই তুইটি দেশী-বিদেশী উত্তরাধিকারের ঠেলায় সামনের দিকে এগোবার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। ফলে হয়েছে, হিজ হাইনেসের চরিত্রে একদিকে ফুটে উঠেছে রোগমুক্তির ঠিক পরে পরে মানুষের মধ্যে যে হীনতাবোধ ফুটে ওঠে সেই সহায়হীন হীনতাবোধ; আর একদিকে ফুটে থাকে অস্বাভাবিক ধরণের অমানুষতা, অনুরাগ-বিরাগ খেয়াল-খুশী দেখানোর অদ্ভুত মনোবিকার: কোন সময় হয়তো তিনি ফেটে পড়ছেন, কোন সময় কান ঝালাপালা করা বাচালতার তুবড়ী ছাড়ছেন, আবার কোন সময়

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কবিতা আওড়াচ্ছেন। তাঁর নিজের অভিযোগগুলোর পিছনে যেন তিনি অন্যের অনুমোদন খোঁজেন। বিভিন্ন ভিন্নমুখী ভাবধারাকে এক ক'রে একটি সর্বাঙ্গীন মানুষে ফুটিয়ে তুলবার কষ্ট-প্রচেষ্টার ফলে তিনি পরিণত হয়েছেন এক করুণ জীবে, অর্ধ মানুষে।

'কেউ আমাকে বুঝবে না, কেউ বুঝবে না—' বিড়বিড় ক'রে হিজ হাইনেস আবার বলেন।

'আমি কিছুটা বুঝতে পারি, টুলীপ। আপনি যে সুখী নন, একথা সকলেই জানি। আপনি কোন কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারেন না। শত্রু মিত্রকে আপনি আলাদা করে দেখতে পারেন না…আপনার বিপদ তো সেখানেই। আপনি—'

বারান্দায় একটা চিৎকার-গর্জন ওঠে, জানালায় ক্রম দ্রাম ধাক্কা পড়ে। বুঝলাম, এবারের নাট-গুরু হলেন ক্যাপটেন রাসেল। প্রশ্ন করলাম :

'কে ?'

'বেরিয়ে এস তোমাদের মা'রাজাকে নিয়ে!' গর্জাতে গর্জাতে রাসেল ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে।

বসবার ঘরে ছুটে গিয়ে আমি বলি : 'ব্যাপার কি ? হাইনেস এখন বিশ্রাম করছেন।'

'হুঁ, বিশ্রাম করছেন! শালা কালা জারজ! বিশ্রাম করাচ্ছি!' ক্যাপটেন রাসেলের লালচে মুখে রুক্ষতার পর্দা পড়েছে…তাঁর শ্বাপদ-সদৃশ ছুঁচলো মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে, ঘন নিশ্বাসের চাপে নাকে শব্দ হচ্ছে, দুঃখে রাগে চোখ দুটো ছল ছল করছে।

'ক্যাপটেন রাসেল, তুমি বাইরে এস, একটু পরেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি।' বললাম আমি। ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিয়ে রাসেল মহারাজার শয়নকক্ষের দিকে এগিয়ে গেল। চিৎকার করে বললো : 'দেখছি আমি, ব্লাডি মা'রাজা, তার ব্যবস্থা আমিই করব!'

মহারাজাও শয়নকক্ষ ছেড়ে বসবার ঘরে এসে দাঁড়ালেন। রাসেল তাঁর দিকে ধাওয়া করে গর্জন করে উঠল : 'কি করেছ তুমি আমার মেয়েকে ?' রাসেলের মুখ আরও কঠিন হয়ে ওঠে, চোখ দুটো জ্বলে ওঠে : 'কি করেছ তুমি ? জবাব দাও, না হোলে তোমার ঘাড় মটকে দেব।'

শক্ত হয়ে সটান দাঁড়িয়ে কিন্তু একটু কম্পিত কণ্ঠে হিজ হাইনেস হুকুম দেন : 'বের হও, বেরোও এখান থেকে !' ঠিক তার পরমুহূর্তে, কোনো রকম সময় না দিয়ে, বাঘের মত ত্বরিৎগতিতে তিনি রাসেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, শক্ত কঠিন হাতে তার ঘাড় আঁকড়ে ধরে তাকে ঝাপটে ফেলে দেন। হিজ হাইনেসের হঠাৎ-আক্রমণে বিভ্রান্ত রাসেল একটু পিছিয়ে পড়ে, কিন্তু তার পরমুহূর্তেই দু'হাত দিয়ে ধরে শ্রেফ ভারী দেহের চাপে মহারাজাকে ঠেলে কয়েক পা নিয়ে যায়। ঝাঁকি দিয়ে মহারাজার হাত থেকে ঘাড়টা মুক্ত করবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, বাঘের মত শক্ত ক'রে ঘাড় আঁকড়ে থাকেন টুলীপ।

আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম এদের ছাড়িয়ে দেবার, এদের দু'জনের মাঝে কীলক-প্রবিষ্ট হয়ে আলাদা ক'রে দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার এই পাতলা দেহে তা পারব কেন ? চিৎকার করি : 'কি হচ্ছে, থামুন থামুন !' আর দু'হাত দিয়ে রাসেলের আক্রমণ থেকে মহারাজকে রক্ষা করবার চেষ্টা করি।

চিৎকার ও হুটোপাটির শব্দে এ-ডি-সিদের ঘর থেকে মুন্সী মিথনলাল ও পিয়ারা সিং ছুটে এল। পুলিশ দৌড়ে এল বারান্দা থেকে দরজার পাশে, কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করল না। মিসেস রাসেল ও বান্টির কণ্ঠস্বর বারান্দা থেকে শোনা গেল—তাদের একতলার ঘরের ঠিক ওপরে এই দোতলার ঘরের দ্রুম দ্রাম শব্দে তারা ছুটে এসেছে। আমি আবার বলি :

'থামুন আপনারা, থামুন ! ক্যাপটেন রাসেল, সুরু করলে কি !'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। হিজ হাইনেস ফুঁসছেন, রাসেল গোঁ গোঁ করছে, আর সেই সঙ্গে চলেছে দু'জনার প্রতি দু'জনার অকথ্য অশ্লীল গালাগাল। বিরাট বপু রাসেলের ধাক্কায় হিজ হাইনেস দাঁড়াতে পারেন না; কিন্তু রাসেলের কাঁধে বেশ জোরের সঙ্গে আঙুল বসিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই সক্ষমতার জন্য তাঁর চোখে আনন্দাশ্রুর সঙ্গে মিশে ভেসে উঠেছে ক্রোধ। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করছে দেখে পিয়ারা সিং এগিয়ে গিয়ে পুলিশকে বেরিয়ে যেতে বলে। সে-কথা পুলিশ শোনে। রাসেলকে সে এবার হুকুমের কণ্ঠে বলে লড়াই বন্ধ ক'রে বাইরে যেতে। সে-কথায় কর্ণপাত করে না রাসেল। পিয়ারা সিং তখন তার লম্বা শক্ত হাত দিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে হিজ হাইনেসের আঙুলের কামড় থেকে রাসেলের কাঁধ খুলে দিয়ে ফিরিঙ্গীটিকে ঘর থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করে। ছিন্ন-বন্ধন রাসেল টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। পর-মুহূর্তে স্ত্রীর সাহায্যে দেহের সমতা রক্ষা ক'রে সে উঠে দাঁড়ায়। মিসেস রাসেল লড়িয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সানুনয় কণ্ঠে নানা শব্দ ও ভাষায় প্রতিবাদ করছিল। মেয়ে বাটি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

বিবর্ণ হিজ হাইনেস চিৎকার ক'রে ওঠেন: 'বেরোও, বেরোও, দূর হয়ে যাও এখান থেকে!' তাঁর যুদ্ধপ্রিয় হৃদয়ের সঙ্গে পাল্লা রেখে লড়াইতে যে তাঁর দেহ এগোতে পারে না, এগোতে হ'লে প্রয়োজন হয় পিয়ারা সিংএর শক্ত হাতের সমর্থন, এবং তাতে যে মর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে, সেটা ফুটে ওঠে তাঁর সর্ব অবয়বে।

মুন্সী মিথনলাল এগিয়ে এসে মহারাজার জামা থেকে ধূলো ঝাড়তে থাকেন এবং পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে হিজ হাইনেসকে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে অনুরোধ করেন।

এমন অবমাননাকর পরিস্থিতির মাঝে দাঁড়িয়ে আমার ভারী বিশ্রী

লাগছিল। সেই কুৎসিত গালাগাল, আস্ফালন···কারণ, দু'জনাই তখন শান্তিরক্ষাকারী ও বারান্দায় দণ্ডায়মান পুলিশ সাবইনস্পেক্টরকে বোঝাবার প্রতিযোগীতা সুরু করেছে যে এ মল্লযুদ্ধে সে-ই মাত্র বিজয়ী।

মিসেস রাসেল স্বামীকে নিবৃত্ত ক'রে অনুরোধ করে: 'এস জন্, এস!'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে বাণ্টি।

আত্মতৃপ্ত বিরাটদেহী দানবের মত সমগ্র দৃশ্যের উপর পিয়ারা সিং প্রভাব বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে তার সাহায্য যে অত্যাবশ্যকীয়, সে-উপলব্ধি যেন তার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট।

'বের হও, বেরিয়ে যাও! পিয়ারা সিং নিকাল দেও উস্‌কো!' চিৎকার ক'রে ওঠেন হিজ হাইনেস।

রাসেল দম্পতি ও পুলিশদের কাছে এগিয়ে গিয়ে মুন্সী মিথনলাল তাদের অনুরোধ করেন ঘর ছেড়ে চলে যেতে। দু'হাত প্রসারিত ক'রে রাখালের মত তাদের মৃদু ধাক্কা দেন দরজার দিকে। মুন্সীজীর পিছনে পিছনে পিয়ারা সিং ও আমি বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে আসি। সাব-ইনস্পেক্টরকে জিজ্ঞেস করি কোন ওয়ারেণ্ট আছে কিনা। কোন কিছু নেই শুনে তাকে বলি তার সাঙ্গপাঙ্গ সহ এক্ষুনি প্রাসাদের ত্রিসীমানা ছেড়ে চলে যেতে। ক্যাপটেন রাসেলের অনুরোধে তার মেয়ের খোঁজে সাব ইনস্পেক্টর এসেছে এখানে। সুতরাং তার দিকে সে তাকায় একবার। কোন কথা না বলে সিঁড়ি দিয়ে রাসেল নিচে নেমে যায়। সাব ইনস্পেক্টরও আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী বেরিয়ে যায়।

॥ ছয় ॥

হিজ হাইনেস মহারাজার রাজকীয় মেজাজ ঠাণ্ডা হয় না। রাসেলের এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেবার উদ্দেশে তিনি ঠিক করলেন সিমলার ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবেন। রিক্সা প্রস্তুতের হুকুম দিয়ে তিনি আমাকে ও মিথনলালকে আদেশ করলেন তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হ'য়ে নিতে।

অনেক সময় আমার ইচ্ছে হতো যে হিজ হাইনেসকে এই সব ব্যাপারে আমার অপছন্দের কথা খোলাখুলি বলি। ইচ্ছা হয় ডেপুটি কমিশনারের কাছে যাওয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করি। কিন্তু কেন যেন হিজ হাইনেসের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনের সেই সংগোপন বিরোধিতাকে ভাষা দিতে পারি না। পুরুষানুক্রমে বিশেষ সুখসুবিধা ও রাজকীয় ক্ষমতার আবেষ্টনে বাস ক'রে এমন একজাতীয় অদ্ভুত রাজমহিমার আবরণ সৃষ্টি করেছেন হিজ হাইনেস তাঁর চারিপাশে যে, আশে পাশের সকলেই তাঁর বিরাট অহম-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের কাছে নত হয়ে থাকে। এবং তাঁর এই অন্যায় অহম-কেন্দ্রীকতা ভেঙ্গে দেওয়াও যেত না··কারণ, আমরা যারা তাঁর পার্শ্বচর, তারা তো বেতনভুক কর্মচারী মাত্র, এবং রাজকীয় সম্মান-সম্ভ্রম দেখিয়ে চলার যে প্রচলিত বিনয়ী প্রকাশভঙ্গী আমাদের মেনে চলতে হতো, তাতে মহারাজার ঐ আত্ম-কেন্দ্রীকতাবোধকে কোনমতেই ধাক্কা দেওয়া সম্ভব হতো না। ক্যাপটেন রাসেলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়বার যে কোন ভিত্তিই মহারাজার ছিল না, তা আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে তিনি ঠেলে নিয়ে চললেন তাঁর সঙ্গে। আমাদের এইসব রাজা মহারাজাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা বিচার করবার পদ্ধতিই অদ্ভুত। অন্যের সমস্যা বিচার করতে গিয়ে সমস্যার সবকিছু শুনে

শেষ মেষ এঁরা সিদ্ধান্তে পৌছোন যে এঁদের ভগবত প্রদত্ত প্রাচুর্যে এই লোকগুলোর হিংসা হয় বলেই এরা উদ্ভট উপায়ে মনগড়া ঝগড়া বাঁধিয়ে বসে।

ডেপুটি কমিশনার হিজ হাইনেসকে দেখা না করেই প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনারের চাপরাশী নিজের মাথা খাটিয়ে খবর দিল যে সাহেব কুঠিতে নেই। হিজ হাইনেস বুঝলেন। ডেপুটি কমিশনার সর্দার শান্ত্ সিং আই. সি. এস-এর ধৃষ্টতা দেখে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বসবার ঘরে পায়চারী করতে থাকেন মহারাজা বাহাদুর। ভাবেন, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের স্টেট-ডিপার্টমেণ্টে তিনি তুলবেন এ-কথা। দেখে নেবেন একবার শান্ত্ সিংকে। হিজ হাইনেসের নালিশের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শান্ত্ সিং আগেই আঁচ করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে তাঁর রাজ্যকে ভারত-ভুক্তির নতুন চুক্তিতে এখনও হিজ হাইনেসের রাজী না হওয়াতে রাজধানীতে মহারাজা সম্বন্ধে যে সুধারণার অভাব ঘটেছে, তাতে তাঁর এইসব ব্যক্তিগত ছোটখাট ঘটনার কোনো দামই ভারত সরকার এখন দেবেন না।

ডেপুটি কমিশনারের বাংলো থেকে বেরিয়ে রিক্সায় চলতে চলতে সান্ধ্যসমীরণে মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হ'লে হিজ হাইনেস যেন বুঝতে পারলেন যে ব্যাপার কেমন একটু কোথায় গোলমেলে হয়ে গেছে। তিনি যে অবস্থায় পড়েছেন তা থেকে সামলিয়ে উঠতে হ'লে প্রচণ্ড একটা কিছু করা দরকার। হঠাৎ রিক্সাকুলিদের তাঁর রিক্সা আমার রিক্সার খুব কাছে আনতে বললেন। তারপর আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে তাঁর সেই পুরোনো উপলব্ধিতে, যা তাঁর কাছে সত্য বলে মনে হয়, বলেন : 'খুটোয় বাঁধা ষাঁড় আমি!'

দিল্লীর স্টেট-ডিপার্টমেণ্টের নির্দেশে মহারাজার রাজ্যের ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী মিঃ হোরেসের পরিবর্তে শ্রীযুত পোপতলাল জে শাহ্ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীযুত পোপতলালকে পরামর্শের জন্য সিমলায় আসতে

আমি হিজ হাইনেসকে বললাম। কথাটি হিজ হাইনেসের মনে ধরল। পথে টেলিগ্রাফ অফিসে তার প্রেরণ ক'রে আমরা ফিরলাম।

কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম মহারাজার কাছে পোপতলালের তার এসেছে তাঁকে বিশেষ প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য শ্যামপুরে যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসবার অনুরোধ জানিয়ে।

সমস্ত বিকেল ধরেই কত গবেষণা গুজবের শ্রুতিরোচক খবরের আনাগোনা চলেছে। আজ রাস্তার হঠাৎ-বৃদ্ধি বহু সংখ্যক রিক্সা থেকে কত জোড়া ঔৎসুক আঁখি নিয়ে এই বিশেষ বাড়ীর দিকে নজর দিয়ে দেখেছে··· কানাঘুষো, মৃদুকণ্ঠে কথা, অর্থপূর্ণ হা হা হাসি, সঙ্গে সঙ্গে শ্ শ্ শব্দে গুজবের মৃদু উচ্চকণ্ঠের উপর ঘোমটা টেনে দেবার চেষ্টা। বাল্টিকে নিয়ে হিজ হাইনেসের এ্যাড্ভেঞ্চারের কুৎসা-কাহিনী বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। সিমলা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রীষ্মাবাসের যতসব মিস্টার ও মিসেসরা একটু হিংসা মিশানো আনন্দ উপভোগ করছেন এই এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীতে।

এই রকম একটি অবস্থার মধ্যে পড়ে হিজ হাইনেস ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েন। কোনমতেই যেন তিনি বেরিয়ে আসতে পারছেন না। সমস্ত বিকেল ধরে গেলাসের পর গেলাস মদ পান করতে থাকেন। বোতল থেকে নিজেই মদ ঢেলে নেন যাতে সোডা মিশিয়ে তাঁকে কেউ প্রতারণা করতে না পারে। কিছুই তিনি খাবেন না এবং শুতেও যাবেন না। অনেক ক'রে বুঝিয়ে তাঁকে বিশ্রামের জন্য একটি আর্মচেয়ারে বসিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। মুন্সী মিথনলাল সেই সময়ে প্রবেশ ক'রে সান্ত্বনা দেবার নামে গোলমাল সুরু করে দিলেন। মুন্সীজীর স্নেহে শান্ত হওয়ার পরিবর্তে হিজ হাইনেস আরও বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অবশেষে মদের সঙ্গে লুকিয়ে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলাম। আর্মচেয়ারের ওপরেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ধরাধরি ক'রে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

তারপর আমরা গেলাম খেতে। পিয়ারা সিং, মিথনলাল ও আমি। রাজবাড়ীর রান্না! অত্যন্ত মুখরোচক গুরুপাক খাদ্য সব, যার ফলে ইতিমধ্যেই মুন্সীজী ভুগছেন বদহজমে, আমি ভুগছি দীর্ঘকালের অজীর্ণতায়। দশ রকমের বিভিন্ন ধরনের আনুসঙ্গীক সহ ঘিয়ে ডুবোন পরোটা, পোলাও…মুরগী থেকে বেগুনের বার্তা, রকম বেরকমের চাটনি ও হালুয়া। এত রকমের সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে খেয়েই আমরা বোধহয় মরে যাব। একমাত্র পিয়ারা সিং নির্ভাবনায় প্লেটের পরে প্লেট শেষ করে যেত, অতি-খাওয়ার পরিণাম সম্বন্ধে তার মনে কোন দুর্ভাবনাই হতো না।

টেলিগ্রামের পরে পরেই সন্ধ্যেবেলা এসে হাজির হলেন হিজ হাইনেসের পলিটিক্যাল সেক্রেটারী মিঃ বুলচাঁদ। খর্বাকৃতি মোটা লোকটিকে আমরা কেন যেন কেউই ঠিক পছন্দ করতাম না। যখন তখন ঘড়্ ঘড়্ ক'রে নাক ডাকে বুলচাঁদের,—ঘোড়ার নাকে ঘাসের টুকরো পড়লে যে রকম শব্দ হয় সেই রকম শব্দ ক'রে সে নাক ডাকে। হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা ক'রে সে বললে যে দেওয়ান তাকে পাঠিয়েছে হিজ হাইনেসকে অনতিবিলম্বে শ্যামপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। ফিরোজপুরের ধনী বেনিয়া পুত্র বুলচাঁদকে সংগ্রহ করেছিলেন হিজ হাইনেস কয়েক বছর আগে অক্সফোর্ডে। হিজ হাইনেস তাকে খুব যে একটা পছন্দ করতেন, তা নয়। কিন্তু বুলচাঁদ এমন ভাবে নিজের প্রভাব হিজ হাইনেসের ওপরে বিস্তারিত করতে সক্ষম হয়েছিল যে, আমি যখন শ্যামপুরে এলাম, তখন হিজ হাইনেসের জগতে সে একজন বিশেষ কেউ কেটা হয়ে বসে আছে। বুলচাঁদের আগমন দেখে আমার ধারণা হ'লো যে গঙ্গাদাসীর বিশেষ বার্তা বহন করেই সে এখানে এসেছে। সুতরাং রাজ্যের 'প্রধানা মহিলা' সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। গঙ্গাদাসীর উল্লেখ আমরা আমাদের মধ্যে এই ভাবেই সাধারণতঃ করতাম। আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে গেল

বুলচাঁদ। বাল্টির ব্যাপারও বুলচাঁদকে আমরা কেউ কিছু বললাম না। গোপনতার সমতা রক্ষা করলাম যেন আমরা এইভাবে।

কিন্তু ধূর্ত বুলচাদের হিজ হাইনেসের খবর সংগ্রহ করতে খুব বেশী সময় লাগল না। পরের দিন সকালের মধ্যেই সব খবর সে জেনে গেল। কিন্তু হিজ হাইনেসকে শ্যামপুরে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে বুলচাঁদের সময় আরও কম লাগল। বুঝলাম, পোপতলালের টেলিগ্রাম থেকে গঙ্গাদাসীর বার্তা আরও জরুরী।

॥ সাত ॥

বিকেলে স্পেশাল ট্রেনে কালকা হয়ে শ্যামপুরে রওনা হ'লাম। এগারটি তোপধ্বনি হবার কথা হিজ হাইনেস যখনই এই স্থান ত্যাগ করেন কিংবা আগমন করেন সেই সময়ে। উদগ্র মন নিয়ে তিনি তোপ ধ্বনি শুনতে থাকেন। সাতটি তোপ দাগবার পর কামান চুপ ক'রে গেল। গর্বের প্রাচীরে বিরাট ঘা লাগল মহারাজার। বুলচাঁদের মারফৎ 'নেকড়ের' চিৎকারের ইতিবৃত্ত তার কানে এসেছে। রেল স্টেশনে লোকের কানা-ঘুষোয় তু' একটি কথা যে তাঁর কানে যায়নি তা নয়। এরই পরে পরে তার রাজকীয় সম্মানের নিদর্শন তোপ ধ্বনির সংখ্যা কমে গেল এগার থেকে সাতে! বিমর্ষ হিজ হাইনেস বলে ওঠেন: 'খুটোয় বাধা ষাঁড় বানিয়েছে আমায়!'

কসৌলি স্টেশনে গাড়ী থামলে বুলচাঁদ গেল চায়ের তদারকে। সেই সুযোগে আমি হিজ হাইনেসকে বললাম সমস্ত অবস্থাটাকে যেন তিনি গোড়া থেকে একবার ভাল ক'রে তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেন। দিল্লীর স্টেট-ডিপার্টমেণ্টে টিকিয়ালী রাণী ইন্দিরা ও অন্যান্যদের যে সব দরখাস্ত ও চিঠি গিয়েছে হিজ হাইনেসের বিরুদ্ধে, হিজ হাইনেসের উচিত স্টেট-ডিপার্টমেণ্টে

গিয়ে গঙ্গাদাসীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে এর একটা বিহিত ক'রে আসা। তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সমস্যারও একটা ফয়সালা ক'রে এসে মহারাজার নিজের জীবনেরও তো একটা সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আরও বললাম, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার ব্যাপারেও হিজ হাইনেসের এভাবে আর অপেক্ষা করা উচিত হচ্ছে না। এ রকম অ-স্থির ভাবে কতদিন আর তিনি থাকবেন। এসবের একটা ব্যবস্থা ক'রে নতুন ভাবে আবার জীবন সুরু করুন হিজ হাইনেস। আমি বেশ বুঝেছিলাম যে, হিজ হাইনেসও মনে মনে এরকমই কিছু একটা করা দরকার বলে ভাবছিলেন। কিন্তু বাড়ি-কাহিনী গঙ্গাদাসীর কর্ণে গিয়ে পৌঁছলে যে দৃশ্যের অবতারণা হবে তার আশঙ্কায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। অন্য কোন কিছুতে গভীর ভাবে মনোযোগ দিতে তিনি পারছিলেন না।

ট্রেনে আমার নির্দিষ্ট কামরায় ফিরে এসে বসলাম। ট্রেন ছুটে চলেছে হিমালয়ের তুঙ্গ শৈল ও গভীর অন্তর্দেশের মাঝখান দিয়ে। আমি বসে বসে দেখছি গোধূলির হিমালয়ের সেই প্রশান্ত সৌন্দর্য। আস্তে আস্তে আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল টুলীপ ও ইন্দিরা দেবী।

এদের মনমালিন্যের সব ঘটনা ভেসে ওঠে আমার চোখের ওপরে। গত জীবনের নির্বুদ্ধিতার ফল সব মুছে ফেলে পারবেন কি হিজ হাইনেস আবার নতুন ক'রে জীবনের পথে পা বাড়াতে? কিন্তু যেদিক থেকেই এ সমস্যার বিচার করার চেষ্টা করি না কেন, হিজ হাইনেসের পূর্ব জীবনের কার্যাবলী, বিশেষ ক'রে মহারাণীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং তাঁর শ্যামপুর রাজ্যের ভারত রাষ্ট্রভুক্তির প্রশ্নের ওপরে তাঁর একরোখা মেজাজের কথা বিচার করলে এ-সমস্যা সমাধানের কোন পথই খুঁজে পাই না।

বাংলাদেশের মালতীপুরের ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করেছিলেন হিজ হাইনেস ১৯৩৫ সনে। বয়স তখন তাঁর পঁচিশ, ইন্দিরা দেবীর আঠার।

এ-বিয়ে কিন্তু মহারাজার প্রথম নয়, তৃতীয়। ইতিপূর্বে তিনি দু'বার বিয়ে করেছেন, কিন্তু তাঁদের কোন ছেলে হয়নি। দ্বিতীয় রাণীর একটি মেয়ে হয়েছে শুধু। ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে বিয়ের দু' বছর আগে মহারাজার অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে গঙ্গাদাসী নামে এক ব্রাহ্মণ তনয়ার সঙ্গে। বয়সে সে মহারাজার থেকে পাঁচ বছরের বড়। এই দু' বছরের মধ্যে গঙ্গাদাসীর দু'টি সন্তান হয়েছে: একটি ছেলে, একটি মেয়ে কিন্তু উপপত্নীর ছেলে তো রাজ-সিংহাসনে বসতে পারে না। সুতরাং ব্যবস্থা হোলো তৃতীয় বিবাহের। ভবিষ্যৎ টিকিয়ালী রাণী ইন্দিরা দেবী কিংবা তার পিতামাতা দুর্ভাগ্যবশতঃ হিজ হাইনেসের সঙ্গে গঙ্গাদাসীর এই গোপন সম্পর্কের কথা কিছুই জানতেন না।

অদ্ভুত জীবন এই ব্রাহ্মণ কন্যা গঙ্গাদাসীর। কোনো এক পূজারীর পুত্রী সে···বাল্যকাল থেকেই তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে নানাস্থানে নানারকম ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে। রাজপ্রসাদে রাজ-রাণীদের সখীর জীবন থেকে পরবর্তীকালে দ্বিতীয় রাজ-মহিষীর কোলের মেয়ের ধাই হতে হয়েছিল তাকে। দ্বিতীয় রাজ-মহিষীর সঙ্গে একবার তাকে যেতে হয় মহিষীর পিতৃগৃহে, সিমলা পাহাড়ের বাদাউন রাজ্যে। সেখানে রাজ-মহিষীর ভ্রাতা বাদাউনের হিজ হাইনেসের সঙ্গে গোপনে ঘনিষ্ঠতা ঘটে গঙ্গাদাসীর। রাণীদের সঙ্গে রাজার ঘনিষ্ঠতায় আসে শিথিলতা। গঙ্গাদাসীর গর্ভে নতুন শিশুর আগমনের সন্দেহ জাগে অনেকের মনে। ফলে বাদাউন ছেড়ে তাকে চলে আসতে হয় শ্যামপুরে।

ঠিক সেই সময় রাজ-কলেজের গ্রীষ্মকালীন ছুটির পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করতে শ্যামপুরে এসেছেন আমাদের হিজ হাইনেস। বাসনা, কিছুদিন মায়ের কাছে বাস করবেন। ১৯২০ সনে পিতার মৃত্যুর পর থেকে তাঁর স্টেট রয়েছে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে এবং টুলীপের পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁর মায়ের উপর। পরের বছর টুলীপ সাবালক হ'য়ে রাজতক্তে

আরোহণ করেন। তারই কিছু আনুষঙ্গিক রীতিসহবৎ শিক্ষার জন্য তিনি ছুটিতে শ্যামপুরে রাজমাতার কাছে থাকবেন, সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করবেন তাঁর দুই রাণীর সাহচর্য। এই সময় গঙ্গাদাসীর ওপর নজর পড়ে যুবক রাজার। প্রথম দর্শনেই তিনি তার প্রেমে পড়েন। প্রথম প্রথম তাদের মিলন ঘটতে থাকে অতি সংগোপনে। কিন্তু গঙ্গাদাসীর গর্ভের স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে এ-মিলন আর গোপন থাকে না, চারদিকে কানাঘুষো জানাজানি হয়ে যায়।

হিজ হাইনেসের দুই রাণীর মধ্যে বড় রাণী ছিলেন মহারাজার থেকে দশ বছরের বড়। তাঁর প্রভাব হিজ হাইনেসের ওপরে বিশেষ কিছুই ছিল না। সুতরাং শ্যামপুর প্রাসাদের এক পার্শ্বে ধর্মপ্রাণ নারীর নিরিবিলি জীবন অতিবাহিত করতেন তিনি। বয়স হিসেবে দ্বিতীয় রাণী হিজ হাইনেসের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিলেন। দাম্পত্য জীবনে এঁর প্রভাবও ছিল মহারাজার ওপর। কিন্তু পুত্র সন্তান প্রসব করার পর থেকে মহারাজার ওপরে গঙ্গাদাসীর প্রভাব এত বৃদ্ধি পেল যে সবকিছু ছেড়ে তিনি পড়ে থাকতেন গঙ্গাদাসীর ঘরে। এই অবস্থায় বৃদ্ধা রাজমাতা এবং হিজ হাইনেসের দুই বিবাহিতা মহিষী ব্যবস্থা করলেন মহারাজার তৃতীয় বিবাহের। উদ্দেশ্য, রাজতক্তে যাতে বৈধ পুত্র সন্তান বসতে পারে। গঙ্গাদাসীর কাছে এ বিবাহ স্বভাবতঃই অত্যন্ত খারাপ ঠেকে।

সিংহাসন আরোহণের বছরেই তাঁর বিয়ে হোলো মালতীপুরের ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে। নতুন তন্বী বধূর প্রেমে ডুবে রইলেন হিজ হাইনেস। নতুন শিশু এল ইন্দিরা দেবীর—পুত্র সন্তান। সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকার—নতুন টিকা। রাজপরিবারে রাজমাতা রাজমহিষীদের কাছে সমাদর বেড়ে গেল টিকিয়ালী রাণী ইন্দিরা দেবীর। কিন্তু গঙ্গাদাসীর চোখে ঘুম নেই। হিজ হাইনেসের ওপরে তার হারানো প্রভাব ফিরিয়ে পাবার জন্য সে স্বরু করলে আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারের জন্ম হ'লে রাজ্যে স্বরু হয় উৎসবানুষ্ঠানের প্রস্তুতি। অফিস কাছারি সবকিছু ছুটি হয় এই উপলক্ষে। কিন্তু আশ্চর্য, টিকিয়ালী রাণী ইন্দিরা দেবীর পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেও কোন রকম উৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থাই হোলো না। বোঝা গেল গঙ্গাদাসী তার হারানো প্রভাবের সূতো খুঁজে পেয়ে মহারাজাকে সমানে টেনে চলেছে। গঙ্গাদাসীর ছেলেকে ঘোষণা করতে হবে টিকা, উত্তরাধিকারী—। নিরুপায় হিজ হাইনেস গঙ্গাদাসীর চালে বাঁধা পড়ে থাকেন। রাজ্যের দেওয়ান রায়বাহাদুর লায়েক রাম বৈধ রাজপুত্রকে টিকা ঘোষণার অনুরোধ জানালেন মহারাজার কাছে। বৃদ্ধ দেওয়ান বুঝলেন পিছনের অদৃশ্য সূতোর টান কত গভীর! কর্মে ইস্তফা দিয়ে বৃদ্ধ সরে দাঁড়ালেন। নতুন দেওয়ান নিযুক্ত হলেন রাজ্যের আর্থিক উপদেষ্টা চৌধুরী রামজী দাস।

স্বার্থ-উন্মাদ গঙ্গাদাসী স্বরু করলো মহারাজার কানে ইন্দিরা দেবীর বিরুদ্ধে অষ্টপ্রহর বিষোদ্গার। যে কোন ভাবেই হোক না কেন, রাজ-সিংহাসনে বাসতে হবে গঙ্গাদাসীর পুত্রকে। সৎ-অসৎ পথের বাছ-বিচার করবে না গঙ্গাদাসী। নতুন দেওয়ানকে পক্ষে টানবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ধর্মভীরু রামজী দাস এত বড় অন্যায়ের সপক্ষে দাঁড়াতে সম্মত হলেন না। তিনি তো জানেন যে গঙ্গাদাসী মহারাজার উপপত্নী মাত্র। কোনদিনই এই ব্রাহ্মণ কন্যা কোন উপায়েই মহারাজার বৈধ পত্নীরূপে গণ্য হ'তে পারে না। সুতরাং গঙ্গীর অবৈধ পুত্রকে টিকা হিসেবে ঘোষণা করতে তিনি পারেন না। গর্ব-আহত গঙ্গাদাসীর শত্রু-তালিকায় নাম উঠল রামজী দাসের।

ইন্দিরা মহারাণী শিক্ষিতা হলেও এই সমাজের এত সঙ্কীর্ণতা, এত স্বার্থ-সংঘাত সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞান মোটেই ছিল না। আর, এইসব বুঝবার মত বয়সও তার হয়নি। এই স্বার্থ-সংঘাতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিণী যে কত নিম্নে নেমে যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে তাঁর এতটুকু ধ্যান ধারণাও

ছিল না। পরম নিশ্চিন্তে তিনি দিন কাটিয়ে চলেছেন। কিছুদিন পরে তাঁর আট মাস বয়সের শিশুর হঠাৎ একদিন জ্বর হোলো। জ্বর ক্রমশ বেড়েই চলে। ভাবনা-আকুল ইন্দিরা দেবী চেষ্টা করেন ডাক্তার ডাকতে। কিন্তু হিজ হাইনেস মোটেই আমল দেন না এই নব-শিশুর ব্যাধিকে। কিছুদিন বাদে হঠাৎ এসে হাজির হয় অন্তঃপুর-মহলের দ্বারে এক যোগী সন্ন্যাসী। কিসব গাছ-গাছড়ার শিকড় দিলেন যোগীবর শিশুর জন্য। সেই শিকড়ের রস সেবনে শিশু কেমন অস্থির হয়ে পড়ল। ভীত মাতার বার বার ক্রন্দন-অনুরোধেও মহারাজার শিলা-কঠিন হৃদয়ে রেখাপাত হোলো না, ডাক্তার এল না। অবশেষে ভিতরের যন্ত্রণায় আস্তে আস্তে শিশুটি মারা গেল। গভীর সন্দেহ জাগল ইন্দিরা দেবীর মনে তাঁর পুত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয়নি,—এছাড়া কোনই প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, কিন্তু তবুও তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের স্থিরবিশ্বাস, এ-মৃত্যুর পিছনে রয়েছে গভীর ষড়যন্ত্র। রাজকুমারের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য মায়ের আবেদনের কোন মূল্যই কেউ দিল না। কিন্তু তবুও তো প্রমাণ আছে যে এই শিশু-হত্যার পিছনে রয়েছে গঙ্গাদাসীর গভীর ষড়যন্ত্র। মায়ের মনের প্রশ্ন : সেই যোগী সন্ন্যাসীটি গেল কোথায়? শিশুকে শিকড়ের রস সেবন করিয়ে সেই যে সে চলে গেল, রাজ্যের কোন স্থানেই তার খোঁজ পাওয়া গেল না কেন? তাঁর শিশু-সন্তানের মৃত্যু সংবাদ শুনবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো-প্রাসাদে, যেখানে মহারাজা গঙ্গাদাসীকে নিয়ে বাস করতেন, সেখানে এত আনন্দোল্লাস কেন হয়েছিল? ইন্দিরার শিশুর মৃত্যুর পরে পরেই কেন মহারাজা রাজ্যের দরবার আহ্বান ক'রে গঙ্গী-পুত্রকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করতে চাইলেন?

ভারত সরকার কিন্তু মহারাজার এই ঘোষণাকে মেনে নিলেন না। ইন্দিরা দেবী তাঁর পুত্রের রহস্যজনক মৃত্যুর সংবাদ লিখে জানিয়েছিলেন দিল্লীর পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে। গঙ্গীদাসী ও মহারাজা তাই ধরে

নিলেন যে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গঙ্গীপুত্রকে যুবরাজ বলে মেনে নেওয়ার অস্বীকৃতির মূলে রয়েছে ইন্দিরা দেবীর আবেদন। সুতরাং মহারাজা ও গঙ্গীদাসীর সমস্ত রাগ এসে পড়ল ইন্দিরা মহারাণীর ওপর।

হিজ হাইনেস ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ ক'রে দিলেন। নানা রকম গুজব ও ভীতিপ্রদ উড়ো খবর আসতে লাগল ইন্দিরার কানে, গঙ্গাদাসীর হাতে নিজের জীবন ও সম্মান সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। শ্যামপুর দুর্গ-প্রাসাদে বৃদ্ধা শাশুড়ী রাজ-মাতার সঙ্গে এসে তিনি বাস করতে লাগলেন। তাঁর কোন বক্তব্যই তিনি মহারাজাকে বলতে পারতেন না, কারণ হঠাৎ যদি দুর্গ-প্রাসাদেও মহারাজা আসেন, গঙ্গাদাসীও আসে তাঁর সঙ্গে। এমন কি, মহারাজা ইন্দিরাকে প্রাসাদ-কর্মচারীদের সামনে বিশ্বাসঘাতিনী বলে অভিযোগ করতেও সুরু করলেন। ইন্দিরার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। গঙ্গাদাসীর প্ররোচনায় প্রাসাদের চাকর-বাকররাও ইন্দিরা দেবীকে সোজাসুজি অগ্রাহ্য করতে সুরু করল। ইন্দিরার প্রতি সাধারণ সমবেদনা থাকা সত্ত্বেও পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজমাতা পুত্রবধূর পক্ষে দাঁড়ালেন না। কিছুদিনের মধ্যেই ইন্দিরার ব্যক্তিগত কাজকর্ম করবার জন্য যেসব চাকর-বাকর ছিল, দু' একজন ছাড়া তারা সব স্থানান্তরিত হয়ে গেল। এদের চারজন এসেছিল বিয়ের পরে ইন্দিরার বাপের বাড়ীর দেশ মালতীপুর থেকে।

ঠিক এই সময়ে মারা গেলেন দ্বিতীয় রাণী। ইন্দিরাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন, এবং মহারাজার ওপরেও তাঁর কিছু প্রভাব ছিল। দ্বিতীয় রাণীর মৃত্যুর পর গঙ্গাদাসী মহারাজার অন্তরের অন্দরের অর্গল খুলে সোজাসুজি বেরিয়ে পড়ল। প্রথম রাণী এই সময়ে বৃদ্ধা রাজমাতার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন। সুতরাং গঙ্গাদাসীর পোয়াবারো। তার কুচক্রের এক একটা ঘুঁটি মহারাজার হাত দিয়ে সে চালতে সুরু করল। তাঁর অন্দর মহলে ইন্দিরা দেবী মোটামুটি ভাবে একেবারে আলাদা

হ'য়ে পড়লেন। আজ্ঞাবাহী কোন একটি লোক রইল না তাঁর কাছে। দ্বাররক্ষী ও প্রহরীর কড়া পাহারায় কারও ঐ মহলে প্রবেশের উপায় রইল না, এমন কি কোন মেয়েরও নয়। এক কথায়, ইন্দিরা অন্দর মহলে রইলেন বন্দিনী হয়ে। কোনমতে ইন্দিরা পাঠালেন সে-খবর দিল্লীর পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে। গোলমালের ভয়ে হিজ হাইনেস নিয়ম কিছু শিথিল করলেন।

কিন্তু সমস্যার তো কোন সমাধান হোলো না। গঙ্গাদাসীর তো কোন বৈধ স্বীকৃতি হলো না। সুতরাং বৈধ অবৈধ উপায়ে হিজ হাইনেস উপপত্নীর নামে নানা সম্পত্তি হস্তান্তর ক'রে দলিল করতে লাগলেন। নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাদাসীর নামে তুলে দিতে লাগলেন শ্যামপুর স্টেটেরও সম্পত্তি। পুরোনো প্রাসাদের বহুমূল্য অলঙ্কার মণি-মাণিক্য দিলেন গঙ্গাদাসীকে, বিক্রি ক'রে দিলেন প্রাসাদের প্রাচীন মহামূল্য চিত্রসম্ভার, কারুকার্য খচিত সাবেকদিনের একটি হাতীর হাওদা। এর পরের স্তরে সুরু করলেন অর্থের জন্যে সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে রাজ্যের প্রজার উপর হামলা। বৃদ্ধ দেওয়ান রামজী দাস আপত্তি জানালেন মহারাজার সমীপে। কিন্তু মহারাজা কে? রাজশক্তির পাঞ্জা হাতে নিয়ে ঘুঁটি চালাচ্ছে তো গঙ্গাদাসী! সুতরাং অবাধ লুণ্ঠন। স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে রাজ্যের এখানে ওখানে। সে-বিদ্রোহ ডুবিয়ে দিল পুলিশ গুলির মুখে এবং রক্তের নদীতে, নির্বিচার গ্রেফ্‌তার আর বিচারহীন বন্দীত্বে। কিন্তু জনসাধারণের সংগ্রাম নতুন পর্যায়ে উঠে সাংগঠনিক রূপ নিল প্রজামণ্ডলে। ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নৈতিক সমর্থন এল এই প্রজামণ্ডলের পিছনে।

অবশেষে শ্যামপুর রাজ্যের এই প্রজা-বিদ্রোহের মূল অনুসন্ধানের জন্য এক অনুসন্ধান-কমিটি বসল। হিজ হাইনেসের অত্যাচারের সব কাহিনী ফাঁস হয়ে গেল। নানারকমের অবৈধ নজরানা নেওয়া,

সন্তানহীন প্রজার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারদের কাছ থেকে অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায় প্রভৃতি নানারকম অজুহাতে টাকা আদায়ের ফন্দি প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এসব অবৈধ আদেশ না মানলে তার সমস্ত সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। এমন কি নতুন আদেশের বহু পূর্বে নিঃসন্তান আত্মীয়ের সম্পত্তি যারা পেয়েছিল তাদের ধরে ধরে পর্যন্ত অর্থ আদায় হয়েছে। যাদের টাকা ছিল, তারা টাকা দিয়ে ত্রাণ পেয়েছে। আর যাদের টাকা নেই, তারা ঝুলন্ত খাঁড়ার নিচে অহর্নিশ বাস করছে, এই বুঝি তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় হিজ হাইনেসের আদেশে।

এতসব অত্যাচার, জুলুম, অর্থ আদায় যে ব্রাহ্মণ কন্যা উপপত্নী গঙ্গাদাসীর প্রভাবে এবং স্বার্থে হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রজা উৎপীড়নের সেটাই একমাত্র মূল কারণ নয়। মহারাজার আড়ালে গঙ্গাদাসীর নিত্য নতুন প্রেমিক গ্রহণ হিজ হাইনেসকে ক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছিল। ফলে, তাঁদের মনোমালিন্য পরিণত হলো অহর্নিশ কলহে। প্রণয়ক্ষিপ্ত হিজ হাইনেস ছুটলেন মেয়ে-মৃগয়ায়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে মেয়ে সংগ্রহ ক'রে জোগান দিতে লাগল নিয়োজিত এজেণ্টরা। ফলে কুমারী কন্যা ও কড়ি নিয়ে নির্ভাবনায় বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল এ-রাজ্যে। এই সব নতুন সংগৃহীত মেয়েদের এনে প্রাসাদে তুলতে পারতেন না হিজ হাইনেস। মহারানী ইন্দিরাকে পর্যন্ত যে গঙ্গাদাসী সহ্য করতে পারে না, সে যে তার এই সব নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের সাময়িক স্থানও দেবে না রাজপ্রসাদে, তা জানা কথা, বরং তাদের রাজপ্রাসাদে আনলে গোপন হত্যার ব্যবস্থা করত সে। সুতরাং মহারাজা অন্য পথ ধরলেন। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ক্যাম্প স্থাপন ও শিকারে যেতে শুরু করলেন। নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তে বিকৃত কামোন্মাদনা চরিতার্থ হতে লাগল এইভাবে। তাছাড়া গঙ্গাদাসীও প্রায়ই তার দাসীদের

পাঠাত হিজ হাইনেসের কক্ষে; এর ওপর থাকত গঙ্গাদাসীর প্রাসাদে গোপন নৈশ উৎসবের নানা ব্যঞ্জনাপূর্ণ ব্যবস্থা, যার সম্বন্ধে শুধু হরেক রকম গুজবই শোনা যেত, কারণ, গঙ্গাদাসীর প্রাসাদের অভ্যন্তরে স্মরাতুরদের রিরংসা চরিতার্থতার রকমারি বিকৃতি কেউ কল্পনাও করতে পারত না।

অবশেষে রাজ্যের কুশাসন ও মহারাজার স্বেচ্ছাচারীতার নানারকম অভিযোগের জন্য ভারত সরকার আরেকটি অনুসন্ধান কমিটি বসালেন। অতঃপর পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট হিজ হাইনেসের কতকগুলো বিশেষ ক্ষমতা ও সুবিধার ওপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা আরোপ ক'রে নতুন আদেশ জারী করলেন। হুকুম এল ব্রাহ্মণ কন্যা উপপত্নী গঙ্গাদাসীকে তার পুত্রকন্যা সহ শ্যামপুর রাজ্য ত্যাগ করতে হবে। পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের কর্নেল বার্টনের সঙ্গে দেখা ক'রে হিজ হাইনেস তাঁকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন গঙ্গাদাসীর বহিষ্কারের আদেশটা তুলে নিতে। কিন্তু কর্নেল জানালেন যে ঐটেই তো মূল, ঐ মেয়ের জন্যেই শ্যামপুরে এত গোলমাল। তাকে শ্যামপুর ছেড়ে যেতেই হবে—এটাই ভারত সরকারের সুচিন্তিত অভিমত ও আদেশ। হিজ হাইনেসকে কর্নেল আরও বলে দিলেন যে দু'মাসের মধ্যেই গঙ্গাদাসীকে যেন রাজ্য থেকে বহিষ্কার ক'রে দেন এবং পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে একটা রিপোর্ট পাঠান।

কিছুদিন পর কর্নেল বার্টন আমন্ত্রিত হয়ে এলেন শ্যামপুরে শিকার করতে এবং দেখা গেল যে, যে-কোন কারণেই হোক, গঙ্গাদাসীর বহিষ্কারের আদেশ মুলতুবী থেকে গেল। লোক মুখে শোনা গেল, কর্নেল দম্পতির সম্মানের জন্য হিজ হাইনেস যে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেখানে অতি উপাদেয় ময়ূরের কাবাবের সঙ্গে রাজ-ভাণ্ডারের সুপ্রাচীন ফরাসী শ্যাম্পেন দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়িত ক'রে

মহারাজা বলে মিসেস বার্টনের গলায় অত্যন্ত মূল্যবান নেকলেস ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, ভারত সরকার কর্তৃক অনুসন্ধানের সময় এবং তার পর যখন গঙ্গাদাসীর ওপর বহিষ্কারের আদেশ এল এবং হিজ হাইনেসরও মনে হয়েছিল যে এই আদেশ বোধহয় আর রোখা যাবে না, তখন ঐ কয়েকদিনের জন্য মহারাজার ওপর গঙ্গাদাসীর প্রভাব কিছুটা কমে গিয়েছিল। মহারাজাকে সে-ভাবে আর সে আগলে রাখতে পারল না। পুরোনো প্রাসাদে ইন্দিরার কাছে গিয়ে তাঁর সহানুভূতি উদ্রেকের নানা কলাকৌশল খাটাতে লাগলেন হিজ হাইনেস। স্বামীর অনুতাপের ধারায় ইন্দিরাও গলে গেলেন, স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল।

বৃদ্ধ দেওয়ান রামজী দাস মহারাজার এই মতি-পরিবর্তনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। গঙ্গাদাসীর বহিষ্কারের আদেশ তাড়াতাড়ি কার্যকরী করবার চেষ্টা করলেন তিনি। রাজ্যসরকারের হরিদ্বারের প্রাসাদটা সবেমাত্র বে-আইনীভাবে বিক্রি ক'রে গঙ্গাদাসীর হাতে এসে পড়েছে চার লাখ টাকা। সে-টাকা তিনি উদ্ধারের চেষ্টা করলেন। দেওয়ানের এই বিশ্বাস ও সততা দু'চক্ষে দেখতে পারত না গঙ্গাদাসী। কিছুদিন পরে দেখা গেল অদ্ভুত অবস্থায় রামজী দাসের মৃত্যু ঘটেছে। এ-ঘটনায় সকলে যে খুব আশ্চর্য হলো, তা নয়।

রামজী দাসের মৃত্যুর পর নতুন দেওয়ান নিযুক্ত হলেন হিজ হাইনেসের খুড়তুতো ভাই চৌধুরী রঘবীর সিং। বয়সে যুবক, চরিত্রে লম্পট, এই নতুন লোকটি ছিলেন মহারাজার একান্ত সচিব, সুতরাং সোনায় সোহাগা! একেবারে মহারাজার হাতের লোক এবং সেই সঙ্গে গঙ্গাদাসীর গোপন প্রেমিক। নতুন দেওয়ান নতুন পথে এগোল। আপস-মীমাংসার নামে ইন্দিরার কাছে সে অশ্রাব্য কুপ্রস্তাব পাঠালে।

মৌখিক প্রেমনিবেদনের ব্যর্থতায় রঘবীর সিং এবার বিচার ক'রে দেখল ইন্দিরার অবস্থা। সহায়হীনা নারীর কাছে নরম গরম ভাষায় আবার পাঠাল আর একখানা প্রেমপত্র। ইন্দিরার নীরবতায় কামাতুর রঘবীর মনে মনে প্যাঁচ কষতে লাগল কিভাবে তাঁকে পাওয়া যায়। ভয় একটু হলো, যদি হিজ হাইনেসের কানে ইন্দিরা দেবী রঘবীরের প্রেম-নিবেদনের কথা আর তার কুপ্রস্তাবের চিঠিটা দেখিয়ে দেন! সুতরাং আর একটু প্রস্তুতির প্রয়োজন। এবং এই কুকর্মে গঙ্গাদাসী তার প্রধান সহায়। ইন্দিরার চরিত্র সম্বন্ধে কানাঘুসো বাজে রটনা ছড়াতে লাগল। কোন্ এক মিলিটারী অফিসরের সঙ্গে বলে তাঁর গোপন প্রণয়ের লীলাখেলা চলে। হিজ হাইনেসও তাঁর অন্যায় যৌনকর্মের সাফাই হিসেবে এ গুজবে বিশ্বাস করলেন। হুঁ, তিনি যে একাই লিপ্ত থাকেন, তা নয়, সুযোগ ক'রে নিয়ে রানীসাহেবাও এ পথের পথিক হন!

এই সময় একদিন হিজ হাইনেস দুর্গে এলে ইন্দিরা দেবী রঘবীরের প্রেমপত্র তাঁকে দেখালেন। কিন্তু গুজবে বিশ্বাসী মহারাজার তখন মনস্থির। রঘবীরের বিরুদ্ধে ইন্দিরার চক্রান্তের অঙ্গ হিসেবেই তিনি প্রেমপত্রকে মনে করলেন জাল চিঠি। প্রাসাদের অন্যান্য লোকজনদের সামনেই তিনি ইন্দিরা দেবীকে নোংরা ভাষায় অপমান করলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ইন্দিরা দেবী এলেন সিমলার পাহাড়ে। মহারাজার নাম সই-করা এক হুকুম-নামা এল শ্যামপুর প্রাসাদের রক্ষী-বাহিনীর প্রধান কর্মচারীর কাছে। তাতে নির্দেশ দেওয়া ছিল, ইন্দিরা মহারানীর বাসস্থানের ওপর কড়া নজর রাখার। অন্য কোন লোককে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া হয়। ইন্দিরা দেবী কোথায় যান না-যান তার ওপর যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়, এবং কখনই যেন তিনি একলা বের না হতে পারেন।

ফল হলো এই যে, সিমলা পাহাড়ের ঐ পরিবেশে ইন্দিরা মহা-

রানীকে নিয়ে রসাল আলোচনা বেশ জমে উঠল। সহজ-লভ্য জেনানা মনে ক'রে কায়দা-তুরস্ত হৃদয়-নিবেদকদের নিকট থেকে আবেদন আসতে লাগল ইন্দিরার নামে। শ্যামপুরে হিজ হাইনেসের সঙ্গে ইন্দিরার যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার ফলে ইন্দিরা দেবী এখন অন্তঃসত্ত্বা। রসাল জমাট গুজবের পক্ষে এঘটনাটি চমৎকার ইন্ধন জোগাল।

১৯৪২-র আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে রাজমাতা এবং পাটরানী ইন্দিরার অন্তঃসত্ত্বার কথা জানতে পেরে তাঁকে নিয়ে বের হলেন তীর্থভ্রমণে। তাঁরা গেলেন হরিদ্বার, মথুরা, কাশী ও দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরের মন্দিরে। দু'হাতে দানখয়রাত ক'রে ও মন্দিরে-মন্দিরে প্রার্থনা জানালেন যেন ইন্দিরার গর্ভে পুত্র সন্তান হয়।

কিন্তু গঙ্গীর চোখে ঘুম নেই। ইন্দিরার গর্ভে যদি সত্যি সত্যিই পুত্র সন্তান হয়, শ্যামপুরের রাজসিংহাসনে তো বসবে সেই ছেলে!

হঠাৎ গুজব ছড়াল যে ইন্দিরা কার সঙ্গে বলে পালিয়ে গেছেন।

তীর্থভ্রমণের পরে দেরাদুনে এসেছেন তাঁরা। তাঁদের কানেও ইন্দিরার এই অন্তর্ধানের গুজব এল। মনে মনে হাসলেন ইন্দিরা। দেরাদুনের এক নার্সিং হোমে ইন্দিরার প্রসবের সব ব্যবস্থা করলেন রাজমাতা ও পাটরানী। হঠাৎ একদিন এক পুলিস ইন্‌স্পেক্টর এক পরোয়ানা নিয়ে এসে ইন্দিরা দেবীকে দেখাল। তাতে নির্দেশ আছে যে ইন্দিরা দেবীকে তক্ষুণি শ্যামপুর রাজ্য পুলিসের হাতে সমর্পণ করার। চূড়ান্ত অপমান ইন্দিরা মহারানীর।

ভাইসরয়, পাঞ্জাবের গভর্নর এবং পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের মিঃ উইলিয়মসনকে সব ঘটনা জানিয়ে জরুরী টেলিগ্রাম পাঠালেন ইন্দিরা দেবী। মিঃ উইলিয়মসন টেলিগ্রামে উত্তর দিলেন তাঁকে সিমলায় আসতে। প্রয়োজনীয় ডাক্তারী ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা তিনি করবেন বলে ইন্দিরাকে জানালেন।

সিমলায় এলেন ইন্দিরা দেবী। সঙ্গে এসেছেন তাঁর মা। মেয়ের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর পেয়ে তিনি দেরাছুনে এসেছিলেন মেয়ের কাছে। সিমলায় ইন্দিরাকে পরীক্ষা করলেন দু'জন আই. এম. এস. সার্জেন। ঠিক সময় মতই প্রসব হবে, অহেতুক চিন্তিত না হতে পরামর্শ দিলেন তাঁরা কিন্তু মিঃ উইলিয়মসন ইন্দিরাকে একদিন জানালেন মহারাজার ইচ্ছার কথা। মহারানীর ফিরে যাওয়া উচিত শ্যামপুরে। অন্তঃসত্ত্বার এই অবস্থায় নড়াচড়া ঠিক হবে না, কিন্তু তবুও মহারাজার ইচ্ছাই পালন করা উচিত মহারানীর, অল্প কথায় সোজাসুজি জানালেন উইলিয়মসন।

নিরুপায় ইন্দিরা দেবী বুঝলেন। ফিরে আসতে হলো তাঁকে শ্যাম-পুরে। আবার সেই প্রাসাদ-দুর্গের কক্ষ। বন্দীনিবাস। গভীর শঙ্কায় দিন গোনেন। প্রথম পুত্রকে হারানোর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা বিঁধে আছে তাঁর মনে। বুঝলেন, কায়দা ক'রে গঙ্গী তাঁকে শ্যামপুরে এনে ফেলেছে। কিন্তু, তবু ভরসা যে মা রয়েছেন ইন্দিরার সঙ্গে। গঙ্গীর কারসাজীর হাত থেকে মেয়েকে তিনি রক্ষা করবেন। এবং জানুয়ারীর এক সকালে ইন্দিরা দেবীর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো।

নতুন উত্তরাধিকারীর জন্ম হলো। রীতি অনুযায়ী ঘোষণা হওয়ার কথা রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজার জন্ম। কিন্তু এবারেও মহারাজা নীরব। ঘোষণা তো দূরের কথা, গঙ্গাদাসীর ভয়ে প্রাসাদ-দুর্গে এসে মুখদর্শন পর্যন্ত করলেন না তিনি।

মাস কয়েক পরে ইন্দিরা দেবীর মা ফিরে গেলেন তাঁর দেশে। গাঢ়ী নামক স্থানে যে রাজপ্রাসাদ আছে তাতেই এসে বাস করতে লাগলেন ইন্দিরা দেবী তাঁর নবজাতককে নিয়ে। যুদ্ধের শেষ তিনটি বছর তিনি এই প্রাসাদেই অবস্থান করেন।

ইন্দিরার নবজাতক খুবই দুর্বল হয়েছে। অনেক লেখালেখি ও

আবেদনের পর মিঃ উইলিয়মসনের নির্দেশে মহারাজা নবজাতক রাজপুত্রের জন্য একজন ধাত্রী নিযুক্ত করলেন, ইন্দিরার জন্য গাড়ী এবং ভৃত্য-পরিচারিকার ব্যবস্থা করলেন। দু'বছর পর যখন গোলমাল দেখা দিয়েছিল, তখন মিঃ উইলিয়মসন এসেছিলেন রাজ্যে। তখন তিনি মহারাজাকে বলেছিলেন রাজপুত্রের ওপর নজর দিতে, তাকে নিয়মিতভাবে দেখতে। গঙ্গাদাসীর ভয়ে নেহাৎ অনিচ্ছায় মিঃ উইলিয়মসনের কথায় তাঁকে রাজী হতে হয়েছিল।

এই রকম নজর-বন্দী অবস্থায় থেকেও ইন্দিরা খবর পেলেন যে গঙ্গাদাসী রাজপুত্রকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। প্রমাণ কিছু নেই, হাওয়ায় ভেসে এল এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা। সন্দেহ হওয়ার দু'একটা কারণও ঘটতে লাগল। দিল্লীর পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে নতুন নির্দেশ এল গঙ্গাদাসীর বহিষ্কারের। কিন্তু সে-নির্দেশ আর পালিত হলো না, কারণ, ইংরাজ প্রতিনিধি স্যার হার্টলে উইদরস ও লেডী উইদরসের সঙ্গে মহারাজার খুবই প্রীতিভাব রয়েছে।

রাজপুত্র পাঁচ বছরে পা দিলেন। ইন্দিরা দেবী তার লেখাপড়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। সিমলার কোন শিশু-বিদ্যালয়ে তাকে ভর্তির ব্যবস্থার জন্য তিনি লেখালেখি করতে লাগলেন। অবশেষে অনেক বাদানুবাদ এবং মহারাজার দিক থেকে নানারকম অর্থহীন বিরোধিতা কাটিয়ে ইন্দিরার বালক পুত্রের সিমলার কোন শিশু-বিদ্যালয়ে পাঠ-ব্যবস্থার অনুমোদন এল। শিশুপুত্রের সঙ্গে থাকার জন্য ইন্দিরা দেবীকে সিমলায় শ্যামপুর লজে বাস করবার অনুমতিও দেওয়া হলো।

এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও ব্যাপকভাবে প্রজা-বিদ্রোহ দেখা দিলে মহারাজা তাঁর মন্ত্রী-মণ্ডলীর রদবদল করতে বাধ্য হলেন। চৌধুরী রঘবীর সিং হলো প্রধান সেনাপতি এবং তার স্থানে স্বরাষ্ট্র সচিব হলেন সুব্রাহ্মণ রায় বাহাদুর শিবনাথ। কিন্তু শুধু ঘোড়া

বদলালেই তো আর শ্যামপুরের খরস্রোতা জীবন-নদী সহজে পার হওয়া যায় না। মন্ত্রী-মণ্ডলীর এই রদবদলে রাজ্যের অবস্থার কোন উন্নতিই হলো না।

ইন্দিরা মহারানীর অবস্থা কিন্তু আরও খারাপ হলো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবনাথ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ-কন্যা গঙ্গাদাসীর প্রতি তাঁর বর্ণ-পক্ষপাতিত্ব। নতুন শাসনের ধাক্কাটা অনুভব করতে ইন্দিরা দেবীর বিশেষ দেরী হলো না। সিমলায় তিনি এসেছেন তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে, সঙ্গে আছে ফিরিঙ্গী ধাত্রী মিসেস বারোজ। একদিন সকালে মিসেস বারোজ বের হলো মলের বাজারে জিনিসপত্র কিনতে। যাবার সময় ইন্দিরাকে বলল রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সে। অত কিছু না ভেবে ইন্দিরা রাজী হলেন। সকাল পেরিয়ে গেল, মিসেস বারোজের দেখা নেই; খাবার সময় হলো, তখনও তারা ফিরল না। চিন্তিত মাতা চাকর-বাকরকে পাঠালেন সিমলার চারদিকে পুত্র ও ধাত্রীর খোঁজে। কোথায় গেল তারা?—কেউই তাদের দেখে নি। ভীত ইন্দিরা ফোন করলেন সিমলার পুলিসের বড় কর্তাকে, টেলিগ্রাম পাঠালেন পাঞ্জাবের গভর্নরকে। কিন্তু না ধাত্রী, না রাজপুত্র—কারও কোন খোঁজ কোথাও পাওয়া গেল না। এমন সময় অপরাহ্নে শ্যামপুরের ইংরেজ প্রতিনিধির কাছ থেকে চিঠি এল ইন্দিরার নামে। ইন্দিরা যদি ইচ্ছা করেন তবে ছোট সিমলার এ্যাবারগাল্ডিয়া বাংলোয় এসে তাঁর পুত্রকে দেখে যেতে পারেন। তাঁরই হুকুমে রাজকুমারকে মিসেস বারোজ এখানে নিয়ে এসেছে। মায়ের প্রভাব থেকে রাজকুমারকে দূরে রাখার প্রয়োজনেই এটা করা হয়েছে। আর, এ-সাক্ষাৎ দৈনন্দিন সাক্ষাৎ নয়, পুত্রকে যেন বিদায় জানিয়েই আসেন ইন্দিরা দেবী। কারণ, তাঁকে ফিরে যেতে হবে শ্যামপুরে। তার পরদিন সকালে এসে উপস্থিত হলেন পণ্ডিত শিবনাথ। মহারানীকে বোঝালেন যে তাঁর শ্যামপুরেই ফিরে যাওয়া উচিত। ইন্দিরা

শিবনাথের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন যে, একমাত্র পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কথা ছাড়া তিনি কোথাও নড়বেন না, তিনি এ-বিষয় সেখানে ইতিমধ্যে লিখেছেনও। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বুঝে গেলেন যে দিল্লী পর্যন্ত এ নিয়ে নাড়া-চাড়া শুরু হয়েছে। সেই দিনই বিকেলে ইন্দিরার পুত্র ফিরে এল মায়ের বুকে ; ফিরিঙ্গী ধাত্রী মিসেস বারোজ আর ফিরল না। দিল্লীতে দরবার করার ফলে ভারত গভর্নমেণ্ট ইন্দিরা দেবীকে তাঁর শিশু রাজপুত্রকে নিয়ে কসৌলিতে বাস করবার হুকুম দিলেন। মিস ম্যাক্‌কুইন নামে একজন স্কচ ধাত্রী নিয়োজিত হলো রাজপুত্রের জন্য। ইন্দিরার দরখাস্তের ফল হলো আরও সুদূর প্রসারী। পণ্ডিত শিবনাথ মন্ত্রিত্ব থেকে বিতাড়িত হলেন। দিল্লীর পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট তাঁর স্থানে পাঠালেন পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব পুলিস অধিকর্তা মিঃ হোয়েসকে। লাহোরের ফোরমান ক্রিশ্চিয়ান কলেজের প্রফেসর মিঃ রিচার্ডস এলেন শ্যামপুরের শিক্ষা-সচিব হয়ে, স্বরাষ্ট্র ও অর্থ দপ্তরের ভার দেওয়া হলো মেজর স্যাস্‌কে।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের যে বিক্ষোভ জমাট বেঁধে উঠছিল দেশের সব জায়গায়, তার ঢেউ এসে লাগল শ্যামপুরেও। শ্যামপুরের নীরব সর্বংসহা প্রজা মুখর হয়ে উঠল, প্রজা-মণ্ডলের নেতৃত্বে সে-বিক্ষোভ শক্তিশালী হয়ে উঠল। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হলো শ্যামপুরেও। বছরের পর বছর সরকারী দুঃশাসনে যে বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল শ্যামপুরের ঘরে ঘরে, তাতে অগ্নি-সংযোগ করল ইংরেজ মন্ত্রীদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা দাবিয়ে রাখবার নৃশংস অত্যাচার।

এই সময় বৃটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করল ভারতকে। তৎকালীন বিশৃঙ্খলার পূর্ণ সুযোগের ব্যবহার করতে চাইলেন শ্যামপুরের হিজ হাইনেস মহারাজা দলীপ কুমার। তিনি হবেন স্বাধীন রাজা। ভারত-ভুক্তির দলিলে তিনি সই দেবেন না। সর্বভারতের ঘৃণায় পাত্র হয়ে উঠলেন আমাদের মহারাজা।

শ্যামপুরের প্রজা বিদ্রোহের যে দাবানল জলে উঠেছিল এই সময়ে, কমিউনিষ্টদের প্ররোচনাই বলে ছিল তার মূলে—তাতে মহারাজা বাধ্য হলেন ইংরেজ মন্ত্রীদের সরিয়ে দিয়ে কিছু কিছু সংস্কারের ঘোষণা করতে। নতুন ভারত-সরকার ভূতপূর্ব ঝানু আই. সি. এস শ্রীযুত পোপতলাল জে শা'কে কেন্দ্রীয় গর্ভনমেণ্টের প্রতিনিধি ক'রে পাঠালেন শ্যামপুরে।

ভারত ভুক্তির দলিলে সই না করার জন্ম তাঁর সম্বন্ধে নতুন ভারত-সরকার কি ভাবছেন, গঙ্গাদাসীর ব্যাপারটাই বা দিল্লীর নতুন গভর্নমেণ্ট কিভাবে গ্রহণ করবেন, কিছুই ঠিক বুঝতে পারছেন না হিজ হাইনেস। এরই মধ্যে এলেন শ্রীপোপতলাল। এই সবকিছু মাথায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে হিজ হাইনেস এলেন গ্রীষ্মের দিন কাটাতে সিমলার পাহাড়ে।

গঙ্গাদাসী সঙ্গে নেই মহারাজার। মন-মরা হিজ হাইনেস তাই ছুটেছিলেন দেহ ও মনের ব্যথা ভুলবার জন্ম বাণ্টি রাসেলের পেছনে। এরই ফলে চরম অবস্থার সৃষ্টি হলো ক্যাপটেন রাসেলের সঙ্গে এবং আমাদের ছাড়তে হলো সিমলা পাহাড়। এর যে শেষ কোথায় এবং কি ভাবে, আমরা কেউই জানি না, না জানেন হিজ হাইনেস নিজেও। পাহাড় ছেড়ে নেমে চলেছি নীচের সমতল ভূমির দিকে। মহারাজার মন-মেজাজ সেখানে হয় সবকিছু ভেঙ্গেচুরে তছনছ ক'রে দেবে, নয় তো, তিনি নতুন ক'রে খেলা শুরু করবেন। কোন্ পথ তিনি গ্রহণ করবেন? কিছুই জানি নে আমরা; তবে এটুকু বুঝে-ছিলাম যে, যে-জুয়া খেলা শুরু হয়েছে এবার, তাতে মহারাজা নেমেছেন সর্বস্ব পণ ক'রে। বড় বেশী বাজি ধরেছেন তিনি। চারদিকের বিরোধিতার মধ্যে তিনি যে খেলা শুরু করেছেন, ছুনিয়ার যে-কোন জুয়ার আড্ডার বাজি থেকে তাঁর এই পণ অনেক অনেক অনেক বেশী; তাতে, হয় তিনি বাজিমাৎ ক'রে বেরিয়ে আসবেন, না হয় তো, সর্বস্ব খুইয়ে পথে দাঁড়াবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

নব নিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপতলাল জে শা'কে মহারাজার রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের কথা টেলিগ্রামে জানানো সত্ত্বেও, তিনি কিংবা আর কেউই শ্যামপুর স্টেশনে মহারাজাকে স্বাগত জানাতে এলেন না, এমন কি, মহারাজার রাজ্য-প্রবেশে যে এগারটি তোপধ্বনি হয়ে থাকে, তা পর্যন্ত এবার হলো না। স্বভাবতঃই হিজ হাইনেসের রাজকীয় মেজাজ উত্তপ্ত হবারই কথা, এবং হলোও তাই। অশ্রাব্য গালাগালের খৈ ফুটতে লাগল মহারাজার শ্রীমুখে। স্টেশন-মাষ্টার থেকে কুলিরা পর্যন্ত পাহাড়ী ডোগরা ভাষার চোস্ত কানে-আঙুল-দেওয়া গাল খেল মহারাজার কাছে। রাজ্যে উপস্থিত থাকলে এবং স্টেশনে এলে এরকম গালাগালের বকশিশ তারা প্রায়ই পেয়ে থাকে; মাত্র মাস কয়েক আগে, মহারাজার এবারের অনুপস্থিতির পূর্বেও তারা এই জাতীয় উপহার পেয়েছে।

এইসব মুহূর্তে মুন্সী মিথললালের মুন্সিয়ানা সত্যিই অদ্ভুত দেখি। মহারাজার কানে কানে তিনি যেন কি বললেন। দেখলাম, মুহূর্তে মহারাজা একেবারে শান্ত হয়ে গেছেন। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম: 'কোন্ যাদুবিদ্যায় এটা সম্ভব হলো, মুন্সীজী?' মুন্সীজী বললেন, তিনি মহারাজাকে জানিয়েছেন যে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিচার ক'রে প্রাসাদ-প্রবেশের শুভমুহূর্ত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। শুনে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলাম হিজ হাইনেসের ভণ্ডামিপূর্ণ শান্ত চেহারার দিকে। আমার বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টির ভেতর থেকে শিষ্টতা-বিহীন কৌতূহল উপচে পড়ছিল। পাকা নটের মতো হিজ হাইনেস এই

কুসংস্কার মেনে নেওয়ার ভান ক'রে নীরব রইলেন। হল্ পেরিয়ে আমরা রাজকীয় বিশ্রামাগারে প্রবেশ করলাম। মোগল-চূড়া ও মিনার শোভিত এই বিশেষ বিশ্রামগারটা তৈরি হয়েছিল রাজপরিবার ও রাজ-অতিথিদের জন্যে।

আমাদের রাজ-রাজরার জীবনের অদ্ভুত কথা পাঠ ক'রে পাঠকের মনে কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই গোড়ায়ই দু'একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন মনে করছি।

য়ুরোপে ডাক্তারী পড়তে যাবার আগেই আমি জানতাম যে আমাদের এই বিংশ শতাব্দীতেও গত-শতাব্দীর নানা সংস্কার ও দেশাচার সব কি অদ্ভুত উপায়ে সংরক্ষিত হ'য়ে আছে। তিন বছর পশ্চিম-বাসের পর আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে,য়ুরোপীয় হাল-ফ্যাশানের সঙ্গে আমাদের পুরোনো রীতিনীতি ও চিন্তাধারার কিভাবে টক্কর চলেছে। শিশুবয়স থেকে যেসব সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক বাধা-নিষেধ ও প্রতিরোধ আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে যায়, যৌবন কালে নানারকম বিরোধিতা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে সেগুলো আমি মেনে নিয়েছিলাম। পশ্চিমবাসের পর এসব সংস্কারগুলো আমার মনে বিরক্ত উৎপাদন করত। এই সব কুসংস্কারের মধ্যে থাকতে থাকতে যাতে নিরাশ হয়ে ভেঙ্গে না পড়ি, তার জন্য আমি সচেষ্ট হয়ে নিজের মনে এইসব বাধা-নিষেধের প্রতি বিদ্রূপ-ব্যাঙ্গ গড়ে তুললাম। নির্বোধ অত্যাধুনিক আমি নই যে য়ুরোপের সবকিছুই আমার কাছে আদরণীয় আর আমার দেশের সবকিছুই অপাঙ্‌ক্তেয়—এরকম অদ্ভুত চিন্তা আমার নেই। বিভিন্ন শতাব্দীর বিবর্তনের সঙ্গে যে সংঘাত চলেছে আমাদের, তার পরিণতি, আমার মনে হতো, বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ, যদি না আমরা য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ সাধন ক'রে জীবনের নতুন মূল্যবোধ গ্রহণ করি, এবং মোটামুটি ভাবে আমরা কোন্ পথে এগোব, না বুঝি। প্রতীচ্য ও

ভারতীয় সভ্যতা—এ দুইটি ধারার সংঘর্ষের চমৎকার প্রতিফলন তো দেখছি আমাদের এই শ্যামপুরের হিজ হাইনেসের মধ্যে। একদিকে তিনি শিক্ষা পেয়েছেন ইংলিশ পাবলিক স্কুল পদ্ধতিতে, আর সেই সঙ্গে বেড়ে উঠেছেন রাজপরিবারের চরম কুসংস্কার ও তমসাচ্ছন্ন চিন্তাধারার আবেষ্টনে ফলে, দুই সভ্যতার বর্বর তাড়নার প্রভাবে পড়ে হিজ হাইনেস ছুটে চলেছেন তাঁর জীবন-কক্ষে, ক্ষণকালের জন্যেও তাঁর মনে নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই জাগে না।

আমার কাছে সত্যিই ভারী বিশ্রী লাগছিল এই শুভ মুহূর্তের জন্য এভাবে অপেক্ষা করতে। এ কথা আমি জানতাম যে, রাজ-জ্যোতিষীর দ্বারা এই শুভ মুহূর্ত নির্বাচন রাজার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখন শুধু চেয়ারে বসে বসে রাজ-জ্যোতিষীর আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে। তিনি এসে আকাশের নক্ষত্রের অবস্থানের সঙ্গে হিজ হাইনেসের কোষ্ঠী মিলিয়ে বিচার ক'রে ফতোয়া দেবেন যাত্রা শুভ ব'লে এবং এই অদ্ভুত কুসংস্কারের কথা জানা সত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে। শেষে না পেরে হঠাৎ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম :

'আচ্ছা, রাজ-জ্যোতিষী যখন মহারাজার প্রয়োজনে আমাদের নক্ষত্রের অবস্থান এদিক-ওদিক ক'রে নিয়ে শুভমুহূর্ত বের ক'রে দেবেনই, তখন কেন আমরা এভাবে বসে আছি!'

বিরক্ত হিজ হাইনেস বলে উঠলেন : 'তা বটে, আমার তো দু'দুটো কোষ্ঠী আছে। একটায় যদি শুভমুহূর্ত না পাওয়া যায়, অন্যটায় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

মুন্সীজী বুঝলেন যে মহারাজা সত্যিই এইভাবে বসে থাকার জন্য ক্রমশঃই উত্তপ্ত হয়ে উঠছেন। গম্ভীর মুখে তিনি বললেন : 'নক্ষত্রের অবস্থানে শুনেছি পরিবর্তন হয়—'

সঙ্গে সঙ্গে পিয়ারা সিং কুলিদের হাঁক দিয়ে উঠল : 'এই চল্—'এমন ভাবে সে চেঁচিয়ে উঠল যেন একপাল গাধা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে।

মনে মনে আমি কিন্তু একটু দুর্বলতাই অনুভব করলাম। বিশ্রামাগারের বাইরে মোটর তৈরী আছে তো? তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখলাম, হ্যাঁ, মহারাজার রোল্স্-রয়েস এসে দাঁড়িয়েছে। তার পেছনে তিনখানা বুইক ও একখানা স্টেশন ওয়াগন। কুড়ি গজ পর পর শ্রেণীবদ্ধ হয়ে রাজ্যের পুলিস রাজপথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একখানা বুইক গাড়ী থেকে রাজ-জ্যোতিষী নামলেন। হাত জোড় ক'রে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। বৃদ্ধ হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

'শুভমুহূর্ত কখন, বিচার ক'রে দেখেছেন কি পণ্ডিতজী?' জিজ্ঞেস করলাম।

'মহারাজার কোষ্ঠীতে অশুভ সময় বলে কিছু নেই বৎস। সব সময়ই তাঁর পক্ষে শুভ।'

নিজের মনের ভাব চেপে রাখতে পারলাম না, ইংরেজীতে বলে উঠলাম : 'ব্রেভো!' পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালাম বিশ্রাম-কক্ষের দিকে। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি হিজ হাইনেস। দাঁড়িয়ে পড়লাম।

পণ্ডিতজী হাতজোড় ক'রে হিজ হাইনেসকে অভিবাদন জানালেন। সে-অভিবাদনের সুদে-আসলে শোধ দিলেন, ট্রাউজার পরা সত্ত্বেও হিজ হাইনেস একেবারে অবনত মস্তকে পণ্ডিতজীর পদযুগল ছুঁয়ে। পণ্ডিতজীর শ্রীচরণ থেকে কাল্পনিক পদরেণু নিয়ে কপালে লাগাতে লাগাতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'আশীর্বাদ করছি মহারাজা, দীর্ঘজীবি হও। তোমার জীবনে সব সময়ই শুভ মুহূর্ত। তোমার পথ সব সময়ই কুসুমাস্তীর্ণ।'

এই অকাটমূর্খের ভাঁড়ামি শুনে হাসি চেপে রাখা কষ্টকর। হিজ হাইনেসের রোলস রয়েসের দরজা খুলে দিতে দিতে আমি বললাম :

'কুসুমাস্তীর্ণ পথ। গোলাপের কাঁটার কথা ভুলে যাবেন না হাইনেস!'

হো হো ক'রে হাসতে হাসতে হিজ হাইনেস উঠে বসলেন গাড়ীতে।

শ্যামপুরের অপ্রশস্ত রাস্তাগুলো ধুলোভর্তি এবড়ো খেবড়ো হ'লে কি হবে, রাস্তার ধারে ধারে লেখা বিভিন্ন পথচলার নির্দেশনামা কিন্তু সত্যিই মনোহর। রাজপথের দু'ধার থেকে ছোট ছোট গলি ও পায়ে-হাঁটা পথ বেরিয়ে গেছে। যানবাহনের মধ্যে অভিজাত মহলের দু'চার-খানা মোটরগাড়ী, উত্তর ভারতের সুপরিচিত জুড়ী কিংবা বহুঘোড়ার গাড়ী, টাঙ্গা, এক্কা, গরুরগাড়ী এবং মানুষ-টানা রিক্সা চলে শ্যামপুর শহরের রাস্তার ধুলো উড়োতে উড়োতে। শহরের প্রধান রাজপথ গেছে রেল স্টেশন থেকে ভিক্টোরিয়া বাজারের অন্তঃস্থল পর্যন্ত। রাস্তাটির নাম ভিক্টোরিয়া রাজপথ—মহামান্য সম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে নামকরণ হয়েছে বর্তমান হিজ হাইনেসের প্রপিতামহের কালে, যখন সর্বপ্রথম তিনি মহারানীর সরকার বাহাদুরের সঙ্গে বিশেষ চুক্তি সম্পাদন ক'রে করদ মিত্ররাজ্যের সম্মানিত স্বাধীন রাজা হয়েছিলেন। রাজধানীর অন্যান্য পথের নাম হয়েছে বিভিন্ন ইংরেজ রাজপুরুষ, ভাইসরয় এবং মহারাজার পূর্বপুরুষদের নামে।

আমাদের আগে আগে চলল শ্যামপুর পুলিসের গাড়ী। ভিক্টোরিয়া বাজার অতিক্রম করছি। আমাদের দেখে রাস্তার অন্য যানবাহন ও পথচারীরা সব এদিক ওদিক ছুটে সরে যেতে লাগল—যেন মুরগীর পালে পাগলা কুকুর পড়েছে। সমস্ত যানবাহন দাঁড়িয়ে গেল, পাহারাদাররা মিলিটারি কায়দায় দাঁড়িয়ে স্যালুট দিল, দোকানীরা তাদের ইঁদুর-খাঁচার মতো দোকানের সংকীর্ণ দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে

অবনত মস্তকে কুর্নিশ করতে লাগল। সকলের শ্রদ্ধা ছিনিয়ে নিতে নিতে আমরা ছুটে এগিয়ে চললাম রাজপ্রাসাদের দিকে। বাঁয়ে ঘুরে সিংহদ্বার পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম প্রাসাদ-সীমানার অন্দরে। হাওয়া-ঘরের চূড়ার শান্তিপ্রিয় পায়রাগুলো আমাদের হঠাৎ আগমনে ফট্ ফট্ ক'রে আকাশে উড়ে গেল। তারই শব্দে প্রস্তর মূর্তির মতো দণ্ডায়মান শুভ্র শ্মশ্রু বিমণ্ডিত দু'জন অশ্বারোহী রাজপুতপ্রহরী সচকিত হয়ে উঠল, তাদের কোমরে ঝুলোন প্রাচীন তরবারি ঝনঝনিয়ে উঠল। লাল পাথরের তৈরি প্রাসাদের মর্মর মেঝের ওপর দিয়ে বহু লোকজনের শশব্যস্ত চলা-ফেরার শব্দ আমাদের কানে এল।

আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়াল সাবেকী-ধাঁচের সুন্দর প্রাসাদটির অলিন্দে। সুচারু কারুকার্য খচিত স্তম্ভ ও মর্মর জাফরি। সামনের প্রশস্ত লনে কেয়ারীর মধ্যে অতি সযত্নে তৈরি করা রংবেরঙের নানা রকম ফুল, তারই মাঝে ঝরণা···গ্রীষ্মের নিষ্ঠুর সূর্যের তাপে দগ্ধ পুষ্পস্তবক সেই ঝরণার জলে জীবনের রূপ রস আহরণ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে আমাদের। দেখে মনটা আনন্দে নেচে ওঠে।

দীর্ঘ চতুষ্কোন প্রাসাদের পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে আমাদের আবাস। সাহেবী কায়দায় সাজানো হিজ হাইনেসের কক্ষগুলোর পরই অন্দর-মহলের মর্মর প্রাঙ্গণ···জেনানা মহলের তিনতলা বাড়ী। গঙ্গাদাসীর আবাসস্থল।

আমার দিল-দরিয়া ভাব মুহূর্তে কেটে গেল। হলে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে হিজ্ হাইনেস চিৎকার শুরু করেছেন।

মেজাজ তাঁর চড়াই ছিল। হল্ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমাদের সম্ভাষণ জানাবার জন্ম প্রাসাদের বিভিন্ন লোকদের জড়ো হয়ে থাকতে দেখে তিনি একেবারে ফেটে পড়লেন। তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল দোরের সামনে সাজানো ব্যাঘ্রমুণ্ডর সঙ্গে।

এইরকম মেঝের ওপর ব্যাঘ্র চর্ম ছড়ানো, দেয়ালে ও ঘরের এখানে সেখানে ষ্ট্যাণ্ডে রক্ষিত বিকশিত দন্তী হিংস্র ব্যাঘ্র-মুণ্ড কিংবা শিকারের নানারকম বিজয়-চিহ্ন দেখলে এই পরিবেশে অরণ্যের প্রভাব বিস্তারিত হয় আমার মনে, অজানা ভয়ের শিহরণে না চাইলেও কেমন যেন সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। বারান্দায় রক্ষিত দুটো বিরাটাকারের খাঁচায় স্প্রীং ভাঙা কলের পাখী চুপচাপ পড়ে আছে···গাছে গাছে সুন্দর টিয়া পাখীর ছোটাছুটির মধ্যে এদুটি কলের পাখীর যান্ত্রিক ডাক শুনে কেমন বিদ্রূপ মনে হতো। হিমালয়ের বিস্ময়ভরা সৌন্দর্যের কোল থেকে আমরা যেন ধুপ ক'রে এসে পড়লাম আধুনিক এক বাজারের মাঝখানে যেখানে মার্কিনী পসরার ছড়াছড়ি!

হলের মধ্যে আসবার সঙ্গে সঙ্গে, অশ্রুত এবং অদৃশ্য হলেও, দণ্ডায়মান লোকদের চোখের হাবভাব দেখে কাছে-পিঠে কোন কিছুর উপস্থিতি বুঝতে পারলাম। দোপাট্টায় মুখ ঢেকে দু'জন মেয়ে হলে প্রবেশ ক'রে মহারাজার পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে নিবেদন করল :

'মহারানী সাহেবা—' শয়ন কক্ষের দিকে চোখ দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তারা।

বুঝলাম গঙ্গা দাসী অপেক্ষা করছে মহারাজার জন্যে। মহারানী না হলে কি হবে, বছর দুই হলো তাকে এই সম্ভাষণই সকলকে করতে হচ্ছে মহারাজার আদেশে। সেদিন গঙ্গাদাসী একটা দৃশ্যের অবতারণা ক'রে মহারাজকে দিয়ে মহারানী সম্ভাষণ আদায় ক'রে নিয়েছিল। এই প্রাসাদে বাস করতো শুধু গঙ্গাদাসী। রাজমাতা এবং মহারাজার দুই রানী বাস করতেন তিন মাইল দূরের শ্যামপুর দুর্গের প্রাসাদে।

আমরা হল্ ঘর ছেড়ে নিজ নিজ কক্ষে চলে গেলাম। শয়নকক্ষ অতিক্রম ক'রে যাবার সময় পর্দার ফাঁক দিয়ে আমার নজর পড়ল গঙ্গাদাসীর ওপর। পাঞ্জাবী মেয়েদের কুর্তা ও সালোয়ার পড়েছে

গঙ্গী, কাঁধের দু'ধারে ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুলছে দোপাট্টা। দেখলাম, স্বাস্থ্যবতী গঙ্গীর মুখের দুটি ঈষৎ উচ্চ গণ্ড; ভ্রূ-কুঁচকোন আঁখিতে দেখলাম চিন্তার গভীরতা। আমার দৃষ্টি থেকে সে তার মুখ ঘুরিয়ে নিল, যদিও আমার সামনে সে ঘোমটা দিত না। দোর দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে আমার নজরে পড়ল যে গঙ্গী আয়নায় নিজের চেহারার ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা একবার বুলিয়ে নিচ্ছে।

মিনিট তিরিশেক হবে, আমি স্নান করছিলাম, জয়সিং বেয়ারা এসে আমার স্নানঘরের দোরে ধাক্কা দিল: 'মহারাজা আপনাকে এখুনি যেতে বলেছেন হুজুর।' জয়সিং হলো প্রাসাদ-ভৃত্যদের সর্দার।

কেমন একটা বিরক্তি জমে উঠল মনে। কিন্তু সত্য কথা বলতে হলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার ওপর হিজ হাইনেসের এই নির্ভরতার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমার মন পূর্ণমাত্রায় ভরে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো সিমলার নাটকটা হিজ হাইনেসের জীবনে কেমন জমে উঠবে।

সবুজ রোমান বাথটবের কবোষ্ণ জল থেকে নিজের দেহকে তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা ঝির ঝির জলের ঝরণা-পাইপের নিচে মাথাটাকে দিয়ে আমি বললাম জয়সিংকে: 'আচ্ছা যাও জয়সিং, আমি আসছি—' ঝির ঝির জলে আমার শান্ত-সমিধ ফিরে এল, যে-কোন অঘটনের মুখোমুখী আমি এখন হতে পারব।

আমার নোকর ফ্রান্সিস এগিয়ে দিল কোর্তা আর ঢোলা পা'জামা। তাই পরে নিয়ে আমি ধীরে ধীরে এগোলাম মহারাজার কক্ষের দিকে।

কক্ষে প্রবেশ করতে করতে শুনলাম পর্দার অন্তরাল থেকে আসা একটা কাশির ক্ষীণ শব্দ। পর্দার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি

একজোড়া আঁখি আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে। মনে হলো, হিজ হাইনেসের সঙ্গে তার কি একটা বোঝা-পড়া চলেছে এবং সেটা সে চায় অন্তরালেই চালাতে, যদিও গঙ্গী জানতো যে তাদের সব কথাই আমি হিজ হাইনেসের কাছ থেকেই জানি। আমায় দেখে হিজ হাইনেস ইংরেজীতে বলে উঠলেন :

'বুঝলে ডাক্তার, দড়িতে বাঁধা ষাঁড় আমি!'

আমার মন্তব্য প্রকাশের পূর্বেই কক্ষে প্রবেশ করল গঙ্গাদাসীর পরিচারিকা রূপা। দু'হাত জোড় ক'রে সে নিবেদন করল :

'মহারাজ, রানীসাহেবা আপনাকে ডাকছেন।'

বুঝলাম, আমি মাঝে এসে পড়েছি। বললাম :

'আমি পরে আসব হাইনেস।'

'না, না, তুমি আমার দেহের তাপটা দেখ।' রূপাকে হাত তুলে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে বললেন : বসো ডাক্তার, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।'

পর্দার অন্তরালের গুঞ্জন সরব রূপ পেতে শুরু করল এবার, কানে এল কাশির শব্দ, সালোয়ার-কুর্তার খস খস আওয়াজ। আশঙ্কা হলো, গঙ্গীর বিরূপতার ধাক্কা খেতে না হয় আমাকে, এসব স্থলে মানে মানে সরে পড়াই বিধেয়, মনে হলো বার বার।

'টুলীপ, ভেতরে এস, আমার কথা আছে তোমার সঙ্গে।' পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল গঙ্গী। তার ঈষৎ সবুজ চোখের ওপরের ভ্রূ-কাঁপছে ক্রোধে, তার গোধুম-আভা গণ্ডে ফুটে উঠছে রাগ।

হিজ হাইনেস মুখ ঘুরিয়ে রইলেন।

আমি বললাম : 'হাইনেস, আপনাকে ওঁরা ভেতরে ডাকছেন।'

গঙ্গাদাসীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে মহারাজা চিৎকার ক'রে উঠলেন :

'যাও, এখান থেকে যাও গঙ্গী—!'

'আচ্ছা—!' অপমানিতা গঙ্গী হিংস্র ব্যাঘ্রীর মত মুখ বিকৃত ক'রে, একটা বিরাট অস্থিরতাকে দু'হাতে চেপে নিয়ে পর্দার অন্তরালে ফিরে গেল।

'হিজ হাইনেস, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।' তাঁর হাতটি আমার হাতে নিয়ে তাঁকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে ভীতকণ্ঠে আমি বললাম: 'আপনার দেহের তাপ এখন স্বাভাবিক আছে, কিন্তু আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

'শালী কুত্তি, আস্‌লী কুত্তি—'

'হাইনেস! হাইনেস!' ফিসফিস শব্দে আমি বলে উঠলাম।

কিন্তু দুর্বলতা আর ক্রোধে হাইনেস তখন কাঁপছেন, মনের ভিন্নমুখী আবেগের প্রতিফলন পড়েছে তার মুখমণ্ডলে···ক্রোধ এবং সেই সঙ্গে গঙ্গীকে এভাবে ফিরিয়ে দেওয়ায় ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠেছে তাঁর মুখাবয়বে।

অতি সন্তর্পণে পা ফেলে আমি কক্ষ ছেড়ে চলে যেতে চাইলাম, ভাবলাম, আমার অনুপস্থিতি মহারাজাকে শয়নকক্ষে যাবার সুযোগ দেবে।

একটা কাউচে দু'হাত দিয়ে কপাল টিপে হিজ হাইনেস বসে ছিলেন। আমাকে ও-ভাবে যেতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি: 'যেও না ডাক্তার, যেও না। বসো একটু, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

আজকের এই আলাপের মধ্য দিয়েই আমি হিজ হাইনেসের জীবন-কক্ষে আরও স্পষ্টভাবে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলাম, ব্রাহ্মণ তনয়া গঙ্গাদাসীর সঙ্গে তাঁর আকর্ষণের কারণ বুঝতে পারলাম। এভাবে ইতিপূর্বে আর হিজ হাইনেস আমাকে তাঁর মন-খোলা-আলাপের

বিশ্বাসী পাত্র হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তাঁদের সম্পর্ক সম্বন্ধে যেসব কল্পনা আমার মনে ছিল, দেখলাম সেগুলো সবই প্রায় সঠিক। সহানুভূতিশীল মন নিয়ে তাঁর বক্তব্য আমি শুনলাম। প্রারম্ভে স্বভাবতঃই তিনি শুরু করতে পারছিলেন না। ঠোঁট জোড়া কাঁপছিল, মাথা নিচু ক'রে তিনি বসেছিলেন। যাতে তিনি শুরু করতে পারেন আমি সেই সহজভাব এনে দেবার জন্যে নিজেই আরম্ভ করলাম :

'আপনি ওঁর প্রতি এত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন কেন, টুলীপ ?'

'ঠিক বুঝি না, ডাক্তার—' উত্তর দিলেন হিজ হাইনেস। একটা বিকৃত হাসি তাঁর মুখে। নীরবে ক্ষণকাল কুঁকড়ে বসে থেকে তিনি আবার শুরু করলেন : 'যেমন করেই হোক, মেয়েটি যেন আমার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে···যৌন আবেদন বলবে ?···হয়তো তাই···সময় সময় আমার প্রতি ও অত্যন্ত অনুরক্ত, ভয়ানক ভাবে আকৃষ্ট, কিন্তু ওর আগের প্রণয়ীদের কথা মনে পড়লে কেন জানি আমার মন যায় ক্ষেপে।'

'ঈর্ষা ?'

'বোধ হয় তাই। কিন্তু ওর অনুপস্থিতি ওর প্রতি আমার আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেয়।'

'কি চাইছেন উনি এখন ?'

'নতুন কিছু নয়। ও চায়, আমি ওকে বিয়ে করি এবং ওর ছেলেকে যুবরাজ বলে মেনে নি।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন হিজ হাইনেস। 'ও চায় আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে ওর হাতের মুঠোয়, কিন্তু আমায় ও দেবে না—'

কথা শেষ করেন না হিজ হাইনেস কিন্তু আমি বুঝি তাঁর অসমাপ্ত কথার অন্তর্নিহিত অর্থ কি। ঐ মেয়ের সাবেক জীবন সম্বন্ধে আমার কৌতূহল প্রখর হয়ে উঠেছে। একটু খুঁচিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বললাম :

'তাহলে দেখছি টুলীপ ও-মেয়ের সব কলাকৌশলেরই খবর রাখেন···'

হঠাৎ কাউচ ছেড়ে টুলীপ শয়নকক্ষের দোর পর্যন্ত নিঃশব্দে হেঁটে গেলেন, গঙ্গী আড়ি পেতে শুনছে কিনা দেখতে। আকস্মিক পদবিক্ষেপ ভঙ্গিমা তাঁর। গঙ্গী যদি ও-ঘরে থেকেই থাকে, তার মনে যাতে তাঁর এই হঠাৎ-উঁকিতে কোন সন্দেহ না জাগে, সে-সম্বন্ধেও তিনি সজাগ। মুহূর্তে তিনি ফিরে এলেন নিশ্চিন্ততায় মাথা নাড়তে নাড়তে।

কক্ষের মধ্যে ইতস্তত: হাঁটতে হাঁটতে মন্তব্য করলেন হাইনেস :

'পাকা খেলোয়ারী নটী বটে!'

'খুব যে ভেবেচিন্তে করে, তা কিন্তু আমার মনে হয় না,' বললাম আমি। পৈশাচিক প্রতিভার অধিকারিণী এ-মেয়ে, তারই জন্য সে পূর্বাহ্নে ছক কেটে সেইভাবে এগোয়,—গঙ্গী সম্বন্ধে এতটা ভাবতে আমি রাজী নই। দেবীও নয় এ-মেয়ে, নয় পিশাচীও। আমার মনে হয়, এ-মেয়ে গাঁয়ের চাষী-বৌর ছেঁড়া ন্যাকড়ায়-বাঁধা পুঁটলির মতো এলোমেলো স্নায়ু, আবেগ আর কল্পনার গ্রন্থি মাত্র, প্রখর সহজাত মালিকানা-বোধ বিশিষ্ট কৃষাণী মেয়ের মতো।

'মনে হয় তোমার কথাই ঠিক ডাক্তার। অত ছক বেঁধে চলে না ও-মেয়ে, কিন্তু অদ্ভুত সহজাত বুদ্ধিতে ও ওর পথ ক'রে এগিয়ে যায়। ছলনাময়ী···শিশুর মতো ভাব ক'রে ও দাবী করে রক্ষণাবেক্ষণের, কিন্তু ও যা চায় তার পাই-কড়ি আদায় ক'রে নেবার কৌশল ওর নখদর্পণে। একটা ধূর্ত মেয়ে···'

'হ্যাঁ, কিছু কিছু মেয়ে এইভাবেই কিশোরীর মত ভাব ক'রে চলতে পারে বটে। সে-কথা ছেড়ে দিলেও গঙ্গাদাসীর কিন্তু একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে।'

গঙ্গী সম্পর্কে এইভাবে মন্তব্য প্রকাশে হিজ হাইনেসের মেজাজ আবার চড়ে না যায়, একটু সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম। না, বোধ হয় হিজ হাইনেসের মনের তিক্ততা সেদিন অত্যন্ত বেশীই ছিল। গঙ্গীর সম্বন্ধে তিনি সোজাসুজি উদ্গারণ শুরু করলেন :

'কুত্তি!...কত প্রেমের কথা, কত কাকলি, কত ফিসফিসানি যে আমি...তুমি তো জানো ডাক্তার ওকে আমি কিভাবে চাই—আর তার ফলে ওর মুঠোর মধ্যে আমি গিয়ে পড়ি...হ্যাঁ, আমি একেবারে জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ি, একেবারে দড়িতে বাঁধা ষাঁড়ের মতো!...সময় সময় ওকে মনে হয়, অপরূপ অদ্ভুত। কিন্তু ও যায় সরে, ধীরে ধীরে চলে যায় কোন্ সুদূরে, আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। একই বাড়ীতে একই সঙ্গে আমরা আছি কিন্তু প্রতি পলে অনুভব করি ও-মেয়ে যেন আর আমার কাছে নেই। দেহলীন হয়েও ও বলতে থাকে আমারই খুড়তুতো ভাই রঘবীর সিংএর কথা। তৃপ্তি নেই ওর, যদিও—'

হঠাৎ শয়নকক্ষের দোরে গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখে আসেন গঙ্গী কান পেতে আছে কিনা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'কোথায় পেয়েছিলেন একে টুলীপ?'

'ও—, হোশিয়ারপুর জেলায়। ওর বাবা পণ্ডিত পিয়ারালাল ছিল ৪১ নং ডোগরা রেজিমেণ্টে পুরোহিত। স্ত্রী আর কন্যাকে গাঁয়ে রেখে জীবনের অধিকাংশ সময় তাকে থাকতে হতো সীমান্ত এলাকায়। স্ত্রীর প্রতি তার সন্দেহ ছিল বরাবরই। ছুটিতে গাঁয়ে এলে স্ত্রীকে ধরে বেদম প্রহার দিত পণ্ডিত। গঙ্গীর কিন্তু ওর বাবাকে খুব ভাল লাগত। আসবার সময় কন্যার জন্য সে নিয়ে আসত নানারকম ফল, কাপড়-জামা। কিন্তু মার ওপর যখন বাবা চিৎকার ক'রে ফেটে পড়ত, গঙ্গী তখন ভয়ে কুঁকড়ে যেত। গঙ্গী আমায় তাই বলেছে। ওর মা বলে একরকম বেশ্যাই ছিল। গঙ্গীর সমবয়সী ছেলে-মেয়েরা ওকে

বিদ্রূপ করতো, ফলে ও কারুর সঙ্গে মিশত না। নিঃসঙ্গী গঙ্গীর মায়ের প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। চোদ্দ বছর বয়স পেরোবার আগেই পাহাড়ে গরু চরাবার সময় রাখালদের কাছে কিশোরী গঙ্গীর কুমারী-জীবন শেষ হয়ে যায়।...ওর বয়সের মেয়েদের থেকে অনেক বেশী পাকা মেয়ে তখন ও—'

গঙ্গী-চরিত্রের ছকটা যেন আমি ঠিক ধরতে পারছি। গঙ্গীর উঠ্‌তি-কল্পনার মুখে নায়ক ছিল ওর বাবা। মেয়ে ভালোবাসত তার বাবাকে এবং ভয়ে কুঁকড়ে যেত বাবার ঐ পীড়ক-রূপ দেখে। এবং পরবর্তী-জীবনে গঙ্গী বোধ হয় তার জীবনের চৌহদ্দির মধ্যে যেসব পুরুষ এসেছে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে তার বাবার এই দ্বি-মুখী রূপের প্রতিফলন দেখেছে। ভালোবেসেছে আর সঙ্গে সঙ্গে ভীত সন্ত্রস্ত মনে পালাতে চেয়েছে।

'একটা কথা ডাক্তার, বহু পুরুষের সান্নিধ্যে গঙ্গাদাসী এসেছে বটে, কিন্তু বড় একাকিনী, বড় অসুখী, বড় ভীতু, বড় সন্ত্রস্ত ও, পাছে লোকে কি বলে। নিজেকে গোপনতার আড়ালে সরিয়ে রাখতে চায় সব সময়।...আবার মিথ্যে কথায় ও ওস্তাদ; সাধারণ লোক যে-ভাবে সত্য কথা বলে, ও সেইভাবে আনায়াসে মিথ্যে বলে যায়।'

মনে মনে বুঝলাম আমি, বাইরের বিতাড়নে মনের খোলসের মধ্যে নিজেকে টেনে নিয়ে এসে গঙ্গী স্বপ্ন আর কল্পনার মেদুর মেঘভরা আকাশের নিচে বাস করে ব'লেই তার এই অনায়াস মিথ্যাভাষণ।

'একটা গোপন বার্তা শোনাচ্ছি তোমাকে ডাক্তার,' বেশ একটু চেষ্টা ক'রে হিজ্‌ হাইনেস বলেন: 'যৌন ব্যাপারেও খুব স্বাভাবিক নয় গঙ্গী। আত্ম-....'

থেমে গেলেন মহারাজা, আমিও নীরব রইলাম। ক্ষণকাল পরে প্রশ্ন করলাম:

'শুনেছি ওর বিয়ে হয়েছিল।'

'হুঁ, বিয়ের নামে ওকে হোশিয়ারপুর জেলার ডেপুটি কমিশনারের অফিসের এক ব্রাহ্মণ পিয়নের কাছে বিক্রি ক'রে দেওয়া হয়েছিল। ঐ বয়সে সুতন্বী গঙ্গী বলে অদ্ভুত মনমাতানো সুন্দরী ছিল। ঈষৎ সবুজ আঁখি, দেহভরা কান্তি। শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ের মেয়েরা ওকে বলতো: "সবুজ-চোখী ডাইনি।" ওর স্বামী শিবরাম ছিল পিপে-মাতাল। সংসর্গের ব্যাপারে গঙ্গী যাই হোক না কেন, ও কিন্তু মদ একেবারে সহ্য করতে পারত না। দিন-রাত ও বিরক্ত করত শিবরামকে মদ ছাড়বার জন্য। আর শিবরামও বৌ-পেটানোর ব্যাপারে তাদের অঞ্চলে বেশ নাম কিনে ফেলল। এরপর মতিলাল নামে এক পলোয়ান ও জুয়াড়ীর সঙ্গে ও পালাল অমৃতসরে। জুয়াড়ী মতিলাল ফতুর হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যে। গঙ্গী গিয়ে পড়ল মতির এক বন্ধু—অবশ্য যতদিন মতির টাকা ছিল ততদিন নয়—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের একাউন্টেণ্ট কিষেণ চাঁদের হাতে। কিন্তু কিষেন চাঁদের তো স্ত্রী রয়েছে। এ অবস্থায় দিনের পর দিন গঙ্গীর সম্পূর্ণ ভরণপোষণ তার পক্ষে সম্ভব হলো না। সুতরাং গঙ্গীর জীবন-কক্ষে মধু লুটতে এল অমৃতসর শহরের ব্যবসায়ী-জগতের অলির দল: এল উকিল বাল্‌মুকুন্দ, অধ্যাপক সাহানী, আমদানী-রপ্তানীর কারবারী মুলরাজ, এল কাপড়া-বেচনেওলা মুনিলাল। পাহাড়ী মেয়ের আঁটসাঁট দেহ, ঈষৎ সবুজ চোখ, কান্তি ভরা সুতন্বী অসতীর দেহ-বার্তা ছুটল বাতাসের আগে। সুকণ্ঠীও বটে গঙ্গী, সে গাইত সহজ সরল পাহাড়-দেশের গান। লাহোরের ফিল্‌ম-রাজা শেঠ রণছোড় দাস পাঞ্জাবী গীতি-কাব্য হীর ও তার প্রণয়াস্পদ রাণঝার উপাখ্যান ভিত্তি ক'রে যে ফিল্‌ম তুললো, তার মধ্যে গঙ্গীকে সে নামাল একটা চরিত্রে—'

গঙ্গীর জীবন-কাহিনী শুনতে শুনতে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। বললাম : 'তা হ'লে গঙ্গা দাসী এবার অভিনেত্রী!'

'হুঁ, এবং এর পর থেকে শুরু হলো শুধু হাত-বদল—' এইসব সত্য কথা বলে টুলীপ যেন নিজেকে আঘাত করছে। শুকনো পাঁশুটে তাঁর মুখের চেহারা, কিন্তু কেমন একটা উন্মাদনা লেপ্টে আছে সে মুখে। বলে চললেন : 'এবং ছলাকলায় গঙ্গীও পারদর্শিণী হয়ে উঠল। গঙ্গীর মধ্যে তখন পর্যন্ত, আমার মনে হয় ডাক্তার, একটা নিষ্কলঙ্ক কান্তি ছিল, আর ছিল সেই শিশুর নিরুপায় ভাব। এবং সত্যি সত্যিই ও চাইত কারুর রক্ষণায় থাকতে। হোমি মেটা নামে এক অবসর জীবনযাপী ষাট বছরের বৃদ্ধ পার্শী রুটি ব্যবসায়ী এল গঙ্গীর জীবনে। লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্টে জীবনভোর ব্যবসা ক'রে হোমি মেটা প্রচুর টাকা করেছিল কিন্তু তার স্ত্রী পালিয়ে গেছে কোন্ এক আর্মি অফিসারের সঙ্গে। শেঠ রণছোড় দাসের বাড়ীতে হোমি মেটার সঙ্গে গঙ্গীর প্রথম সাক্ষাৎ। শেঠজীর সঙ্গে গঙ্গীর কি একটা অপ্রীতিকর ঘটনার জের চলেছে তখন। শেঠিনীর জন্যে শেঠজী গঙ্গীকে সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্বে রাখতে পারছে না। বৃদ্ধ বুদ্ধু হোমির মনে করুণা জাগল গঙ্গীর প্রতি। গঙ্গী তার সূচীভেদ্য দৃষ্টি ফেলল বুড়োর ওপর,—এ সেই দৃষ্টি যা পুরুষের স্নায়ু শিরা পেশী মজ্জা ভেদ ক'রে হাড়ে শিহরণ জাগায়। বুড়ো পার্শী নিয়ে এল গঙ্গীকে তারই তত্ত্বাবধানে। জমি কিনল লাহোরের অভিজাত-পাড়া ক্যানাল ব্যাঙ্কে, তুলল বাড়ী। বুড়োর মনে আশা : গঙ্গী তাকে বিয়ে করবে, সংসার পাতবে। সেই সময় সিনেমার সংলাপ লেখক ইন্দ্রনাথের সঙ্গে গঙ্গীর পরিচয় হলো। 'মায়া' নামে একখানা ছবির গান লিখে ইন্দ্রনাথ তখন নাম করেছে। তারই সাহায্যে লাহোরের আর্ট-জগতে গঙ্গী আসর জমালে। ইংরেজী শিখল, শিখল হাল-ফ্যাশান মাফিক চলতে। বুড়ো পার্শী গঙ্গীর কাছে

বিয়ের প্রস্তাব করল, কিন্তু ছলনা-কুশলী গঙ্গী তখন ইন্দ্রনাথের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ভাব দেখালে। নিষ্কাম প্রেমের পূজারী হয়েই রইল হোমি, জায়গা-জমি যা সে দিয়েছিল গঙ্গীকে, তা আর সে ফিরিয়ে নিল না।—'

অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি। বললাম: 'আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি টুলীপ, গঙ্গাদাসীর জীবনের এত কথা জানা সত্ত্বেও তার প্রতি আপনার—'

'বিস্মিত আমি নিজেও কম নই ডাক্তার!' দোরের দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ফেলে হিজ হাইনেস তিক্তস্বরে বলতে থাকলেন: 'সত্যি-কারের একটা কুত্তি হলো গঙ্গী···কিন্তু আমি তো পারি না ওকে ছেড়ে থাকতে!'

'ওর লাহোর-বাসের সময়েই কি আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?'

'না, না। আমার সঙ্গে ওর প্রথম সাক্ষাৎ এই শ্যামপুরেই। ওর বাবা পণ্ডিত পিয়ারালাল ফৌজ থেকে অবসর নিয়ে এই শ্যামপুরেই বসবাস শুরু করে। গঙ্গী এসেছিল বুড়ো বাপকে দেখতে। শ্যাম-পুরের এই শহর-সীমার মধ্যে এসে গঙ্গী আর লাহোরে ফিরে যায় নি। সর্দার আর সরকারী কর্মচারীরা ওর মোহে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। ও প্রবেশ করল রাজপ্রাসাদে। আমার দ্বিতীয় রানীর সহেলী (সখী-সাথী) হলো। তার পর, ডাক্তার, শুরু হলো···'

কথা অসমাপ্ত রেখে হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন হিজ হাইনেস। আমি অপেক্ষা করলাম। দেখলাম, ঠোঁট এঁটে বসে আছেন টুলীপ। সে-উন্মাদনার ছাপ নেই আর তাঁর মুখে। আমি প্রশ্ন করলাম:

'বাদাউনের ঘটনাটি কি—'

হঠাৎ ঘুরে বসে রাগতকণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন হাইনেস: 'তুমি কি ক'রে জানলে, ডাক্তার?'

'কিন্তু আমার তো মনে হয়, টুলীপ, একথা সবাই জানে। আপনি যদি মনে ক'রে থাকেন একথা একান্ত গোপনীয় রয়েছে, তাহ'লে আপনি ভুল করেছেন।'

উদ্ধত কণ্ঠে হিজ হাইনেস বললেন : 'যখন তুমি জানোই—' জানি না, কেন আমি তোমায় এসব বলছি।'

'সত্যিই আমি দুঃখিত, হাইনেস, যদি আপনার গোপন কিছুতে প্রবেশ ক'রে থাকি। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, টুলীপ। কাকেই বা আপনি এসব কথা বলতে পারেন। বিশদভাবে যদি আমি জানতে পারি, আমি হয়তো আপনার সাহায্যে আসতে পারি—'

'হুঁ—, বাদাউনের রাজা হলো আমার শ্যালক, আমার দ্বিতীয় রানীর ভাই। রানীর সহেলী হয়ে গঙ্গী গিয়েছিল বাদাউনে। সেখানে কেলেঙ্কারির জন্যে ওকে বাদাউন ছেড়ে শ্যামপুরে ফিরে আসতে হয়। ফিরে আসবার পরেই আমার সঙ্গে ওর প্রথম দেখা...' ক্ষণকালের জন্য টুলীপ নীরব থাকেন। তারপর আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলেন : 'একটা অত্যন্ত গোপন খবর তোমায় দেব, তোমাকেই শুধু বিশ্বাস ক'রে বলছি।...আমি জানি না গঙ্গীর ছেলে বাদাউনের রাজা সাহেবের, না, আমার। সেইজন্যেই ঐ ছেলেকে যুবরাজ বলে গ্রহণ করতে আমি পারছি না।... অন্তঃপুরে ওকে প্রথম দেখেই আমি ভালোবেসেছি। আমি ফিরে যেতে পারলাম না আর রাজ-কলেজে। যেদিন আমি গদিতে বসলাম সেদিনই আমি গঙ্গীর ছেলেকে যুবরাজ বলে প্রায় ঘোষণাই ক'রে ফেলেছিলাম। কিন্তু বাদ সাধলেন আমার মা আর ইন্দিরাও—'

'আমি বুঝতে পারি না। আপনি কেমন ক'রে গঙ্গাদাসীকে বিশ্বাস করেন এবং তার সঙ্গে বাসই বা করেন কি ক'রে?'

'স্ত্রীদের সঙ্গে আমার ব্যবহার সত্যিই খারাপ, এবং গঙ্গীও খারাপ,'

ঠেস্-চেয়ারের হাতলের ওপর বসে বলতে থাকেন টুলীপ : 'ভাবলাম, আমরা দুই খারাপ একজায়গায় হলে বোধ হয় খুব ভাল দম্পতিই হতে পারব।' একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠল হিজ হাইনেসের ঠোঁটে কিন্তু পরমুহূর্তে গম্ভীর কণ্ঠে জোর দিয়েই বললেন : 'ও কিন্তু আমায় এক বিশেষ ভাবেই বোঝে। এবং যৌন—'

'সাময়িক আনন্দের জন্য আপনার ধৈর্যহীনতা, আর অস্থির আবেগের দরুন বড় বেশী দাম দিতে হচ্ছে না কি হাইনেস?'

'কিন্তু, ডাক্তার, গঙ্গীকে আমি অন্যায় ভাবে দুষবো না। সত্যিই ওর সংসর্গে আমি আনন্দ পাই। আমার কথা শুনে বোধ হয় তুমি হাসছ, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওই শুধু আমাকে জানে, বোঝে; আমার চারধারের কৃত্রিমতার মাঝে, যেখানে আমি একটা প্রাণহীন প্রতিভূ-মাত্র, চারদিকের এই পরিবেশের ভাঁড়ামির মাঝে ওর লাহোর-দিনের হৈ-হুল্লোড়, জাঁক-জমক ছেড়ে আমার প্রতি এই যে আসক্তি অনুরাগ—, আমাকে ভালোবাসে বলেই না ও দেখায়! ওকে পেয়ে সত্যিই আমার জীবন ধন্য। আমার ব্যক্তিগত জীবন সুখী, ওর সান্নিধ্যে আমার কর্মশক্তি দশগুণ বেড়ে যায়, এ আমি অনুভব করি। ওর কাছে আমি আমার তনুমন সব উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি। ওর জীবনের গোপন কথা সব ও আমাকে বলেছে, বারে বারে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, যদি ওর কুমারী-জীবনে আমার সঙ্গে ওর দেখা হতো!'

আমার মনে হলো, অন্ততঃ টুলীপকে আমি যতদূর জানি তার থেকে আমার মনে হলো, যে অন্য পুরুষের থেকে টুলীপকে যে আলাদা দৃষ্টিতে গঙ্গী দেখে, পরম আপনার বলে তাঁকে অভিহিত করে, তাতেই তিনি পরমানন্দিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম :

'তা হ'লে গোলমালটি কোথায়? প্রথম সন্দেহ করে—'

'বুঝলে না ডাক্তার, গঙ্গী-চরিত্রের সবথেকে বড় হলো তার

অধৈর্যতা ; এই দেখলে ওর নুয়ে-পড়া নরম ভাব, পরমুহূর্তেই ও একেবারে উল্টো চরিত্রের। এইমাত্র ও করুণাময়ী, মুহূর্ত পরেই পাষাণী, —এমনিই হলো ওর ভিন্নমুখী চরিত্রের চেহারা : হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা, দুদর্মনীয় ক্রোধ, দয়া…সব মিলিয়ে ওর ঐ ধৈর্য্যহীনতা। এমন কি সঙ্গমের সময়েও ও ভাবে পরপুরুষের কথা—' হিজ হাইনেসের দৃষ্টি নিচের দিকে নেমে যায়, থরথর ক'রে ঠোঁট কাঁপে।

ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে আমি বললাম :

'সব মেয়েরাই দাম্ভিক এবং প্রশংসা পিয়াসী। কিন্তু টুলীপ, গঙ্গাদাসীর ওপর আপনার অটল বিশ্বাস কেন ধাক্কা খেল ?'

মুহূর্তকাল স্থির-দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করলেন হাইনেস, যেন নিজের মনে বাজিয়ে দেখছেন : "তোমায় কি আমি বিশ্বাস করতে পারি ?" তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন :

'বিশ্বাস ক'রে তোমায় একটা কথা বলছি ডাক্তার। দ্বিতীয় কানে যেন না যায়। চৌধুরী রঘবীর সিংকে তো তুমি জান,—আমার খুড়তুতো ভাই। শ্যামপুরে আসবার পর থেকে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে ঐ ছোকরার সঙ্গে গঙ্গীর একটা গোপন সম্পর্ক হয়। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেও গঙ্গী সেটা বজায় রেখেই চলেছিল। গঙ্গীকে আমি বললাম ওটা বন্ধ করতে এবং কিছু কথা কাটাকাটির পর ও সেটা মেনেও নিলে। পরের কয়েকমাস গঙ্গীর গভীর প্রেমকূজন শুনলাম, অত কূজন আমি কোন মেয়ের কাছেই কোনদিন শুনি নি। তারপর…হঠাৎ এক রাতে আমি শিকার-শিবির থেকে ফিরে এলাম, ফিরলাম নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। দেখলাম, আমার ঘরে আলো জ্বলছে। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হলো, গঙ্গী কি আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে ? সত্যি বলতে কি, আমি ইচ্ছে করেই শিকার থেকে হঠাৎ ফিরে এসেছিলাম। পাশের দরজা দিয়ে সন্তর্পণে আমি

বারান্দায় এলাম। আধ-খোলা জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। দেখলাম, গঙ্গী আর রঘবীর প্রবল উত্তেজনায় আলিঙ্গনাবদ্ধ, চুম্বনরত··। এ-দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারি নি, আজও না! কেন জানি, এই রকম একটা কিছু আশঙ্কা ক'রেই আমি আগের রাতে গঙ্গীকে কত ক'রে বলেছিলাম আমার সঙ্গে শিকার-শিবিরে আসতে। আমার হৃদয়ের প্রেম-প্রণয় উজাড় ক'রে দিয়ে ওকে টেনে আনতে চেষ্টা করেছিলাম আমার সঙ্গে। কিন্তু ও এল না, ওর বলে কি জরুরী কাজ রয়েছে। আমার প্রণয়-উচ্ছ্বাসের প্রতিদানে ও কেমন অশিষ্ট ভাবই দেখালে। একটা দুঃখ-ভরা বুভুক্ষু মন নিয়ে আমি চলে গেলাম শিকারে।···' একটু নীরব থেকে আবার বলতে শুরু করলেন: 'যাক্, আমি জানালা থেকে সরে গেলাম কিন্তু আমার পায়ের শব্দ ওরা শুনতে পেয়েছিল। ওরা পরস্পরকে ছেড়ে সরে গেল। একটা প্রচণ্ড তুফানের তাণ্ডব চলল আমার মনে, সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আমি ছুটে ফিরে গেলাম আবার শিকারে। কাঁদলাম, অসুখী মনের দুঃখ আর ক্রোধ দু'চোখ বেয়ে অঝোরে নামল···'

বলতে বলতে টুলীপ আমার দিক থেকে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। দু'চোখ বেয়ে তাঁর জল নেমেছে, তাই তিনি ঢাকতে চান। দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, বুঝতে পারছি, তাঁর মনের ভেতর একটা অব্যক্ত ব্যথা গুমরে উঠছে। আমার মনে হলো সেই চিত্র, আলিঙ্গনাবদ্ধ গঙ্গী আর রঘবীর, যে-চিত্র টুলীপের মনে কেটে বসে আছে, একটা কঠিন ক্ষত রেখে গিয়েছে মনের সেই নরম কোণটিতে।

'সেই সময়েও কি আপনি গঙ্গীকে ত্যাগ করার কথা ভাবেন নি?'

'সেই রাত্রেই ওকে আমি তাড়িয়ে দেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু গঙ্গী ও রঘবীর এল আমার শিকার-শিবিরে। আমার সমস্ত রাত্রি

অধৈর্যতা; এই দেখলে ওর নুয়ে-পড়া নরম ভাব, পরমুহূর্তেই ও একেবারে উল্টো চরিত্রের। এইমাত্র ও করুণাময়ী, মুহূর্ত পরেই পাষাণী, —এমনিই হলো ওর ভিন্নমুখী চরিত্রের চেহারা: হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা, দুর্দমনীয় ক্রোধ, দয়া…সব মিলিয়ে ওর ঐ ধৈর্য্যহীনতা। এমন কি সঙ্গমের সময়েও ও ভাবে পরপুরুষের কথা—' হিজ হাইনেসের দৃষ্টি নিচের দিকে নেমে যায়, থরথর ক'রে ঠোঁট কাঁপে।

ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে আমি বললাম:

'সব মেয়েরাই দাম্ভিক এবং প্রশংসা পিয়াসী। কিন্তু টুলীপ, গঙ্গাদাসীর ওপর আপনার অটল বিশ্বাস কেন ধাক্কা খেল?'

মুহূর্তকাল স্থির-দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করলেন হাইনেস, যেন নিজের মনে বাজিয়ে দেখছেন: "তোমায় কি আমি বিশ্বাস করতে পারি?" তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন:

'বিশ্বাস ক'রে তোমায় একটা কথা বলছি ডাক্তার। দ্বিতীয় কানে যেন না যায়। চৌধুরী রঘবীর সিংকে তো তুমি জান,—আমার খুড়তুতো ভাই। শ্যামপুরে আসবার পর থেকে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে ঐ ছোকরার সঙ্গে গঙ্গীর একটা গোপন সম্পর্ক হয়। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেও গঙ্গী সেটা বজায় রেখেই চলেছিল। গঙ্গীকে আমি বললাম ওটা বন্ধ করতে এবং কিছু কথা কাটাকাটির পর ও সেটা মেনেও নিলে। পরের কয়েকমাস গঙ্গীর গভীর প্রেমকূজন শুনলাম, অত কূজন আমি কোন মেয়ের কাছেই কোনদিন শুনি নি। তারপর…হঠাৎ এক রাতে আমি শিকার-শিবির থেকে ফিরে এলাম, ফিরলাম নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। দেখলাম, আমার ঘরে আলো জ্বলছে। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হলো, গঙ্গী কি আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে? সত্যি বলতে কি, আমি ইচ্ছে করেই শিকার থেকে হঠাৎ ফিরে এসেছিলাম। পাশের দরজা দিয়ে সন্তর্পণে আমি

বারান্দায় এলাম। আধ-খোলা জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। দেখলাম, গঙ্গী আর রঘবীর প্রবল উত্তেজনায় আলিঙ্গনাবদ্ধ, চুম্বনরত···। এ-দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারি নি, আজও না! কেন জানি, এই রকম একটা কিছু আশঙ্কা ক'রেই আমি আগের রাতে গঙ্গীকে কত ক'রে বলেছিলাম আমার সঙ্গে শিকার-শিবিরে আসতে। আমার হৃদয়ের প্রেম-প্রণয় উজাড় ক'রে দিয়ে ওকে টেনে আনতে চেষ্টা করেছিলাম আমার সঙ্গে। কিন্তু ও এল না, ওর বলে কি জরুরী কাজ রয়েছে। আমার প্রণয়-উচ্ছ্বাসের প্রতিদানে ও কেমন অশিষ্ট ভাবই দেখালে। একটা দুঃখ-ভরা বুভুক্ষু মন নিয়ে আমি চলে গেলাম শিকারে।···' একটু নীরব থেকে আবার বলতে শুরু করলেন: 'যাক্, আমি জানালা থেকে সরে গেলাম কিন্তু আমার পায়ের শব্দ ওরা শুনতে পেয়েছিল। ওরা পরস্পরকে ছেড়ে সরে গেল। একটা প্রচণ্ড তুফানের তাণ্ডব চলল আমার মনে, সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আমি ছুটে ফিরে গেলাম আবার শিকারে। কাঁদলাম, অসুখী মনের দুঃখ আর ক্রোধ দু'চোখ বেয়ে অঝোরে নামল···'

বলতে বলতে টুলীপ আমার দিক থেকে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। দু'চোখ বেয়ে তাঁর জল নেমেছে, তাই তিনি ঢাকতে চান। দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, বুঝতে পারছি, তাঁর মনের ভেতর একটা অব্যক্ত ব্যথা গুমরে উঠছে। আমার মনে হলো সেই চিত্র, আলিঙ্গনাবদ্ধ গঙ্গী আর রঘবীর, যে-চিত্র টুলীপের মনে কেটে বসে আছে, একটা কঠিন ক্ষত রেখে গিয়েছে মনের সেই নরম কোণটিতে।

'সেই সময়েও কি আপনি গঙ্গীকে ত্যাগ করার কথা ভাবেন নি?'

'সেই রাত্রেই ওকে আমি তাড়িয়ে দেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু গঙ্গী ও রঘবীর এল আমার শিকার-শিবিরে। আমার সমস্ত রাত্রি

গেছে দুঃশ্চিন্তা, ক্ষোভ আর জাগরণে, ফলে আমার চোখমুখ ফুলে উঠেছিল। ওদের সঙ্গে দেখা করব না, সোজা বলে দিলাম। রঘবীর এল আমার শিবিরের ভেতরে, এসে ক্ষমা চাইল। ও দোষ দিল গঙ্গীকে, ওরই প্ররোচনায় বলে রঘবীর গিয়েছিল তার কাছে। শেষ বিদায় জানাবার জন্য যখন দু'জন দাঁড়িয়েছিল, তখনই বলে আমি উঁকি দিয়ে ওদের দেখেছিলাম। গঙ্গীকে যেন আমি বিশ্বাস না করি, রঘবীরও আর তাকে করে না। সাংঘাতিক মেয়ে বলে গঙ্গী। রঘবীরের কথা আমি বিশ্বাস করলাম এবং রঘবীরকে বেশ ভালোভাবেই বিদায় দিলাম যদিও ওর ওপর আমার সমস্ত বিশ্বাস একেবারে ভেঙে গিয়েছিল।'

'কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগছে রঘবীরের একথার পরেও আপনি গঙ্গীকে কি ক'রে রাখলেন!'

'গঙ্গীর সঙ্গে আমি কিন্তু দেখা করতে চাইলাম না। ও জোর ক'রে এল। আমার পা জড়িয়ে ধরে বারে বারে চুমু খেল। দু'চোখ বেয়ে ওর জলধারা নামছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে ও চুমু খেতে লাগল, বারে বারে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ওকে দু'হাতে তুলে নিলাম। ওর ওপর রাগ ক'রে বললাম, ও কি ভাবে আমার বিশ্বাস ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে। ও কেবল কাঁদছে আর কাঁদছে। ওর কাঁদা দেখে আমি গলে গেলাম, ওকে বুকে টেনে নিলাম। তার পর—যাক্, তার পর তো তুমি জানই...'

একটা চাপা কণ্ঠস্বর ফুটে উঠল আমার গলায়: 'হ্যাঁ, জানি বৈকি!'

'কিন্তু, ডাক্তার, শ্যামপুরে সকলেই তো জানে যে গঙ্গীকে নিয়ে আমি থাকি। ওকে সরিয়ে দিলে একটা যা তা গুঞ্জন উঠত না কি?... আর সত্যি কথা বলতে কি, তারপর থেকে গঙ্গী আমার প্রতি অত্যন্ত

ঝুঁকে পড়ল। হয়তো ওকে সন্দেহ করি বলেই। এবং আমাদের পরস্পরের জীবনটাই কেমন বিশ্রী হয়ে গিয়েছে, আমার মনে জমে উঠেছে একটা ঈর্ষা আর গঙ্গী পারে না ওর ভেতরের ছেনালি ভুলতে…'

'সত্যিই টুলীপ আপনাকে বাহবা দিতে হবে!'

'আরও অনেক কথা তোমাকে বলব ডাক্তার। কিন্তু আমাকে তুমি সৎ পরামর্শ দেবে।' নব উন্মাদনায় মহারাজা শুরু করেন: 'আরও অনেক ঘটনা, ছোটখাট বিষয়—'

শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই কার পদধ্বনি শোনা যায় শয়নকক্ষে। নিমেষে হিজ হাইনেসের মুখাবয়ব পাণ্ডুর হয়ে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে ক্রোধে ফেটে পড়েন: 'কে, কে ওখানে?'

আমার মনে হলো, গঙ্গী যদি হয় হিজ হাইনেস নিজের ক্রোধ প্রশমিত করতে সক্ষম হবেন না, কারণ, আমি তো দেখছি, কাহিনী-বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর মনের দুয়ারে কী ভীষণ ঘা-ই না পড়ছে।

ভেতর থেকে উত্তর এল: 'আমি রূপা। মহারানী সাহেবা—'

'কেন?'

'মহারানী সাহেবা আপনাকে—'

মুখের জমে-ওঠা তিক্ততার রস গিলে ফেললেন হিজ হাইনেস। মুখের সেই কঠিন ভাব আর রইল না, এল শিথিল কোমলতা, বললেন:

'গঙ্গী!…একটু অপেক্ষা কর ডাক্তার, উপায় নেই, না হলে কুরুক্ষেত্র শুরু হবে!'

অন্দর-মহলের দিকে হিজ হাইনেস চলে গেলেন। তাঁর সুশ্রী দেহের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি। তারপর ভাবতে ভাবতে চলে এলাম আমার নিজের কক্ষে।

গত সাত বছর ধরে এই অন্তর্দ্বন্দ্বে নিপীড়িত হচ্ছেন হিজ হাইনেস।

গঙ্গীর ওপর তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস নেই, তা সত্ত্বেও গঙ্গীর সম্মোহনে তিনি ভুলে থাকতে ভালোবাসেন। সতীসাধ্বী স্ত্রীর কাছে যা তিনি পান না, তা যেন পান গঙ্গীর কাছে। গঙ্গীর মেজাজের কূলকিনারা তিনি খুঁজে পান না, একটা নারকীয় যন্ত্রণার তুফান গোঙিয়ে চলে তাঁর মনের ওপর দিয়ে, তা সত্ত্বেও গঙ্গীর ঘাটেই তাঁর নোঙর। গঙ্গীর দ্রুত পরিবর্তনশীল মেজাজ, তার উদ্দীপনা যে রঙের সৃষ্টি করে, তারই মোহে তিনি আবিষ্ট। যে অনুরাগ ও কামনার সরস দীপ্তি ফুটে আছে গঙ্গীর দেহে-মনে, লিপ্সার সেই বুনিয়াদী মোহিনী রূপের মাঝে তার চঞ্চলতা-চপলতা, তার নোংরামি-নীচুতা সব চাপা পড়ে যায়। একই মন-মেজাজের দুই বহুরূপী তাঁদের পরস্পর জীবন-কক্ষ থেকে চ্যুত হয়ে জীবনের ক্লান্তি বিনোদনের জন্য ভুল ক'রে পরস্পরের ওপর লীন হয়ে থাকতে চায়। নিজেদের তৈরি করা এমনি এক মোহ-মাখানো জগতে তাঁরা দিবসের উৎক্ষিপ্ত মেজাজের অবসান ঘটিয়ে নিশীথ রাত্রির চরম উদ্দীপনাময় প্রেমের খেলায় পরস্পরকে আঁকড়িয়ে ধরে ; তার পর এক শান্ত নিশ্চিন্ত মুহূর্তে তাঁদের দেহক্ষুধার উদ্দামতা পরিতৃপ্তি খুঁজে নেয় রতি-সায়রে। কিন্তু দিবসবেলায় গঙ্গীহীন টুলীপ একটি ছিলে-আঁটা ধনুকের মতো। এবং, সত্যি সত্যি আমারও মনে হয়, হিজ হাইনেস এই ছিলে-আঁটা উদ্দীপনাময় অবস্থায় থাকতেই ভাল বাসেন। কারণ তাঁর এই কিছু-না-পাওয়া জীবনে তৈরি-করা উত্তেজনা চাগিয়ে রেখেই তো তিনি, কি তাঁর রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে, কি সামাজিক জীবনে, তাঁর হামবড়া অহম্ ভাবকে সকলের ওপরে তুলে রাখেন ; আত্ম-পরিপ্রেক্ষিতেই তো তাঁর সবকিছু বিচার, সবকিছুর সমীকরণ ঘটছে তাঁর অহম্‌বোধকে ভিত্তি ক'রে। এখানকার এই প্যাঁচালো অবস্থার মধ্যে সরলতার খেই খুঁজে পাওয়া ভার। গঙ্গীর এবং তাঁর মধ্যে এই যে লুকোচুরির খেলা চলেছে, তার সর্বগতি ঐ একই দিকে,

তারা ধেয়ে চলেছে এক দুর্দমনীয় আকর্ষণের মধ্যে, এক সীমাহীন বস্তু কামনার টানে; সহজ-জীবনের সাবলীল গতি নয় তার, 'সত্যিকারের চাওয়ার' নামাবলী এঁটে এ এক বিকৃত জীবনের 'চাওয়ার অনুভূতি' মাত্র।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে : শয়তানের বিশ্রাম নেই,—এবং শ্যামপুর রাজ্যের নীতিহীন জীবনের অংশ হয়ে আমাদেরও কারও কোন বিশ্রাম নেই। সেইদিন বিকেলে কেবল চা-পান শেষ করেছি, এমন সময় আমার তলব হলো পরম প্রতাপান্বিত হিজ হাইনেস মহারাজা বাহাদুরের সামনে হাজির হতে।

সিমলা থেকে ফিরবার পর হিজ হাইনেস ও গঙ্গীর মধ্যে যে চৈতালী ঘূর্ণী শুরু হয়েছিল, এখন তা পরিণত হলো কাল বৈশাখীতে। ভারতে যোগ দেওয়ার অনিচ্ছা দেখানোর জন্য দিল্লীর স্টেট ডিপার্টমেণ্ট শ্যামপুরে প্রধানমন্ত্রী ক'রে পাঠিয়েছেন ঝুনো আই. সি. এস. শ্রীযুক্ত পোপতলাল জে. শা'কে। বুলচাঁদ মারফৎ এই পোপতলালই সিমলায় হিজ হাইনেসকে খবর পাঠিয়েছিলেন বিশেষ আলোচনার জন্যে শ্যামপুরে ফিরে আসতে। শ্যামপুরে প্রত্যাবর্তনের পরেই গঙ্গীর ঘূর্ণীতে হিজ হাইনেস এমনভাবে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করেছেন যে, নতুন দেওয়ান পোপতলালকে কোন শুভেচ্ছা জানানোরও ফুরসত তিনি পেলেন না। এখানেই শেষ নয়, মহারাজার শ্যামপুরে আসার সংবাদ পেয়ে পোপতলাল নিজে এলেন রাজপ্রাসাদে। মহারাজা ছিলেন গঙ্গীর কক্ষে, তিনি পোপতলালের সঙ্গে তখন দেখা করতে পারবেন না ব'লে জানিয়ে দিলেন। অপমানিত ক্ষুব্ধ পোপতলাল কড়া ভাষায় একখানা চিঠি লিখে মুন্সীজীর হাতে দিয়ে ফিরে গেলেন। অন্দর মহল থেকে পরে বেরিয়ে মাহারাজা যখন মুন্সীজীর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে পড়লেন,

তখন প্রমাদ গুনলেন। কোন পথ না দেখে দুশ্চিন্তিত হিজ হাইনেস আমায় ডেকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে এত্তেলা পেয়ে আমার আসবার আগেই মুন্সীজী ও পেয়ারা সিং গিয়েছিল পোপতলালের কাছে। এবং ঝানু সিভিলিয়ন তখনই মাত্র মহারাজার আহ্বানে প্রাসাদে এসেছেন।

আমি কক্ষে প্রবেশ করতে করতে অনুভব করলাম যে অবস্থা বেশ গরম। প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপর দিয়ে হিজ হাইনেস অবস্থাটাকে হাল্কা ক'রে দেবার জন্য বলে উঠলেন:

'বুঝলেন দেওয়ান সাহেব, আমার ইংরেজ বন্ধুরা ডাঃ হরিশঙ্করকে বলে 'হারি (দ্রুত) শঙ্কর, কিন্তু আমাদের ডাক্তারের হলো কচ্ছপ-গতি।'

শ্রীপোপাতলাল হিজ হাইনেসের এ ঠাট্টা এড়িয়ে গেলেন। উল্টো আমার দিকে কড়া কটাক্ষ হেনে একটা হেলান-দেওয়া চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসলেন। সবল, দৃঢ় গঠন, প্রশস্ত ললাট, একটু পোড়া রঙের মুখশ্রী পোপতলালের, যা দেখে গুজরাটি বেনিয়ারা মনে করতো যে এরকম বুদ্ধিমান লোক তাদের জাতের মধ্যে খুব সহজ-লভ্য নয়। বৃটিশ রাজশক্তির ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক পূর্বেই পোপতলাল তাঁর আই. সি. এস.-এর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এই লোকটিকে আবার টেনে নিয়ে এসে প্রথমে বসালেন "টেক্সটাইল বোর্ডে", তারপর সোজা পাঠিয়ে দিলেন এই ক্ষুদে শ্যামপুর রাজ্যের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার কাজে, আর সেই সঙ্গে মহারাজাকে সমঝিয়েদিতে যে, ভারত ইউনিয়নে স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়াই তাঁর পক্ষে শুভ। লোকটা অ-গুজরাটি এই অর্থে যে তাঁর অবসরের সময় তিনি কবিতা লেখেন আর সাহিত্যের স্থান দেন অর্থের উপরে। বস্ত্রের লক্ষ্মী-ভাণ্ডার আমেদাবাদ শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের মধ্যে এতটা গুণ অবশ্য আশা করা যায় না।

মহারাজার ঠাট্টায় চিড়ে ভিজল না দেখে আমি নিজেই সচেষ্ট হয়ে উঠলাম। কিন্তু দেখলাম আই. সি. এস. পোপতলাল নির্বিকার। বৃটিশ ভারতের লৌহ-কঠিন ঐতিহ্যে শিক্ষিত আই. সি. এস. শ্রীযুত পোপতলাল ঝুনো কূটনীতিজ্ঞ। এ্যাংলো-স্যাক্সনী কায়দায় এঁদের দৃশ্যতঃ কম কথা বলার সঙ্গে মিশে আছে লোক-দেখানো শক্তিমানের ধাপ্পা। বিরাট অব্যবহৃত শক্তির অধিকর্তা হিসেবে শাসন-যন্ত্রকে দৃশ্যমান রেখে প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের প্রতিভূর ভূমিকায় এঁরা অবতীর্ণ হন। এই ধাপ্পার কৌশল বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয় শোষিত ও শাসিতদের স্নায়ু ভেঙে দেওয়ার জন্য। এই নির্বিকার, দৃঢ়-কঠিন, উদ্ধত দেবমূর্তির সামনে সর্বজনকথিত রাজপুত-সাহসিকতার ধারক ও বাহক আমাদের রাজপুত্রের স্নায়ু বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারল না। মহারাজা বললেন :

'সত্যিই আমি দুঃখিত, দেওয়ান সাহেব, যে আমার রাজ্য-প্রবেশের সময় রাজ-সম্মানের জন্য এগারবার তোপধ্বনি জানাবার পুরোনো নিয়মটা আপনি এসেই বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।'

কথা বলতে বলতে হিজ হাইনেসের নিচের কম্পমান ঠোঁট একটু ঝুলে পড়েছে, তাঁর প্রাচীন রাজবংশের নুয়ে-পড়া গর্ব যেন তাঁর ম্রিয়মাণ মুখে ফুটে উঠেছে আর সেই সঙ্গে তাঁর বড় বড় চক্‌চকে ডাগর চোখ দুটো ভাবপ্রবণ স্প্যানিয়াল কুকুরের মত ঝাপসা হয়ে অশ্রুতে ভরে উঠছে। শ্যামপুর ছেড়ে যাওয়া কিংবা প্রবেশের সময় এই যে এগারবার তোপধ্বনি হয়, সেটা হিজ হাইনেসের সত্তার সঙ্গে যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে, এ কথাটি আমি কোনদিন আগে এভাবে বুঝতে পারি নি।

শ্রীপোপতলাল তখনও নির্বিকার, তবে মনে হলো তাঁর মুখের রং যেন আর একটু গাঢ় হয়ে উঠল।

নিঃশব্দে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। মহারাজা আবার বলেন :

'আমার মনে হয় সর্দার প্যাটেল আমার ওপর রেগে আছেন, কারণ আমি নেতাজী সুভাষ বসুর প্রশংসা করি, এবং নেতাজীকে সর্দার আবার সবসময়ে ঘৃণা করেন। তা ছাড়া রয়েছে রানী ইন্দিরার চিঠি পত্র। বুঝতে পারছি, তাতেই তাঁর মন-মেজাজ আমার ওপর খিঁচিয়ে আছে।'

শ্রীপোপতলাল সর্দারজীর বিরুদ্ধে এই মন্তব্যের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন অনুভব করলেন। সংযত কণ্ঠে তিনি বললেন :

'হাইনেস, ব্যক্তিগত আক্রোশ-টাক্রোশ কিছু প্রশ্ন নয়; কথা হচ্ছে ভারত-রাষ্ট্রে শ্যামপুরের যোগ দেওয়া সম্বন্ধে—'

মহারাজা উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে বলেন : 'এটা ভেবে দেখতে হবে, চট ক'রে উত্তর দেওয়া যায় না। আমার মা'র পরামর্শও একবার নিতে হবে। তাছাড়া, দেওয়ান সাহেব, শ্যামপুর হলো তিব্বত জম্মু ও কাশ্মীরের সীমা ঘেঁষে, এবং সে-হিসেবে নেপাল ও ভুটানের মতো শ্যামপুর হলো অন্তবর্তী রাজ্য। আমার পূর্বপুরুষরা শিখদের কাছে পরাজিত হন নি, তবে, হ্যাঁ, শ্যামপুরের কিছু সামন্ত-রাজারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বটে। আমাদের রাজবংশ অত্যন্ত প্রাচীন। এবং গান্ধিজী তাঁর 'রাম-রাজ' দর্শন প্রচারের বহু আগে থেকেই আমরা আমাদের রাজ্যে তার প্রচলন করেছি। তাছাড়া, আমার রাজ্যের প্রজাসাধারণকেও আমার নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করতে হবে···'

শ্রীপোপতলালের মুখের রং একেবারে কফি-রঙের মতো কালচে হয়ে উঠল। আর্মচেয়ারে তিনি নড়ে চড়ে বসলেন, তসরের ট্রাউজারের ভাঁজ গেল ভেঙে, সুন্দর আম্র-অঙ্কিত নেকটাইটা গলায় চেপে বসল। কলারের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে গলার ফাঁসটা একটু ঢিলে ক'রে

দিয়ে রক্তের চাপটা তিনি প্রশমিত ক'রে নিলেন। তার পর বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে চেয়ারে ভাল ক'রে বসে হেলান দিয়ে বিনম্র স্বরে বললেন :

'রাজাসাহেব, সর্দারজীর হুকুম তামিল করার জন্যেই আমি শ্যামপুরে এসেছি। আমার কাজ হলো কার্যনির্বাহকের এবং আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে একটা বিশেষ কর্তব্যে। আপনি যদি ষ্টেট ডিপার্টমেন্টে কোন স্মারকলিপি পাঠাতে চান, আমি তা সানন্দে পাঠিয়ে দেব। তবে, আপনার নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে আমি বলব, ভারত-রাষ্ট্রে শ্যামপুরের যোগ দেওয়ার কথাই আপনার ভাবা উচিত। কারণ, সব রাজা-মহারাজারাই তাই করছেন। এবং আমি মনে করি, একজন দেশসেবক হিসেবেও তো আপনার কর্তব্য পরিবারের মধ্যেই চলে আসা! তা ছাড়া এ পথ নেবার পক্ষে আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা—'

'ধেৎতোর স্বার্থ—! আমার ব্যক্তিগত সুবিধেটা কি শুনি, মিঃ শা?' অসহিষ্ণু হিজ হাইনেস কথার মাঝেই ফেটে পড়লেন : 'আমার রাজ্য ও স্বাধীনতা—দুই-ই আমি হারালাম। চমৎকার আমার ব্যক্তিগত সুবিধা—!'

শ্রীপোপতলাল বাধা দিয়ে বলেন : 'হিজ হাইনেসের তো হারাবার মতো কোন স্বাধীনতাই ছিল না! আপনি ছিলেন বৃটিশ রাজশক্তির অধীন।'

'কিন্তু বৃটিশ এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পর—'

'আপনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন, স্যার!' সংবাদপত্রের লেখার ওপর নির্ভর ক'রে বাস্তব এড়িয়ে যারা তর্ক সাজায় সেই জাতীয় একজন বালখিল্যের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক আলোচনা করতে হচ্ছে ব'লে সিভিলিয়ন শ্রীপোপতলাল যেন ক্রুদ্ধ।

'কিন্তু স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার তো একজন মস্ত বড় আইনজ্ঞ। এবং তিনি…তিনিও তো ত্রিবাঙ্কুরের পক্ষে…'

'এবং তিনি এখন কোথায়?' শ্রীপোপতলাল যেন প্রশ্নটা সজোরে ছুঁড়ে দেন মহারাজার মুখের ওপর।

দেওয়ানের এই কঠিন প্রশ্ন সখের রাজনীতিবিদ হিজ হাইনেসকে একেবার বসিয়ে দিল। কম্পিত অধরে ম্রিয়মাণ হাইনেস সমর্থন খোঁজেন মুন্সীজী এবং আমার দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে।

ক্লান্ত গণ্ডারের মতো অধোবদনে ব'সে মুন্সীজী নিশ্বাস নিচ্ছেন, আর এই জাতীয় অসম সংগ্রামে যেখানে জানি মহারাজা তর্কে দাঁড়াতে পারবেন না, সেখানে স্বতন্ত্র মতামত প্রকাশ করাই আমার ভাল মনে হলো। সমগ্র দৃশ্যের নাটগুরু হিসেবে নিজেকে প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা না করেও, শুধুমাত্র সামান্য অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা ঝানু পোপতলাল এ নাট্যমঞ্চে মুরুব্বী হয়ে বসতে সক্ষম হয়েছেন।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যেন নীরবে পরিমাপ করবার চেষ্টা করছে পরস্পরের ইচ্ছা-শক্তিকে। এই অসম সংগ্রাম আস্তে আস্তে মিইয়ে আসবে, দুইয়ের মধ্যে যে দুর্বল, সে মেনে নেবে একটা সাময়িক সমঝোতার পথ হিসেবে আপাতঃ আলোচনা বন্ধ করার কথা। এবং এই জাতীয় অবস্থায় হিজ হাইনেস কখনও কোনদিনই স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। সেই থম থমে অবস্থার মধ্যে এবারে মঞ্চে আবির্ভূত হলো গঙ্গাদাসী। এতক্ষণ সে মহারাজার সাজ-ঘরে দাঁড়িয়ে এ ঘরের আলাপ-আলোচনা আড়ি পেতে শুনছিল।

মুখের ওপর দোপাট্টা মৃদু টেনে দিয়ে হিজ হাইনেসের দিকে এগোতে এগোতে গঙ্গী বলে: 'কে ওঁ, কে—?'

এই অসভ্যতার জন্য শ্রীপোপতলাল কোনরকম বিরক্তিভাব প্রকাশ

করলেন না। শান্তভাবে চেয়ারে বসে বাঁ হাতের তেলোয় থুতনি রেখে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

হিজ হাইনেস চেঁচিয়ে উঠলেন : 'মক্ষীরানী, আঃ! মিঃ পোপতলাল জে. শা' হলেন শ্যামপুরের নবনিযুক্ত দেওয়ান।'

'কি নাম বললে টুলীপ? পোপতলাল স্-আ-া-?' নগ্ন বিদ্রূপ ফেটে পড়ে গঙ্গীর কথা বলার মধ্যে। শিশুর নতুন কথা আওড়ানোর মতো গঙ্গী বারে বারে বিদ্রূপকণ্ঠে উচ্চারণ করে দেওয়ানের নাম।

অপমানিত, ক্ষুব্ধ শ্রীপোপতলালের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোয়। কিন্তু এসব অবস্থায় নিজেকে না হারিয়ে ফেলে নিজেকে আয়ত্বে রাখবার সংযম শিক্ষা তাঁর আছে। তাঁর চোখের সেই ধিকৃধিকে আগুন আস্তে আস্তে কোমল তরল দৃষ্টিতে পরিণত হলো, যার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রসন্ন দাক্ষিণ্য চুয়ে চুয়ে পড়তে লাগল এই অজ্ঞান নারীর প্রতি।

এই করুণামাখা দৃষ্টির সামনে গঙ্গী সঙ্কোচ অনুভব করল, সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল হিজ হাইনেসের দিকে। কিন্তু টুলীপ তাঁর আঁখি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছেন, যেন কোন সমর্থন নেই তাঁর গঙ্গীর প্রতি। কেমন একটা ভীতিভাব জাগে গঙ্গীর মনে, ঘৃণামাখানো ক্রুদ্ধস্বরে সে বলে ফেলে :

'আমরা বাপু একমুহূর্ত কি একটু নিরিবিলি থাকতে পারব না? কেবল লোক আর লোক! যখনই আসি না কেন, কেবল মিটিং আর কনফারেন্স, মিটিং আর কনফারেন্স! এখন কি চলেছে শুনি—?'

গঙ্গীকে নীরব ক'রে দেবার বাসনায় হিজ হাইনেস বলেন : 'মক্ষীরানী, রাজ্যের একটা জরুরী ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।'

'কি জাতীয় রাজ্যোন্নতির বিষয়টা শুনি—' মক্ষীরানী খ্যান খ্যান

কণ্ঠে জানতে চায়: 'তোমরা পুরুষরা নিজেদের বড় বেশী ক্ষমতাবান ব'লে মনে ক'রো। বল দেখি আমায়, কি হয়েছে! যদিও সামান্য পাহাড়ী মেয়ে আমি, তবু এক্ষুনি সব ঝামেলা মিটিয়ে দিতে পারব।'

মক্ষীরানীর কণ্ঠস্বর সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং গঙ্গীও এটাই চেয়েছিল। ও চায় সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকতে, সূর্যমুখী ফুলের মতো চারধারের সবাই তাকিয়ে থাকবে গঙ্গী-সূর্যের পানে। গঙ্গীর অহম্‌বোধ শুধু ওকে অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখে, ও একটুও বুঝতে পারে না আলোচ্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব।

শ্রীপোপতলাল এই অবস্থা আর সহ্য করতে পারলেন না। নিজেকে সোজা টেনে তুলে নিলেন আর্ম-চেয়ার থেকে। একটা অধৈর্যের ছাপ পড়েছে তাঁর গম্ভীর মুখে। তিনি চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

ঈষৎ-সবুজ চোখ দুটো তুলে গঙ্গী চাইল পোপতলালের দিকে··· এ সেই গণিকার দৃষ্টি যা দিয়ে গঙ্গী নিজেকে সকল তর্কের উর্ধ্বে তুলে নেয়। এই মনোহারী দৃষ্টি ছুঁড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গী মাথাটা একটু হেলিয়ে নিয়ে এমন বিনম্র আবেদন জানায় তার সমগ্র সত্তা দিয়ে যে, ঐ আবেদনের আকর্ষণ থেকে দেওয়ান পারবে না নিজেকে সরিয়ে রাখতে। বললে: 'বসুন দেওয়ান সাহেব, একটু সরবৎ কিংবা চা দি?' দেওয়ান শ্রীপোপতলালের ঠোঁটের কোণের হাসিখানি একটু যেন কেঁপে ওঠে, হৃদয়ের কোণে যেন আবেদনের সরস সাড়া জাগে, একটা ভারী নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। কিন্তু ঝুনো পোপতলালের বাইরের কঠিন আবরণের নিচে অন্তরের এই ফল্গুধারা প্রকাশ পায় না এতটুকু। বেশ জোরের সঙ্গে তিনি বলেন:

'আপনার সঙ্গে আলোচনা?—'

গঙ্গীর বিনম্রভাব মুহূর্তে উড়ে যায়। চেঁচিয়ে বলে: 'টুলীপ, টুলীপ! আমার প্রাসাদে বসে আমি অপমানিত হবো!'

শ্রীপোপতলাল দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে মৃদু পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন। মুন্সীজী আর পিয়ারা সিং গেল তাঁর পেছন পেছন। এক সর্বনাশের নীরবতা যেন সমস্ত কক্ষ ব্যেপে বিরাজ করে।

.

আমিও উঠলাম চলে আসবার জন্যে। কিন্তু গঙ্গী আমায় অনুরোধ করল অপেক্ষা করতে।

গঙ্গী আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল টুলীপ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। দু'হাত দিয়ে টুলীপের গলা জড়িয়ে ধরল। আমি য়ুরোপে বাস করেছি অনেক দিন, খোলা জায়গায় প্রেম-নিবেদন প্রণয় করতে দেখেছি অনেক। কিন্তু তবুও আমার ভারতীয় মনে প্রেমের এই প্রদর্শন সমর্থন পায় না।

গঙ্গীর আলিঙ্গনে টুলীপ নিজেকে ছেড়ে দেন। পোপতলালের প্রতি গঙ্গীর ঐ ছেনালি হিজ হাইনেসের মনে উষ্মার উদ্রেক করেছিল, যদিও তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁরই জন্য সে ওটা করেছে। কিন্তু অন্য কারও প্রতি গঙ্গীর এই ছেনালিভাব মহারাজা কিছুতেই সইতে পারতেন না। তাই গঙ্গীর এই আমন্ত্রণে হিজ হাইনেস প্রাপ্তির আনন্দে নিজেকে ছেড়ে দেন। গঙ্গী বলে :

'একটা কিছু খাবে?…এই, কৈ হ্যায়? হুইস্কী লে আও!'

পা টিপে টিপে ভগীরথ প্রবেশ করে। দু'হাতে গঙ্গীকে নমস্কার জানিয়ে সে যায় হুইস্কীর বোতল খুলতে।

টুলীপ বলেন : 'আমার কিছু মার্কিন বন্ধু আছে…' কথায় একটা বিশেষ ইঙ্গিত ফুটিয়ে তিনি বলেন : 'হ্যাঁ, আমি ওদের শিকারে নিমন্ত্রণ করব…। ওদের একজন আমায় বলেওছিল একটা আলাদা চুক্তি করার কথা…কারণ নেপাল, রুশিয়া, কাশ্মীর, পাকিস্তান ও

ভারতের মাঝে অবস্থিত হলো আমার এই শ্যামপুর। দাঁড়াও ঝুনো দেওয়ান, তোমাকে একহাত খেল দেখাচ্ছি—'

'কিন্তু টুলীপ, দেওয়ানকে যে পাঠিয়েছেন সর্দার প্যাটেল। আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার চান একটা শক্তিমান দেশ হিসেবে ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে। এবং, এমন কি স্যার সি. পি. রামস্বামী—'

টুলীপ অধৈর্য কণ্ঠে বলে ওঠেন: 'কিন্তু শ্যামপুর তো আর ত্রিবাঙ্কুর নয়!' এতক্ষণে টুলীপের চরিত্রে যে কপটতা ছিল ঘুমিয়ে, সেটা বেরিয়ে এল নগ্নরূপে। 'আমার পূর্বপুরুষরা শ্যামপুরের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন একদল শিক্ষিত সৈন্যের সাহায্যে। আমরা পাহাড়ীরা এখনও আবার তাই পারি। প্যাটেলের তর্জনি হেলনের বিরুদ্ধে রয়েছে আমাদের দুর্দমনীয় শক্তি। আর ঐ গুজরাটি বেনিয়া, পোপতলাল শা', তুমি দাঁড়াবে আমার সামনে!'

'কি নাম! পোপতলাল স-আ-া—!' বিদ্রূপ করে গঙ্গী।

'কিন্তু গঙ্গী, তোমার ও-রকম অসভ্যতা দেখানো উচিত হয় নি!' গঙ্গীর দিকে ফিরে টুলীপ বলেন। বেশ বোঝা যায় যে তাঁর ঐ দম্ভোক্তি সত্ত্বেও মনের কোণে পোপতলাল-ভীতি জমে উঠেছে।

'তুমি ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও দেখি, আমার হাতের তেলোয় বাছাধনকে আম খাওয়াব, দেখবে!' চোখ নাচিয়ে গঙ্গী বলে।

গঙ্গীর এ-উক্তিতে মহারাজা জোর পান না। তাঁর মনে আবার আর এক ভীতি উঁকি দিতে থাকে। মনের ভয় চাপা দিয়ে কপট ভাষায় টুলীপ বলেন:

'শ্যামপুরে আমি নিজেই পোপতলালের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে ছেড়ে দেব। সিমলা পাহাড়ের অন্যান্য রাজারা আমার বন্ধু। বল্লভভাইকে বুঝিয়ে দেব যে সিমলা পাহাড় তার গুজরাট নয়!'

'কিন্তু মহারাজা রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা তো বড় গরম··· প্রজামণ্ডল—'

'কাপুরুষের মতো কথা বলো না, ডাক্তার। পাহাড়ী লোক তুমি, দু'পাতা লেখাপড়া শিখে আমাদের সেই শক্তিমান পূর্বপুরুষদের কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়!'

গঙ্গী বিদ্রূপ করে: 'এইসব বাবুদের রকমই এই! সহজেই এরা ভয় পায়— !'

'হাইনেস, আমি শুধু সত্য ঘটনার দিকেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আপনাকে কেউ খাঁটি কথা বলতে সাহস পায় না। আপনি বুঝতে পারছেন না—'

'হুঁ, অন্যে সাহস পায় না, আর তুমি ধৃষ্টতা দেখাবার সাহস রাখো!'

ক্রোধের একটা প্রলয় তাণ্ডব শুরু হলো আমার ভেতরে। দুর্দমনীয় ইচ্ছা হলো হিজ হাইনেসের এই আত্মসন্তুষ্টির বুদ্‌বুদ ফাটিয়ে দিতে। কিন্তু অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলাম।

গঙ্গী বললে: 'ডাক্তার সাহেব, দেখছেন তো মহারাজা কিরকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কাল সমস্ত দিন ধরে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। সুতরাং ওঁর কড়া কথায় কিছু মনে করবেন না।'

সুযোগ নিয়ে মহারাজা বলেন: 'আমাদের ঝগড়ার কথা গঙ্গী যখন নিজেই বললে, আশা করি, ডাক্তার, তুমি আমাদের মাঝে মধ্যস্থতা করবে। গঙ্গীর টাকার দরকার, ও আমাকে বলছে কিছু সরকারী বাড়ী বিক্রি ক'রে দিতে, আর ওর নামে সিমলার একটা বাড়ী লিখে দিতে। কিন্তু, ডাক্তার, কি ক'রে আমি তা দি বল? হরিদ্বারের বাড়ী আর এখানকার সরকারী জিনিসপত্র বিক্রি করাতে প্রজামণ্ডল যেরকম চেঁচামেচি শুরু করেছে—'

'কিন্তু এসব তোমার তো পৈত্রিক সম্পত্তি, সরকারী হলো কি ক'রে ?' গঙ্গী প্রশ্ন করে।

'দলিলপত্র তো আর আমার কাছে নেই যে প্রমাণ করবো এগুলো পৈত্রিক সম্পত্তি ! কিছু কাগজপত্র রয়েছে মার কাছে—'

'তোমার এই সবসময় মার কথায় চলা আমার মোটেই ভাল লাগে না। ঐ বুড়ী মাগী আর ঐ সয়তানী ইন্দিরা রাতদিন তো তোমার বিরুদ্ধে লেগে রয়েছে। দিল্লীতে যে ইন্দিরা দরখাস্ত পাঠিয়েছে, তার পেছনে, মনে করেছো, ঐ বুড়ী নেই ? দু' চোখ বুজে বোকার মতো তুমি বসে থাকবে, কিছুই দেখবে না !'

'ইন্দিরার সম্বন্ধে আমার কিছুই করার নেই—।' বলেন টুলীপ।

'কিন্তু তোমার মা, তাঁর ইচ্ছার দাসানুদাস তুমি—' কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার ক'রে বলে গঙ্গী।

'উঃ, তোমরা সকলেই কি আমার বিরুদ্ধে !' কপালে আঙুল দিয়ে ঠুকতে ঠুকতে বলেন হাইনেস : 'দিল্লী, রাজমাতা, ইন্দিরা, গঙ্গী, রাজ্যের সমস্ত প্রজারা—সব আমার বিরুদ্ধে—এমন কি এই ডাক্তার হরিশঙ্কর পর্যন্ত !'

আমি বললাম : 'তাহ'লে বুঝতে পেরেছেন হাইনেস যে প্রজারাও আপনার বিরুদ্ধে গিয়েছে। আমার মনে হয়, আপনি এদের নিজের পক্ষে সহজেই আনতে পারেন প্রজামণ্ডলের বিরুদ্ধে যে পুলিসী অত্যাচার চলেছে তা বন্ধ ক'রে আর রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিয়ে। এতে ক'রে আপনি সর্দার প্যাটেল এবং শ্রীযুক্ত পোপতলালকে আপনার দিকে টানতেও পারেন।'

'পোপতলাল-বুড়োটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও তো।' গঙ্গী মৃদুস্বরে বলে। সে যেন তার দেহাভ্যন্তরের কোন্ এক অন্তর্নির্দেশনায় এ কথা বলছে।

'বেশ, আমার বিরুদ্ধে আর কার কি বলার আছে ?'

সত্যঘটনা বলে হাইনেসকে একেবারে মুশরিয়ে দিতে মন চাইল না। ম্যাকিয়াভেলি কায়দায় কথার ভেল্কির মধ্য দিয়ে সত্য কথা বললাম :

'বুঝলেন হাইনেস, দুঃসময়ে বন্ধুর প্রয়োজন সব থেকে বেশী। আপনার আত্মীয়রা, সর্দাররা, এমন কি আপনার সৎ ভাই আপনার রাজ্যের প্রধান-সেনাপতি পর্যন্ত আজ আপনার বিরুদ্ধে। যেসব জায়গীরদারদের জমিজমা আপনার হুকুমে বাজেয়াপ্ত হয়েছে, তারাও আপনার বিরুদ্ধে। সাধারণ প্রজার মধ্যে এখন পর্যন্ত রাজভক্তি আছে, কিন্তু তাদের অভাব-অনটনের সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষীরা আপনার বিরুদ্ধে তাদের লাগাতে পারে—'

'তুমি কি মনে করো ডাক্তার, প্রজারা এখনও রাজভক্ত ?' রাজা-প্রজার মধুর সম্পর্কের সাবেকী ধারণার কথা তো অহরহ টুলীপের মুখে। দিল্লীর বিরুদ্ধে প্রজার রাজভক্তি কিছুটা কাজে লাগানো যায় কিনা তাই তিনি বুঝবার চেষ্টা করছেন ব'লে আমার মনে হলো।

প্রজারা যে আর নীরবে ললাট-লিখন বলে চুপচাপ বসে দুঃখ দুর্দশা সহ্য করছে না, এই সহজ সরল উত্তরটি এড়িয়ে গিয়ে আমি বললাম : 'সাধারণ লোক তো বিশ্বাস রেখেই আমরণ চলতে চায় !'

'হুঁ, প্রজারা আমায় ভালোবাসে। তাদের সঙ্গেই তো আমি আছি। তাদের সকলকে নিয়েই আমি দাঁড়াব শত্রুর বিরুদ্ধে। সর্দার আর জায়গীরদারদের এমন শিক্ষা দেব যে তারা জীবনে তা ভুলতে পারবে না। আমার বিরুদ্ধে যেসব সরকারী কর্মচারী যাবে, রাজ্য থেকে তাদের দূর ক'রে দেব। তার পর আমি একবার দেখে নেব দিল্লীর ষ্টেট-ডিপার্টমেণ্টকে। প্রয়োজন হলে বৃটিশ আর আমেরিকানদের আমার রাজ্যের কোন কোন অংশ ব্যবহারের অনুমতি দেব।

তার পর, বুঝলে ডাক্তার, এদিকের সব সামলিয়ে নিয়ে ও ব্যাটাদেরও দেব তাড়িয়ে···।'

'হুঁ, ঐসব বাঁদরমুখোদের কোনকিছু না দিয়েই, এমন কি এতটুকু ঝামেলার সৃষ্টি না ক'রে আমি কিন্তু এসব কাজ ক'রে দিতে পারি,— তবে হ্যাঁ,—' একটা বিদ্রূপের স্বর কণ্ঠে ফুটিয়ে গঙ্গী বলে : 'এসবই হ'তে পারে আমাকে যদি দু'তিনটে বাড়ী লিখে দাও।'

গঙ্গীর কথা কানে না তুলে মহারাজা বলতে থাকেন :

'হ্যাঁ, এখন একটা শিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তার পর ডাকব আমেরিকানদের সেই শিকারে—' কূটনীতির ছাপ ফুটে ওঠে তাঁর হাবভাবে।

ইচ্ছে হলো মহারাজাকে বলি যে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে, তার মধ্যে এইসব শিকারের পেছনে অপব্যায়, বেগার এবং টাকা ওড়ানোর অভিযোগ প্রধান। কিন্তু আমার সাহসে কুলাল না। আমার স্কন্ধে যাতে এই শিকার-ব্যবস্থার দায়িত্ব না চাপে, তার জন্য বললাম :

'হাইনেস, এইসব শিকার-ব্যবস্থার উপযুক্ত লোক হচ্ছে ক্যাপটেন পিয়ারা সিং।'

'ঠিক! কে আছে, পিয়ারা সিংকে বোলাও!'

মুহূর্তে এক উত্তেজনার ঝড়ে উড়তে থাকেন মহারাজা। এমন সময় প্রাসাদ-প্রাচীরের বাইরে শোনা যায় বহু লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর :

'শ্যামপুর প্রজামণ্ডল জিন্দাবাদ!'

'মহারাজা মুর্দাবাদ!'

'পণ্ডিত গোবিন্দ দাস জিন্দাবাদ! প্রজামণ্ডল জিন্দাবাদ—'

সিংহ দরজায় সুবৃহৎ এক লাঠি হস্তে দাঁড়িয়ে আছে পিয়ারা সিং। যেন তাই দিয়েই সে ঠেকিয়ে রাখবে এই জনসমুদ্রকে।

'বোধ হয় প্রজামণ্ডলের লোকেরা প্রাসাদে ঢুকে পড়বে, হাইনেস।' বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম।

'কোথায়, কোথায় তারা? আমি আসছি!' উত্তেজিত মহারাজা বাইরে দৌড়ে যেতে যেতে বলেন।

গঙ্গী মহারাজার সামনে এসে তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। দু'হাতে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে। উত্তেজিত মহারাজা গঙ্গীকে মাড়িয়ে দিয়ে এগোবার চেষ্টা করেন। গঙ্গী মহারাজার পা জড়িয়ে ধরে মিনতি জানায়:

'এই বিপদের মধ্যে যাবে না তুমি। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমার জন্য অন্ততঃ তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে না এই বিপদে। আমার পরম ধন তুমি। তুমি আমার—'

আমিও বললাম: 'সত্যি টুলীপ, এইরকম ঝক্কির মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না আপনার।'

চিৎকার ক'রে ওঠেন হাইনেস: 'আমি কাপুরুষ!' একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে গঙ্গীকে দূরে সরিয়ে ফেলে হিজ হাইনেস বেরিয়ে গেলেন।

বাগানের দিকে যেতে যেতে এক সান্ত্রীর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। পেছন পেছন আমি দৌড়িয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বললাম:

'হাইনেস, হাইনেস, হঠাৎ কিছু ক'রে বসবেন না যেন!'

আমার আশঙ্কা হলো হিজ হাইনেস কাউকে মেরে না বসেন। তাঁর পেছন পেছন আমি দৌড়োচ্ছি, কিন্তু আমার পা যেন চলছে না, কেমন খিল ধরে যাচ্ছে। এই সময় হতাশ কণ্ঠে আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল:

'টুলীপ, গুলি যদি ছোড়েন তো ওপরের দিকে ছুড়ুন, ওপরের

তার পর, বুঝলে ডাক্তার, এদিকের সব সামলিয়ে নিয়ে ও ব্যাটাদেরও দেব তাড়িয়ে…।'

'হুঁ, ঐসব বাঁদরমুখোদের কোনকিছু না দিয়েই, এমন কি এতটুকু ঝামেলার সৃষ্টি না ক'রে আমি কিন্তু এসব কাজ ক'রে দিতে পারি,—তবে হ্যাঁ,—' একটা বিদ্রূপের স্বর কণ্ঠে ফুটিয়ে গঙ্গী বলে : 'এসবই হতে পারে আমাকে যদি দু'তিনটে বাড়ী লিখে দাও।'

গঙ্গীর কথা কানে না তুলে মহারাজা বলতে থাকেন :

'হ্যাঁ, এখন একটা শিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তার পর ডাকব আমেরিকানদের সেই শিকারে—' কূটনীতির ছাপ ফুটে ওঠে তাঁর হাবভাবে।

ইচ্ছে হলো মহারাজাকে বলি যে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে, তার মধ্যে এইসব শিকারের পেছনে অপব্যায়, বেগার এবং টাকা ওড়ানোর অভিযোগ প্রধান। কিন্তু আমার সাহসে কুলাল না। আমার স্কন্ধে যাতে এই শিকার-ব্যবস্থার দায়িত্ব না চাপে, তার জন্য বললাম :

'হাইনেস, এইসব শিকার-ব্যবস্থার উপযুক্ত লোক হচ্ছে ক্যাপটেন পিয়ারা সিং।'

'ঠিক ! কে আছে, পিয়ারা সিংকে বোলাও !'

মুহূর্তে এক উত্তেজনার ঝড়ে উড়তে থাকেন মহারাজা। এমন সময় প্রাসাদ-প্রাচীরের বাইরে শোনা যায় বহু লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর :

'শ্যামপুর প্রজামণ্ডল জিন্দাবাদ !'

'মহারাজা মুর্দাবাদ !'

'পণ্ডিত গোবিন্দ দাস জিন্দাবাদ ! প্রজামণ্ডল জিন্দাবাদ—'

সিংহ দরজায় সুবৃহৎ এক লাঠি হস্তে দাঁড়িয়ে আছে পিয়ারা সিং। যেন তাই দিয়েই সে ঠেকিয়ে রাখবে এই জনসমুদ্রকে।

'বোধ হয় প্রজামণ্ডলের লোকেরা প্রাসাদে ঢুকে পড়বে, হাইনেস।' বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম।

'কোথায়, কোথায় তারা? আমি আসছি!' উত্তেজিত মহারাজা বাইরে দৌড়ে যেতে যেতে বলেন।

গঙ্গী মহারাজার সামনে এসে তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। দু'হাতে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে। উত্তেজিত মহারাজা গঙ্গীকে মাড়িয়ে দিয়ে এগোবার চেষ্টা করেন। গঙ্গী মহারাজার পা জড়িয়ে ধরে মিনতি জানায়:

'এই বিপদের মধ্যে যাবে না তুমি। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমার জন্য অন্ততঃ তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে না এই বিপদে। আমার পরম ধন তুমি। তুমি আমার—'

আমিও বললাম: 'সত্যি টুলীপ, এইরকম ঝক্কির মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না আপনার।'

চিৎকার ক'রে ওঠেন হাইনেস: 'আমি কাপুরুষ!' একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে গঙ্গীকে দূরে সরিয়ে ফেলে হিজ হাইনেস বেরিয়ে গেলেন।

বাগানের দিকে যেতে যেতে এক সান্ত্রীর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। পেছন পেছন আমি দৌড়িয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বললাম:

'হাইনেস, হাইনেস, হঠাৎ কিছু ক'রে বসবেন না যেন!'

আমার আশঙ্কা হলো হিজ হাইনেস কাউকে মেরে না বসেন। তাঁর পেছন পেছন আমি দৌড়োচ্ছি, কিন্তু আমার পা যেন চলছে না, কেমন খিল ধরে যাচ্ছে। এই সময় হতাশ কণ্ঠে আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল:

'টুলীপ, গুলি যদি ছোড়েন তো ওপরের দিকে ছুড়ুন, ওপরের

দিকে!' আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আমার এই কথায় কাজ হয়েছে। ঘোড়া টেপার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে রাইফেলের মুখটা আকাশের দিকে তুলে ধরেছেন হাইনেস।

সিংহ-দরজার সব পায়রাগুলো ভয়ে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল।

বাইরে জনসাধারণও পেছিয়ে যেতে শুরু করল।

গতকালের ঐ ঘটনায় আমার স্নায়ুর ওপর উৎপীড়ন এবং শ্যামপুরের রাত্রির গুমোট গরম আমার নিদ্রা ঘুচিয়ে দিল। প্রায় সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করছি, ভোরের দিকে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখে ঘুম নেমে এল। আমার এই আধা-ঘুম অবস্থায় মনে হলো, আমার বিছানার পাশে কে যেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। মনে হলো, বোধ হয় আমার বেয়ারা প্রত্যুষের চা নিয়ে এসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন কক্ষের হাওয়া কোন রমণীর আগমনের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে নাকে এল বিশেষ এক সুগন্ধ, যা গঙ্গী সাধারণতঃ ব্যবহার ক'রে থাকে। মুহূর্তে আমার নিদ্রা ছুটে গেল। চেয়ারে বসতে বসতে গঙ্গী বললে :

'এই সাত-সকালে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম বলে আমি দুঃখিত ডাক্তার সাহেব।'

মশারীর মধ্য থেকে গঙ্গীকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মশারী থেকে মুখ বাড়িয়ে আমি তার দিকে তাকালাম। চা নিয়ে বেয়ারা অপেক্ষা করছিল, সে এসে মশারী তুলে দিল। গঙ্গীর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার নিদ্রাহীন চোখে জলের দাগ। দুঃখিত হলাম মেয়েটির জন্যে। বেয়ারাকে ডেকে বললাম :

'ফ্রান্সিস, মহারানী সাহেবাকে চা দাও।'

'আপনার এখানে ব্রাণ্ডি আছে ডাক্তার সাহেব?' গঙ্গী জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে বৈকি। ফ্রান্সিস্ ব্রাণ্ডি।'

বুঝলাম গঙ্গী চাইছে তার মনের দুঃখ মদে ডুবিয়ে দিতে। কিন্তু গঙ্গী-চরিত্র এমনই যে, যদি সে আমার পরামর্শ চাইতে এসে থাকে, সে বলবে না তার মনের কথা, বলবে সেইটুকু, যেটুকু বললে সে পারবে আমার সমবেদনা ও সমর্থন তার দিকে টেনে নিতে।

'একটা সিগারেট দিতে পারেন ডাক্তার সাহেব?' গঙ্গী বললে।

'হুঁ, হুঁ—' খাটে বসে তাকে একটা সিগারেট দিয়ে আমি নিজেই সেটা ধরিয়ে দিলাম। পাহাড়ী মেয়েরা এমনিতেই ধূমপান করে, কিন্তু গঙ্গীর এভাবে কাগজ-পাকানো সিগারেট চেয়ে খাওয়া যেন বড় বেশী বিকৃতরুচি মনে হয়। কড়া টান দিয়ে সেই ধোঁয়া কায়দা ক'রে ছাড়তে থাকে গঙ্গী।

আমি নীরবে বসে রইলাম। সাধারণতঃ আমিই প্রথম আলাপ ক'রে থাকি, যাতে প্রথম-আলাপনের দ্বিধা কেটে যায়। কিন্তু আজ সকালে বেশ কষ্ট করেই আমি অপেক্ষা ক'রে রইলাম যাতে গঙ্গী তার গোপনীয়তার গহ্বর আপন আয়ত্বে রেখে আমার কাছে যে কাজে এসেছে তা সমাপনান্তে নিরুপদ্রবে ফিরে যেতে পারে। আমি কিছুদিন হলো বুঝতে পারছি যে মানুষের গহন মনের গভীরে অবস্থিত অভিলাষের সঙ্গে মনের উপর ভাসমান অনুভূতি মিশ খাইয়ে তুলে আনতে পারলেই সমস্যা-বিচার অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। কত বাধা-অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়ে হিজ হাইনেস তাঁর মনের দুয়ার খুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। আর গঙ্গী,—তার মনে এত অসংখ্য ক্ষত রয়েছে যে তা নিজের কাছে তুলে ধরারও সাহস তার নেই, পরের কাছে মেলে ধরা—সে তো তার পক্ষে রীতিমত কঠিন। আমার মনে হলো, যদি কিছু

মধু-মলয় তার মনের দুয়ারে মেদুর স্পর্শ লাগিয়েও যায়, তাতে গঙ্গীর পক্ষে ভালোই হবে।

কিন্তু গঙ্গীর অনির্মল অনুভূতির জগৎ একেবারে অন্ধ, মনের বাতায়নের অর্গল সামান্য একটুও খোলে না। দু'জনের মাঝে প্রত্যূষের এই হাইতোলা শূন্যতার ব্যবধান রচনা ক'রে আমার বৃথাই অপেক্ষায় বসে রইলাম কখন গঙ্গী মন খুলে কথা কইবে। আমার নজরে পড়ল গঙ্গীর নাকের ডগা মৃদু মৃদু কাঁপছে। তার পর সে তার সবুজ চোখের ঝকমকে আলো ঘুরিয়ে এনে ঠিকরে ফেলল আমার দিকে। চাহনিটা একটু বাঁকা, আমাকে সামান্য একটু বিগলিত ক'রে দেবার জন্যেই যে তার এই ভঙ্গি, আমি তা বুঝে ফেলেছি। আমিই শুরু করলাম :

'গতকালের ঘটনার পর আমার মনে হয়, আমাদের কারোরই বিশেষ ঘুম হয় নি। মহারাজা সাহেবের ঘুম বোধ হয় একেবারেই হয় নি।'

গঙ্গীর মুখে কথা ফুটল : 'ওর জন্যে ভাববেন না। শোবার আগে তো বেশ টেনেছিলেন। আর তা ছাড়া আপনি তো একটা ঘুমের ওষুধও দিয়েছিলেন। এখনও ঘুমোচ্ছে। অন্ততঃ আমি আসবার সময়েও দেখে এসেছি ঘুমোচ্ছে।'

'আমি কিন্তু হিজ হাইনেসের জন্য সত্যিই চিন্তিত। শরীর-মন তাঁর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। সিমলা থেকে ফেরবার পর তিনি যেন এক মুশকিলের সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন—'

'দেখবেন, ঠিক ভেসে থাকতে পারবে!' কেমন একটা ক্রুরতা ফুটে ওঠে গঙ্গীর কৃত্রিম হাসি মাখানো ঠোঁটে।

'কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, যে-ঝড় আসছে তাতে সাঁতরে পার হবার মতো শক্তি মহারাজার আছে কি না।'

'আপনি ওকে চিনতে পারেন নি ডাক্তার সাহেব। বড় ধূর্ত, এতটুকু দয়ামায়া নেই ওর প্রাণে...'

ফ্রান্সিস চায়ের ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল। গঙ্গী তার কথা অসমাপ্ত রেখেই চুপ ক'রে গেল। একটা চাপা-ক্রোধ পাহাড়ী মেয়েটির গোল মুখের চ্যাপ্টা নাকটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিল।

পেয়ালায় চা ঢেলে আমি গঙ্গীর দিকে এগিয়ে দিলাম।

'ব্রাণ্ডি—'

'ও, হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। দিচ্ছি ব্রাণ্ডি। চা কিংবা কফি—কোনটা চাই সঙ্গে।'

'একবারে নির্জলা, ডাক্তার সাহেব—' ইংরেজীতেই বললে গঙ্গী।

চায়ের ট্রের ওপর একখানা পাত্র নিয়ে এসেছিল ফ্রান্সিস, দেখতে সেটা ভারী বিশ্রী। তার মধ্যে ব্রাণ্ডি ঢেলে গঙ্গীর দিকে এগিয়ে দিলাম। অদ্ভুৎ একটা ইতরতা ফুটে উঠেছে গঙ্গীর মুখে-চোখে। গঙ্গীর হাবভাবে ঐ অসভ্যতা দেখেই ব্রাণ্ডির পাত্রের জন্য আমি আর লজ্জিত হলাম না। এক চুমুকে সমস্তটা গলায় ঢেলে দিয়ে মুখটা বিকৃত করল গঙ্গী। জিজ্ঞেস করলাম :

'আপনি টুলীপ সম্বন্ধে কি বলছিলেন?'

'জানি না ওকে নিয়ে আমি এখন কি করবো। কিছুই ওর বোঝা যায় না। যা তা করবে আর যা তা বলবে, মুখের কোন লাগাম নেই। আমার কাছ ছাড়া হলেই কেমন যেন একটা প্রতিহিংসার ভূত ওর ঘাড়ে চেপে বসে...কি সব বলে সিমলায় ক'রে এসেছে, কি ছাইভস্ম সব খেয়েছে!'

'কিন্তু মহারানী সাহেবা, টুলীপ হাজারো অন্যাই করুন না কেন,—আর তা করবার মতো শক্তিও তাঁর আছে,—তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আপনার প্রতি তাঁর ভালোবাসা অমলিন।'

এ-কথা বলে যে গঙ্গীকে তোষামোদ করা হলো, তা আমি জানি। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল সে, চোখ দু'টো তার নিচের দিকে নেমে গেছে, কেমন একটা প্রলোভন জাগানো স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে সে-চোখের দৃষ্টিতে। ক্ষণকাল পরে গঙ্গী বলল: 'আপনার কথাই যদি ঠিক হয় ডাক্তার সাহেব, তবে কেন টুলীপ একটা উইল ক'রে কিছু টাকা আর বাড়ী আমার নামে লিখে দিচ্ছে না?' একটা অভিমান-ক্ষুব্ধ চাপ প'ড়ে ঠোঁট দু'টো তার ঈষৎ স্ফীত হয়ে উঠেছে।

আমি উপলব্ধি করলাম যে, একটা ক্রুদ্ধ ক্ষোভের ঢেউ আমার মনের ওপর দিয়ে দ্রুত বয়ে গেল। আমার মুখে যে তিক্ততার লালা জমে উঠেছিল, আমি তা কোনমতে মুখ ভরতি চায়ের ঢোকের সঙ্গে গিলে ফেললাম। আমি বেশ বুঝতে পারছি, স্বার্থান্বেষী শয়তানী এবার তার স্বার্থের জোয়াসে আমাকে জুড়ে নেবার চেষ্টা করছে। অথচ কত সহজ সাবলীল ভাবে সে তার স্বার্থের কথা বলে গেল! একটা অদ্ভুত নিষ্ঠুর সততা রয়েছে তার এই আত্মস্বার্থবোধে: সেই রক্ষণাহীন একক জীবন-যাপনের ভীতি, বৃদ্ধবয়সের একাকী বাসের একটা সত্যিকারের ভয় তাকে এই টাকা ও বাড়ীর দাবীর জন্য এইভাবে মুখর করেছে। কতরকম জীবনের মধ্য দিয়েই না গঙ্গীকে পার হয়ে আসতে হয়েছে, কতরকম মিথ্যার আশ্রয় নিয়েই না তাকে চলতে হয়েছে! এই যে মন খুলে সে কথা বলতে শুরু করছে, হয়তো এ থেকেই তার নবজীবনের সূচনা হলো। কিন্তু আমার এই ভ্রান্তি মুহূর্তকালের। ও-মেয়ের চোখের ওপর আমার নজর পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম, কি ভুলই না আমি করেছিলাম আমার বিশ্লেষণে। বুঝলাম, কি একটা যেন সে খুঁজছে এবং সেই প্রয়োজনেই দরকার হলে আমাকে তার জালে জড়িয়ে নিতেও কসুর করবে না। তার এক-একটা চোখ-ধাঁধানো

ক্ষণিক বাসনা ঝরে-পড়া ফ্যাকাশে পাপড়ীর মতো যখন লুটিয়ে পড়ে, তখন যে শূন্যতার গহ্বর ফুটে উঠে তার চরিত্রে, তখন সেইসব গহ্বরের চারিধারে জন্মায় শুধু বাঁকা বাঁকা ছত্রকের মতো মনের অদৃশ্য কতসব কুটিল চক্রান্ত। এগুলো কোনসময়েই আর সহজ-সোজা করা যায় না।

আমি বললাম: 'টুলীপ যেন ক্রমশঃই জড়িয়ে পড়ছেন। চারদিক থেকে তাঁর ওপর আক্রমণ চলেছে—'

'ও তবে আমার কাছে আসে না কেন, কেন ও মন খুলে ধরে না আমার কাছে।' মাথাটা ঈষৎ বেঁকিয়ে গঙ্গী বলে: 'কেন ও আসে না?—'

টুলীপের একেবারে গোড়ার দুর্বলতার তন্ত্রীতে স্পর্শ করতে চায় গঙ্গী তার সহজাত অনুভূতি দিয়ে। এ হলো তার চরিত্রের একেবারে মূলের জিনিস। পুরুষের আকাঙ্ক্ষার অবচেতন নাড়ীতে ঘা দিয়ে তার স্বভাবের তলদেশে যে কাপুরুষতা চাপা রয়েছে সেখানে অনুভব করতে চায় এ নারী। আমি বললাম হেঁয়ালি ভাষায়:

'মহারানী সাহেবা, টুলীপ যে তাঁর মা'র হাতের পুতুল। বলা যেতে পারে, এখন পর্যন্ত তাঁর জন্মনাড়ী কাটাই হয়নি। কোন মেয়ের কাছেই তাই তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন না। আর আজ আবার সব প্রজারা তাঁর বিরুদ্ধে…'

আমার কথা যে গঙ্গী খুব বুঝতে পারল, তা নয়। তার চোখের ফাঁকা দৃষ্টি দেখেই আমি তা বেশ বুঝতে পারছি। আমি আবার বললাম যাতে সে বুঝতে পারে: 'বড়ই দুর্বল চিত্তের মানুষ আমাদের হিজ হাইনেস। যে কেউ তাঁকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিতে পারে।'

'কিন্তু বড় নির্দয়, বড় হিংস্র সময় সময় আমার ভীষণ ভয় করে,' গঙ্গী বলে আর তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। 'মাতাল

হলে ওর আর-এক চেহারা, আমাকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। আমাকে কেন ও বুঝতে পারে না ডাক্তার সাহেব!...'

টুলীপ-চরিত্র সম্বন্ধে আমার ধারণাকেই গঙ্গী যেন ব্যাখ্যা করছে। দুর্বল বলেই হিজ হাইনেস দয়াহীন; সবল মানুষ তার মনের জোর দিয়েই সব কিছু রক্ষা ক'রে চলে। টুলীপ যে এই ভাবে মদ গিলছেন, গঙ্গীকে ধরে প্রহার দিচ্ছেন, তাতেই তো প্রমাণিত হয় যে তাঁর স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল, তিনি ধৈর্যহারা হয়ে গিয়েছেন। যাই হোক, আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে গঙ্গীর হালচালেরই প্রত্যুত্তর হলো হিজ হাইনেসের এই অবস্থা, এবং টুলীপের প্রতি যা প্রযোজ্য তা একই ভাবে প্রয়োগ করা চলে গঙ্গীর বেলায়ও। দু'জনেই তো প্রায় একইরকম মন-মেজাজের, একইরকম ভাবপ্রবণ আর সহজ-দাহ্য। গঙ্গী, তুমিও তো ঐ একইরকম দুর্বল, দয়াদাক্ষিণ্যের লেশমাত্র তোমার চরিত্রেও নেই। বরং তোমার মধ্যে এ জিনিস রয়েছে আরও বেশী মাত্রায় এই কারণে যে, পুরুষের প্রতি অনেক সহজে মেয়েরা পারে তার প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে, তাদের প্রতি পুরুষরা যে অন্যায়-অবিচার ক'রে এসেছে যুগ যুগ ধরে তার জন্য তোমার মতো মেয়ে অনেক বেশী নির্দয় হতে পারে। গঙ্গী যদি মদ না খেত, তা হলে তার উপর হিজ হাইনেসের মাতবরী সে সহজে সহ্য করত না। কিন্তু এ বিশ্লেষণ তো আর গঙ্গীকে আমি বোঝাতে পারব না, তার চরিত্র-বিশ্লেষণে তাকে দোষ দিলেই সে যাবে ক্ষেপে এবং আঘাত করবে আমাকে। এ মেয়ে চোখের জলে আমাকে মোটেই অভিভূত করতে পারে নি। তার চোখের জলের পেছনে যে শয়তানী লুকিয়ে আছে, তা আমি বুঝেছি। তাই আমি বললাম:

'সত্যিই আমি দুঃখিত মহারানী। আপনি মনের দুঃখ চাপবেন না, মন খুলে কাঁদুন। তাতে আপনার ভালই হবে।'

ওই কান্নার মধ্যেই হাসি ফুটে উঠল গঙ্গীর মুখে-চোখে। হাসি-কান্নার অপূর্ব সংমিশ্রণ। বলল :

'অদ্ভুত লোক আপনি ডাক্তার সাহেব! মন খুলে কাঁদলেই আমার ভাল হবে, এই আপনার ব্যবস্থা!'

গঙ্গী-চরিত্রের খেলয়ারী আর অতি-সংসারী আবরণের নীচে যে একটা শিশু-চরিত্রের সহজ সরলতার ফল্গুধারা আছে, তার এই হাসি-কান্না দেখে তাই আমার মনে হলো। আমার মনের কাঠিন্য কিছুটা নরম হলো। শুধু নরম হওয়া নয়, একটা কামনা-বাসনার অস্পষ্ট মৃদু তরঙ্গ আমার মনের ওপর দিয়ে গড়িয়েও গেল। আমার মনে হলো, গঙ্গীর এই অতি-সংসারী মনোভাব তার চরিত্রের শয়তানী দিকটা যেন বাচ্চাদের সংসারী ভাব দেখানোর সঙ্গে তুলনীয়। সত্যিই গঙ্গীকে এই মুহূর্তে ভারী ভাল লাগছে। আমি নম্র কণ্ঠে বললাম :

'দেখলেন তো, আপনি হাসতে আরম্ভ করেছেন!'

মাথাটা ঈষৎ বেঁকিয়ে দু'চোখে-মুখে সুন্দর চাপা আনন্দ মাখিয়ে গঙ্গী আবার বললে :

'সত্যিই অদ্ভুৎ, ভারী সুন্দর আপনি ডাক্তার সাহেব!'

মুহূর্তকাল মাত্র আমার এই নিজেকে হারানো। মুহূর্তকাল পরেই আমি কিন্তু ভীত হয়ে পড়লাম। আমি কিন্তু সত্যিই চাই না এই বিয়োগ-বিধুর নাটকের মধ্যে কোন কুশী-লবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের প্রতি আমার ডাক্তার হিসেবে সহানুভূতি আছে মাত্র, এবং আমার এক্তিয়ারের বাইরে আমি হাত বাড়াতেও চাই না। আমার চোখের সামনেই তো নাটকটি বেশ জমে উঠেছে। আমি তো জানি, গঙ্গীর বন্ধুত্ব কিংবা সহানুভূতি লাভ করা মানে হলো তার প্রতি যৌনভাবে জড়িত হয়ে পড়া। তার অর্ধ সহবাস পর্যন্তই যে গঙ্গী এগোবে এমন কোন কথা নেই, একটা উষ্ণ

তাপের জালের মধ্যে স্মরাতুর জীবটিকে জড়িয়ে নিয়ে গঙ্গী তাকে একেবারে তার গোলামে পরিণত ক'রে ফেলবে, খুশীমত কাজ করিয়ে নেবে। কিন্তু এখন তার মনমাতানো স্পর্শ থেকে বেরিয়ে আসি কি ভাবে?

সে বললে: 'ডাক্তার সাহেব, মাঝে মাঝে আমার মাথায় কেমন একটা ভূত চেপে বসে। বারে বারে ইচ্ছে জাগে দিই নিজেকে শেষ ক'রে। এত অসুখী আমি। টুলীপ আমাকে ঘৃণা করে। অশিক্ষিত পাহাড়ী মেয়ে আমি। দু'একবার ওকে প্রতারণাও যে না করেছি তা নয়। আমাকে ও বিশ্বাস করে না। আমার মনে হয়, টুলীপ সত্যি সত্যিই ইন্দিরাকেই ভালোবাসে। বি. এ. পাশ মেয়ে ইন্দিরা। তার ছেলেকে রাজপুত্র হিসেবে স্বীকারও ক'রে নিয়েছে টুলীপ। আমি তো উপপত্নী, আমার ছেলেকে ছেলে হিসেবেও গ্রহণ করছে না। ওর জন্যে কীই না করলাম আমি। আপনি তো সব জানেন ডাক্তার সাহেব। ওর বুড়ী মা, বৌ-রানীরা, কেউ ওকে পছন্দ করে না। তবুও টুলীপ আমাকে চায় না, আমাকে রানী হিসেবে গ্রহণ করবে না, আমার ছেলেকে রাজপুত্র বলে মেনে নেবে না। কেন আমাকে ও বিয়ে করবে না, বলতে পারেন?…তাহলে আমি কি করব, আমার কি করার আছে, ডাক্তার সাহেব?—বলুন, বলুন আপনি, কোন্ পথে যাব আমি? কেন নিজেকে শেষ ক'রে দেব না?…'

এতটা ভাবপ্রবণ হয়ে গঙ্গী কথা বলছিল যে আমার মনে হলো, গঙ্গীর গহন মনের প্রশ্নটা সে তুলে ধরেছে এবার। আমার নিজের মনে যাচাই করতে গিয়ে আমি বুঝলাম, উঁহু, তার মনের খাঁটী অনুভূতির প্রকাশ এ নয়। এটি হলো তার মনের সাময়িক ক্লান্তি থেকে উদ্ভূত নিজেকে বিনাশ ক'রে দেবার একটা অর্ধসত্য আবেগ মাত্র যা চাপা

পড়ে আছে তার চরিত্রের সেই সবকিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করার বাসনার নীচে। সে বলল :

'আমার কাছে আর্সেনিক আছে ডাক্তার সাহেব—'

'মহারানী সাহেবা !' আমি চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'ভয় পাবেন না, ডাক্তার সাহেব। আপনি যে আমাকে আর্সেনিক দিয়েছেন, এ কথা আমি কাউকেই বলব না।'

স্তম্ভিত আমি তাকিয়ে রইলাম গঙ্গীর দিকে। এ যদি ঠাট্টা হয়, তবে এ হলো মারাত্মক ঠাট্টা। মুহূর্তে আমার মাথাটা ঘুলিয়ে উঠল, হ্যাঁ, এ মেয়ে পারে এই ঠগী আক্রমণ চালাতে। তাকে আর্সেনিক দিয়েছি বলে মিথ্যা রটনার ভয় দেখিয়ে সে পারে আমাকে তার জালে জড়াতে। জোর ক'রে একটা অট্টহাসি ছুঁড়ে দিয়ে আমি আমার মনের তুফানকে চাপা দিলাম। গঙ্গী আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল :

'ডাক্তার সাহেব, আমাকে সাহায্য করুন, আমার পক্ষ নিয়ে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। আপনি টুলীপকে আমার হয়ে কথা বলুন। আমার সঙ্গে যে আপনার কথা হয়েছে, তা যেন ও জানতে না পারে। একেবারে শিশুর মতো টুলীপ, ওর যে কিসে ভাল-মন্দ, তা ও নিজেই জানে না। ওর রাজ্যসংক্রান্ত সমস্যার মুশকিল-আসান আমি ক'রে দিতে পারতাম—'

'হ্যাঁ, হিজ হাইনেস আপনাকে সত্যিই ভালোবাসে গঙ্গাদেবী।' আমি বললাম গঙ্গীর কথার মাঝেই।

মনে হলো গঙ্গী যেন আরও কথা আশা করছে আমার কাছ থেকে যাতে তার মনের ভারসাম্য সে ফিরে পেতে পারে। নিজের চরিত্রের শূন্য-বিশ্বাস থেকে সে তো কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে না। সে যে বিশ্বাস করে না নিজেকেই। কিন্তু আমার এই চরিত্র-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তো তাকে কিছু বলতে পারছি না।

একটা দুঃখবিজড়িত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে গঙ্গী আমায় জিজ্ঞেস করল : 'টুলীপ কি কিছু বলেছে আপনাকে,—এই গত কয়েক দিনের মধ্যে ?'

'না। তবে ডাক্তার হিসেবে আমি তো জানি হিজ হাইনেস আপনার প্রতি কিরকম অনুরক্ত। আপনার প্রতি তাঁর ভালোবাসা—কি যেন ভাষাটা,—যা মাপা যায় না,—হ্যাঁ, অসীম ভালোবাসা—'

'কিন্তু কিছু কি বলেছে ?'

আমি হাসলাম। গঙ্গীর অতিলোভী মনোবৃত্তির সামনে যদি খাঁটী কথাগুলো নিয়ে লোফালুফি করতে পারতাম!

'আচ্ছা গঙ্গাদেবী, একটা কথা বলুন তো। মনে কিছু করবেন না প্রশ্ন করছি ব'লে : আপনি হিজ হাইনেসের মনে ঈর্ষা জাগান কেন, কেনই বা ছোটখাট জিনিস নিয়ে যা তা কাণ্ড করেন ?'

একটু বিরক্ত হয়েই গঙ্গী উত্তর দিল : 'ডাক্তার সাহেব, আপনার মনে এ রকম প্রশ্ন জাগে কি ক'রে আমি বুঝতে পারি না। সাত-সাতটি বছর ধরে আমি টুলীপকে ভালোবেসে আসছি, ওর দু'দুটো ছেলের মা হয়েছি আমি। ও বুঝতেই চায় না যে আমি নারী, আমি ভালোবাসা চাই, সত্যিকারের ভালোবাসা। আপনি তো জানেন, অন্য মেয়েদের নিয়ে ও যা তা কাণ্ড করে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। কিন্তু টুলীপ চায় একটা কিছু নাটকীয় দৃশ্যের অবতারনা হোক সব সময়। আমার মনে হয় কি জানেন ডাক্তার সাহেব, ও সত্যিসত্যি অখুশি হয়েই থাকতে ভালোবাসে। আমি চাই আনন্দচিত্তে থাকতে, আমি পারি না ঐসব নাটুকেপনা সইতে। টুলীপকে আমি কষ্ট দিতে চাই, এ আপনি কি ক'রে ভাবতে পারলেন ?...'

নিজের পক্ষ সমর্থন এই যে গঙ্গী করল, তাতে আমি বুঝলাম, এ মেয়ে যে-কোন কাজ অবলীলাক্রমে করতে পারে। গত সাত

বছরের অনেক ঘটনাই তো আমার জানা, আর গঙ্গী সেসব ঘটনা একেবারে চাপা দিয়ে একটা ঈষদ্-উন্মত্ত সরলতার ওড়না টেনে ঢেকে দেবার চেষ্টা করছে দেখে মনে মনে আমি হাসলাম। সে তো জানে না যে তার চরিত্রের অনেক ঘটনাই আমি জানি। একটা দৃঢ়বিশ্বাস আছে গঙ্গীর যে, সে সকলের চোখেই ধুলো দিতে পারে। একটা যৌন-আবেদনের সাহায্যে সে চাইছে আমার মনে করুণা জাগাতে যাতে মহারাজার সঙ্গে তার মন-কষাকষির নাটকে আমি তার পক্ষ নিয়ে দাঁড়াই।

ঠোঁট দু'টো ফুলিয়ে গঙ্গী শেষবারের মতো আবার বলল : 'আপনার সাহায্য কিন্তু আমি চাই-ই চাই।'

গঙ্গীর এখন এ স্থান পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন। আমি তাই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। গঙ্গী বুঝল আমার ইঙ্গিত। উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে।

আমি বললাম : 'বেশ তো, আমার সাধ্যমত করব।' তার পর হঠাৎ আমার মনে একটা তীব্র বাসনা জাগল ওদের দু'জনকেই সাহায্য করার। 'আচ্ছা, আমরা তিন জনেই যদি একবার একসঙ্গে বসে কথা বলি, তা হলে বোধ হয় খুব ভাল হয়। কোথায় যে মতের গরমিল হচ্ছে তা বোঝা যায়। তবে একটা কথা, আমার উপদেশ মেনে আপনি চলবেন, এ স্বীকৃতি আপনাকে দিতে হবে।'

যেন আকাশের চাঁদ চাইছে এমনি ভাবে শিশুর মতো ক'রে গঙ্গী বলল : 'আমি যা চাইছি সেটা বুঝিয়ে ওকে দিয়ে করিয়ে দিন আপনি, হ্যাঁ—'

গঙ্গীর আবদারী ভাষার কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম।

মুহূর্তে গঙ্গীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে যেন বুঝেছে যে আমি টুলীপের পক্ষে। 'আপনারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে!' চেঁচিয়ে উঠল গঙ্গী।

সমস্ত বিশ্বাস যেন মুহূর্তে মুছে গেছে তার মুখ থেকে। চোখ দুটোয় এক অন্ধ শূন্যতা জলজল করছে। কেমন একটা ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি ফুটে উঠেছে সেই স্থানে। এ দৃষ্টির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। পশুী যখন পথ পায় না কিছুর, এই বিহ্বলতা ফুটে ওঠে তার চোখের দৃষ্টিতে।

কর্মব্যস্ত সোমবার এল তার গম্ভীর লম্বা মুখ নিয়ে, এমন কি এল মহারাজারও সামনে। সকাল আটটায় হিজ হাইনেস হুকুম জারী করলেন যে দশটার সময় সকলকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে অফিসে।

নির্দিষ্ট সময়ে আমি যখন এলাম, আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সব সময়ে যে-লোক তাঁর রাজকীয় কায়দা ঠিক রাখতে গিয়ে কোন সাক্ষাৎকারই নির্দিষ্ট সময়ে রাখতে পারেন না, সেই হাইনেস সকলের আগে তৈরি হয়ে গিয়েছেন! বুঝলাম, চরম উত্তেজনার মধ্যে রয়েছেন হাইনেস। চোখদুটো তাঁর রক্তবর্ণ, বোধ হয় নিদ্রাহীনতার জন্যে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির মেজর জেনারেলের (সম্মানিত পদবী) মিলিটারী পোষাকে তিনি সজ্জিত হয়ে এসেছেন। বড় বেশী চটপটে মনে হচ্ছে তাঁকে, যেন এই চটপটে-ভাবের আড়ালে নিজের আভ্যন্তরিক ঝড় তিনি চাপা দিয়ে রাখতে চাইছেন। তাঁর এই মিলিটারী পোষাক বুলচাঁদ, পিয়ারা সিং এবং মুন্সীজীকে সম্মোহিত ক'রে ফেলেছে, কিন্তু আমার বারে বারে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তাঁর মনের ভেতরে যে আলোড়ন চলেছে তা প্রায় ভয়েরই নামান্তর মাত্র। এখন তাঁর নিজের মুখেরই কথা: 'খুঁটোয় বাঁধা ষাঁড়'-এর অবস্থা যেন তাঁর।

প্রাসাদের সামনেই অপেক্ষমান গাড়ীর সারির প্রথমেই দেখলাম একটা সাঁজোয়া গাড়ী। বুঝলাম, প্রজামণ্ডলের নেতাদের গ্রেফতারের পর এই সাবধানী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মহারাজা। তিনি বললেন:

'তুমি হরিশঙ্কর আর পিয়ারা সিং এস আমার সঙ্গে আর্মাড কারে। আর মুন্সীজী ও বুলচাঁদ যাক রোল্‌স্ রয়েসে।'

তাকিয়ে দেখলাম বুলচাঁদের ভীতিসঙ্কুল মুখখানা। হিজ হাইনেসকে সে বলল :

'কিন্তু মহারাজা আপনি আমাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন তার কথা তো শুনলেন না--'

'সে পরে হবে'খন—' বুলচাঁদকে থামিয়ে দিলেন হাইনেস।

বুলচাঁদকে পাঠিয়েছিলেন মহারাজা দুটো কাজে। ইন্দিরা মহারানীকে বুঝিয়ে যদি দিল্লীর স্টেট ডিপার্টমেণ্ট থেকে তাঁর দরখাস্ত-খানা তুলে নিয়ে আসা যায়; আর পোপতলালকে বাজিয়ে দেখতে কত টাকা পেলে বুড়ো ময়না মহারাজার দিকে চলতে পারে। আর এসব তেল-দেয়াদেয়ির ব্যাপারে তো বানিয়ানন্দন বুলচাঁদ আদর্শস্থানীয়। হিজ হাইনেসের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল বুলচাঁদ, কারণ, রিপোর্টের মধ্য দিয়ে যদি হাতে কিছু এসে যায়, আর এমনি খোলা গাড়ীতে পেছন পেছন যাওয়ার চেয়ে মহারাজার সঙ্গে আর্মাড কারে থাকতে পারলে বিপদাশঙ্কাও কম।

গাড়ীতে উঠে বসতে বসতে মহারাজা পিয়ারা সিংকে জিজ্ঞেস করেন: 'ক্যাপ্টেন সাহেব, জেনারেল রঘবীর সিং ফৌজ চলাচল সম্বন্ধে কি বললেন ?'

'তিনি সেইভাবেই সব ব্যবস্থা করছেন।'

সৈন্য চলাচলের ব্যবস্থার কথা আমি এই সর্বপ্রথম শুনলাম। হুঁ, একদিকে দিল্লী, আর একদিকে প্রজামণ্ডল—দু'তরফকেই স্বাধীন শ্যামপুর রাজার সত্যিকারের শৌর্য দেখিয়ে দিতে চাইছেন মহারাজা!

'কিন্তু জেনারেল সাহেব বললেন কি ? আমার প্রতি তাঁর মনোভাব—'

'অত্যন্ত আন্তরিক হিজ হাইনেস। অন্যান্য সর্দারদের মতো নয়, আপনার প্রতি তাঁর —'

মাথা নাড়ছেন আর মুখে বলছেন হিজ হাইনেস: 'হুঁ, হুঁ!' আসলে কিন্তু অন্য কি এক গভীর মতলব ঘুরছে তাঁর মাথায়। তাঁর ঈষৎ রক্তিম দুর্বল মুখখানায় সেই চিন্তার ছাপ পড়েছে।

সাঁজোয়া গাড়ীর জানালা গলিয়ে আমরা বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ভিক্টোরিয়া বাজারের চারিদিকে পুলিশ বাহিনী দণ্ডায়মান। দোকানপাট সব তখনও বন্ধ কারণ শ্যামপুরের বাজার ঠিক ভাবে শুরু হয় প্রায় দুপুরে। তবে প্রজামণ্ডলের ডাকে হরতালও হয়ে থাকতে পারে বলে আমার একবার মনে হলো।

গর্বিত কণ্ঠে হিজ হাইনেস বলেন: 'একটা একটা ক'রে সব ঠিক ক'রে ফেলব। দেওয়ান পোপতলালকেও আমার পক্ষে টেনে আনব এবার—'

চোখের কোণে একটা চক্‌চকে আলো দেখে আমার মনে হলো, হিজ হাইনেসের অন্তস্তলের চাপা চিন্তাজগৎ হঠাৎ যেন কি একটা আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু চোখের নীচের গভীর কালো দাগ তাঁর দুশ্চিন্তিত মনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। গম্ভীর প্রণয়ের মূল্য দিতে গিয়ে হিজ হাইনেস দেওয়ান, প্রধান সেনাপতি, রাজ্যের সর্দারদের, প্রজামণ্ডলের নেতাদের এবং বলা যেতে পারে রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকেই তিনি তাঁর বিরোধী ক'রে ফেলেছেন, এবং মনে মনে তিনি জানেন তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অনিশ্চিত। এখন শুধু ছলচাতুরী খেলা দেখিয়ে সময় কাটাচ্ছেন মাত্র।

হঠাৎ একটা দিল দরিয়া ভাব ফুটিয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন: 'আরে ডাক্তার, অত মুখ গোমড়া ক'রে বসে আছ কেন?'

'কর্মব্যস্ত সোমবারের সকাল যে!'

বুঝলাম হিজ হাইনেস খুশি হলেন না আমার কথা শুনে। কি যেন বলতে গিয়ে তিনি কথা চেপে গেলেন।

হুজরীবাগ প্রাসাদে হিজ হাইনেসের অফিস। সাঁজোয়া গাড়ী থেকে নেমে হিজ হাইনেস আর আমি চললাম অফিসের দিকে। পিয়ারা সিং বসে রইল গাড়ীতে। চলতে চলতে হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখটা এনে হিজ হাইনেস জিজ্ঞেস করলেন :

'আজ সকালে গঙ্গী তোমাকে কি বলছিল ডাক্তার?'

আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম, তবে সে হকচকানো সাময়িক মাত্র, কারণ আমি তো জানি রাজপ্রাসাদে কোন কিছুই গোপন থাকে না। গঙ্গীর আক্রমণের মুখে আমি যে আত্ম-রক্ষা করতে পেরেছিলাম, তার জন্য মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদই দিলাম। একটু পিছল পথে পা দেবার জন্য মনটা তো একবার, মুহূর্তের জন্য হলেও, উস্ খুস্ হয়েছিল।

'আপনার সঙ্গে একটা বিলিব্যবস্থার ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইছিলেন।'

'হুঁ। আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। মনে হচ্ছে মেয়েটা চালাক হবার চেষ্টা করছে!'

হুজরীবাগ প্রাসাদের সান্ত্রীরা আমাদের স্যালুট জানাল, চাপরাসীরা জানাল মাথা নুইয়ে অভিবাদন, শশব্যস্ত কেরানীকুল এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চৌধুরী রঘবীর সিং এসে মহারাজাকে ফৌজী কায়দায় স্যালুট করল।

'এই যে চৌধুরী সাহেব, ভেতর চলো, একটা পরামর্শ আছে।' মিলিটারী অভিবাদনের পালা চুকবার পর বললেন মহারাজা।

মাথা নুইয়ে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল মহারাজার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে

গেলেন। ইতিমধ্যে ক্যাপটেন পিয়ারা সিং পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো অফিস কক্ষে প্রবেশ ক'রে হিজ হাইনেস তাঁর বেল্টটা খুলে পিয়ারা সিং-এর হাতে দিতে দিতে বললেন :

'সিংজী তোমার কাজ হলো, ঐ যে আমাদের গর্দভগুলো রয়েছে না, মিঞা মুন্সী, বুলচাঁদ, ওরা যেন কেউ এখানে না ঢোকে তুমি দেখবে।'

ইঙ্গিতটা নিজের ওপরে নিয়ে আমি পেছিয়ে পড়লাম। তা দেখে হিজ হাইনেস চেঁচিয়ে বললেন : 'আরে ডাক্তার তুমি যাচ্ছ কোথায় ? হঠাৎ যদি চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি পড়ে যাই, তখন—!'

মৃদু হেসে আমরা বসলাম টেবিলের ধারে : আমি আর রঘবীর বসলাম হিজ হাইনেসের উল্টো দিকে।

টেবিলের উপর হাতখানা মেলে ধরলেন হিজ হাইনেস। কিন্তু কি ধরতে চাইছেন তিনি ? হৃদ্যতা প্রদর্শন যতখানিই হোক না কেন, যে-দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন রঘবীর সিং-এর দিকে, তা দেখে আমার মনে হলো, গঙ্গাদাসী যেন এখনও তাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। টুলীপ শুরু করলেন ;

'আচ্ছা চৌধুরী, শুনছি, আমাদের চাচা সাহেব ঠাকুর পরদুম্ন সিং সাহেব এবার বলে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন! শালা বেতমিজ! চোর! শালা ডাকাত আর ছিচকে চোরের সর্দার !... যখন এরা আমার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, সেদিন যদি আংরেজ সরকার এ বদমাশগুলোকে একেবারে খতম ক'রে দিতেন... তখন এই রাস্কেলগুলোর প্রতি সেই যে দয়া দেখিয়েছিলেন আংরেজ সরকার, তাতে আমার বাবার জীবনটাই কেমন তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। উধমপুরের মোহন চাঁদ, হুকুমপুরের শিবরাম সিং—এই সব

রাস্কেলরাই তো ছিল আমার চাচা শালার সঙ্গে···আমার বাবা তো অসময়ে মারাই গেলেন এর জন্যে।···'

হিজ হাইনেস ক্ষণকাল নীরব রইলেন। বাবার স্মৃতি মনে হওয়ায় যে এই নীরবতা, তা নয়, তিনি ওজন ক'রে দেখছিলেন রঘবীর সিং-এর মনে এর কি প্রতিক্রিয়া হলো এবং কি সহানুভূতি তিনি পেতে পারেন প্রধান সেনাধ্যক্ষের কাছ থেকে। রাজ্যের সকলেই জানে যে অতিরিক্ত দৈহিক অত্যাচারের জন্যেই বুড়ো রাজার দুর্বল শরীর রাজযক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় এবং তাতেই তিনি মারা যান। মহারাজার বক্তৃতায় রঘবীর সিং-এর মুখে কোন ভাব পরিবর্তনই হলো না। হিজ হাইনেস টেবিলের উপর বুড়ো আঙুল দিয়ে সজোরে টোকা মারতে মারতে আবার বললেন : 'আংরেজ সরকারের এই ব্যাপারে মাথা গলানো মোটেই উচিত হয় নি, এই দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া উচিত হয় নি, এ আমি বলব।'

হঠাৎ উদ্দীপনায় টেবিল ছেড়ে দ্রুত পদবিক্ষেপে মেঝেতে হাঁটতে হাঁটতে চেঁচিয়ে উঠলেন :

'রাজ্যের অভিজাতেরা তাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে আর তাদের প্রতি দয়া দেখাতে হবে রাজাকে! কি সুন্দর পরামর্শ দিয়েছিলেন আংরেজ প্রতিনিধি! এসব বদমাশদের উচিত শিক্ষা দেওয়াই উচিত ছিল।···এই দেখ না, তোমাকে সেনাপতি করেছি, তাতেও ও:দের কত কথা! কেন ওদের ছেলেদের কাউকে তোমার জায়গায় নেই নি!···শালারা এবার দশহরার দরবারে আসুক না, দেখব তখন!···'

এই সব ষড়যন্ত্রে প্রয়োজনমত ফোড়ন দেবার বাসনায় রঘবীর এবার যোগ দেয় :

'উহুঁ, দশহরার আগেই ব্যবস্থা করতে হবে।' মহারাজার আস্থায় পুনর্বাসন চাইছে রঘবীর, গম্ভীর ব্যাপার নিয়ে তাঁর মনে

যে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান চায় সে। নিজের মনের কথার কোন প্রকাশই সে হতে দেয় না; তবে আমার মনে হয়, সে এসব নিয়ে বিশেষ ভাবেই নি, বরং বলা যেতে পারে, তার অত ভাববার মতো ক্ষমতাই নেই।

দ্রুত পায়চারী করতে করতে চেঁচিয়ে বলেন হিজ হাইনেস: 'বলে দিচ্ছি রঘবীর তোমাকে, ঐ সব বলদদের আমার পথ থেকে হঠাবো এবার। আত্মীয়তার আর আভিজাত্যের মুখোশ এঁটে আমার দরবার সাজিয়ে বসে আছে যারা, অথচ আসলে যারা বিদ্রোহী, তাদের সবাইকে দূর ক'রে দেব! আমার প্রজাদের, আমার রায়তদের রাজভক্তির ওপর আমি আমার রাজ-শাসন দাঁড় করাবো। তবে হ্যাঁ, আমি দিল্লীর হস্তক্ষেপ সহ্য করব না। ইন্দিরা যদি তাঁর দরখাস্তটা তুলে নিত! আর ঐ প্রজামণ্ডল? ওদের দিকে কিছু টাকা ছুঁড়ে দিলেই হলো। মোদ্দা কথা হলো, ওরা যদি সত্যি সত্যি গান্ধীজীর অনুগামী হয়, তা হলে ওরা রামরাজ্যেও বিশ্বাসী। আমিও তো ঐ মতে বিশ্বাসী। রাজা আর প্রজার সম্পর্ক তো পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। আমি আবার প্রজাদের মধ্যে সেই বিশ্বাস পুনর্জীবিত করব, তাদের বিশ্বাস করাব যে, তাদের স্বার্থ রক্ষার কথা রাজা হিসেবে আমার হৃদয়ে সবসময়ই আছে। অন্যান্য রাজাদের মতো আমি নই যারা প্রজাদের ঘৃণা করে!...'

চমৎকার মনোহারী কথা বলে চলেছেন মহারাজা, কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যগর্ভ বক্তৃতা বিরক্তি উৎপাদন করে আমার মনে। আমি বলে ফেললাম:

'শত্রুর নীতি কিংবা তার রাজনীতির ওপর কড়া বক্তৃতায় দোষারোপ করলে কিন্তু তা প্রমাণ হয়ে গেল বলে কেউ ভাবে না টুলীপ।'

'কিন্তু হিজ হাইনেস তো রামরাজত্বের আদর্শ নিয়ে কথা বলছেন।' রঘবীর সিং মন্তব্য করে।

মহারাজা বলেন: 'বুঝলে না রঘবীর, ডাক্তার হলো ইংরেজ-ঘেঁষা লোক। আমাদের প্রাচীন ভারতের রাজা-প্রজার মধুর সম্পর্কের আদর্শ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, বোঝেও না।'

আমি বেশ বুঝতে পারছি হিজ হাইনেস সেনাপতি রঘবীর সিং-এর পূর্ণ আনুগত্য এবং বন্ধুত্ব কামনা করেই এত কথা বলে যাচ্ছেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করছেন, মনে হয়, ততই যেন এক অদৃশ্য ব্যবধান তাঁদের মধ্যে মুখব্যাদন ক'রে এসে দাঁড়াচ্ছে। গঙ্গীর ছায়া যেন দু'ভাইয়ের মধ্যে উঁকি মারছে, রঘবীরের সঙ্গে তার সেই আলিঙ্গনাবদ্ধ দৃশ্য মহারাজার এত কথা, এত বক্তৃতার জাল ফুঁড়ে মাথা উঁচিয়ে উঠছে। একটা অসহনীয় নীরবতা বিরাজ করতে থাকে কক্ষের মধ্যে। হিজ হাইনেস সইতে পারছেন এইনীরবতা। ঠোঁটের কোণে জোর ক'রে হাসি ফুটিয়ে তিনি আমায় মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন:

'ক্যাসিয়াস, দৃষ্টি কেন তব ক্ষীণ, কেন ক্ষুধার্ত তব আঁখি! কথা কও, কথা কও!'

'মনে হচ্ছে টুলীপ, আপনি রাজার ক্ষমতা আর সুবিধের ওপর অনেক কথা বলে গেলেন কিন্তু রাজার দায়িত্ব এবং তাঁর ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে কিছুই বললেন না।'

'আমি বুঝতে পারি না ডাক্তার, তুমি আমার বন্ধু, না, শত্রু!'

একটা দুর্বল হাসি ঠোঁটের উপর লেপটিয়ে দিয়ে আমি যোগ দিলাম: 'এই কিছুটা গণতন্ত্রী মানুষ আর কি!' আমার কণ্ঠের উল্টো-সুরের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমি সজাগ বলেই আমার এই দুর্বল হাসি।

'তোমার মতো মূর্খরা আর ঐ প্রজামণ্ডলওলারা কেবল গণতন্ত্র, গণতন্ত্র ক'রে চেঁচায়। গণতন্ত্র কথাটার কি অর্থ বলতে পার? কোথায়

গণতন্ত্র আছে, আর কোথায়ই বা গণতন্ত্র রক্ষা ক'রে কাজ হয় শুনি ?'
হিজ হাইনেসের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'কার সঙ্গে সমান হবে ?
ঐ বোকা বলদের দলের সঙ্গে নীচে নেমে এসে সমান হয়ে যাওয়ার
জন্যে কি চমৎকার কুকুরের চিৎকার! প্লেটোর 'রিপাবলিক' পড়েছ ?
তিনি তো দার্শনিক রাজর্ষির আদর্শের কথা বলেছেন। স্যার ম্যালকম
ডারলিং—ঐ যে যিনি পাঞ্জাবের অনেক উন্নতিমূলক কাজ করেছেন,
তিনি আমাকে প্লেটোর বইখানার একটা কপি উপহার দিয়ে উপদেশ
দিয়েছিলেন আমি যেন এই বইটার মূলকথা হৃদয়ঙ্গম করি।'

আমি মুখটি এঁটে চুপটি ক'রে বসে রইলাম। হিজ হাইনেস তা
দেখে আরও চটে গেলেন। তিনি বলতে থাকলেন: 'তবে হ্যাঁ, একটা
নতুন ব্যবস্থা থাকা দরকার। রাজ্যের বেশ ভাল ভাল লোকদের নিয়ে
একটা পরিষদ জাতীয় কোন ব্যবস্থা থাকা দরকার। মনু বলেছেন:
ইতিহাস, দেশের রীতিনীতি, দেব-দ্বিজে বিশ্বাসী জ্ঞানী ব্যক্তি যাঁরা
তাদের নিয়ে হবে এই—'

'দেবতা!' নম্র কণ্ঠে আমি কথাটা বললেও আমার কণ্ঠস্বরের
শ্লেষের খোঁচাটা চাপতে পারলাম না। এইসব প্রলাপ শুনতে হচ্ছে
বলে আমার আত্ম-সম্মানে ঘা লেগেছে। আমি বললাম: 'হ্যাঁ আমি
বুড়ো ভগবান বাবুর কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। অনেকদিন
তো ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। আপনার পরিবারের
তিনি হলেন একজন পুরোনো বিশ্বস্ত বন্ধু। আজকাল কিন্তু ভদ্রলোক
আপনাদের প্রতি সেরকম বিশ্বস্ততা দেখাচ্ছেন না। ভদ্রলোক তো
ঘরের কোণাতেই বসে আছেন, তিনি বেরিয়ে এলেই তো পারেন।
সত্যিই বিস্মিত হতে হয়—এ ভদ্রলোকের কিন্তু কোন পরিবর্তনই নেই!
কত মানুষ মরল, কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হলো, আমাদের
গ্রহ-নক্ষত্রগুলো পর্যন্ত বয়সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, আমাদের মা বসুমতী

বুড়িয়ে যাচ্ছেন, আর আমাদের ভগবান বাবু কিন্তু ঠিকই আছেন—সেই আদি অকৃত্রিম—কি এক অবোধ্য অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে ভদ্রলোক!…’

আমার কণ্ঠের তিক্ততা এত স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মুহূর্তে মনে হলো এবার আমায় শক্ত মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম হিজ হাইনেস হাসছেন। ক্ষণকাল পরে তিনি বললেন:

‘বুঝলে ডাক্তার, আমি যে একজন মনীষী ব্যক্তি, সে-কথাটার কেউই স্বীকৃতি দিতে চায় না! কিন্তু তোমার কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আমি আদায় করব। শুধু তুমি কেন, প্রত্যেককেই এ' স্বীকৃতি দিতে হবে। আমি যে কি ধাতুতে তৈরি, তা আমি দেখিয়ে দেব সবাইকে! আমি, আ-আমি হলাম…’

কথা তিনি শেষ করতে পারলেন না, শেষ কথাটি তাঁর তোত-লামিতে পরিণত হয়ে গেল। তাঁর অন্তরে যে দানব-নৃত্যের তা-থই চলেছে তার প্রকাশ মাত্র ঐ একটি কথায় এসে আটকিয়ে গেল। সেই একটি “আমি” কথাটার মধ্যে যে তাঁর খুব একটা আস্থা আছে তা নয়, কিন্তু ঐ কথাটি দিয়েই তিনি সব কিছু উঁচু ক'রে তুলে ধরতে চান। মনের তুফান প্রকাশের ভাষা না পেয়ে কুঞ্চিত ললাটে ঘর্মাক্ত কলেবরে মহারাজা নিজের একাকীত্ব যেন প্রতি পদে বুঝতে পারেন। তাই তিনি হঠাৎ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রঘবীর সিং-এর দিকে তাকিয়ে বলেন:

‘তা হলে এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর একটা মহলা করা যাক। ভারতের নিকটবর্তী কোন এক জায়গায় এই মহলা হবে, কেমন!’

রঘবীর সিং মাথা নেড়ে সায় দেয়।

এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পরমুহূর্তে নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। ক্ষণকাল নীরব থেকে মহারাজা চেয়ারের হেলানে শরীরটাকে টান ক'রে মেলে দিয়ে বলেন :

'আজ বিকেলে একবার পোলো খেলা যাক, কি বলো।'

'তা ভালই।' উত্তর দিল রঘবীর সিং।

'বেশ, যাবার পথে বুলচাঁদকে পাঠিয়ে দিয়ে যেও তো।' হিজ হাইনেস রঘবীরকে স্থান-ত্যাগের নির্দেশ জানালেন এইভাবে নম্র কায়দায়।

আমিও উঠলাম যাবার জন্যে।

মহারাজা ধৈর্যহারা কণ্ঠে বলে ওঠেন : 'তুমি চল্‌লে কোথায় ডাক্তার? তুমি তো জান আমার শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না।'

ক্ষীণ হাসি হেসে আমি আবার বসলাম।

শ্রুতিপথের বাইরে রঘবীর চলে গেলে হিজ হাইনেস ফিস ফিস ক'রে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন :

'ডাক্তার বলো দেখি, ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারি কি না?

'হ্যাঁ, পারেন বৈ কি।'

'গঙ্গীর প্রতি ওর আকর্ষণটা জানো তো। তা সত্ত্বেও তুমি বলছ?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় টুলীপ, আপনার প্রতি জেনারেল সাহেব সত্যিই বিশ্বস্ত।'

'কিন্তু আমি ঠিক আস্থা রাখতে পারছি না।...'

বুলচাঁদ এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

'ইন্দিরা কি বললে বুলচাঁদ?' এমন ভাবে মহারাজা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন, শুনে মনে হলো, তাঁর এই রাজনৈতিক পরামর্শদাতাকে কি সম্মানের দৃষ্টিতেই না তিনি দেখে থাকেন।

'আমার আশঙ্কা হয়, হিজ হাইনেস, যে ইন্দিরা মহারানী আমার সঙ্গে দেখাই করবেন না।'

হিজ হাইনেস চেঁচিয়ে ওঠেন : 'হুঁ, তোমার কাজের উত্তর হলো তবে : একটি "না," অর্থাৎ কিছুই করতে পার নি!'

বুলচাঁদ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। মহারাজা আবার ঘড়ঘড় শব্দে চেঁচিয়ে ওঠেন :

'একেবারে অকর্মার দল! পোপতলাল, পোপতলাল কি বললে?'

'আগামী কাল সকালে যেতে বলেছেন।'

'হাঁদারাম! হাঁদারাম!—যাও, আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও!'

অধোমুখে বুলচাঁদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

'ইন্দিরার কাছে আমাকেই যেতে হবে দেখছি।' নীচের ঠোঁটে বিরক্তি ফুটিয়ে হিজ হাইনেস বলেন।

'হ্যাঁ, বিকেলে একবার নিজেই ঘুরে আসুন না—' বললাম আমি।

'পোলো খেলার পর।...কোই হ্যায়। সই করবার জন্য কি কাগজপত্র আছে নিয়ে আসতে বলো তো শর্মাকে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি।

বিকেলে স্নানের টবের ঠাণ্ডা জলে নেমে সত্যিই বেশ আরাম অনুভব করলাম। সমস্ত দিনের দুশ্চিন্তা আমার দেহে-মনে যে কাঠিন্য এনে দিয়েছিল, তা এই টবে নামার সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে গেল। জলের মধ্যে সমস্ত দেহের মানচিত্রের উপর দিয়ে আমি আমার আঙুল বুলিয়ে নিলাম। এমন সময় ফ্রান্সিস এসে আমায় খবর দিলে যে মহারাজা বাহাদুর খবর পাঠিয়েছেন ডাক্তার সাহেব যেন তাঁর সঙ্গে পোলোর মাঠে দেখা করেন। স্নান সমাপনান্তে টার্কিশ তোয়ালেটা গায়ে

বুলিয়ে নিয়ে জামা কাপড় পরে ফ্রান্সিসকে বললাম চা আনতে। ফ্রান্সিসকে নিয়ে ইদানীং আমি বিরক্তই হয়েছি। লোকটা অলস, বোধ হয় শ্যামপুরের সব থেকে অলস সে। আমার জামার বোতাম থাকে না, সেদিকে তার এতটুকু নজর নেই। লোকটাকে সরিয়ে দিয়েই এসব সমস্যার সমাধান আমি ক'রে নিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের পটে ভেসে উঠল টুলীপ-গঙ্গীর চিত্র। টুলীপের জীবন থেকে কি গঙ্গীকে সরিয়ে দিলেই তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান হবে? হবে কি এই জমিদারী আর বুর্জোয়া সমাজের সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত শ্যামপুর রাজ্যের সমস্যার সমাধান? যদি পারতাম, যদি আমার ক্ষমতা থাকত, দিতাম এসব একেবারে ধ্বংস ক'রে যাতে সাধারণ লোক আবার নতুন ক'রে সবকিছু গড়ে তুলতে পারে।

ফ্রান্সিস চা নিয়ে এল। পেয়ালায় চা ঢালতে গিয়ে নীচের পিরিচে ঢেলে ফেলল চা। পিরিচে চা দেখলেই কেন যেন আমার ভারী বিশ্রী লাগে। কিন্তু আজ আমি মেজাজ হারলাম না। গাড়ীতে না চেপে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে আমি চললাম পোলো মাঠের দিকে।

শ্যামপুর বাজারের পাশ দিয়ে যাবার সময় বুঝলাম যে সকালে যেসব দোকান বন্ধ দেখেছিলাম, তার কারণ হলো হরতাল।

আমাকে হেঁটে যেতে দেখে ছায়া-ঘেরা বারান্দায় যে লোকগুলো বসেছিল, তারা ফিসফিস ক'রে কি যেন সব বলতে থাকে। এমন সময় দেখলাম দুটো টাঙা জোর-কদমে আমার দিকে ছুটে আসছে। তাড়াতাড়ি পাশের ফুটপাথে উঠে গিয়ে দেখলাম টাঙার মধ্যে রাইফেলধারী পুলিস বাহিনী। ঘোড়ার খুরে রাজপথের লাল ধুলো উড়তে উড়তে আমার নাকে-মুখে এসে লাগছে। কিছু বুঝতে পারার আগেই দেখলাম পুলিস বাহিনী দূরের বারান্দার হুকো-টানা লোকগুলোর মাথার ওপর

দিয়ে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে গুলি ছুঁড়ে দিল। কিছু কিছু লোক দাড়ি কামাচ্ছিল, কেউ কেউ দিবসের নিদ্রার পর রাস্তার কলে মুখ ধুচ্ছিল। গুলির শব্দে যে যেদিকে পারল ভয়ে আতঙ্কে দৌড়তে লাগল। একটা চিৎকার-ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস মুখরিত—যেন তারা সব মরতে বসেছে। কেউ কেউ বিমর্ষ মুখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চমূ বাহিনীর চলে যাবার পর আমি বহুদিন পর আবার উপলব্ধি করলাম শ্যামপুর রাজপথের সাধারণ পথচারী হওয়ার কি অর্থ। বুঝলাম, টুলীপ প্রজামণ্ডলের মুখোমুখী না হয়ে প্রজাসাধারণকে ভীতি-আশঙ্কার আবহাওয়ায় ডুবিয়ে রাখতে চাইছেন। সেই প্রয়োজনেই শান্তিপ্রিয় লোকের মনে ত্রাস স্থষ্টির জন্য আজের এই পুলিসী অভিযান এবং গত রাতের গ্রেফতার। হিজ হাইনেসের জীবন যা আমি জানি তার সঙ্গে এই ত্রাস-স্থষ্টির প্রচেষ্টার পেছনে যে মন কাজ করছে, তা বিচার ক'রে আমি বিস্মিতই হয়েছি। না চাইলেও হৃদয় আমার দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল, বিশ্রী ধরণের ক্রোধ আমাকে পেয়ে বসল আমার অক্ষমতার জন্য, সব কিছু বুঝেও এই ঘূর্ণি থেকে বেরোবার পথ নেই দেখে একটা অখুশি ভাব আমার মন-মেজাজ খারাপ ক'রে দিল। কিং জর্জ পার্কের পাশ দিয়ে কার্জন রোড ধরে দুশ্চিন্তিত মনে আমি চলেছি পোলো মাঠের দিকে। কার্জন পার্কের সরোবরের কাকচক্ষু জলে মরালের কম্পমান ছায়া দেখে আমি হৃষ্টমনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কি সুন্দর গ্রীবা জলের তালে তালে নাচছে। বেশিক্ষণ এই সৌন্দর্য দাঁড়িয়ে দেখতে পারলাম না। হঠাৎ মহারাজার কথা মনে পড়ে গেল। খেলা শেষ হবার পর আমাকে দেখতে না পেলে মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন তিনি। টেনিস লনের নীল ঢাকনির পাশ কাটিয়ে আমি কিছুটা এগিয়েছি মাত্র, এমন সময় আমার নজরে পড়ল একদল পুলিস বাহিনী। তারা দৌড়ে এল

আমার দিকে। এসেই হাঁক দিয়ে বলল : 'হেই, এপথে যাওয়া নিষেধ!' আমি হলাম মহারাজা বাহাদুরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। আমার প্রতি এই অপমানসূচক ব্যবহারে আমি বিরক্তির সঙ্গে তাদের কথা কানে না তুলেই এগোলাম। মুহূর্তে রক্তবর্ণ চোখে পুলিসের দল আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেশ কয়েকটা কিল ঘুসি পড়ল আমার দেহে। পুলিসের লাঠিখানা ধরে আমি যখন সংগ্রামরত, এমন সময় পোলো-মাঠের প্রধান খানসামা অনেকটা দূর থেকে আমায় ঐ অবস্থায় দেখে ছুটে এল। আমার টুপিটা মাটিতে পড়ে গিয়েছে। সে তখন চেঁচিয়ে পুলিসদের বীরত্ব দেখানো বন্ধ করল। আমার পরিচয় যখন জানতে পারল পুলিসরা তখন বারে বারে ক্ষমা চেয়ে কাতর প্রার্থনা করতে লাগল। আর আমার মনে তখন এক সমস্যা জেগেছে, কি ভাবে আমার এই বিবর্ণ চেহারা নিয়ে হিজ হাইনেসের সামনে দাঁড়াব। আমার দেহে যদিও কোন জখমের চিহ্ন নেই, তবুও এই অপমানবোধ আমার চেহারায় ছাপ ফেলেছে। বিরক্তি সহকারে পুলিসদের হটিয়ে দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম পোলো-মাঠের তাঁবুর দিকে।

খেলা-শেষের পরে মহারাজা, রঘবীর সিং এবং অন্যান্য হোমরা-চোমরা লোকেরা সব পানপর্বে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ঠিক সেই সময়ে আমার প্রবেশ। আমায় দেখে হিজ হাইনেস চেঁচিয়ে উঠলেন : 'হ্যালো, মিস্টার লেট লতিফ! তা এত শুকনো লাগছে কেন তোমায় ডাক্তার, মনে হচ্ছে যেন তোমার মা মারা গিয়েছে।···আচ্ছা, এক গ্লাস টেনে নাও তো, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই কোন হ্যায়, ডাক্তার সাবকে এক গ্লাস—'

ভগীরথ আমাকে যে পূর্ণপাত্র শ্যামপেন দিল, আমি সাগ্রহে তা গ্রহণ করলাম। এতে অন্ততঃ আমার স্নায়ুর ওপর যে ঝড় বয়ে গিয়েছে, তা পুনর্জীবিত হবে। আমার হৃত সম্মান আবার আমার

মনে আসন বিস্তার করতে পারবে। কিন্তু অন্তরে আমি সত্যিই মুষড়িয়ে পড়েছি কারণ আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই সব শ্যামপেন পোলো, এই জাকজমক—সব কিছু হলো এক শূন্যগর্ভ জিনিসের ওপরের কারুকার্য-খচিত আবরণ মাত্র। বাস্তবতার মুষলাঘাতে এই সব লোকদেখানো সুদৃশ্য ক্ষণভঙ্গুর জাফরি চুরচুর হ'য়ে ভেঙে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে।...

মাতাল সাথীদের সঙ্গ থেকে আলাদা ক'রে নিয়ে আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম ইন্দিরা মহারানীর ওখানে যাবার কথা। খুব সহজ কাজ নয় এই তোষামোদের জাল সরিয়ে মহারাজাকে নিয়ে বেরিয়ে আসা। রাজা সংসারচাঁদ বলে এক যুবক জমিদার বারে বারে টুলীপকে অনুরোধ করছে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে রাত্রে আহার গ্রহণ ক'রে তাদের আপ্যায়িত করতে। এসব অনুরোধ-উপরোধ কাটিয়ে বেরোন খুব সহজ সাধ্য কাজ নয়। যাই হোক, অবশেষে রোলস্‌রয়েসে চেপে আমরা চললাম শ্যামপুর দুর্গ প্রাসাদের দিকে। আমরা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের চারিদিকে মহারাজার আগমন-বার্তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাজমাতা আর বড়রানী গিয়েছেন কালী-মন্দিরে পুজো দিতে। কিন্তু মহারাজার প্রয়োজন ইন্দিরা দেবীকে। দিল্লীর দরবার থেকে তাঁর দরখাস্তখানা তুলে আনাতে হবে, এবং সেইজন্যেই মহারাজার আগমন। খবর পেয়ে ইন্দিরা মহারানী এসে উপস্থিত হলেন টুলীপের সামনে। রাজকাজের অত্যধিক চাপের জন্য মহারাজা এতদিন দেখা করতে আসতে পারেন নি। বার ঘণ্টা চোদ্দ ঘণ্টা তাঁকে কাজ করতে হয়! এ তো আর মেয়েদের ঘর-সংসারের কাজ নয়! ইন্দিরার পরনে সাদা সুতির শাড়ী। ভারী সুন্দর লাগছিল তাঁকে দেখতে, যেন কুমোরের খোদাই করা প্রতিমা, একটা চাপা দুঃখের ক্ষীণ রেখা যেন একটু দেখা যায় তাঁর চোখের নীচে।

মহারাজার কথা শুনে একটা স্মিত হাসি খেলে গেল বুদ্ধিমতী মেয়েটির ঠোঁটের ওপর দিয়ে। বললেন তিনি : 'বার-চোদ্দ ঘণ্টা কাজ!'

'হুঁ, হুঁ। এ তো আর বিলাসী মেয়েদের কাজ নয়। এ তুমি বুঝবে না যে আমার কাজ কখনও বন্ধ হয় না।' একটা ধৈর্যহীনতার স্বর ফুটে ওঠে হিজ হাইনেসের কথায়।

'হ্যাঁ, পোলো খেলাটাও তো রাজকাজ বটে!' একটু হেসে ইন্দিরা বলেন।

'বটেই তো। বাইরের খেলোয়ারদের সঙ্গে আমার শ্যামপুরের টিমকে জেতানো তো রাজকাজেরই অঙ্গ।'

'বাঃ, বাঃ বেশ বলেছেন টুলীপ!' আমি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না।

সেই মুহূর্তে পাশের ঘর থেকে একটা শিশুর কাকলীকণ্ঠ বলে উঠল : 'মা, ওমা, ঐ যে এসেছেন, উনি বুঝি আমার বাবা! আমার মোটেই ঘুম পাচ্ছে না মা, আমি একটু আসব?'

'আমার কাজও কিন্তু কখনও শেষ হয় না—' বলতে বলতে বালক পুত্রের ঘরের দিকে গেলেন ইন্দিরা দেবী। তাঁর বাঁকা ঠোঁটের কোণে একটা ক্ষীণ চাপা হাসি।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই বালক এক দৌড়ে এসে হাজির হলো। সুন্দর সাদা পা'জামা আর পাঞ্জাবী পরনে তার, খালি পায়ে দৌড়ে এসে দাঁড়াল সে চৌকাঠের ওপর। পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল টুলীপের কোলে। দেখলাম পিতার হৃদয়ে স্নেহ উছলে উঠল, টুলীপ ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন চাকর-বাকররা কেউ দেখে আবার গঙ্গীকে গিয়ে না বলে ইন্দিরা ও তার ছেলের সঙ্গে তাঁর এই মাখামাখির কথা। কিন্তু পিতৃস্নেহ মাথা উঁচিয়ে উঠল, গঙ্গী-ভীতিকে সরিয়ে দিয়ে টুলীপ

রাজপুত্রের মাথায় আস্তে আস্তে হাত দিয়ে স্নেহস্পর্শ করতে লাগলেন। 'দেখি দেখি, তোর সুন্দর মুখখানা দেখি—' টুলীপ বললেন।

পিতার এই স্নেহবাক্যে পুত্র বাবার কোলে আরও জোরে মাথা চেপে রাখে। পিতার এ স্নেহ-ভালোবাসা থেকে সে তো একেবারে বঞ্চিত। ইন্দিরা ছেলেকে বলেন :

'কি রে দুষ্টু, বাবাকে লজ্জা! এই না কেবল বলিস বাবার কাছে যাবো, বাবার কাছে যাবো! এই তো তোর বাবা এসেছেন। নে, এবার কথা বল— !'

এ কথায় টুলীপ কিন্তু বিরক্ত হন, কারণ নিজের দোষ সম্বন্ধে তিনি যেন সজাগ হয়ে উঠতে থাকেন। ছেলের মুখখানা দু'হাতে তুলবার চেষ্টা করেন। বালক আরও জোরে মাথা গুঁজতে চায় তার বাবার কোলে। আর টুলীপ জোর ক'রে সে-মাথা তুলে ধরতে চান। ছেলের মাথা তিনি তুলে ধরলেন বটে, কিন্তু এই জোর ক'রে তোলার মধ্য দিয়ে তাঁর মুখের চোয়াল চাপ পড়ে শক্ত হয়ে ওঠে, শক্ত হয়ে যায় তাঁর মনও। পুত্রের দু'চোখে জলের ধারা। আনন্দাশ্রুর ধারা বইছে ইন্দিরা দেবীর গাল বেয়ে।

টুলীপ চেঁচিয়ে বলেন :

'অত কাঁদবি না। পুরুষ মানুষ না তুই !'

ইন্দিরা দেবী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পুত্রকে দু'বাহু দিয়ে আড়াল ক'রে কোলে টেনে নিলেন। টুলীপ আবার আরও কঠিন না হয়ে যান পুত্রের প্রতি।

এবার মহারাজা উঠতে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন ইন্দিরা দেবী। সিঁড়ির কাছে এসে মুখটি নীচু ক'রে তিনি বললেন ইন্দিরা দেবীকে :

'তোমার কাছে কিন্তু একটা কাজ নিয়েই এসেছিলাম। মন-মেজাজে আমার সঙ্গে তোমার ঠিক মিল নেই এটা আমি বুঝি এবং সেইজন্যেই

একই বাড়ীতে একসঙ্গে আমরা থাকতে পারছি না। কিন্তু তোমার প্রতি আমার বন্ধুত্ব তুলনাহীন। ছেলে যাতে অন্ততঃ আমাদের মধ্যের মন-কষাকষিটা না বুঝতে পারে তার দিকে আমাদের খেয়াল রাখা দরকার।...(কি ভাবে যে কথাটা বলি!)...হ্যাঁ, তোমার উপযুক্ত আমি নই, তা আমি জানি ইন্দিরা। তবে চারদিকের আমাদের মন-ভাঙার এত ব্যবস্থার মধ্যেও আমরা বোধহয় নিজেদের কিছুটা বুঝবার চেষ্টা করতে পারি। এবং আমরা হয়তো আবার একসঙ্গে মিলেও যেতে পারি ইন্দিরা। তোমার প্রয়োজনের যাবতীয় খরচ, সুখসুবিধা-আরাম সব কিছুর ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব। জানি না, আমি বদলাতে পারব কিনা, কিন্তু সত্যিই আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আমি বেশ বুঝি যে, আমাদের এ অবস্থা কোনমতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গিয়েছে, না! আর আমাদের বিয়েও—হ্যাঁ, আমি না মেনে চলবার চেষ্টা করেছি সব সময়—আমি হলাম দুর্বল আর তুমি হলে শক্তিরূপিণী। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা কথা আমি বলব, বিশ্বাস করো, সত্যিই আমি খারাপ নই ইন্দিরা—'

টুলীপের কণ্ঠস্বরে যে আবেগ ফুটে উঠল তাতে আমার মনে হলো সত্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে তিনি বোধ হয় সত্যি সত্যিই যে শৃঙ্খলতাহীনতার ঘৃণার দহে ডুবে আছেন গত কয়েকমাস হলো তার বিরুদ্ধে লড়তে চাইছেন। একটা চাপা আবেগের ছোপ পড়েছে তাঁর মুখে। এবং সেই আবেগ ইন্দিরা দেবীর মুখেও প্রতিচ্ছায়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। একটা নরম ছায়া পড়েছে তাঁর শান্তশ্রী স্তব্ধবাক মুখাবয়বে আর সজল আঁখির মাঝে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর অন্তরানুভূতি থর থর ক'রে কাঁপছে। কিন্তু ইন্দিরা পোড়খাওয়া মেয়ে। স্বামীর মনোভাবে তিনি সত্যিই আলোড়িত হয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর গর্বোদ্ধত অনুভূতির দেয়াল, যা ঘা খেয়ে খেয়ে

প্রস্তর-কঠিন হয়ে গড়ে উঠেছে বছরের পর বছর ধরে, তা ইন্দিরার নরম বিগলিত মনের বাসনার আঘাতে একটুও নড়ল না। ধীর কণ্ঠে বললেন ইন্দিরা দেবী :

'কি চাও তুমি আমার কাছে ?'

'দিল্লীর ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের বিরুদ্ধে আমার সংগ্রামে আমি চাই তোমাকে আমার সঙ্গে।'

মনে হলো ইন্দিরা মহারানীর দু'চোখের বাঁধ এবার বুঝি ভেঙে ভেসেই গেল। তিনি বলে উঠলেন : 'কোনদিন তো তুমি আমার খোঁজ নাও নি ; দিনের পর দিন কি মনকষ্টেই না আমি কাটাচ্ছি। প্রতিদিন দুঃখের আঘাতে আমার হৃদয়-মন ভেঙে গেছে। আজ কি আছে আমার যে দেব তোমাকে—'

'সত্যি আমি দুঃখিত, ইন্দিরা।'

ইন্দিরার 'আমি' বোধহয় এবার ভেঙে পড়ল। ধীরে মাথাটা নুইয়ে তিনি রাখলেন টুকোজীপের বুকে।

টুকোজীপ একটা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ঠিক ক'রে নেবার চেষ্টা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরার মাথায় হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। মুহূর্তকাল পরে ধীর কণ্ঠে হিজ হাইনেস বললেন :

'ইন্দিরা, দিল্লীর বিরুদ্ধে আমার লড়াই। লড়াই আমার তোমার দু'জনেরই ; তোমার দরখাস্তটা এবার তুলে নিতে হয়।'

প্রিয়পরশে অভিভূত হয়ে থাকার মুহূর্তে টুকোজীপ তাঁর কথাটা বললেন।

'যা তুমি চাইবে তাই আমি করবো।' ক্ষণকাল নীরব থেকে ইন্দিরা দেবী তাঁর কথার শেষে যোগ দিলেন : 'হ্যাঁ, ভেবে দেখব।' মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালেন মহারানী, এভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক হবে না, বোধ হয় বুঝতে পারেন ইন্দিরা দেবী। নিজেকে

স্বামীর বক্ষলগ্ন থেকে বিমুক্ত ক'রে নেন। হ্যাঁ, গঙ্গীর কথায় টুলীপের আবার তাঁকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে কতক্ষণ!

তাই এ দৃশ্যের নীরব দর্শক হয়ে আমি এক অজানা শঙ্কায় মুহূর্ত গুনছি। আমার মনের ভীতি-শঙ্কা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকে চেপে আমি দুরু দুরু বক্ষে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখছি।

স্ত্রীর দিকে ফিরে টুলীপ বললেন: 'ঠিক, ঠিক। সত্যিই তো, নিজেকে রক্ষা করেই তোমাকে চলতে হবে। আমার ওপর আস্থা রাখবার মতো কি আমি দিয়েছি তোমাকে? কেন আমায় বিশ্বাস করবে তুমি? লোকটা তো আমি ভাল নই। তুমি ঠিকই করেছ ইন্দিরা, আমাকে বিশ্বাস না ক'রে ঠিকই করেছ।'

'চুপ, চুপ টুলীপ, আমি আর পারছি না—' বড় বড় বাঁধ-ভাঙা চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ইন্দিরা দেবীর। টুলীপের প্রতি ভালোবাসা-সহানুভূতির বন্যাও তো হলো তাঁর চোখের এই জল। আজ তাঁর কাছে এসে স্বামীর এই যে দীনভাবে দাঁড়ান, তার জন্য মনের উৎফুল্লতা আর সেই সঙ্গে নিজের মনের বুক-ভাঙা দুঃখ এত তীব্র আকারে দেখা দিল যে, ইন্দিরা দেবী আর পারলেন না ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। ভীত প্রাণীর মতো তিনি দৌড়ে উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

এ সংগ্রামে শূন্য হাতে ফিরে আসা ছাড়া উপায় নেই। আমি বেশ জানি, টুলীপ যে যান্ত্রিকভাবে হৃদয়ের এসব সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়ান, সে সমাধান কখনই এত সহজে সম্ভব নয়।

:

রাত প্রায় দেড়টা। টুলীপ পায়চারি করতে করতে আমার কক্ষের বারান্দার পাশে এসে কণ্ঠে আমার প্রতি কৃত্রিম মর্যাদা ফুটিয়ে ডাকলেন: 'ডাক্তার সাহেব কি ঘুমোলেন নাকি?'

'না না, আসুন আসুন, ঘুমোইনি এখনও।' রাত্রির প্রথম তন্দ্রা থেকে হকচকিয়ে উঠে মিথ্যা জবাব দিতে দিতে টেবল-ল্যাম্পের সুইচটা টিপে দিলাম। অকারণ আতঙ্কে ব্যস্ত হয়ে আবার বললাম: 'আসুন আসুন, হিজ হাইনেস।'

টুলীপের পরনে কালো রেশমী পাজামা। তাঁর বিবর্ণ মুখখানা নিয়ে তিনি আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন, তাঁকে দেখে আমার কল্পনার মেফিস্টোফেলিস আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল।

'জানো ডাক্তার, আজ রাতে গঙ্গী খেতে আসেনি, কোথায় যে আছে তাও জানিনে। শুনলাম দুপুরে খেয়েছে শেঠ সদানন্দের স্ত্রীর ওখানে, তার পর ফিরে এসেছিল, আবার সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে কিচ্ছু ব'লে যায়নি…'

কোথায় গিয়েছে, তা আমি বেশ আন্দাজ করতে পারছিলাম। তবে টুলীপকে ভাঁওতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তাঁকে আসন গ্রহণ ক'রে মদের গেলাসে আমন্ত্রণ জানালাম।

'বেশ, বেশ,' স্ফুর্তির স্বর হিজ হাইনেসের কণ্ঠে, তিনি যে ইতিপূর্বেই টেনে এসেছেন, তা বেশ বুঝতে পারলাম।

'কফি—?'

'কফি! মাইরী—! কী যে বলছ।' বলেই একটা চলতি হিন্দুস্থানী কবিতা আওড়ালেন: 'সাকি, দাও গো মোরে, পেয়ালা ভরে…'

'ফ্রান্সিস!' আমি জোর গলায় ডাকলাম। কিন্তু কোন উত্তরই এল না। আমার বন্ধু, দার্শনিক, আমার জীবন-পথের পথ-প্রদর্শক ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই তার অতি প্রয়োজনীয় নৈশ-বিশ্রাম উপভোগ করছে।

'আচ্ছা, আমি নিজেই আনছি। জানি কোথায় ওগুলো রেখেছে।' উঠে দাঁড়িয়ে আমি গেলাম বোতল আর গেলাস আনতে।

ডান হাতখানা চিবুকের নীচে রেখে উদাস নয়নে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন হিজ হাইনেস। ফিরে এসে বললাম :

'বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন টুলীপ—' হুইস্কীর গেলাসটা তাঁর হাতে তুলে দিতে দিতে আমি প্রশ্ন করলাম।

'একেবারে নগ্ন ক'রে ফেলে এই সব মেয়েরা, কিছুই গোপন থাকে না তাদের কাছে—' কথাটা শেষ করেন না হাইনেস।

'জ্বালা-যন্ত্রনা, অনুশোচনা আর অপরাধ—জন্ম থেকেই তো এসব চলেছে আমাদের জীবনে—' দার্শনিকের ভঙ্গিতে আমি বললাম।

'যে-ভাবেই এগুলো আসুক না কেন ডাক্তার, এসব আমাদের ঠেলে নিয়ে যায় দুঃখের দিকে। মোদ্দা কথা হলো দুঃখ পাওয়া।'

আমি নীরব রইলাম। আমার নির্লিপ্ততায় অধীর হয়ে ওঠেন টুলীপ, তাই আবার বলেন : 'আসল কথা হলো, মানুষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে।'

'অত্যুগ্র কামোন্মদনা আর পরমুহূর্তে এ সবকিছুই অনিত্য—এই দুইটি বোধের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এটাকে বলা যেতে পারে অহম্ বোধের ক্রমিক প্রকাশ।' অর্ধ-বিদ্রূপচ্ছলে আমি মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় কথাটা বললাম।

'আমার ভেতরে এটি হলো অতীতের অনুশোচনা, খুব সম্ভব এগুলোই আমার অন্তরকে অহরহ পীড়ন করছে।'

'তাহলে কি হাইনেস পুরোনো প্রেমপত্র-টত্র পড়ছেন নাকি ?'

'তা নয়। তবে আজ সন্ধ্যায় ইন্দিরাকে দেখে, ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর প্রথম দিনগুলোর স্মৃতি আমার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বি. এ. পাশ করা সত্ত্বেও ইন্দিরা ছিল যাকে বলে পুরোদস্তুর হিন্দু স্ত্রী। বিশেষ ক'রে আমি যখন অসুখে ভুগি, তখন ও-ই আমার দেখাশুনো করতো। আর যাই হোক, ও আমার দুটি ছেলের মা।

আর তা ছাড়া, ইন্দিরার রসিক মনটার কথা মনে হলেই আমি সত্যিই বিস্মিত হয়ে যাই।' মেয়েদের সম্বন্ধে টুলীপের ছিল যাকে বলে বিশ্ব-জোড়া নারী-প্রেম ; কাজেই একদিন যে তিনি একনিষ্ঠ প্রেমিক ছিলেন, এবং সেকথা যে তিনি এ ভাবে বলবেন, তা কিন্তু আমি ঠিক আশা করি নি। একথা ঠিক যে, সতী-সাধ্বী হিন্দু স্ত্রীর ভাব-ধারণা সম্বন্ধে বংশানুক্রমিক দৃঢ় বিশ্বাসের দরুন তাঁর পক্ষে অল্প কিছুদিনের জন্য এই ধরণের গৃহধর্মানুরাগী হওয়া সম্ভব হয়েছিল ; আর সেই প্রথম কয়েক মাস তিনি ইন্দিররার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাসও করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে এই যে অনুতাপের সুর বেজে উঠছে, খুব সম্ভব, গঙ্গী যে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে এই আশঙ্কাই তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

'জান ডাক্তার,' হিজ হাইনেস আবার বলতে শুরু করেন : 'ইন্দিরার প্রতি আমি এতখানি আসক্ত ছিলাম যে অন্য মেয়েদের ও হিংসার চোখে না দেখা পর্যন্ত আমার সমস্ত কাজকর্ম এবং আমার যা-কিছু ছিল তার সবকিছুর মধ্যেই ওকে আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলেই মনে করতাম। আমি অনুভব করতাম, যেন ওর আর আমার একই অন্তরাত্মা, আমার যা কিছু দোষ-ত্রুটি, আমার সব গোপন কথা ওর কাছে ব্যক্ত করতে পারি। নিশীথ রাত্রি পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে আমরা নিজেদের জীবন সম্বন্ধে কত কথা, কত আলোচনাই না করেছি। ও মন খুলে বলতো আমাকে ওর বাপের বাড়ির কথা, বলতো ওর বালিকা-বয়সের বন্ধুবান্ধবদের কথা। আমিও ওর কাছে আমার কামনা-বাসনা, এমনকি নিতান্ত বেয়াড়া ধরনের আকাঙ্খা-গুলোও ব্যক্ত করেছি। আমার মনে হতো, আমার সমস্ত দোষ-গুণ দিয়ে যতদিন আমি ওর কাছে আমার দেহ-মন সমর্পণ ক'রে চলব ততদিন নিশ্চয়ই স্নেহময়ী জননীর মতো ও আমাকে বুঝতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, অত ভালো মেয়ে কি আমার সয়!

ও হলো খাঁটি মেয়ে, ও সইতে পারত না আমার অন্য মেয়ের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানো, ও রাগ করত। এমনি করেই আস্তে আস্তে সব কিছুতেই আমার দোষ-ত্রুটি ওর চোখে বড় হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু আমি তো নির্দোষী নই। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে, ওর চোখে চোখে তাকাতে কিংবা ওকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসতে গিয়ে আমি কেন যেন বিষম লজ্জানুভব করতে আরম্ভ করলাম। ইন্দিরা যদি অতখানি খিচখিচ না করত, যদি একটু মানিয়ে নিতে পারত, তা হ'লে আমাদের পরস্পরের সম্পর্কের আজ এ পরিণতি কখনই হতো না। ওর অবিশ্বাস এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছল যে ও আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্য ঝি-চাকরদের লেলিয়ে দিল। আমি পারলাম না এ-অবস্থা বরদাস্ত করতে। এভাবে চোরের মতন জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব নয়। কাজেই মনে মনে ওর কাছ থেকে সরে আসতে বাধ্য হলাম; এবং ঠিক এই সময়েই গঙ্গী এল আমার জীবনে। এবং বলতে কি ডাক্তার, গঙ্গীকে পেয়ে আমি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেলাম। কারণ সে-ও ছিল আমারই মতো অধম, আর আমরা দু'জনে দুই অধমের মিলনে একটা সুন্দর জীবন যাপন করতে সক্ষম হ'বো, অধমের দাম্পত্য-জীবন গড়ে তুলতে পারব এই ধারণা আমাদের পেয়ে বসল।'

'হুঁ, যে পর্যন্ত না গঙ্গী প্রভুত্ব প্রয়াসী হয়ে উঠল।'

'ঠিকই বলেছ ডাক্তার, এবং আরও নিম্নস্তরের। কারণ, গঙ্গী নিজের বদ্ অভ্যাসগুলো ষোল আনা বজায় রাখবে আর আমি তার বিশ্বস্ত প্রণয়ী সেজে বসে থাকবো—এই চায় গঙ্গী। তার পর আছে তার সেই চাওয়া,—তাকে বিয়ে করতে হবে, তার দু'ছেলেকে সমাজে বৈধ স্থান দিতে হবে। কল্প সরকার কেন তাতে রাজী হবে? আর তার ওপর আছে টাকাপয়সা গয়নার প্রতি গঙ্গীর অদ্ভুত লোভ।'

'সত্যিই টুলীপ!' সহানুভূতি দেখাতে চেয়েই আমি বললাম, কিন্তু আমার কণ্ঠে ফুটে উঠল স্নেহের ক্ষীণ স্বর: 'আপনার মতো এমন মহানুভব লোকের নারীর হাতে এই নির্যাতন সত্যিই দুঃখের!'

'আমি যে দুর্বল তা আমি জানি ডাক্তার। আমি ওদের হাতে মোমের পুতুল। ওরা আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে।'

'আমার মনে হয়, হাইনেস, যদি আপনার মধ্যে পরাজয়ের মনোভাবের পরিবর্তে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলে এই দৌর্বল্যের সৃষ্টি হতো তা হ'লে এক পক্ষে কিন্তু এ ভালই হতো। আমি জানি আমার একথা আপনি স্বীকার করতে চাইবেন না। আমার মনে হয় আপনার চরিত্রে এই খানেই যত গোলমালের মূল। আপনি নিজে চান এই দ্বন্দ্ব, আর আপনার জীবনে যেসব মেয়েরা এসেছে তারাও তাই চায়,—এবং সাধারণতঃ মেয়েরা তাই চেয়ে থাকে,—আর তারই পরিণতিতে আপনারা দু'পক্ষই দুর্ভোগ ভোগ করেন। এবং এই ভোগান্তি কি শুধু আপনাদের নিজেদের, আপনাদের ধারে-কাছে যারা থাকে তারাও এর চাবুকাঘাত পেয়ে থাকে।'

'তোমার ওসব কথার মার-প্যাচ আমি বুঝতে পারি না, ডাক্তার।'

এবার আমি একটু অধৈর্যই হলাম। যেমন করেই হোক, আজ এই নিশীৎ-রাত্রে আমি যেন এই মানুষটাকে অনেকটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছি।

'নিজেকে আপনি যতটা দুর্বল মনে করেন, ততখানি দুর্বল আপনি নন, টুলীপ,' সত্যের সঙ্গে কিছুটা তোষামোদ মিশিয়ে আমি বললাম: 'এই গ্রন্থি-জালে যারা জড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কম স্নায়ু-দুর্বল লোক হচ্ছেন আপনি। তা না হ'লে, আপনি কখনই আমার কাছে নিজের কথা এভাবে প্রকাশ করতে পারতেন না, এবং আমাকেও

সব সময় এভাবে আপনার পাশে পেতেন না। এটুকু বুঝতে পারছি যে, আপনি অন্ততঃ আপনার সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন। আপনার কামনা-বাসনাগুলোই হচ্ছে আপনার যত অনর্থের মূল। আর এইগুলো আপনার একেবারে মজ্জাগত। ইন্দিরা মহারানীকেও শক্ত মেয়ে বলতে হবে, কারণ তিনি স্বেচ্ছায় নিজের নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছেন এবং আপনাকে উপেক্ষা করার মতো সাহসও তাঁর আছে। সত্যিই, একমাত্র অপদার্থ হচ্ছে আপনার মক্ষীরানী ; শুধুমাত্র অসহায়া মেয়েই নয়, অন্য অর্থে এ-মেয়ে শক্তিধারিণীও বটে, কিন্তু তার গতি ধ্বংসের দিকে। আর তার কামনা-বাসনার যেন আর শেষ নেই, যেমন নেই তার অজ্ঞানতার কোন সীমা।'

'কথা বলছো যেন ত্রিকালদর্শী ঋষির মতো, ডাক্তার! কিন্তু আমি যে জড়িয়ে পড়েছি জালে! বলতে পার মানুষ কেন বিয়ে করে, আর কেনই বা পুরুষের নারীর প্রতি এই আসক্তি ?'

'আপনাকে বিয়ে করতে হয়েছে ঠিকই। প্রত্যেককেই বিয়ে করতে হয়। কাট-খোট্টা সাধু-সন্ন্যাসীরাই শুধু বিয়ের বিরোধী, কারণ তাদের ধারণা বিবাহিত নর-নারীরা একত্র জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে নোংরামির সাগরে অবগাহন করে। বুঝলেন টুলীপ, বন্ধনহীন ব'লে কোন কিছুই নেই এ সংসারে ; তবে বিকৃতমনা যে, তার কথা অবশ্য আলাদা। যে লোকের মন ভাঙা, কোন কিছুতেই তার তেমন স্থায়ী আসক্তি থাকে না, পাত্র থেকে পাত্রান্তরে সে ছুটে বেড়ায়, দিবা স্বপ্নে সে বিভোর হ'য়ে থাকে, বাস্তব জগতে যার কোন নিশানাই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বাভাবিক বিবাহিত-জীবনে সাধারণ জীবনটা দৈনন্দিন জীবনের খুঁটি-নাটিগুলো অতিক্রম ক'রে উন্নত ধরনের উদ্দেশ্যের কোঠায় রূপান্তরিত হয় ; নর ও নারী উভয়েরই মনের কোণে এই বাসনাই থাকে। তারা তখন এই উন্নততর ব্যক্তিত্বের দর্পণে নিজেদের

প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। এই উন্নততর ব্যক্তিত্বের কোঠায় পৌঁছোবার জন্য মানুষ সবসময়েই সচেষ্ট।'

'তা হলে পরিত্রাণ নেই, তাই না ডাক্তার?' টুলীপ ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

'না, আমরা সকলেই অবস্থার দাসানুদাস।'

'তাহ'লে বুদ্ধদেবের অনাসক্তির আদর্শটা কি?'

'সে তো একটা আদর্শ মাত্র। কিন্তু বৌদ্ধমত যেখানে সফল হয় নি, হিন্দুমত সেখানে সাফল্যের অধিকারী হয়েছে, কারণ মানুষের দৌর্বল্যের কিছুটা স্বীকৃতি এ-মত মেনে নিয়েছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন: "কর্মেই তোমার অধিকার।" কিন্তু গান্ধীজী আদিম পাপের ধ্যান-ধারণা সংক্রান্ত য়ুরোপীয় খৃষ্টমত আমদানি ক'রে ভারতীয় আত্মায় অপরাধবোধ সংযোজিত করেছেন আর সেই সঙ্গে জীবনধর্ম-বিরোধী প্রাচীন ভারতীয় সন্ন্যাসব্রত ও যৌন-সঙ্গম পরিহারের উপর বিশেষ জোর দিয়ে আমাদের মনে কিছুটা বিভ্রমের সৃষ্টি করেছেন। তিনি মদ্যপান বর্জন, কৃচ্ছ্রসাধন, উপবাস ও প্রার্থনার মহিমা প্রচার করেছেন। পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মমতানুসারে মানব-জীবন হ'লো দেহ-ভিত্তিক: সত্য ও বাস্তবতার মধ্যে ভগবানও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অসীম ব্রহ্মের মন ও আত্মার ভেতরে এই বিশ্বজগৎ হ'লো একটা লীলা বিশেষ। একমেব অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের হৃদয়ে বাসনার উদ্রেক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহুমুখী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ শুরু হয়, আর তখন বস্তুটাকে ভেঙে ফেলে তার মধ্যে মিশে যাওয়ার জন্য মানুষের মনে নিরবচ্ছিন্ন বাসনার সৃষ্টি হয়। কাজেই বাসনা হচ্ছে প্রাণী মাত্রেরই একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ, আমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের পেছনে রয়েছে এই বাসনারই তাগিদ বা অনুপ্রেরণা। আর আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, আমরা ইচ্ছেমত যে-কোন কাজই করতে পারি।

অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন—এই বিভ্রমই আমাদের পেয়ে বসেছে। এইভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি করি যে, সীমাবদ্ধ ভাবে নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তির সম্ভব হ'লেও আমাদের যেমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, তেমনি আমরা বাস্তবিক-পক্ষে কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য-দ্বারা পরিবেষ্টিতও বটে,—আর তখনই এই বিশ্বজগতে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে উন্নততর জীবনে গিয়ে আমরা মুক্তিলাভে সক্ষম হই। এই বিশ্বজগৎ শুধুমাত্র একা আমার জন্যে নয়, বর্তমানের মতো অতীতেও এ রূপ লাভ করেছে আরও বহুজনের কাজকর্ম, চিন্তাধারা, বাসনা কামনার মধ্য দিয়ে...'

'যা সব বলছ না ডাক্তার, বোঝা বড় কঠিন।' বলে ফেলেন টুলীপ। আমার বক্তৃতার ভাব-ধারণা হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে তাঁর চিন্তাধারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছুটে চলেছে, আমার বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে তিনি একটু বিরক্তও হয়েছেন, বুঝতে পারছি আমি। 'নিশ্চয়ই, যে সমস্ত কথা বললে তুমি, তার সবই যুক্তিযুক্ত নয়। মেয়েদের এই যে সব যা তা কাজ, কই সে-সম্বন্ধে তো কিছু বললে না?'

'মেয়েদের যতকিছু খেয়াল, সব ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রতিহিংসা, ঘৃণা ও ভালোবাসা—সবই তাদের ক্রমবিকাশ লাভের চিহ্ন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের বেলায়ই শিশুকালের মনোবৃত্তির টানটা এত বেশী যে, সর্বতোমুখী ক্রমবিকাশ তাদের ভাগ্যে ঘটবার অবকাশ পায় না, তারা থেকে যায় এক অসহায় স্নায়ু-রোগী, স্বার্থপর, দাম্ভিক, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, অকৃতজ্ঞ নর পশু হয়ে, অখুশি হয়ে থাকতে পারলেই তারা যেন সন্তুষ্ট। জীবনে সহানুভূতি ও প্রশংসাবাদও তারা লাভ করে, কিন্তু আসলে তাদের মনে সুস্থ ও স্বাভাবিক হওয়ার কোন ইচ্ছেই থাকে না।'

'আমরা সকলেই বাঁদর-বংশ-সম্ভূত,—ডারুইনের এই ধারণাটা তুমি বিশ্বাস করো ডাক্তার?' হঠাৎ আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে হিজ হাইনেস জিজ্ঞেস ক'রে বসেন।

'আমার ধারণা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন রকমের ক্রমোন্নতিবাদে বিশ্বাসী একমাত্র নিহিলিষ্টরা ছাড়া। নিহিলিষ্টরা মনে করে মানব-জাতি এমন দুষ্টপ্রকৃতির এবং বর্বর যে, ধরাধাম থেকে মানুষের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই দরকার, এবং—'

বারান্দায় কার যেন পদধ্বনি শোনা যায়। পরমুহূর্তে দরজায় করাঘাতের শব্দ। আমরা দু'জনেই চমকে উঠলাম।

'মহারাজ,' গম্ভীর বৃদ্ধা পরিচারিকা রূপার কণ্ঠধ্বনি। 'মহারানী সাহেবা আপনাকে শোবার কথা মনে করিয়ে দিতে বলেছেন।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আসছি,' চমকে উঠে টুলীপ বলেন। তার পর আমার দিকে অর্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন: 'হুঁ, তাহলে ময়না খাঁচায় ফিরেছেন! কিন্তু কোথা থেকে?'

'অনুগ্রহ ক'রে আপনি এবার শুতে যান, না হলে মক্ষীরানী আবার উদ্বিগ্ন হবে।' বললাম আমি।

আতঙ্ক, একঘেয়েমি আর মদের আমেজে যেন অভিভূত হয়েই টুলীপ কিছু সময় চেয়ারে বসে রইলেন। কিছু করবেন বা বলবেন এই প্রত্যাশাতেই আমি নীরবে অপেক্ষা ক'রে রইলাম।

'হৃদয় আমার নাচে রে—' অনেকক্ষণ পর হিজ হাইনেস বলে উঠলেন।

'আপনি কিন্তু গঙ্গাদেবীকে ভালোবাসেন, ভয়ও করেন,' আমি বলি: 'যান, এবার শুতে যান।'

টুলীপ চেয়ার থেকে উঠে আমার দিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন।

সুইচ্‌টা টিপে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেও ঘুম এল না আমার চোখে। আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝলাম যে, গন্ডী কোন মতলব এঁটেই টুলীপকে এই ভাবে তার সামনে হাজির হওয়ার জন্ম ডেকে পাঠিয়েছে। এবং এর ভূমিকা তৈরির জন্যেই সে কিছু সময়ের জন্যে তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। "সেরিফের ভূমিকায় চোরের" মতো এখন গন্ডী যত দোষ টুলীপের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে নাস্তানাবুদ করবে।

এখন আমার মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাল যে, এই মেয়েটি একাধারে ধর্ষকামী ও অস্বাভাবিক হিংস্র যৌনাভিলাষী মর্ষকামী। সে জ্বালাতে চায় এবং নিজেও জ্বলে মরতে চায়। অনবরত প্রেমিক গ্রহণ ও পরিবর্তন—এইটেই হচ্ছে নিমফোম্যানিয়াকদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অধিকাংশ নর-নারীই তো কিছুটা এই ধরনের মনোবৃত্তি সম্পন্ন, তাই এই মেয়েটা যে দ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, তা কেউই সহজে বুঝতে পারে না।

গন্ডীর এই বে-সামাল অবস্থাটা কখন উপস্থিত হয়? আর তার চরিত্রের আলোড়ন-বিলোড়নগুলো কোথায়ই বা তাকে টেনে নিয়ে যায়? তার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ আবিষ্কারের জন্য মাটির পৃথিবী ও উপরের নীলাকাশের মধ্যে কতদূরই বা যেতে হবে? টুলীপ তার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে দু'চারটে কথা বলে থাকেন সেই সমস্ত টুকরো টুকরো উপাদান আর নিজের ভাসা ভাসা পর্যবেক্ষণ ছাড়া যদি জানবার আর কোন উপায়ই না থাকে, তাহলে এই মেয়েটিকে ঠিক ভাবে বুঝব কি ক'রে? সদা-সর্বদা মনের মধ্যে কি একটা জিনিস পুষে রেখে কেনই বা টুলীপকে সে ঘৃণা করে, তা কি ক'রে বিচার করব? তাহলে কি বুঝব যে এর গোপন রহস্য যৌন-জীবনের গহন অন্তস্তলে সমাহিত? বহু বিষয়ের মতো এই

গোপন উৎসস্থলটিও কিন্তু সাধারণতঃ লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে যায়।

বোধ হয় গোলযোগটা সেইখানেই। যেহেতু প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে সে দেখে তার নিষ্ঠুর পিতাকে, সেইজন্য দুটো পরোক্ষ বিরোধী মানসিক ভাব-ধারায় উৎপীড়িত হ'য়ে গঙ্গী পুরুষ জাতিকে যেমন ভালোবাসে আবার তেমনি ঘৃণাও করে। এই ভাব-সঙ্কটের ফলেই রণপ্রিয়া এ্যামাজন প্রমীলাদের মতো পুরুষের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রে থাকে গঙ্গী।

এই সমস্ত কথা যদি তার সামনে তুলে ধরা যায়, আর তাকে বলা হয় যে, সে যদি মন খুলে তার যত দুঃখ-কষ্টের কথা আমার কাছে স্বীকার করে, তাহ'লে তার মানসিক দুঃখ-দুর্গতির অনেকটা হয়তো লাঘব করতে সাহায্য করতে পারি। যদি তুলেই ধরি গঙ্গী কি তাহ'লে তার প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে অপমানই বোধ করবে? কিন্তু ক'জনই বা নিজের মনের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারে? আর প্রেমই কি সকলে ঠিক মতো করতে পারে? আমাদের জীবনটা কতকগুলো অনুভূতি ও ভাব-ধারণার খোলস বা ছিবড়ে ছাড়া আর কি! এগুলো অস্পষ্ট থেকেই এমনভাবে নারকীয় আবর্জনা কুণ্ডে পুঞ্জীভূত হয়ে ব্যথা-বিষের উৎসস্থলে রূপান্তরিত হয় যে, পরে শুধরোবার আর কোন উপায়ই থাকে না। স্বার্থপ্রণোদিত হয়েই মানুষ উদারতার নামাবলি গায়ে দিয়ে এতে আদৌ হস্তক্ষেপ করতে চায় না, ফলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতেও পারি না···

এসব বিষয় নিয়ে মনে মনে চিন্তা করছি, এমন সময় হিজ হাইনেস ফিরে এসে আমার বিছানার পাশে একখানা আর্মচেয়ারে ধপাস ক'রে বসে পড়লেন। আমি আলো জ্বালালাম; তাঁর চুল

ও পোষাক-পরিচ্ছদের এলোমেলো অবস্থা দেখে আমি আরো বেশী বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লাম।

'আমাকে মাপ করো ডাক্তার,' টুলীপ বললেন: 'পা দুটোয় যেন মোটেই বল পাচ্ছি না, শরীরটা ভাল মনে হচ্ছে না। ঝগড়া ক'রে গঙ্গী আমাকে ঘর থেকে বের ক'রে দিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আবার ইন্দিরার কাছে ফিরে গিয়েছি বলে ও আমায় গালাগাল করছে!…'

'হুঁ, আপনার কাছ থেকে সরে পড়বার জন্যেই সে ওরকম অছিলা ধরেছে।'

'কি বলছ ডাক্তার?' টুলীপ চিৎকার ক'রে ওঠেন। 'তুমি কি বলতে চাও…'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, গঙ্গী পোপতলালের সঙ্গে…'

'হা ভগবান!' মাথায় করাঘাত ক'রে টুলীপ চেঁচিয়ে ওঠেন। শিশুর মতো ডুকরিয়ে কেঁদে ফেলেন, কোন প্রবোধবাক্য বা সান্ত্বনার কথা বলতে গেলেও এই রোদনধ্বনি ভেদ ক'রে তাঁর মনে গিয়ে পৌঁছোবে বলে মনে হয় না। কাজেই, এই ঘন নিশীথরাত্রির নৈশ-অন্ধকার ভেদ ক'রে যাতে তাঁর রোদন-ধ্বনি বাইরে না যায় সেই উদ্দেশ্যে আমি দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। দোষী ও নির্দোষী সকলেরই গভীর নিদ্রায় ভরা নীরন্ধ্র রাত্রি তখন আরো ঘন জমাট হয়ে উঠছে।

লেভ তলষ্টয় একটা খুব মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, মানুষের সব ব্যথা-বিষেরই উপশম হয়, কিন্তু শয়ন-কক্ষের বিয়োগান্ত-নাটকের কথা-বেদনা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। তবে ইয়াস্‌নিয়া পোলিয়ানার ঋষি একথাও বলতে পারতেন যে, কালের সুবিদিত রোগ উপশম-ক্ষমতার গুণে ব্যথা-বেদনার কিছুটা উপশম হ'লেও প্রেমের ক্ষত চিহ্নগুলো কিন্তু জীবন ভোর থেকেই যায়।

ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা না করলেও প্রথম আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে এক তীব্র বেদনার সৃষ্টি হয়। অতি সাম্প্রতিক আঘাতের বেদনা মানুষের মনের আকাশে প্রায়ই মহাবেগে ধাবমান জলন্ত তারকার মতোই তীব্র গতিশীল হ'য়ে থাকে। আর, আমাদের হিজ হাইনেসের মনের জগতে, যিনি তাঁর প্রজার নিকট অপ্রিয় স্বৈরাচারী দেশ-শাসক হিসেব পরিগণিত, তাঁর অন্তরাকাশে আরও কতকগুলো ধূমকেতুর উদয় হ'য়ে যেন তাঁর মনের সমগ্র সৌর-জগৎটাকেই উদ্বেলিত ক'রে তুলেছিল। সূর্য বংশোদ্ভূত টুলীপ এখন তাঁর মনের সূর্যকে খুঁজে বার ক'রে প্রকৃতির বুকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় অস্থির হ'য়ে উঠেছেন।

ঊষার প্রথম লগ্নে মহারাজা আমায় খবর পাঠালেন যে, তাঁর সঙ্গে এক্ষুণি অরণ্যে যেতে হবে শিকার-বাড়িতে। সেখানে ঐ অঞ্চলের সেনাদলের মহড়া পরিদর্শন করা হবে।

গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখে হিজ হাইনেস হলের ভেতর প্রবেশ করলেন। আমি অপেক্ষা করছিলাম তাঁর জন্য। কাডিলাক গাড়ীখানা আনবার জন্যে তিনি হুকুম দিয়েছেন। তার মানে তিনি নিজেই গাড়ী চালাবেন; কারণ যখনই তাঁর গাড়ী চালাবার সখ হয়, তখনই তিনি এই বিশেষ গাড়ীখানাই ব্যবহার করেন। সোফার হায়দর আলী গম্ভীর মুখে গাড়ীর দোর খুলে দিল মহারাজ ও আমার প্রবেশ করবার জন্যে, তার পর আমরা গাড়ীতে উঠে বসলে সে পেছনের সিটে গিয়ে বসল। অধীরভাবেই হিজ হাইনেস গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন। ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ীখানা বোঁ ক'রে ছুটল।

শ্যামপুরের বড়বাজারের ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে। হরতালের জের যেন তখনও চলেছে, কারণ কোন দোকানই খোলা দেখলাম না। এই সময় হঠাৎ আমার মনে হলো যে, টুলীপ

পিয়ারা সিং, মুন্সী মিথনলাল বা বুলচাঁদ কাউকেই যে আমাদের সঙ্গে নিলেন না, তার কারণ হলো গঙ্গী-ঘটিত ব্যাপারের অধিকাংশ গোপন তথ্য একমাত্র আমিই জানি। এবং টুলীপও বোধ হয় এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। ভগ্ন-হৃদয় মানুষ, বন্ধুর মধ্যে তার প্রেমিকার প্রতিচ্ছবি, তার ভাব-ধারণা, স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাগুলো সব অন্বেষণ ক'রে থাকে। যাতে প্রতিটি জিনিসের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়, সেই রকম একখানা দর্পণে পরিণত হ'য়ে সহজাত প্রবৃত্তি বশতঃ আমি যেন টুলীপের জীবনে নারীর স্থান দখল ক'রে বসলাম।

এই মনোভাবটা কতকটা লোভনীয় হ'লেও আবার সঙ্গে সঙ্গে অবমাননাকরও বটে। কিন্তু চিকিৎসককে এই সমস্ত মাতৃসুলভ আদর যত্ন ও সুকঠিন সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন সম্বন্ধেও শিক্ষা লাভ করতে হয়, যাতে রুগী নিজের ওপর আবার আস্থা ফিরে পেতে পারে। আর তা ছাড়া এ কয়দিনে নিজের সম্বন্ধেও আমি এমন সব বিষয় জানতে পেরেছি, যেগুলো আমার কাছে অত্যন্ত অস্পষ্টই ছিল। আমি জানতে পারলাম যে, আমি সত্যিই দুর্বল, অহংকারী এবং ভীরু; আরও জানতে পারলাম যে, নিজের দৃঢ় বিশ্বাসগুলো কাজে পরিণত করার সাহস আমার নেই, সঙ্কটমুহূর্তে আমি যুক্তি ও নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলি; নৈতিকতার জায়গায় মনোবিজ্ঞানকে বসিয়ে আমি পূর্বতন সংস্কার ত্যাগ ক'রে উদার-নীতির নতুন কোন বন্ধ্যা তত্ত্ব দিয়ে পরীক্ষা করতে উদ্যত হই। এই অদ্ভুত মনোভাব অতিমাত্রায় আত্মচিন্তায় নিমগ্ন নর-নারীকেও স্বাধীন ভাবে কাজ করার অধিকার দেয়।

কিন্তু, যে-সমস্ত কারণের জন্যে মানুষ নির্দিষ্ট ধরনের কতকগুলো কাজকর্মে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে, সেই সমস্ত কাজকর্ম নৈতিক মাপ-কাঠিতে যাচাই না ক'রে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বুঝবার ওপরেই আমি বিশেষ জোর দিয়েছি। কাজেই, টুলীপের ওপর, কতকটা যেন

অনুকম্পারই মতো কেমন একটা ভালোবাসার ভাবই জাগ্রত হয়েছে আমার মনে।

শ্যামপুরের পাকা সড়ক অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়ে আরম্ভ হয়েছে প্রস্তরসমাকীর্ণ এবড়ো-খেবড়ো পান্নার সংরক্ষিত অরণ্যের পথ। মহারাজার শিকার-ভবনগুলোর মধ্যে একটা এই অরণ্যেই রয়েছে। এই বিরাট বনানী হিমালয়ের বিশাল বিস্তৃত বক্ষে গিয়ে মিশে গিয়েছে। রাস্তার প্রত্যেকটি বড় ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে হিজ হাইনেসের শীর্ণ লম্বা মুখখানাও কেঁপে কেঁপে ওঠে। কাডিলাক গাড়ীখানা যেন তাঁর আর-একটি রক্ষিতা। রক্ষিতাটিকে এক করুণ সহানুভূতির সঙ্গেই হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন তিনি। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে একদল গরুর গাড়ী ঠিক মাঝ-পথ দিয়ে শম্বুক-গতিতে চলেছিল। হাইনেসের মোটর গাড়ীর হর্ণের আওয়াজেও গাড়ীগুলো পথ ছেড়ে দিল না। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, এতেও মহারাজার মনোভাবের কোন বৈলক্ষণ ঘটল না। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলাম একপাল পাহাড়ী ছাগল পথ রোধ ক'রে আছে; গাড়ীখানা দেখে ছাগলগুলো ওদের পার্বত্য-সুলভ হাবভাবই প্রকাশ ক'রে বসল। তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে দুই পাহাড়ের মধ্যে অর্ধ-বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ হয়ে সিং উঁচিয়ে দাঁড়াল। মৃদু হেসে দ্রুত গতিতে এদের পার হয়ে গিয়ে আমরা আবার এক নতুন উপসর্গের সম্মুখীন হলাম। ছোট ছোট নালার ওপর কতকগুলো সাঁকো। প্রত্যেকটির প্রবেশ পথেই একমাত্র সরকারী গাড়ী ছাড়া সবরকম গাড়ীর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ক'রে পূর্ত-বিভাগের নোটিশ টাঙানো রয়েছে।

'সাঁকোগুলো মজবুত করা দরকার,' হিজ হাইনেসের মুখ থেকে দুঃখের গ্রন্থিটা ছিঁড়ে ফেলার উদ্দেশ্যেই আমি বললাম।

কিন্তু এই মন্তব্যটা যে মোটেই সময়োপযোগী হলো না, মুহূর্তে বুঝলাম, কারণ, প্রথম সেতুটা পার হওয়ার সময় গাড়ীর ভারে

মড়-মড় ক'রে উঠতেই টুলীপের মনে পুল ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তাঁর নিজস্ব পূর্ত-বিভাগের ঔদাসীন্য অপরাধ-বোধেই পরিণত হলো। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলেন :

'তুমি দেখছি ডাক্তার জংগলের ভেতর আধুনিক দুনিয়ার বিলাসিতা উপভোগ করতে চাইছ ?'

তরাইয়ের রাস্তাটা খাড়া উঠে যেই একটা ছোট পাহাড়ের দিকে মোড় ফিরেছে, অমনি যেন আমরা ডাইনীদের ডেরায় এসে উপস্থিত হলাম। একদল অচ্ছুৎ বসেছিল পথের পাশে, তাদের একটা কুকুর ঘা-ওলা পেছনের ঠ্যাংয়ের উপর ভর দিয়ে বসে ছিল। কাডিলাক-খানা মোড় ঘুরেই কুকুরটাকে চাপা দিয়ে তড়িৎগতিতে বেরিয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখি, হতভাগা কুকুরটা মরে নি, গোঙাতে গোঙাতে রাস্তার এক পাশে নিজের দেহটা টেনে নিয়ে যেতে যেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। টুলীপ চোয়াল দুটো চেপে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে যেন এই হত্যা-জনিত অনুশোচনার পীড়ন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই গাড়ী তীব্র গতিতে চালালেন। পরবর্তী এক মাইল পথ শুধু গাড়ীর চাকার নীচের পাথর-কুচির কড় কড় শব্দই কানে এল। হঠাৎ আর একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হলো : অরণ্যবিথীর একটা ভাঙা কুড়ে ঘর থেকে হঠাৎ একটি ছোট ছেলে দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে কোনরকমে গাড়ীর চাপা-পড়া থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

'ডাক্তার, এবার তুমিই গাড়ী চালাও,' পরিশ্রমে অবসন্ন স্নায়ুক্ষরিত অবস্থায় টুলীপ আমাকে বললেন। একটা তেঁতুল গাছের ছায়াতলে গাড়ীখানা থামিয়ে আমাকে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিলেন।

মিনিট পনের আমরা অপেক্ষাকৃত নীরবতার মধ্যে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে অগ্রসর হলাম। পথ যতই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করছে

রাস্তার বক্রতা ততই বেড়ে চলেছে। উপত্যকা-গুলোর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময়, রাস্তার পার্শ্ববর্তী ধুলোভর্তি কাঁচা রাস্তা দিয়েই চলি, আবার যখন পাথুরে পথ শুরু হয় তখন তার উপরেই গাড়ীখানা উঠিয়ে দি। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকিয়ে আমি চলি। প্রথম উত্তেজনার পর টুলীপের স্নায়ুগুলো ঠাণ্ডা হয়ে আসে এবং আমার গাড়ী চালানোর ওপর তাঁর আস্থাও আমি লক্ষ্য করি।

'আচ্ছা টুলীপ, গতরাতে কি ঘটেছিল বলুন তো?' আস্তে আস্তে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'গঙ্গী আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে,' কথা বলবার সময় তাঁর নীচের ঠোঁটটা কেঁপে উঠল: 'ইন্দিরার কাছে গিয়েছিলাম বলে ও আমার ওপর রাগ করলে, তার পর ওর ঘর থেকে বের ক'রে দিলে। হিংসায় যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। কি যে একটা হয়েছে ওর—'

'উঁহুঁ—, শুধু ইন্দিরাকে হিংসে করার ভান করছে।' সামনে বন্ধুর সর্পিল সড়কের ওপর চোখ দু'টো নিবদ্ধ রেখে আমি বললাম।

মুহূর্তপরে একটু হেসে আবার বললাম:

'আমার মনে হয়, আপনিও এ নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছেন, আপনার ধারণা যে, আপনার সম্বন্ধে ওর মনোভাবটা বদলাতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু—'

'হাঁ, আমার মন হচ্ছে ওর মনের মধ্যে কতগুলো চিন্তা-প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে ও আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। রঘবীরের সঙ্গে যখন ওর সম্পর্ক ছিল, তখনও ঠিক এই রকমই করতো। বাইরে আমার সঙ্গে সম্পর্কটা রাখত ঠিকই কিন্তু অন্তরে ও ছিল রঘবীরের। আমি লক্ষ্য করতাম ওর চোখ দুটোর মধ্যে এবং কথাবার্তায় রঘবীরের প্রতি ওর ঝুঁকে পড়ার ভাবভঙ্গি, দেখতাম ও রঘীরকে জ্বালাতন করছে এবং নিজেও তার দ্বারা জ্বালাতন হয়ে আনন্দ পাচ্ছে। এবং

তার পর আমাকে নিয়ে তিত-বিরক্ত হওয়ার ভাব প্রকাশ করেছে সামান্য খুঁটি-নাটি ব্যাপারে। কখন কখন আমার ওপর ও ভয়ানক চটে গিয়ে ওর টানাটানা চোখ দু'টি দিয়ে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে আমাকে ভর্ৎসনা করেছে। ঝগড়ার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও ওর পরিবর্তন দেখে আমি অবাক হ'য়ে গিয়েছি। বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে ভেবেছি, কেনই বা ও আমাকে ঘৃণা করছে আর কেনই বা আমার ওপর এতদূর নির্দয় হয়ে পড়েছে। ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে আবেদন-ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছি। একটু রাগের ভাব ও দেখিয়েছে, কিন্তু পরক্ষণে কঠিন হয়ে আবার আমাকে সন্দেহ ও অস্থিরতার পাঁকে নিক্ষেপ করেছে।...আমার মনে হয়, আবার গঙ্গী সেরকম করতে শুরু করেছে। আমার সন্দেহ হয়, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মধ্যে গঙ্গীও আছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে গঙ্গী আমাকে ছেড়ে সরে যাচ্ছে। সেইজন্যই গতরাতে ও আমাকে ওর কাছে থাকতে দেয় নি। কিন্তু অবাক হ'য়ে যাই, আমাকে তাড়িয়ে দেওয়াই যদি ওর উদ্দেশ্য ছিল, তবে কেন ও রূপাকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমার মনে কেন যেন বিশ্বাস জন্মাছে যে—'

'আমার কি মনে হচ্ছে জানেন টুলীপ, আমার মনে হয়, আপনাদের মধ্যে সমস্যাটা কেবল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে।'

আমার কথায় টুলীপ যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন, যদিও আমি জানতাম, আমি যে শুধু তাঁর নিজের মনের কথাই বলছি, তা তিনি বেশ ভাল ভাবেই জানেন। অতর্কিত বেদনার ছায়া তাঁর মুখে ফুটে ওঠে; আমার মনে হয়, হয়তো গঙ্গী তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে এই আশঙ্কাই তাঁর মুখে ঐ বেদনার ছাপ এঁকে দিয়েছে।

'তুমি কি সত্যি সত্যিই মনে কর ডাক্তার যে, গঙ্গী আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে?'

আমি নীরব রইলাম, কারণ আমি জানি যদি হাঁ উত্তর দিই তাহলে দিনের পর দিন ধরে তিনি কষ্ট ভোগ করবেন। তার বদলে আর-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম :

'ওকে নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন আপনি ?'

'তুমি তো জান ডাক্তার, এমন এক-এক সময় ছিল যখন ও সম্পূর্ণ আমার উপরেই নির্ভর করতো, ও আমাকে এতদূর পেয়ে বসেছিল যে আমায় নিশ্বাস ফেলবার অবসর পর্যন্ত দিত না। আমিই ছিলাম ওর সর্বস্ব। আমিও তখন ওকে কাছ-ছাড়া করতে পারি নি। এবং বলতে কি ডাক্তার, এখনও ওকে ঐ ভাবেই আমি জানি। ও আমাকে সম্পূর্ণভাবে ওর বশে রাখতে চায়। কিন্তু কিছুদিন হলো দেখছি,—কেন এবং কি ভাবেই বা, তা হয়তো ঠিক বলতে পারব না,—যে, ও আমাকে ঠিক চাইছে না, শুধু তাই নয়, আমাকে ও চাইছে ওর কাছ থেকে সরিয়ে দিতে। মনে হয়, ওর অন্তরে চাওয়া না-চাওয়া দুটো ভাবধারার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে।'

'আমার মনে হয়, আপনি যখন ওকে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, তখন আপনি মনে মনে পরম পুলকিতই হয়েছিলেন, কিন্তু এখন, ও আপনাকে চায় আবার চায়ও না, এই অবস্থায় আপনি নিজেকে অসুখী মনে করছেন। এই সংগ্রামে আপনাদের দু'জনের মধ্যে খুব বেশী পরিমানে শক্তির তারতম্য রয়েছে।'

'কিন্তু ডাক্তার, একটা কথা তুমি বুঝতে পারছ না,—ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। ওকে না পেলে আমার স্বস্তি নেই। রমণী আমি চাই-ই, আর ও হচ্ছে আমার সেই কামনার ধন। আমি চাই ওই মেয়েকে অবলম্বন ক'রে থাকতে। আর আমার এই রাজ-কাজের গোলযোগের মধ্যেও আমি চাই ও-মেয়ে থাকবে আমার পাশে পাশে। গত রাতে ও যে রকম ব্যবহার করল আমার সঙ্গে, একবার ভেবে দেখ

ডাক্তার, কি রকম বিশ্রী ব্যাপার! আমাকে কি ভাবে অপমান করল! আমি যদি প্রত্যুত্তর দিতাম! ও যে আমাকে ছেড়ে দিতেও পারে, একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে উঠল।' হিজ হাইনেস বলছেন আর তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চ গ্রামে ধাপে ধাপে উঠছে। বেশ বুঝতে পারছি যে তাঁর ভিতরের তিক্ততার ভাবটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো ক্রমেই বেড়ে উঠছে। যে সমস্ত সাফাই তিনি দিলেন, তার মধ্যে, তাঁর কাম্য দৈহিক মিলনও যে রয়েছে, তা কিন্তু তিনি একেবারেই উল্লেখ করলেন না। অসংযত ভাষণের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণী-শক্তি যে মহারাজার ওপর ভয়ানক প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে, তা তো আমি জানি। সুতরাং আমি জিজ্ঞেস করলাম:

'আপনার স্বর-সাধনার আর কতটা বাকী আছে টুলীপ?'

'নিরবচ্ছিন্ন সাধনা আর কোথায় হলো? মনটা আমার সব সময় ব্যথাতুর হয়েই থাকে, ফলে আমার ভালোবাসা এখন পর্যন্ত অবাধ গতিতে চলবার অবকাশই পায় নি। প্রতিবন্ধক সৃষ্টি ক'রে প্রথমে এসে দাঁড়াল ওর ছেলেমেয়ে, তার পর দাঁড়াল রঘবীর। ও-কথা ভুলে যেতেও আমার বেশ কিছুদিন গেল। আর গঙ্গীর কামাশক্তি এত প্রবল যে, ও সব সময়েই কামোন্মাদিনী অবস্থাতেই আমার কাছে আসে থাকে; একটু কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা আর পরস্পরকে বোঝা, —তার কোন অবসরই ও আমাকে দিতে চায় না।'

'বুঝলাম,' টুলীপের স্বীকারোক্তিতে কিছুটা লজ্জিত হয়েও তাঁর সততায় আমি বিস্মিত হয়েছি। বললাম: 'ওখানে পথের ধুলো উড়তে দেখে অনুমান করছি, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চৌধুরী রঘবীর সিংয়ের পদাতিক বাহিনী আমাদের অতিক্রম করেই এগিয়ে গিয়েছে।'

'ডাক্তার, আমি গঙ্গীকে হারাতে চাই না, কিন্তু সেই ভীতি আর

অমর্যাদাই আমাকে যেন গ্রাস করতে ছুটে আসছে ব'লে আমার কেবল মনে হয়। ওকে ছাড়া আমার জীবন তরঙ্গসঙ্কুল সফেন সমুদ্রে ভেলাহীন অবস্থায় সাঁতার কাটার মতো—'

'আরে, বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না! কাফিলা যেন দাঁড়িয়ে গেছে?'

'তা হলে কি হলো—?' শঙ্কাভরা কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন হিজ হাইনেস।

গাড়ীর গতিবেগ সামান্য একটু কমিয়ে দিলেও প্রায় সমান গতিবেগেই গাড়ী চালিয়ে পাহাড়ের ঢালু অংশটা অতিক্রম করলাম আমরা। তার পর দ্রুত বড় বড় গগনচুম্বী উৎপাটিত বৃক্ষরাজী ও ঘাসলতা সমাকীর্ণ সবুজ বন থেকে দূরে অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত সমাধিস্থান অতিক্রম ক'রে গেলাম। এই অরণ্যের মধ্যে কিছু অংশ পরিষ্কার করা হয়েছে এবং তারই মাঝে শীতল লতাকুঞ্জ ঘেরা এই গোরস্থান।

এই সময় একটা সাঁকোর মাথায় দু'জন সৈনিক আমাদের নির্দেশ দিল থামবার জন্য। কাছে এসে যে-মুহূর্তে মহারাজাকে তারা চিনতে পারল, ফৌজী কায়দায় দু'পা ঠুকে দাঁড়িয়ে তারা স্যালুট জানাল।

'কি হয়েছে ওখানে?' হিজ হাইনেস জিজ্ঞেস করেন।

'জানি না, মহারাজা' সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে হিজ হাইনেসের দিকে সোজাসুজি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে একজন সৈনিক উত্তর দিল।

'এই জানিনের বাচ্চা সব! কেন জানি না?' মূর্খ সৈনিকের উত্তরে চটে গিয়ে টুলীপ চেঁচিয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে জনৈক অফিসার সাঁকোর অপর দিক থেকে দৌড়ে এগিয়ে এসে মহারাজাকে বলল:

'হুজুর, কয়েকজন কম্যুনিষ্ট গেরিলা ঐ পান্না গ্রামের ওপারে পাহাড়ের ছু' পাশ থেকে চোরা গুলি ছুঁড়ছে। আর ওরাই আমাদের ফৌজী কাফিলা থামিয়ে দিয়েছে।'

'পান্নার শিকার-ভবনে যাব আমরা—' মহারাজা বললেন।

'হুজুর, জায়গাটা খুব নিরাপদ নয়।'

'তাতে কি হয়েছে? আমারা যাবই।' মহারাজার রাজপুত রক্ত মাথা চাগিয়ে উঠল।

'বেশ, হুজুর, পান্না থেকে আর-একটা ঘোরা-পথ গিয়েছে, সেই পথেই আপনি যেতে পারেন। ঐ পথটা শিকার-ভবন পর্যন্তই গিয়েছে। আমি এক পল্টন সৈন্য আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুণি গিয়ে ব্যবস্থা করছি হুজুর।'

'এই কমুনিষ্ট্যদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে।' ক্রুদ্ধ বালকের মতো মহারাজা চেঁচিয়ে বলেন: 'মহড়ার ব্যবস্থা ক'রে ভালই করেছি দেখছি। ক্যাপ্টেন সাহেব, জেনারেল চৌধুরী সাহেব কোথায়? ওকে পান্নার চৌমাথায় আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।'

ফৌজী অফিসারটি নাটকীয় গতিবেগে অভিবাদন জানিয়ে দ্রুত চলে গেল।

কিন্তু তাকে আর দৌড়ে গিয়ে জেনারেল রঘবীর সিংকে খবর দেওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হলো না। ভারতভূমিতে জনরবই অদৃশ্য বেতার বার্তার কাজ ক'রে থাকে। এই জনরব মহারাজার আগমন-বার্তা প্রধান সেনাপতির কানে পৌছে দিয়েছিল, কারণ, দেখা গেল জেনারেলের গাড়ী পুল পার হয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

জেনারেল রঘবীর সিং তার গাড়ী থেকে বের হয়ে আমাদের অভিবাদন জানাবার পূর্বেই টুলীপ (এবং তৎসহ আমিও) গাড়ী থেকে নেমে অভিবাদন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

'মহড়ার আদেশ দিয়ে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্য হিজ হাইনেসকে অভিবাদন জানাচ্ছি, কারণ, গ্রামাঞ্চলে গোলযোগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।' তোষামোদের স্বর রঘবীর সিংয়ের কণ্ঠে।

'প্রত্যেকটি কম্যুনিষ্টকে শেষ না করা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই।' নাটকীয় ভঙ্গীতে হিজ হাইনেস উত্তর দেন।

'তবে সর্দাররাও এই সব গোলযোগের পেছনে রয়েছেন,' মহারাজাকে শান্ত করার জন্যে জেনারেল রঘবীর সিং বলে। তার পর, মহারাজা আর তাঁর জ্ঞাতিভাই অভিজাতদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির জন্য সে চেষ্টা করছে, হিজ হাইনেস হয়তো এরকমও মনে করতে পারেন এই আশঙ্কা ক'রে রঘবীর যোগ দেয়: 'আমার মনে হয়, ওঁদের নিজেদের মধ্যেও মনের মিল নেই। তা সত্ত্বেও ওঁরা সকলেই কংগ্রেস প্রজামণ্ডলের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। প্রজামণ্ডলের ভেতরে আবার কম্যুনিষ্টরাও রয়েছে, যদিও এ দুটো দল পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণাই করে...'

'আমি সর্দারদেরও শেষ ক'রে ফেলবো! ওরা ভেবেছে কি, আমাকে অবজ্ঞা করবে? বেতমিজের দল!...হারামীর বাচ্চারা!...'

ক্রোধান্বিত টুলীপ বলশালী রঘবীরের অপেক্ষাকৃত অবিকৃত মুখখানা দেখে নিজের অধৈর্য অবস্থার জন্যে যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়েন। তাই কথার স্বর পরিবর্তন ক'রে তিনি বলেন:

'ঠাকুর প্রদ্যুম্ন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে একবার। যাই হোক, বয়সে বৃদ্ধ তো, আর সম্পর্কে আমার চাচাও বটে। দিল্লীর ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট যে শ্যামপুরের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করতে উদ্যত হয়েছে, বৃদ্ধ চাচা সাহেব হয়তো তা বুঝতে পারবে।'

'কথাটা ঠিক বলেছেন। তিনজন সর্দারের সঙ্গেই আমাদের দেখা করা উচিত, তবে আলাদা আলাদা ভাবে। ঠাকুর প্রদ্যুম্ন সিংয়ের কাছে আমি খবর পাঠাচ্ছি। শুনেছি, তিনি বলে এখন উধমপুরে

আছেন। উধমপুর এই শিকার-ভবন থেকে মাইল সাতেক হবে।' রঘবীর সিং বলে।

'আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি শিকার-ভবনে। একই সঙ্গে তারা দেখা করুক কিংবা একজন একজন ক'রেই আসুক, তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না।'

'এক-একজন ক'রে ওঁদের সঙ্গে মিটমাট করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে বলেই আমার মনে হয় হাইনেস।' স্বভাব-সিদ্ধ ধূর্ততার সঙ্গে রঘবীর বলে।

'তা বটে, একে একে ওদের সবাইকে সাবাড় করা অনেক সহজ হবে।' মহারাজা বলেন।

'আচ্ছা আমি দেখছি, আপনার গাড়ীর সঙ্গে পাহারার ব্যবস্থা কতটা হলো।' জেনারেল এই বলে ফৌজী কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে মার্চ করতে করতে চলে গেল।

এরই মধ্যে সাঁজোয়া গাড়ী, ট্যাঙ্ক ও জীপ গাড়ীর একটা মিছিল আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। কাজেই প্রয়োজনানুযায়ী আদেশ দেবার জন্য জেনারেল রঘবীর সিং পুলের দিকে এগিয়ে গেল।

পান্না গ্রাম থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে নেপালী-চীনা পদ্ধতিতে গঠিত একটি চমৎকার কাঠের বাংলো হলো এই রাজকীয় শিকার-ভবনটি। বনের একেবারে প্রান্তদেশে অবস্থিত। মানুষের বসবাসের শেষ ঘাঁটি, তার পরেই শুরু হয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ। প্রশস্ত বারান্দার দেয়ালগুলো বাঘ, প্যান্থ্যার ও চিতাবাঘের চামড়ায় সাজানো, মাঝে মাঝে কৃষ্ণসার ও হরিণের মাথা,—এ সবই বিগত দুই-তিন পুরুষের শিকারের চিহ্ন। শ্যামপুরের চারধার মাইলের পর মাইল ধরে জট-পাকানো কাঁটাগাছ ও আগাছার প'ড়ো জমি ও সীমাহারা ধানের ক্ষেতের পর ক্ষেত দেখে মনে হয় যেন, ঝোপ ঝাড় ও

ঘন-সবুজ নরকের মধ্যে এসে পড়েছি আমরা। এর মধ্যে অনেক কিছু বিপদের আশঙ্কা রয়েছে বলে আমার কাছে যেমন ভীতিপ্রদ ঠেকে আবার সঙ্গে সঙ্গে এই বন-সৌন্দর্যের অদ্ভুৎ আকর্ষণে আমার মন ডুবে যায়। বাস্তবিক পক্ষে, এখানে হঠাৎ বাঘের এসে পড়ার বিশেষ কোন আশঙ্কাই নেই। বরং, আমার মনে হয়, এখানে গেরিলাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাই রয়েছে। এবং তাই যদি হয়, তাহলে জগতের সঙ্গে আর তখন কোন যোগাযোগই থাকবে না, আর আমাদের খবরও তখন আদৌ পাওয়া যাবে না। কারণ, এই শিকার-ভবনের সৌখীন জিনিসপত্র এবং ওক কাঠের আসবাব ও সর্বোপরি এর বন্দুক-ভরা অস্ত্রাগার, অসন্তুষ্ট পল্লীবাসীদের দ্বারা গঠিত সশস্ত্র দলগুলোর লক্ষ্যস্থল। দারিদ্র্য ও বেগার-প্রথার কল্যাণে শিকারের সময় হিজ হাইনেসের যে-কোন কর্মচারীর হুকুমে গ্রামবাসীকে তাদের ক্ষেত-খামারের কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে চলে আসতে হয়। আমার আরও মনে হলো যে, প্রজামণ্ডলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তিনজন অভিজাতই হাইনেসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আর আমাদের সঙ্গে যে একদল পল্টন যাচ্ছে, তারা গেরিলার আক্রমণের মুখে আমাদের রক্ষা করতে পারবে কিনা সে-সম্বন্ধেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শিকার-ভবনের সযত্নে রক্ষিত সুন্দর উদ্যানে আমি সাবধানে পায়চারী করছি, আর টুলীপ গিয়েছেন প্রসাধনের কাজটা সেরে ফেলতে। তার পর ফিরে এসে শিকার-ভবনের সুদৃশ্য ছাদের নীচে এবং কার্নিসে যে পায়রা ও বুনো ঘুঘু বাসা বেঁধেছে তাই দেখতে থাকেন হিজ হাইনেস। আর আমি সেই অবসরে আমার স্নানের পাট সেরে নিতে গেলাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই আমার নজরে পড়লো জনৈক

যুবক আমার দিকে ছুটে আসছে। আমার কাছে এসে সে বলল: 'ডাঃ শঙ্কর, মহারাজাকে পরিত্যাগ ক'রে আমাদের দলে আপনি চলে আসুন—!' কথাটি শেষ করেই যুবক দ্রুত চলে গেল। তার দ্রুত নিষ্ক্রমণের পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুহূর্তের জন্য আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। তার চলে যাওয়ার বিশ্রী ঢঙটার ওপর চোখ ফেলে ছেলেটার মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মনে রাখতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সে ততক্ষণ চলে গেছে। আমি বারান্দায় ফিরে আসতেই দেখি হিজ হাইনেস বড় বড় ছয়টা সুন্দর পায়রা শিকার ক'রে ফেলেছেন। এই পাখি-শিকারের সাফল্যে দেখলাম তাঁর মনের প্রফুল্লতাও উপচে পড়ছে, প্রাতঃরাশের টেবিলে বেশ হৃষ্ট অবস্থার সৃষ্টি করেছেন তিনি। প্রাতঃরাশ পরিবেশন করল এই শিকার-ভবনের স্থায়ী বাবুর্চি-খানসামা খোদাবক্স।

'এই যে খোদাবক্স, কেমন আছ তুমি?' চওড়া-মুখ বিনয়ী বৃদ্ধকে হাইনেস জিজ্ঞেস করেন: 'আরে তোমার মেহেদি-রঙের দাড়িরই বা কি হলো?'

'খোদা কসম, আপনার বাপ-ঠাকুর্দার কাছে যেমনটি ছিলাম, সেই রকম হুজুরেরও আমি চির-অনুরক্ত। শুধু মুসলমান হয়ে জন্মেছিলাম ব'লে গাঁয়ের হিন্দুরা যেন আমাকে আজকাল সন্দেহের চোখে দেখছে। দাঙ্গার পর, গত কয়েক মাস ধরে হুজুর, সব সময়েই কেমন ভয়ে ভয়ে আমার দিন কাটছে, এই বুঝি কেউ আমায় খুন ক'রে ফেলে এই আশঙ্কা। পান্না আর উধমপুরে আজকাল অনেক কিছুই ঘটছে যা হুজুরের কানে পৌঁছোয় না। কিন্তু যখন সর্দার, জায়গীরদার নিজেরাই—ক্ষমা করুন, হুজুর, হঠাৎ অনেক কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল হুজুরের সামনে—'

'না, না, ভয়ের কিছু নেই। মন খুলে তুমি সব কথা বলো।'

'হুজুর, উধমপুরের সব মুসলমানরাই তো মারা পড়েছে। অল্প কয়েকজন শুধু পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছে। সত্য কথা বলতে কি হুজুর, আমি সেসময় আমার দাড়ি চেঁচে ফেলি। তার পর আপনাকে যে কি ভাবে বলি?...আপনার চাচা মশাই উধমপুরের ঠাকুর সাহেবের পায়ে পড়ে আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে আমি হিন্দু হয়ে যাব... তোবা! তোবা!...শুধু তাই নয়, আপনার নিমক খেয়েছি, আপনার বিরুদ্ধে গিয়ে নিমকহারামীও করতে হবে। হুজুর, এত কথা বলে ফেললাম, দয়া ক'রে ক্ষমা করুন...'

'কিচ্ছু ভয় নেই তোমার খোদাবক্স, বলে যাও।'

'মহারাজ, ঠাকুর সাহেবের কাছে আমাকে স্বীকার করতে হলো যে, মহারাজার সব কথা তাঁকে জানাবো। কিন্তু আমার মনের ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। তাঁর সবকিছু জেনে নিয়ে—'

'তাহলে আমার নিমকহারামী করেছ।' খোদাবক্সের কথার মাঝেই বিরক্তির স্বরে বলেন হিজ হাইনেস।

খানসামা তার বিশ্বাসঘাতকতা স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদাবক্সের ওপর অসন্তুষ্ট হতে এবং তাকে অবিশ্বাস করতে না দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি জানতাম যে হাইনেস স্বভাব-সিদ্ধ ভাবেই ছিলেন ষড়যন্ত্র-প্রিয় এবং শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বোধ হয় তিনি কিছুটা অপেক্ষা করছিলেন। খোদাবক্স অনুরক্ত ভৃত্য ব'লে তাঁর মনে ধারণা জন্মেছিল।

'মহারাজ, নিমকহারামী করবো আমি! এই সব খুনখারাপীর ব্যাপারে নিজের ইজ্জৎটাই খুইয়ে বসতে হয়। আমাকে দাড়ি চেঁচে ফেলতে হয়েছে, এমন কি আমার ধর্ম পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছে! কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুতেই আপনার নিমকহারামী আমি করতে পারব না, হুজুর। একটা কথা হুজুর, আপনার সম্বন্ধে ঠাকুর সাহেবের আসল মনোভাব

যতটা আমি সংগ্রহ করেছি তাতে, আপনাকে অনুরোধ করব যে, হুজুর, তাঁর সম্বন্ধে যেন সাবধান থাকেন।'

'কি সংগ্রহ করেছ খোদাবক্স?···কিন্তু খানসামা, আমার খাবারের কি হলো? কোথায় ঐ পায়রাগুলো পাকাবে, না, এখানে বসে বসে বক বক ক'রে যাচ্ছ!'

'হুজুর, ভামরু সর্দার পায়রা পাকাচ্ছে,' আশ্বাস দিয়ে খোদাবক্স বলে: 'এখুনি আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।'

'থাক এখন, ওগুলো লাঞ্চের সময় দিও। তুমি আমার চাচা-সাহেব সম্বন্ধে বলো।'

'কি আর বলব হুজুর,' বিনম্র কণ্ঠে খোদাবক্স বলে। মহারাজার সম্বন্ধে অশোভন মন্তব্য সে যা শুনেছে তা বলতে যেন সে পারছে না। কথা বলতেও হয় বেশ সাবধানতার সঙ্গে, কারণ কোন কথা থেকে বিচিত্রমতি মহারাজা আবার ধরে না নেন যে রাজশত্রুদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

খোদাবক্স যখন মনে মনে কথা সাজিয়ে নিচ্ছে, তখন হিস হাইনেস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হঠাৎ মাথা নেড়ে আমাকে বলেন:

'জানিনা, গঙ্গী কেন আমার সঙ্গে ওরকম করছে। ও বুঝতে চাইছে না যে, আমি ওর জন্যে সব কিছুই করতে পারি।'

'স্নায়ুদুর্বল রোগীদের অভ্যাসই হলো নিষ্ঠুরতা, আর আপনি যে ওর জন্য সবকিছু করতে পারেন, ও তা জানে বলেই আপনার সঙ্গে ঐরকম করছে।'

আমার কথাগুলো যেন বুঝলেন হিজ হাইনেস।

'ঠাকুর সাহেব শতদ্রু নদীর পারের জমিগুলো চান। ওসব জমি নাকি আপনার বাবা ও ঠাকুর সাহেবের স্ত্রী,—আপনার চাচী সাহেবার মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল—' নিজের মনেই কথা বলছে

এইভাবে খোদাবক্স বলতে থাকে : 'ঠাকুর সাহেব বলেন যে, এর ওপর একটা দলিলও আছে সরকারী অফিসে। কিন্তু আপনি নাকি বলেছেন যে, ঐ দলিল পাওয়া যাচ্ছে না…'

'বেতমিজ চ্যাচা শালা কি বলতে চায় যে আমি দলিলখানা চুরি করেছি?' রক্তচক্ষু হিজ হাইনেস চেঁচিয়ে বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান। দেয়ালের আড়াল থেকে বাইরে তাকাবার সময় বাঘের চোখের মতন তাঁর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে।

'আর দু'জন ঠাকুর সাহেব, মোহনচাঁদ ও শিবরাম সিং, প্রায়ই ঠাকুর প্রদ্যুম্ন সিংয়ের বাড়ীতে এসে জমা হন হুজুর, তার পর সকলেই একসঙ্গে মদ খেয়ে হুজুরকে গালিগালাজ করেন।'

'আমি জানি, জানি। আমি জানি প্রতিটি লোক আমার পেছনে লেগেছে।'

'ওঁদের অভিযোগ কি?' আমি জিজ্ঞেস করি খোদাবক্সকে।

'ডাগদার সাহেব, ঐ দলিলে বলে আছে যে বেনারসের শ্যামপুর প্রাসাদ, দিল্লী, লাহোর, অমৃতসর, হরিদ্বার ও বোম্বাইয়ের সব সম্পত্তি ও বাড়ী এবং শতদ্রু পারের কতকগুলো জমির হকদার বলে তাঁরাই। ঐ যে, যে-দলিলখানা হারিয়ে গেছে ব'লে বলছেন—'

এক টুকরো হাড় নিয়ে কুকুরের দল যেরকম কামড়া-কামড়ি করে, ঠিক সেই ভাবে এই সব যে উত্তরাধিকারী জ্ঞাতি ভাইয়েরা ঝগড়া করে। এদের এইসব কাণ্ড দেখে মনে হয় যে, যা নিয়ে এদের এই মারামারি, সেই সমস্ত অধিকার প্রজামগুলের দ্বারা যতটা বিপন্ন হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশী হবে কম্যুনিষ্টদের দ্বারা। সত্যিই বিস্মিত হতে হয় এই দেখে যে, বিপর্যয়ের মুখেও সুবিধাভোগী জীবরা কিভাবে তাদের মান-মর্যাদা ও সম্পত্তি নিয়ে মারামারি করে! সবই যখন

শেষ হবার উপক্রম, তখন যেন তাদের দ্বেষ-হিংসা ও আশঙ্কা এবং বিরোধের ভাবটাও ষোলকলায় বর্ধিত হতে থাকে।

'এইসব গুলিছোড়া-ছুড়ির ব্যাপারেও কিন্তু ঠাকুর সাহেবরাই ইন্ধন যোগাচ্ছেন হুজুর।' খোদাবক্স বলে: 'আর হুজুর আপনি নিজে, জেনারেল সাহেব আর ফৌজ নিয়ে এখানে এসে ভালই করেছেন। নির্দোষ লোকেরা এতে মনে জোর পাবে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, টেবিল সাফ কর!' অধীর হয়ে টুলীপ হুকুম দেন। খোদাবক্স মাথা নত ক'রে সেলাম বাজিয়ে প্রাতঃরাশের পেয়ালা-পিরিচ সরাতে শুরু করে।

টুলীপ সুদৃশ্য ভোজনকক্ষের দোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন। কিন্তু আকাশের দীপ্ত আলোক সহ্য করতে না পেরে তিনি ফিরে তাকালেন আমার দিকে। হাত দুটো ঘষতে ঘষতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন:

'রাজ্যের গোলমাল আর আমার নিজের ব্যক্তিগত ঝামেলা একই সঙ্গে একই সময়ে শুরু হয়েছে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই আমি। আমার ভাগ্যে কেনই বা এসব ঘটলো ডাক্তার? আমি যে ক্রমশঃই কোণ-ঠাসা হয়ে পড়ছি!'

ক্ষণকাল নীরব থেকে আমি বললাম: 'দুর্বল-পাকযন্ত্র ভোজন-বিলাসীর অতিলোভ আর দুর্বল-মন প্রেমিকের মেয়েমানুষের প্রতি কামনা-বাসনা—বুঝলেন টুলীপ, এসব থেকেই মানুষের যতকিছু অসুবিধা ঘটে।'

'ওসব দর্শন আওড়ানো থামাও তো ডাক্তার, ওতে কিছুই লাভ হয় না।'

'কিন্তু সত্য গোপন করলেই বা কি লাভ হবে, টুলীপ! অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি যে এভাবে আলোচনা করলেই আশঙ্কা ও দুঃখের কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।'

'কিন্তু কি ক'রে এ-সব থেকে মুক্তি পেতে পারি আমি ডাক্তার?'

'আমার মনে হয়, টুলীপ, জীবনের ওপর দাবী-দাওয়ার বহরটা সীমাবদ্ধ রাখলে,' বুঝবার মতো ভাষা যে প্রয়োগ হচ্ছে না তা আমি বুঝতে পারছি। তা সত্ত্বেও আমি বলে যাই: 'আর মানসিক সংঘাতের মূল উৎসগুলো ধরতে পারলে অনেকটা মুক্ত হওয়া যায়। স্বার্থপর অবিবেচক, অস্থির-চিত্ত, অসন্তুষ্ট, হিংসা-পরায়ণ ও আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে অনবরত নিজেকে বঞ্চিত ক'রে চললে কখনই মুক্ত হ'তে পারা যায় না।'

আমার উপদেশের রূঢ়তা উপলব্ধি ক'রে নিজেকে সংযত করলাম।

'যা মনে আসে তাই বলে যাও বন্ধু। আমি মুখ বুজে শুনব। তবে তিরস্কারটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় অনুগ্রহ ক'রে খেয়াল রেখ।'

'নিতান্ত কচি অবস্থাতেই আপনি পত্র-বহুল বৃক্ষে পরিণত হয়ে গিয়েছেন টুলীপ। প্রথমতঃ, বয়সে পা দেবার আগেই যৌন-চেতনায় আপনি এঁচড়ে পেকে গিয়েছিলেন আর—'

কিন্তু বারান্দায় কাদের যেন কথা শোনা যায়, আমার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়।

'আরে কোথায় গেল সেই বদমাশটা?' রাজা প্রত্যুম্ন সিংয়ের কণ্ঠস্বরের কর্কশ ধ্বনি কানে এসে বেঁধে: 'আমি ওকে বলতে চাই যে, মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি তো করছো, আর এদিকে প্রজারা সব বিদ্রোহী হয়েছে। সব প্রজাদের মধ্যেই আজ বিদ্রোহ! আরে ব্যাটা, এতটুকু লজ্জা নেই—!' দৃঢ়-গঠন শ্যামলা রঙের বেঁটে মানুষ, পালোয়ানের মতো গোঁফগুলো ওপরের দিকে পাকানো, দুগ্ধশুভ্র পাজামা আর বিরাট পাগড়ী মাথায় দিয়ে এসেছেন রাজা প্রত্যুম্ন ঠাকুর, মহারাজার চাচা, একেবারে বনেদী রাজবংশী জমিদারের সাজ।

'মহারাজা এখানেই আছেন,' বৃদ্ধকে ঠাণ্ডা করবার জন্ত তাঁর পেছন দিক থেকে জেনারেল রঘবীর সিং বলে।

'হাঁ, রাজাসাহেব রাগ করবেন না।' বৃদ্ধের পাশ থেকে ঠাকুর মোহনচাঁদ বললেন। লোকটি অগ্রজেরই জুড়িদার, তবে ইনি তাঁর চেয়ে একটু লম্বা ও ফর্সা।

'হাঁ, চাচা সাহেব, অন্ততঃ টুলীপ কি বলতে চায় তা আমরা শুনি।' ঠাকুর শিবরাম বললেন। আগত অভিজাতদের মধ্যে তিনি হলেন সর্বকনিষ্ঠ। বিলিতি কায়দায় জাঁক-জমকপূর্ণ শার্কস্কিন স্যুট পরেছেন তিনি, তবে তাঁর কানের স্বর্ণ-কুণ্ডল য়ুরোপীয় পোশাকের সবটাই মাটি ক'রে দিয়েছে।

'তোরা চুপ কর তো সব, হাঁদারাম!' বৃদ্ধ রাজ-খুল্লতাত চিৎকার করে ওঠেন: 'পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট করবার জন্ত আমি ওকে আজ একহাত শিক্ষা দেব। একেবারে গোল্লায় গিয়েছে ছেলেটা! আমরা কেউই ওকে এতদিন কিছু বলিনি। এখন ওকে জুতোপেটা করা দরকার! কোন্ একটা মেম্‌নীকে সেদিন বলে কি সব ক'রে এসেছে সিমলায়! বলে···থু, থু! আর সেই আর একটা কে আছে, কে একটা বামনী খানকি, গঙ্গাদাসী না কি নাম,—ওটাকে নিয়ে কি ঢলাঢলিই না করছে···ওটাকে আবার এখানে নিয়ে আসেনি তো? ওটাকে দেখতে পেলে চুল ধরে টেনে বের ক'রে দিবি এখান থেকে।'

'এই যে চাচা সাহেব! জয়দেব, জয়দেব!' টুলীপ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাচা সাহেবের পায়ের ধুলো নেবার জন্ত দেহ নত করলেন।

এই আনুষ্ঠানিক অভিবাদনের সময় রাজা প্রদ্যুম্ন সিং শক্ত হয়ে নীরবতা অবলম্বন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু টুলীপ উঠে দাঁড়াতেই আবার আক্রমণ শুরু করলেন:

'পাপের আঁধারে দুনিয়াটা ছেয়ে গেল! হ্যাঁ, চারদিকে অন্ধকার! বেহায়া ছোকরা, তুমি আমাদের সম্পত্তির দলিলগুলো পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে এখন তোমার অফিস থেকে, আমাদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা ক'রে মূর্খের মতো বাদামী কাগজের চিরকুট পাঠাতে শুরু করেছ! তুমি কি মনে কর, সমস্যাটা এড়িয়ে চলতে পারবে?'

'কিন্তু, চাচা সাহেব, এ-সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে মিটমাট করতেই তো চাই।'

'এখন আর মিটমাটের চেষ্টা ক'রে কি লাভ?' বলতে বলতে বারান্দায় উঠে এসে একখানা বেতের চেয়ারে ধপাস ক'রে বসে পড়েন রাজা প্রদ্যুম্ন সিং। 'ক্ষেতের ফসল যখন চড়ুইয়ে খেয়ে ফেলেছে তখন আর অনুশোচনা ক'রে কি হবে? প্রথমে তুমি হলদে চিরকুট লিখে পাঠালে কেন? তার পর আমাদের চিঠিপত্র উপেক্ষা করতে শুরু করলে, আমরা যে লোক পাঠালাম তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলে না! আশ্চর্য্য!'

'আমি সিমলায় গিয়েছিলাম, চাচা সাহেব,' বিনম্র কণ্ঠে বলেন টুলীপ।

'হাঁ, হাঁ, সিমলায় গিয়ে তো কিসব ছাইভস্ম খাচ্ছিলে, সে-সবই খবর পেয়েছি। গোমাংস খেয়ে নিজের ধর্ম তো আগেই নষ্ট করেছ। এখন গো-খাদক মেমনীর সঙ্গে···ছিঃ, ছিঃ, এখন তো গঙ্গাজীর জলেও তোমার শুদ্ধি হবে না বোধহয়। জানিনা, দুনিয়া কোন্ পথে চলেছে, আমাদের পরিবার একদিন পবিত্রতা ও মহত্ত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল। তুমি ব্যাটা আমাদের বংশের মর্যাদা নষ্ট ক'রে আমাদের সুনাম ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছ!'

'আজকাল কিন্তু চাচা সাহেব তরুণরা আহার ও নারী সম্বন্ধে কিছুটা স্বাধীন ভাবেই চলে।' কথাবার্তাটা হাল্কা করার বাসনায় আমি বললাম।

'হুঁ, বেশ বুঝলাম তোমার কথা। রাজপুত্র ও অভিজাতেরা যে-কোন মেয়েকে নিতে পারে, বেশ, সেকথা আমি মেনেই নিলাম।' ভ্রূভঙ্গি সহকারে বৃদ্ধ বলেন: 'কিন্তু গোমাংস খেয়ে নিজের ধর্ম নষ্ট করবে! নিজের মাথাটা একেবারে বসে বসে চিবিয়ে খাবে!'

'দাদা,' তরুণ শিবরাম সিং বলেন: 'প্রথম মহাযুদ্ধে আপনি নিজেই তো কালাপানির ওপারে কিছুকাল ফ্রান্সে কাটিয়ে এসেছেন, আর—।'

'চুপ, চুপ, তোর অত কথা বলার দরকার কি? তুই কি ভেবে কথা বলছিস্ তা আমি জানি!···তোর অধিকারটা তুই চাস্ না যে এই কুত্তার হয়ে কথা বলছিস?'

'তা হ'লে ধর্মের কথা বাদ দিয়ে আসল সমস্যাটা নিয়েই আলোচনা করা যাক,' আত্মীয়-শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সাহস সঞ্চয় ক'রে হিজ হাইনেস বলেন।

'কিসের আলোচনা?' রাজা প্রদ্যুম্ন সিং দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেন। চোখ দুটো তাঁর মংগরিল কুকুরের মতো জ্বলে ওঠে। 'আমাদের বৈধ সম্পত্তি আবার ফিরে পাবার জন্যে আমরা তোমাকে জানিয়েছি অনেকবার। তুমি যখন কিছু করলে না, তখন আমরা দিল্লীতে সরকার বাহাদুরের কাছে আপীল করেছি। আর প্রজামণ্ডল যখন তোমার খতম চায়, তখন আমাদের দাবী মেনে নিয়ে শত্রুর সংখ্যা হ্রাস করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তোমার পক্ষে।'

'ওভাবে আমাকে চিট্ বানাতে পারবেন না, চাচা সাহেব!' মুখ ফিরিয়ে এবং কণ্ঠস্বরের মধ্যে রাগের ভাবটা ফুটিয়ে টুলীপ এবার বলেন।

'বেশ, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি,' রাজা প্রদ্যুম্ন সিং উঠে দাঁড়িয়ে শিকার-ভবনের মেঝের বাঁধানো বারান্দার ওপর তার প্রকাণ্ড লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে পাগলের মত চিৎকার ক'রে ওঠেন।

এক মুহূর্তে বাইরের বনভূমির সবুজের প্রাচুর্য যেন বাক্‌-বিতণ্ডার উত্তাপে জ্বলে ওঠে, ঐ উত্তাপ যেন দিনের দীপ্ত আলো প্রজ্বলিত ক'রে দেয়।

'আমাকে মাস-খানের সময় দিন, আমি সমস্ত আত্তি-আত্মীয়দের ডেকে সবরকম ন্যায্য দাবী মিটিয়ে দেব।' টুলীপ বলেন।

'কিন্তু তুমি যে বলছ, দলিল পাওয়া যাচ্ছে না?' তরুণ ঠাকুর শিবরাম সিং বলেন।

'শুধু কথার মার প্যাঁচে আর দায়িত্ব এড়াতে পারবে না বেটা,' ঠাকুর মোহনচাঁদ মন্তব্য করেন।

'এক মাস অপেক্ষা করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না,' কর্কশ কণ্ঠে রাজা প্রত্যুম্ন সিং বলেন: 'এরকম বদমাশের সঙ্গে আলোচনারই বা কি দরকার?'

'চাচা সাহেব, আমায় গালমন্দ করছেন, আমি নীরবে সহ্য করছি। এরকম যদি চালাতেই থাকেন, তাহলে এর প্রতিবাদের জন্যে আমাকে কিন্তু পরে দায়ী করবেন না।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে টুলীপ বলে ওঠেন।

'তোমার মতো অপদার্থের সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যেও কথা বলতে চাই না,' বৃদ্ধ রাজ-খুল্লতাত চিৎকার ক'রে বলেন: 'তোরা চলে আয় আমার সঙ্গে। ও জারজটা আমাদের সঙ্গে—'

কথা শুনেই আক্রমণ করার জন্য হিজ হাইনেস লাফ দিয়ে ওঠেন। বাঘের মতোই তাঁর হিংস্র গোঁ।

রঘবীর সিং দু'জনের মধ্যে এসে পড়ে মহারাজাকে নিরস্ত করে।

'দেখ, দেখ রঘবীর, পাজীটা তার বুড়ো চাচার গায় হাত তুলতে চায়! মূর্খ! অপদার্থ!' রাজা প্রত্যুম্ন সিং গর্জন করতে করতে এক রকম ভীত অবস্থাতেই পা'-দুটো কোন রকমে চালিয়ে বাগানে নেমে পড়েন।

হিজ হাইনেসের মুখখানা রক্তিম থমথমে হয়ে উঠেছে।

'আমি জানি, এই জারজটার সঙ্গে কথা বলার কোন দরকারই নেই,' বৃদ্ধ বলে যান: 'এখানে আসবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই হারামীর কাছে কোন কিছুই আমরা পাবো না!...'

'চাচা সাহেব, গালাগাল দেবেন না।' দীর্ঘ দেহটা সম্পূর্ণরূপে খাড়া ক'রে উঠে দাঁড়ান হাইনেস। তাঁর মুখের কশ বেয়ে ফেনা উঠছে। চেঁচিয়ে বলে ওঠেন তিনি।

বেশ একটু দূর থেকে লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে বৃদ্ধ চিৎকার করেন: 'আমি যা খুশী তাই বলবো!'

যে গাড়িতে চেপে অভিজাত তিন জন এসেছিলেন, তাই চেপে তাঁরা চলে গেলেন।

কোন্দলের উন্মত্ততা বাতাস অতিক্রম ক'রে উপরের দিকে উঠে সবকিছু যেন প্রজ্বলিত ও সঙ্কুচিত ক'রে ফেলে, শেষ পর্যন্ত চোখ ঝলসানো হলদে আলোর শিখা প্রচণ্ড দাবানলের উপরকার চকচকে আভার মতো আমাদের চোখের সামনে জ্বলতে থাকে।

শ্যামপুর শহরে ফিরে আসার পর দেখি গঙ্গাদাসী টুলীপের বৈঠকখানায় উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে।

'রাজ্যের সর্বত্র গোলযোগের কথা শুনতে পাচ্ছি,' সে বলে: 'কোথায় ছিলে? তোমার জন্য অধীর হয়ে পড়েছি! টুলী, কোথায় গিয়েছিলে, একটা খবরও তো আমাকে দিয়ে যেতে পারতে! তোমার খোঁজে সব জায়গায় লোক পাঠিয়েছি! কি দুশ্চিন্তায়ই না আমার সময় কাটছে!'

শ্যামপুরের গ্রীষ্মকালীন অপরাহ্নের দম বন্ধ করা গরমে টুলীপের গলদ ঘর্ম অবস্থা, চাচা সাহেব আর জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে ঝগড়ায় তাঁর

মেজাজটাও উত্তপ্ত, তার ওপর ক্ষুধার্তও বটে, কারণ, ঐ ভয়াবহ ঝগড়ার পর শিকার-ভবনে লাঞ্চের জন্যে আর আমরা অপেক্ষা করি নি। জেনারেল রঘবীর সিং যদিও টুলীপকে আশ্বাস দিয়েছে যে, তাড়াতাড়িই গোলযোগের অবসান ঘটবে, তবুও পান্নাগ্রামের কাছে মাঝে মাঝে যে সমস্ত গুলির আওয়াজ আমরা শুনতে পেয়েছিলাম, তাতে টুলীপ সারা পথ রীতিমত অস্বস্তিই বোধ করেছেন। মুখখানা তাঁর কুঞ্চিত, যেন একটা শূন্যতার ভাব, একরকম নৈরাশ্য ও আসন্ন বিপর্যয়ের আশঙ্কা তাঁকে পেয়ে বসেছে। ফেরবার সময় তিনি গাড়িতে বিশেষ কোন কথাই বলেন নি।

'কি হয়েছে?' গত রাত্রে যে গঙ্গী তাঁকে ঘরে থাকতে দেয়নি, সে যেন সে-কথা ভুলেই গিয়েছে, তাদের দু'জনের মধ্যে যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে, সে-কথাটি একেবারে মনে না করেই গঙ্গী জিজ্ঞেস করে। নিতম্বিনী গঙ্গী দুলতে দুলতে হাইনেসের দিকে এগিয়ে যায় মন-ভুলানো কটাক্ষপাত করতে করতে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং সেই সঙ্গে রাগান্বিত অবস্থায় হাইনেস সরে দাঁড়ান। তার পর তিনি অপাঙ্গে গঙ্গীর দিকে তাকান।

মদির আঁখির কটাক্ষ হেনে গঙ্গী হিজ হাইনেসের পাশে এসে দাঁড়ায়, মুখে তার রক্তিমাভা, নিজের অফুরন্ত যৌবনের আনন্দে বিড়ালের মতো ঘড়ঘড় শব্দ করতে থাকে।

আবার গঙ্গীর জালে ধরা পড়বার আশঙ্কা জাগে টুলীপের মনে। এমনি ক'রে কাছে টেনে নিয়ে আবার দূরে নিক্ষেপ করবে? একটা বেদনাভরা দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন, যদিও ঠোঁটের কোণে তাঁর হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে ওঠে।

সহসা গঙ্গী হাইনেসের কুঞ্চিত মুখমণ্ডল স্পর্শ ক'রে মৃদু করাঘাত করে।

আর সঙ্গে সঙ্গে টুলীপ তার দিকে ঝুইয়ে প'ড়ে তার সবুজ চোখ ও মুখের ওপর তাকিয়ে তাকে চেপে ধরেন, তার মুখ চেপে আস্তে আস্তে ঠোঁট দুটো মৃদু সঞ্চালিত করেন। এমনি ভাবেই তিনি আত্মসমর্পণ করেন। আর সেই অবসরে আমি ধীরে ধীরে স্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে আসি।

'প্রাণ আমার,' যেতে যেতে আমি শুনি টুলীপ বলছেন : 'প্রিয়তমা প্রাণ আমার! গত রাত্তিরে কেন আমায় ওভাবে তাড়িয়ে দিলে? কেন? তোমার জন্যে কি যে আমি করতে পারি তা তো তুমি নিজেও জান। ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট যদি তোমাকে বিয়ে ক'রে তোমাকে আমার মহারানী করতে অনুমতি না দেয়, তাহলে আমি হাসিমুখে চাষার ছেঁড়া কাপড় পরে মাঠে গিয়ে কাজ করবো। তুমি শুধু আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর, তাহলেই আমি তোমার কাছে আমার জীবন উৎসর্গ করবো · প্রিয়তমে…'

কৌতূহল বশে দরজার বাইরে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর এই সমস্ত প্রেমের ঘোষণাবাণী ওৎ পেতে শুনলাম। কিন্তু এভাবে শুনতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যাই এই আশঙ্কায় নিজের ঘরে চলে এলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এটা হলো আংশিক পুনর্মিলন মাত্র। নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যেই গন্ধী এই হবুচন্দ্র রাজার সঙ্গে চালাকী খেলছে। এই বোকা মানুষটি এই মেয়েটিকেই একমাত্র অবলম্বন ভেবে একান্তভাবে তার কাছে আত্ম সমর্পণ ক'রে বসেন বটে, কিন্তু তাঁর জন্যে সত্যিকারের ভালোবাসার আবরণটার ওপরে ওই মেয়েটির একটা উদগ্র লোলুপতাই মাত্র সঞ্চিত রয়েছে।

সেদিন আর আমি টুলীপের সঙ্গে দেখা করলাম না। আপাতঃ দৃষ্টিতে এদের এই গৃহে প্রত্যাবর্তন রীতিমত আন্তরিক বলেই আমি

গ্রহণ করলাম। সমস্ত দিন তাঁরা কেউ কাছ-ছাড়া হবে না এ আমি জানি। আমিও দিন ভর শুয়ে-বসে বিশ্রাম লাভ ক'রে আনন্দ লাভ করলাম। কিন্তু পরদিন, সকালে শতদ্রু নদীতে সাঁতার কেটে বাড়ীতে ফিরে এসে পেলাম একখানা খামের ওপর অস্থির চিত্তে আঁকবাঁকা নাম লেখা অদ্ভুত ধরনের চিঠি। আমার ভৃত্য, বন্ধু, পথ-প্রদর্শক ও দার্শনিক ফ্রান্সিস আমাকে বললে যে, যখন আমার প্রাতঃভোজনের জন্য এক প্যাকেট কর্নফ্লেক আনতে সে শ্যামপুর বাজারে গিয়েছিল, তখন কে একজন এই চিঠিখানা তার হাতে গুঁজে দিয়েছে। প্রাতঃরাশের টেবিলে বসে আমি চিঠিখানা খুলে পড়লাম। চিঠির প্রত্যেকটি শব্দের ওপর আমার বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হতে থাকে। মনে হয় যেন আকাশের চাঁদ খসে পড়ছে, সমস্ত পৃথিবী গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে আর সেই দূরবর্তী চাঁদ থেকে উচ্চারিত হতাশার বাণীর মতো প্রত্যেকটি শব্দ আমার কানে এসে ঘা দিচ্ছে।

"প্রিয় ডাঃ শঙ্কর,

"আপনার অর্ধমৃত বিবেককে স্পর্শ করবার এবং স্বৈরাচারী তরুণ মহারাজার ওপর আপনি প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন এই বৃথা আশা নিয়েই চিঠিখানা লিখছি। আপনার মহারাজার স্বৈরশাসনের কল্যাণে আমি ও আমার কয়েকজন কমরেড উধমপুর জেলের নরককুণ্ডে অবরুদ্ধ হয়ে দিন গুনছি।

"কৃষি ঋণ থেকে অব্যাহতি এবং 'হাতীয়ানা' 'মোটরানা' প্রভৃতি অবৈধ ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দাবী ক'রে শ্যামপুরের পল্লীবাসীদের এক শোভাযাত্রা পরিচালনের সময় ১৯৪৮-র ১৪ই আগষ্টে আমি ও আমার ছয় জন সাথী গ্রেফতার হই। অতঃপর আমার ও আমাদের কমরেডদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন না ক'রে, বিনা বিচারে এখানে আটক রাখা হয়েছে। বিনা বিচারে আমাদের আটক রাখার বিরুদ্ধে মহারাজার

কাছে, দেওয়ানের কাছে ও ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছি, কিন্তু কোন উত্তরই পাই নি। বোধহয় আমাদের জন্যে বহির্জগতের কোনই অস্তিত্ব নেই, বন্দীদের মনে এই ধারণা জন্মাবার জন্যেই তাদের এই নীরব উপেক্ষা। আশা করি, পৃথিবীর বিবেক বস্তুটি যে একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি, অন্ততঃপক্ষে এই বিশ্বাসটি আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করবার জন্যেই আপনি এই পত্রের প্রাপ্তিসংবাদ আমাদের জানাবেন।

"প্রকাশ্য আদালতে আমাদের বিচার করা অথবা মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে একগুঁয়ে মহারাজাকে সম্মত করাতে আপনি না পারলেও, আমাদের মনে হয়, অন্ততঃপক্ষে এই জেলের বর্বরোচিত অমানুষিক অবস্থা সম্বন্ধে মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আমাদের আবদ্ধ থাকা কালীন দুঃখকষ্টের কিছুটা লাঘব সাধন করতে হয়তো আপনি পারবেন।

"আমাদের পক্ষ থেকে, শাসকের মনে যদি সামান্য বিবেক-বুদ্ধিও অবশিষ্ট থাকে, তাহলেই তা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই, আমরা আজ থেকে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করছি। যতদিন পর্যন্ত আমাদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করা না হবে, ততদিন আমরা অনশন চালিয়ে যাব।

"আমাদের দাবী-দাওয়ার কথা জানাবার পূর্বে এখানে যে আমাদের দিন কিভাবে কাটছে তা আপনাকে জানাতে চাই।

"দু' জন নেতা, দেবী প্রসাদ ও আমাকে, আটক ক'রে রাখা হয়েছে একটা প্রথম শ্রেণীর সেলে। এটি হলো একটি অন্ধকার কুঠুরি, খোলা পাত্রে রক্ষিত আমাদের মূত্রের গন্ধে এ-কুঠুরি সদাসর্বদা দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। উধমপুরের গ্রীষ্মকালীন গরমে আমাদের এই সেলে শ্বাস-রুদ্ধ অবস্থায়, প্রত্যেকটি নিশ্বাসই শেষ-নিশ্বাস বলে মনে হয়, অথচ প্রাণবায়ু বহির্গত হয় না। নয় ফুট দীর্ঘ ও ছয় ফুট প্রস্থ এই কোণ-ঠাসা কক্ষে যখন আমরা চলাফেরা করি, তখন লৌহ-ফটকের মধ্য দিয়ে সশস্ত্র প্রহরী

আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখে। জেলরক্ষী সব সময় ফটকের বাইরে নিয়মমাফিক চলা-ফেরা করে।

"অন্যান্য বন্দীর সংখ্যা প্রায় বারো জন। এদের রাখা হয়েছে এক তৃতীয় শ্রেণীর ডর্মিটরিতে। এই ডর্মিটরটি তিরিশ ফুট লম্বা ও দশ ফুট চওড়া। এখানে তাদের ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থায় রাখা হয়েছে: এখানে কোন পায়খানার ব্যবস্থা নেই; ঘরের এক কোণে সকলেই রাত্র মলমূত্র ত্যাগ করে, ফলে, একে একে সকলেই ম্যালেরিয়া, হুকওয়ার্ম, রক্তাল্পতা ও যক্ষ্মা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে।

"আমাদের সকলকেই ঘুমুতে হয় সিমেণ্টের মেঝেতে, রাত্রে শয়নের কোন বিছানা বা কম্বল আমাদের দেওয়া হয় না। ফলে, গত বছর শীতকালে দু'জন নিউমোনিয়ায় মারা গিয়েছে, একজন মরেছে পেটের যন্ত্রনায় আর বাদ বাকী সকলেই বাতে ভুগছে।

"জেলের ডাক্তার খুব কমই আমাদের দেখে থাকেন, শেষ পর্যন্ত রুগ্ন আটক বন্দীদের মধ্যে একজন তাকে আক্রমণ করে। এবং এই বলে তাকে ভীতি প্রদর্শন করে যে, চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে তাকে সে খুন ক'রে ফেলবে। এই আটক বন্দীটি মারা গিয়েছে, তবে জেল-ডাক্তার এখন সপ্তাহে একদিন ক'রে আমাদের দেখতে শুরু করেছেন।

"আমাদের পালা ক'রে রান্না ক'রে নিতে হয়। আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন আধ সের হিসেবে চাল পাই, ফলে আমরা কঙ্কালসার হয়ে পড়েছি। লোহার পাত্রে আমরা খাই, খাওয়ার পর ওগুলো সেলের ভেতরে ইতস্তুতঃ পড়ে থাকে, ফলে সারাদিন আমাদের মাছির উপদ্রব সহ্য করতে হয়।

"দশ গজ দূরেই জেলের সাধারণ হেঁসেল আর তারই ফলে আমাদের সেল কাঠের ধোঁয়ায় ভরে থাকে; কোন ড্রেন না থাকায় রান্না ঘরের জল আমাদের সেলের সামনে ছোট উঠোনে জমা হয়, শেষ পর্যন্ত ঐ জল

প্রায় পঁচিশ গজ দূরে অবস্থিত খোলা কুয়োর মধ্যে চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। ঐ কুয়োর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে সাংঘাতিক শত্রু মশার সঙ্গীত সব সময়েই শুনতে পাওয়া যায়।

"নাৎসীদের বন্দী-শিবিরগুলো হয়তো আরও খারাপ হতে পারে, কিন্তু আমাদের এই জেলখানা নিশ্চয়ই লাহোর ও দিল্লী কোর্টের চেয়ে ভাল নয়। যুদ্ধের সময় বৃটিশরা ঐ দুই জায়গায় আটক বন্দীদের নিগৃহীত করতো। আর যে অনুপাতে এখানে লোক মরে তাতে, ইংল্যাণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর কুখ্যাত নিউগেট ও ডার্টমুর জেলের সঙ্গে এই জেলের তুলনা করা যেতে পারে।

"দিনরাত ধরে, এমন কি রান্না করা ও কাজ করার সময়েও আমাদের গলা ও হাত-পা থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, ফলে আমাদের মধ্যে কয়েকজনের দেহের মাংস ফুলে গিয়ে পুঁজ পর্যন্ত হয়েছে।

"আমাদের কোন বই, কাগজ বা লিখবার উপকরণ দেওয়া হয় না। যে কাগজে এই চিঠিখানা লিখছি, তা এক কয়েদী ওয়ার্ডার জেল অফিস থেকে চুরি ক'রে এনেছে; এজন্য আমাকে একটি রূপোর আংটি ঘুষ দিতে হয়েছে। আংটিটা আমি জেলের মধ্যে পুলিশের অজ্ঞাতসারে নিয়ে এসেছিলাম।

"সন্ধ্যার সময় আমাদের জোর ক'রে প্রার্থনা সভায় সমবেত করা হয়। এই সময় আমাদের জোর ক'রে বলানো হয়—'মহারাজা সাহেব কি জয়!' 'শ্যামপুর রাজ কি জয়!'

"জেলার সাহেব সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে এক পঞ্চমবাহিনী সৃষ্টি করেছে। যে আটক বন্দী আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে টাকা এনে ঘুষ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের খোঁজ খবর জেলারকে জানানোই হচ্ছে এই পঞ্চমবাহিনীর কাজ। জেলার ও কয়েদী-ওয়ার্ডাররা এই সমস্ত ঘুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেয়। এই সমস্ত

জেল কর্মচারীর দল ও ওয়ার্ডাররা যেন এক-একটি বড় বড় মাছি যারা ছোট ছোট মাছির রক্ত শোষণ করছে, ছোট মাছিরা আবার আরো ছোট মাছিকে শোষণ করছে, ফলে শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষের ওপর সমস্ত আস্থাই হারিয়ে ফেলছে।

"এই সব অবস্থার জন্য, আমি নিম্নলিখিত দাবীগুলো আপনার সামনে রাখতে চাই। আপনি দেখবেন যে দাবীগুলো সবই বাস্তব। আশা করি, আপনি এ-গুলো মহারাজার কাছে উপস্থাপিত করবেন। এই সমস্ত দাবী যদি পূরণ করা হয় তবেই আমরা অনশন ভঙ্গ করতে পারি।

(১) বিনা বিচারে যাদের আটক রাখা হয়েছে প্রকাশ্য আদালতে তাদের বিচার করতে হবে অথবা বিনা সর্তে তাদের মুক্তি দিতে হবে।

(২) এইসব ডেটিন্যুদের শ্রেণী-বিন্যাস প্রথা রদ করতে হবে। সকলের জন্য একই রকম খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) এদের সবাইকে বই ও খবরের কাগজ সরবরাহ করতে হবে।

(৪) এদের সকলের পরিবারের জন্য ষ্টেটকে যথোপযুক্ত পারিবারিক ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) জেলগুলির অবস্থা তদন্ত করা ও মানবতা ও ন্যায় বিচার যাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে তার জন্য, এই সমস্ত বেলসেন ও বুকেনওয়াল্ডের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করতে হবে।

"আপনার বিশ্বস্ত;

"সোমনাথ।"

এই চিঠিখানা সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে আমার মনের মধ্যে এমন তোলপাড় আরম্ভ হলো যে, এই মনের ভাবকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা বলা যেতে পারে। পান্না-গ্রামের পথে গেরিলার ভয়ে যে জরুরী কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম, আমার বিবেকের কাছে এই চিঠির আবেদনও তেমনি জরুরী মনে হয়। তবুও মহারাজার অধীনে চাকুরী করবার জন্য এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আমি আছি, যার জন্য আমার অন্তর আমাকে সতর্ক ও সংযত হয়ে চলারই নির্দেশ দেয়। মহারাজাকে নিয়ে একটা ভাবনা থেকে আর-একটা ভাবনায় উৎক্ষিপ্ত ভাসমান অবস্থার ভেতরেই আমি হঠাৎ অনুভব করি যে আমি দুঃখ-দুর্গতির দুর্বিসহ বিবেকেই যেন পরিণত হয়ে গিয়েছি। এই সমস্ত বীর যোদ্ধারা যেখানে নিজেদের আদর্শের জন্য অনশন করছেন, কি বিরাট তাঁদের ত্যাগ, আর আমি তখন কি করছি? আমার নিজের অকর্মণ্য জীবনের অপরাধ-বোধ আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে। অনুভব করি, আমার চোখের উপর ছায়াগুলো যেন ঘন হয়ে আসছে। দেহের মধ্যে রক্ত চলাচল এত দ্রুত গতিতে হচ্ছে, মনে হয়, যেন রক্তের চাপ মাথার ভেতরে তীব্র বেগে আঘাত করছে। বন্দীদের দাবীগুলোর মূল বিষয়বস্তু আর গোটা শ্যামপুর রাজ্যের সমস্যার ওপর বারে বারে আমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করি। কিন্তু কয়েকটা অর্ধ-সত্যের ক্ষীণ আলোকরশ্মি এবং সমগ্র পরিস্থিতির কয়েকটা দিক ছাড়া মনের মধ্যে এক বিরাট শূন্যতাই আমি অনুভব করি। পরিষ্কার ক'রে বিশেষ কিছু চিন্তা করতে পারি না। স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে দেখি, আশঙ্কার কুহেলিকা আমার মন আবৃত ক'রে রেখেছে। বাস্তব জীবনের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে দেখি, নিশ্চেষ্টতাই আমাকে পেয়ে

বসেছে; আর তার ফলে আমার পক্ষে কোনরকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবই হয় না।

শেষ পর্যন্ত আমার নিজের সম্বন্ধে অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে নতুন ক'রে ভাবতেও চেষ্টা করি। যে-সমস্ত বিষয় চিন্তা করি তা মুখে উচ্চারিত না হ'লেও, আমি যেন নিজের মনেই আলাপ-আলোচনা শুরু করি; এই কথাবার্তার ধারাগুলো এক জায়গায় করলে অনেকটা এইরকম হয়:

'তুমি কে?'

'আমি? আমি মানুষ। অর্থাৎ যুক্তি ও উক্তির অবদান আমার মধ্যে রয়েছে, আর কি করতে হবে না-হবে আমি নিজেই বেছে নিতে পারি। আমি স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী, কোন কিছুরই ক্রীতদাস বা অধীনস্থ জীব আমি নই।'

'কিন্তু তুমি যে আদর্শ-মানুষ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলে দেখছি! প্রকৃতপক্ষে তুমি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, স্বাধীন ইচ্ছা একটুকুও তোমার নেই। অবশ্য যুক্তি দেখাবার ক্ষমতা তোমার আছে এবং তারই জন্যে তুমি জন্তু-জানোয়ার থেকে ভিন্ন জীব, সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, তুমি কতকগুলো অধিকার ও দায়-দায়িত্বসহ নাগরিকও বটে।'

'হ্যাঁ, যত গোলমাল তো ঐখানেই। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্রগুলো আমি আবিষ্কার করতে পারি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কয়েকটি দিকও আমার কিছু কিছু জানা, কিন্তু আমি সীমাবদ্ধ মানুষ, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার সমগ্র দেহের স্বার্থের ওপর নজর না রেখে চলতে-ফিরতে পারে না। আমার ওপর পৃথিবীর যে দাবী রয়েছে তার দিকে লক্ষ্য না রেখে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা কখনই সম্ভব নয়, তা আমি জানি।'

'কিন্তু, অধিকাংশ সময়েই তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার সমগ্র দেহের ওপর নজর না রেখেই চলাফেরা করে। আর তোমার দেহটাও তোমার মনের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে না। আর মনটাও কি সব সময় সজাগ থাকে হে! কাজে-কাজেই, সমষ্টি যদিও ব্যষ্টির চেয়ে বড়, তবুও বাস্তবিক পক্ষে তুমি কাজ কর আংশিক জ্ঞান ও খোলা মন নিয়েই। আর প্রায়ই তুমি এমন সব কাজ কর যা আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর মনে হয়; পরে দুঃখ-কষ্ট কিছু এলেও তার ওপর তোমার কোন নজরই থাকে না।'

'তাহ'লে আদর্শ-মানুষ হ'তে পারলাম কই?'

'হাঁ বাস্তবিকপক্ষে, কোন সময়েই তুমি তোমার আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারছ না।'

'তাহ'লে দেখছি জন্তু-জানোয়োর আর আমার মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে বিশেষ কোন পার্থক্যই নেই; গোরুর মতোই আমি আত্ম-সন্তুষ্টির জাবর কাটি আর কাদার মধ্যে পড়ে থেকে বেশ উপভোগ করি।'

'তাই যে স্বাভাবিক।'

'তাহলে তুমি কি মনে কর যে, অলসভাবে বর্তমান মুহূর্তের বা আগামী দিনের হৈ-হুল্লোর-স্ফূর্তির পায়ে নতি স্বীকার করলে অর্থাৎ, তোমার নিশ্চেষ্টতার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে সে-সম্বন্ধে কোনরকম চিন্তা-ভাবনা না করলে, তোমার কোনকিছু এসে যাবে না?'

'বিশেষ চাতুর্যের সঙ্গে অহমিকার নামাবলীর অন্তরালে আমার দোষ-ত্রুটিগুলো চেপে রেখে,—আর যেহেতু অধিকাংশ মানুষই তো এই পথেরই পথিক—অনায়াসেই সংসারক্ষেত্রে বিচরণ ক'রে যেতে পারব, তাতে একটু বিশ্বাস-ঘাতকতা করছি বলে মনে হতে পারে, এই তো!'

'তাহলে তোমার ভেতরে যে-সমস্ত দুষ্টগ্রহ রয়েছে তার বিরুদ্ধে তুমি লড়াই করতে চাও না। যদি তুমি ছাত্র হতে আর বিজ্ঞান সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার জন্যে যদি তুমি পরিশ্রম না করতে, তাহ'লে কি তুমি পরীক্ষায় পাশ করতে? তুমি কি ফেল করতে চাও, না, অজ্ঞতা দূর ক'রে পরীক্ষায় পাশ করতে চাও?'

'জ্ঞান লাভ ক'রে পরীক্ষায় পাশ করা আর বিজ্ঞ ব্যক্তি হওয়ার মধ্যে কোন স্বার্থকতা আছে কি নেই, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত ক'রে ভেবে কোন কিছু বলতে পারব না। অন্যান্য সব মানুষই যদি অজ্ঞ ও নির্বোধই থেকে যায়, তাহ'লে পরীক্ষায় পাশেরই বা স্বার্থকতা কোথায়?'

'যদি তোমার চাকুরি যেত আর হাতে যদি পয়সা না থাকতো তাহ'লে কিরকম হালটা হতো?'

'নিঃস্ব হ'লে নিশ্চয়ই দুঃখকষ্ট পেতাম।'

'তাহ'লে দেখছি, আত্মসম্মান, মর্যাদা, শীলতা ও ভদ্রতা থেকে বিচ্যুত হ'লে তুমি মোটেই দুঃখিত কিংবা নিজেকে নিঃস্ব মনে কর না। লম্পটরা কি আর পুরুষত্ব খুইয়ে বসে না? কাপুরুষ যারা, তারা কি আর নিজের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কিছু হারায় না?'

'যদি ওভাবে বলো তাহ'লে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, মহারাজার সঙ্গী হয়ে আমি অনেক আগেই আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলেছি।'

'এখন তার ক্ষতিপূরণের জন্য কি করতে চাও?'

'হ্যাঁ, হিজ হাইনেসের সঙ্গে আমার পার্থক্যটা সম্বন্ধে আমি বেশ সজাগই আছি।'

'তাহ'লে তোমাকে এই পার্থক্যগুলো বেশ বুঝে নিয়ে ডাক্তার হিসেবে টুলীপকে মানুষের মতো দাঁড়াতে সাহায্য করতে হবে, আর তা যদি না পার, তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবে।'

'তাহ'লে তাঁর ভেতরে যে সমস্ত সঙ্ঘাত চলেছে সেগুলোর কি হ'বে? ডাক্তার হিসেবে আমি তো সে-সবের বিচার করতে পারি না, তাঁর অবস্থাটাই মাত্র বুঝতে পারি।'

'বোঝাবুঝির প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে কতকগুলো মূল্যমানের তো সৃষ্টি হ'তে পারে। অসুস্থ বলে তো আর তিনি দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। বহু লোকেরই তো তাঁর এ সবের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তে হয়।'

'আচ্ছা, আমি এমন একটা বোঝাপড়ার মানদণ্ড সৃষ্টি ক'রে নেব, যা সবকিছু মানবার তুলাদণ্ডের মতো কাজ করতে পারে, এমন একটা কষ্টিপাথর বের করব যাতে সোজা ও বাঁকা জিনিস অনায়াসেই আলাদা করা যায়।'

'যদি তাই চাও, তাহ'লে বুঝতে পারছি, তুমি ইতিমধ্যেই ভাবতে আরম্ভ করেছ। অর্থাৎ দার্শনিক হয়ে পড়েছ। এভাবে তুমি অবশ্য এমন একটা জীবনপথ স্থির ক'রে নিতে পারবে...'

এই আত্ম-আলোচনা শেষ হ'তে না হ'তেই টুলীপের কাছ থেকে বার্তা এল মুন্সীজীর মারফত। সকালে কেনই বা যেতে দেরী করছি তার কারণ জিজ্ঞেস ক'রেছেন হাইনেস, আর শিকারের আয়োজন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য হাজির হ'তেও নির্দেশ দিয়েছেন। মিঞা মিথুকে বললাম যে আমি যাচ্ছি এক্ষুণি। বাস্, এই তো হয়ে গেল সিদ্ধান্ত! এই খামখেয়ালীপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে নিজের জন্য চিন্তা-ভাবনা করার সামান্য সুযোগই বা কোথায়? এখানে আমি তো চব্বিশ ঘণ্টার গোলাম...

টুলীপের কক্ষে যখন পৌঁছলাম, তখন সূর্যদেব মাথার ওপরে অনেকটা উঠে পড়েছেন। গ্রীষ্মকালে প্রাক্-দ্বিপ্রহর মুহূর্তে ভারতীয়

আবহাওয়ায় যে নিঃসীম নীরবতা বিরাজ করে, এই মুহূর্তে শ্যামপুরের প্রাসাদ-সীমানায় সেই নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। প্রাসাদের লনের ওপর মাত্র কয়েকটি চড়ুইপাখি ডাকতে ডাকতে উড়ছে, আর দেউড়ির গম্বুজে একটা কাক কা-কা ক'রে ডাকছে। প্রহরী হেঁটে হেঁটে শব্দ ক'রে তাকে তাড়িয়ে দিল। আর তারপরেই আবার সেই নীরবতা, ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। মহারাজার আবাসস্থলটিকে আড়ম্বর, শ্রদ্ধা ও অগম্যতায় মহিমা-মণ্ডিত করবার জন্যই এই নীরবতা যেন ইচ্ছে করেই গড়ে তোলা হ'য়েছে। রাজপ্রাসাদের চারধারের শান্ত-শ্রী উদ্যানের উপর অত্যাচারের বোঝার মতোই যেন এই নীরবতা চেপে বসেছে।

রাজবন্দীর চিঠিখানা পড়বার পর, আমার অন্তরের নিভৃততম কোণে যে সমস্ত চিন্তাধারা মাথা উঁচিয়ে উঠছিল, সঠিক ভাবে কেমন ক'রে সেগুলো প্রকাশ করতে পারব তা বুঝতে পারছিলাম না। টুলীপের কক্ষের দিকে যেতে যেতে বেশ উপলব্ধি করলাম আমার দুর্বলতা। বুঝি যে এই দৌর্বল্যের জন্য মনে অনুতাপ ভোগ করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায়ই নেই। ঝটিকার কেন্দ্রস্থলের শান্ত অবস্থার মধ্যে আমি যেন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটা দ্বীপের উপর দাঁড়িয়ে শ্যামপুরের মানুষদের যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছে তাই অবলোকন করছি ; মহারাজার শত্রুরা যেন রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে ; এদের মতের অমিল যাই থাক না কেন, এদের সর্বনিম্ন লক্ষ্য হচ্ছে মহারাজাকে অবনমিত করা। টুলীপ যেন নিজের নিঃসঙ্গতার ডোবায় ডুবছেন, যে-কোন তৃণখণ্ড ধরে নিজেকে ভাসমান অবস্থায় রাখবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছেন ; কিন্তু অপটু সাঁতারুর মতো তলিয়ে যাওয়াই যেন তাঁর একমাত্র নিয়তি···দু'দিন পরে তাঁর মৃতদেহ যখন ভেসে উঠবে, তখন তাঁর ভস্মরাশি সমাহিত করা হবে জাঁকজমক সহকারে, আর শ্যামপুরের শেষ-মহারাজার দেহাবশেষের পরিচায়ক হিসেবে

ঐ ভস্মরাশির ওপর একটা প্রস্তর ফলকও নিশ্চয়ই প্রোথিত করা হবে। আমি জানতাম যে, অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য মূর্তির ক্ষণিক-দীপ্ত আলোক-শিখার মতো হিজ হাইনেসও বেশ অনুমান করতে পারছিলেন যে, এক মহাবিপর্যয়ের দিকেই তিনি ভেসে চলেছেন। কিন্তু তবুও আশা করছিলেন, প্রখর বুদ্ধির সাহায্যে তিনি নিজেকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন।

আমার মনটা নিরাশা ও নিরুদ্যমে ভরে থাকলেও সেদিন সকালে টুলীপ কিন্তু বেশ হৈ-হল্লোর স্ফূর্তির মধ্যেই কাটাচ্ছেন দেখলাম।

'এই যে, বিশ্বনিন্দুক!' আমাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন: 'তোমার আবার কি হলো?'

ক্ষীণ হাসি হেসে আমি মুন্সীজীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, আর মুন্সীজী ইতিমধ্যেই করজোড়ে দাঁড়িয়েছেন মহারাজার সামনে।

'মিঞা মিথুও ঠিক তোমার মতোই।' টুলীপ বলতে থাকেন।

'অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি ভুল করেছি।' মুন্সীজী থতমত খেয়ে বলেন।

বুলচাঁদ একখানা আর্মচেয়ারে বসেছিল। মুন্সী মিথনলালের অবমাননায় তার মুখে দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল।

মুন্সীজীর রাজরোষে পতিত হওয়ার কি কারণ ঘটেছে তা অনুমান করতে পারলাম না। হঠাৎ শুনলাম বুলচাঁদের নাসিকা গর্জন। এই বদ অভ্যাসটা সে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজার দৃষ্টিও তার উপর পড়ল।

'আমার মনে হয় মিঞা মিথুর চেয়ে তুমি আরও বড় গাধা, যে-ভাবে নাক ডাকাচ্ছ তাতে তুমি একটা বিশ্রী আস্ত গাধা ছাড়া আর কি হতে পার!'

'আমাদের ওপর মহারাজার এই চমৎকার ঠাট্টাটার কারণ কি!' সাহস ক'রে জিজ্ঞেস করলাম।

'আঃ, তোমরা এমন সব গণ্ডমূর্খ যে তোমরা শুধু জীবনের খারাপ দিকটাই দেখতে পাও! মিলনের আনন্দটা যে কত গভীর, তা তোমরা বুঝতেই পার না…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন বুঝেছি,' অর্থপূর্ণভাবে মাথাটা একদিকে হেলিয়ে আমি বলে ফেলি : 'তা বেচারা মুন্সীজীর ওপর এরকম ক্রোধ বর্ষণের হেতু?'

'এই দায়িত্বশীল ভদ্রলোকটি আমেরিকান দূতাবাসের একটা টেলিগ্রাম দু'দিন ধরে নিজের পকেটে রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর আমি জিজ্ঞেস না করলে ও-সম্বন্ধে কোন কথাই বলতেন না!' রাগের ভান টুলীপের কণ্ঠে।

'কিন্তু মহারাজা তখন যে ছিলেন জেনানা মহলে…' নাকি সুরে মিখনলাল বলেন।

'তুমি হলে আমার একাধারে খুড়ো মশাই আবার মক্ষীরানী, তা আমার কাছে এলে না কেন বুড়ো সখী?'

'টেলিগ্রামটা কি খুব জরুরী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সমস্ত টেলিগ্রামই তো বাপু জরুরী!'

'তা বটে,' অবনত মস্তকে পরাজয় স্বীকার ক'রে নিলাম। 'আর এতে রাগ হওয়ারই কথা,' তাল সামলে নেবার জন্য কথাটা বলতে হলো।

'সময় সময় টেলিগ্রাম আনন্দ দানও তো করে।' টুলীপের ঠোঁটের কোণে হাসি।

'তা এমন কি সুখবর নিয়ে এল টেলিগ্রামটা?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'দিল্লীর মার্কিন দূতাবাসের মিঃ পিটার ওয়াটকিন্স আগামী কাল শিকার করবার জন্য এখানে দলবল নিয়ে পৌঁছোচ্ছে।'

'রাষ্ট্রদূত বুঝি ?'

'রাষ্ট্রদূতেরই কাছাকাছি। এ হলো একজন বড়দরের সেক্রেটারী। ঠিক মতো বলতে গেলে, রাষ্ট্রদূতের চেয়েও এর ক্ষমতা বেশী, কারণ প্রকৃত ক্ষমতা সব সময়েই তো অধীনস্থ লোকদের হাতেই থাকে।...'

'মহারাজা,' বুলচাঁদ বলে : 'শিকারের জন্য কিন্তু দিল্লীর স্বরাষ্ট্র বিভাগের লোকদের ডেকে আনাই আমাদের কর্তব্য। এ সব আমেরিকানদের দিয়ে আমরা কি করব ?'

'মূর্খ!' টুলীপ বলেন : 'রাষ্ট্র-পরিচালনের কোন কিছুই তো বোঝ না! ভারতে আমেরিকানরাই তো বাপু আগত শক্তি। শ্যামপুরকে স্বাধীন বাফার স্টেট হিসেবে রাখবার আমার দাবী সমর্থন যদি তারা করে, তাহ'লে আমি স্বরাষ্ট্র দফতরের ওপর এক হাত নেবার চেষ্টা করতে পারি।'

'আমেরিকানরা নিশ্চয়ই ভারতে ভাবী-শক্তি।' মুন্সীজী টুলীপের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন।

'হাঁ, হাঁ,' ক্ষীণকণ্ঠে বুলচাঁদ সম্মতি জানায়, কারণ, তার ফাঁকা চোখ-মুখের ভাব থেকে বেশ বোঝা যায় যে, রণকৌশলে নিগূঢ়তম তথ্যগুলো সে আদৌ ঠাওরাতে পারে নি।

'বুঝতে পারছ না মূর্খ, রণ-নীতির দিক থেকে শ্যামপুরের ভৌগলিক অবস্থিতি এমন যে, এখান থেকে খুব উচ্চাকাশে উঠে গেলে এরোপ্লেনে সাত ঘণ্টার মধ্যেই সমরখন্দে পৌঁছোতে পারা যায়!'

'বুঝেছি, এখন বুঝেছি মহারাজ,' রীতিমত উৎসাহের সঙ্গে বুলচাঁদ বলে ফেলে।

'কিন্তু মিঞা মিথু মাত্র যন্ত্রের মতোই আমার কথায় প্রতিধ্বনি করতে পারে। এই তারবার্তা যে কত জরুরী তা তো সে বুঝতেই পারে নি।' টুলীপের কণ্ঠে তিরস্কার ফুটে ওঠে।

'টুলীপ, গতকাল আপনার চাচা-সাহেবের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির সময় কম্যুনিষ্টদের ওপর আপনার কিছুটা আসক্তির ভাবই যেন প্রকাশ পেয়েছিল ব'লে মনে হয়েছিল—!' আমি বললাম।

'তোমার বুদ্ধি দেখছি রীতিমত মোটা!' টুলীপ উত্তর দেন: 'তোমরা বৃটিশের কাছ থেকে সত্যিই কিছুই শিখতে পার নি। কিন্তু লাহোরে রাজ-কলেজের অধ্যক্ষ আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, অস্পষ্ট পররাষ্ট্র নীতিই হলো সব চেয়ে নিরাপদ ও সুনিশ্চিত কূটনীতি। তিনি বলতেন যে, তোমাকে সব সময়েই দু'রকমের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে কোন্ লাইনটা জিতছে!'

একটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখাবার চেষ্টা করলাম আমি।

'আচ্ছা, মিঞা মিথু, এখন গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেল,' টুলীপ বলেন: 'আমরা কিন্তু এবার পাম্নার শিকার-ভবনে যাচ্ছি না; ওখানে তো গেরিলাদের উৎপাত; আমাদের এবার যেতে হবে আরো কুড়ি মাইল উত্তরে ধরমপুর শিকার-ভবনে। কি কি করতে হবে লালা ছোটুরাম সবই জানে। আমার মনে হয়, শিকারীদের দলে জনকয়েক য়ুরোপীয় মহিলা থাকবে, আর যাবেন মহারানী গঙ্গাদাসী। কাজেই এখন আমাদের শ্যামপুর প্রাসাদের গ্যারেজে যত মোটর গাড়ী আছে, সব ওখানে পাঠাতে হবে। বুলচাঁদ, তুমি মিঞা মিথুকে সাহায্য করবে আর ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিংকেও তাড়া লাগাবে। শিকার যদি সফল হয়, সকলেই পুরস্কার পাবে। ডাক্তার, তুমি একবার মক্ষীরানীকে গিয়ে দেখ। ওর মেজাজটা সকাল থেকেই কেন যেন একটু বিগড়ে রয়েছে। ও আগামী কাল আমার সঙ্গে শিকারে যাবে, এই আমি চাই।'

আমরা প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে চললাম। প্রাঙ্গণের বাগানটা পার হ'লেই জেনানা-মহলের নিভৃততম অংশ; কিন্তু বারান্দা পার হতে না-হ'তেই দেখি গঙ্গী এগিয়ে আসছে এদিকে।

'ওরকম ক'রে তোমাকে কষ্ট ক'রে আসতে হবে না, প্রিয়তমে,' উদ্বিগ্ন টুলীপ বলে ওঠেন: 'আমরাই তো যাচ্ছি তোমার ওখানে—'

'নিজেকে বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল টুলীপ, একা আর থাকতে পারছিলাম না,' শিশু-সুলভ অভিযোগের সুর গঙ্গীর কণ্ঠে: 'তোমাকে বড্ড কাছে পেতে ইচ্ছে করছে—' কথাটা শেষ না করেই একটা মনোমুগ্ধকর চটুল ভঙ্গীতে সলজ্জভাবে শাড়ীর প্রান্তভাগটা কপালের উপর টেনে দিয়ে সে চলল টুলীপের সঙ্গে ড্রইংরুমের দিকে। আমরা চললাম তাদের পিছু পিছু।

বৈঠকখানার ভেতরে প্রবেশ করতেই গঙ্গী চঞ্চলভঙ্গীতে ইচ্ছাকৃত ভাবেই কোমরটা নাচিয়ে কাউচের ওপর একখানা পা'র ওপর আর-একখানা পা তুলে বসে পড়ল।

'এবার কিন্তু একটা নতুন খবর দিচ্ছি তোমাদের। সবাই মন দিয়ে শোন! নতুন দেওয়ানকে আটকাবার মতো একটা ফন্দি বের করেছি...'

'উঁহু, ওসব তোমার কাজ নয়—' টুলীপ বলেন।

'আমি বুঝে ফেলেছি গো! ইচ্ছে করলে বুড়ো শালিকটাকে হাতের তেলোর ওপর নাচাতে পারি! ওকে যদি শিকারে যেতে বল, তাহ'লে দেখতে পাবে ওকে নিয়ে কি কাণ্ডই না করি!'

কথাগুলো শুনেই টুলীপের মুখখানা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। পরমুহূর্তে মাথা অবনত হয়ে যায়। আমার মনে হয়, গঙ্গীর সঙ্গে পোপতলালের গোপন কোন কিছু ঘটেছে, সেটা আঁচ ক'রে টুলীপের

মনের মধ্যে আশংকার ভাব জাগ্রত হয়েছে। এক্ষুণি কারণ বলতে পারব না, তবে আমারও মনে হচ্ছে যে, দেওয়ানের সঙ্গে গঙ্গী নিশ্চয়ই জড়িয়ে পড়েছে।

'ও লোকটা তো একটা, কি যেন বলে, এই শূয়োর একটা—, শিকারে ও যেতে চাইবে না, তা আমি বেশ জানি।'

'লোকটা বুড়ো হ'লেও ওর মধ্যে কিন্তু একটা মজার জিনিস আছে,' গঙ্গী বলে: 'তোমার ঐ সমস্ত মাকিনী শ্বেতী রোগীদের চেয়েও ওর কাছ থেকে অনেক বেশী কিছু পেতে পারবে!'

'কূটনীতির দিক থেকে কথাটা ঠিকই বলেছ রানী, কিন্তু…'

মুখের কথাটা আর সে শেষ করতে পারেন না টুলীপ, কারণ তাঁর চোখে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার ভাব ফুটে ওঠে।

টুলীপকে উপেক্ষা ক'রেই গঙ্গীর চোখ দিয়ে যেন হাসি ঠিকরে পড়ে; পোপতলালের ওপর তার নতুন অর্জিত শক্তিতে চোখ দুটো তার ভরপুর, কারণ, সে জানে এই নতুন শক্তি টুলীপের উপর তার নতুন প্রভাব বিস্তারে তাকে সাহায্য করবে। এই পুরুষগুলোর ভাগ্য নিয়ে সে যে ছিনিমিনি খেলতে পারে, এ জ্ঞান যেন তার মনে এক পরম কৌতুক জাগাচ্ছে। সে তাই ঈষৎ লাজ-রক্তিম আননে স্মিত ঠোঁটে বসে পা দোলায়।

গঙ্গীর দেহ ও হৃদয়ের ওপর তাঁর দখলটা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে টুলীপ উদ্দাম গতিতে তার হাতখানা ধ'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন:

'শিকারের পার্টিতে কত কিছু হবে'খন, কিন্তু তোমাকে সুস্থ হ'য়ে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে মক্ষীরানী।'

আদর-সোহাগের উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেন টুলীপ গঙ্গীর দেহে-মনে, মৃদু করাঘাত করতে থাকেন গঙ্গীর বাহুতে।

এঁদের দু'জনের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার এই সমস্ত ভঙ্গিতে, আমি অদ্ভুত ধরনের এক নাটকীয় ভাব-প্রবণতাই প্রত্যক্ষ করছি; এবং এই জিনিস যেন এঁদের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

এঁদের একা রেখে আমি সরে পড়তে চাই, যাতে টুলীপ এই চঞ্চল মেয়েটির দেহ-মনের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে, গত কয়েকদিন ধরে যে-ভাবে গঙ্গী তাঁকে এড়িয়ে চলছিল, তা থেকে আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

জানালা পর্যন্ত গিয়ে বাগানের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বাইরের জগৎ ও আমার চোখের মাঝখানে যেন একটা সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল ছড়িয়ে পড়েছে আর রাজবন্দীদের কথাটা টুলীপের কাছে জানাবার জন্য আমি কিছুক্ষণ পূর্বে যে সঙ্কল্প করেছিলাম, তার কথা মনে হ'তেই আমার চিন্তাধারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার কৃত্রিম ভব্যতা-যুক্ত ও মার্জিত আবহাওয়ার মধ্যে আমি ধৈর্যহারা ও ব্যর্থকাম হয়ে পড়েছি মনে হয়; যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে বা সে-সম্বন্ধে বলতে গিয়েছি, তখনই আমি এই বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। গঙ্গীর বিরুদ্ধে আমার মনে এক প্রচণ্ড ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে; মনে হয়, এ রাজ্যে যতকিছু গলদ ও ত্রুটি, সবকিছু এ মেয়েটির জন্যেই ঘটছে। সে হাসুক বা কাঁদুক, যা খুশি করুক না কেন, সবকিছুর মাধ্যমেই এ মেয়েটি যেন সহজাত প্রবৃত্তিবশেই নিজের শক্তি বাড়াবার জন্যই ষড়যন্ত্র ও মারপ্যাচ খেলে বেড়াচ্ছে। মাত্র গতরাত্রে সে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে, তা সত্ত্বেও এখনও টুলীপের আদর-সোহাগ আদায় করছে এবং তাঁর কাছে ধরা দেবার ভান ক'রে এখন সে নতুন খেলা শুরু করেছে। নিজের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে পড়ে মেয়েটি একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং স্বার্থের প্রয়োজনে আগামী কাল টুলীপকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোবে

এবং তারপর যখন আর দরকার থাকবে না তখন সে তাঁকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে; নিস্পন্দ ও কাল-অন্ধ হয়ে কঙ্কালের মতো আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, অর্ধমৃত, একটা অসুস্থ শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণার টানা-পোড়েনে আমার দেহ-মন ক্ষুব্ধ।

'ডাক্তার, আমরা একবার আস্তাবলটা দেখে আসব কি?' টুলীপ জিজ্ঞেস করেন।

মুখ ফিরিয়ে আমি সম্মতি জানালাম।

'ও টুলীপ, আমাকে একলাটি ফেলে রেখে চলে যেয়ো না—!' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গঙ্গী নাকি স্বরে বলে: 'আমার কাছে থাক···থাকবে না গো—!'

'এক্ষুণি ফিরে আসছি।' টুলীপ বলেন: 'আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।'

'বেশ, বেশ, আমি তা হ'লে এখানেই একটু ঘুমিয়ে নিই,' পা দুটো এপাশ-ওপাশ ক'রে দোলাতে দোলাতে টুলীপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গঙ্গী বলে। কপট ক্রোধের ছাপ ফুটে ওঠে তার মুখাবয়বে।

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে টুলীপ বলেন: 'তা হ'লে তুমি গিয়ে ছট্টুরামকে বরং বলো তাড়াতাড়ি সব প্রস্তুতি শেষ করতে। ধরমপুরের শিকার-ভবনটা ঠিক ক'রে রাখে যেন, অতিথিদের ষ্টেশন থেকে সোজা নিয়ে আসবার বন্দোবস্ত করবে। আমরা নদীর উজান বেয়ে মোটর-বোটে আগামী কাল সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গে মিলব।' বলতে বলতে মহারাজা গঙ্গীর পাশে গিয়ে বসেন।

ফিরে যাওয়ার জন্য মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, গঙ্গী বসে বসে নাটকীয়-ভাবে শুধু পা দুটো আর কোমর এপাশ-ওপাশ করছে। টুলীপের সঙ্গে আড়ি করারই ভান প্রকাশ পাচ্ছে তার অঙ্গভঙ্গীতে যাতে হাইনেস

তার কাছে এসে তাকে আবার আদর করেন এবং এমনি ক'রেই তিনি যেন তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করেন।

সড়ক ধরেও ধরমপুরের শিকার-ভবনে পৌঁছোন যায় আবার শতদ্রু নদী-পথ দিয়েও যাওয়া যাও। আমেরিকান সাহেবরা গেল সড়ক ধরে, আর মহারাজা গেলেন তাঁর দলবল নিয়ে মোটর-বোটে।

সবুজ মাঠগুলো দু'ধারে রেখে একঘণ্টা নদীর উজানে জোরে চলার পর আমরা অরণ্যের সীমানায় এসে পৌঁছলাম।

ধারাল তরবারির মতো মোটর-বোট শতদ্রুর স্রোতের মাঝখান দিয়ে নিজের রাস্তা ক'রে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বড় নদী ছেড়ে দিয়ে আমরা উপনদীতে প্রবেশ করতেই সবুজ পত্র-পল্লব আর বৃক্ষরাজীর সমারোহ আরো ঘন হয়ে উঠতে থাকে, কাজেই, শ্যামপুর থেকে যখন যাত্রা করেছিলাম তখন অপরাহ্নের সূর্য রীতিমত প্রখর থাকলেও, এই মুহূর্তে মনে হলো যেন গোধূলির ক্ষীণ অলোর মধ্যে এসে পড়েছি। এই আবছায়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা মত্ততাও যেন আমাদের পেয়ে বসে। শ্বাসবন্ধ-করা উত্তাপ, গাছ-গাছড়া আর ঝোপঝাড়ের তীব্রগন্ধ আর ভৌতিক আবহাওয়া যেন এক সঙ্গে মিশে গিয়ে এই মত্ততার সৃষ্টি করেছে। বনের বুকের ভেতরে জোর ক'রে ঢুকে পড়ার সময় একটা অস্বস্তি আমাদের পীড়া দিলেও সবুজ ঘন বনানীর সৌন্দর্য ক্রমশঃ আমাদের আকৃষ্ট করতে থাকে। ঘন ঝোপ-ঝাড় ও পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করা শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে ঈষৎ নীলাভ সবুজ আলো চুইয়ে পড়লেও কচুরিপানার মতো দেখতে যে-সমস্ত ভয়াবহ হলদে রঙের স্পঞ্জের মতো লতা ঝুলছিল তাও আমাদের নজরে পড়ে।

টুলীপ ছিলেন মোটর-বোটের হালে ব'সে, তাঁর পিছনে নিশ্চল হয়ে চেয়ারে বসে আছেন শ্রীযুক্ত গোপতলাল জে. শাহ্ আর গন্ধী

কুকুরের মতো গুটি-শুটি মেরে শুয়ে আছে একখানা কাউচে। মুন্সী মিথনলাল, বুলচাঁদ, আর আমি নিজে ও অন্যান্য লোকেরা অলসভাবে বোটের মধ্যে পায়চারি করছি।

অন্ধকারাচ্ছন্ন বনভূমি সম্বন্ধে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্ মুরব্বী চালে বলেন: 'মানুষের আত্মার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা তাদেরকে অরণ্য-সৌন্দর্যে বিমোহিত ক'রে দেয়, অরণ্যের হাতছানি তার মনে সাড়া জাগায়।'

গঙ্গী ছিল অর্ধ-সুপ্ত অবস্থায়। তার অভিপ্রেত মানুষগুলোর আত্মা ও দেহ তার মুঠোর মধ্যেই তো রয়েছে, তাই বহির্জগতের কথা এতক্ষণ সে ভুলেই গিয়েছিল।

'অরণ্য মানুষকে টানে কেন?' টুলীপ জিজ্ঞেস করেন। তাঁর কথার মধ্যে বিরক্তিভরা বৈরাগ্যের ভাব ফুটে ওঠে।

'খুব সম্ভব জীবনটা এখানে মৌলিক অর্থাৎ আদিম ব'লে,' পোপতলাল উত্তর দেন: 'অরণ্যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শিকারী, আর এখানে জীবন-যুদ্ধে যে টিকে থাকতে পারে, সে সবসময় সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে সাহসী এবং সবচেয়ে দেবোপমও বটে।'

জেল থেকে রাজবন্দীর চিঠি পাওয়ার পর আমার মধ্যে যে তিক্ততা জমে উঠেছিল তারি পরিণতি হিসেবে আমি বলে ফেলি: 'আমার মনে হয়, কেবলমাত্র জংগলে নয়, শ্যামপুরের গোটা জংগলী-রাজ্যে ঐ একই নিয়মে সব কিছু চলছে।'

এই মন্তব্য সকলেই নীরবে শুনে গেল। কারণ, অরণ্য সম্বন্ধে পোপতলালের সিদ্ধান্ত সত্য হোক আর নাই-ই হোক, অন্ততঃ শ্যামপুর ষ্টেটের এ হলো বাস্তব সত্য।

নিজের চটু-পটে ভাবটা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বুলচাঁদ বলল:

'বর্তমান সভ্যতার কঠিন প্রস্তরাকীর্ণ পথে পা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়, তখন জংগলে এসে সত্যিসত্যিই পরিত্রাণ পাওয়া যায়।'

হিজ হাইনেস হঠাৎ চিৎকার ক'রে বলেন: 'আমি কিন্তু বন ঘৃণা করি। কেমন একটা ভয় ভয় ভাব রয়েছে এখানে। মনে হয় বাতাস যেন ভারী, ভীতিশঙ্কুল। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।...'

আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, তাঁর চারদিকে যে ঘোরালো শ্বাসরোধ-করা ষড়যন্ত্রের ভারী চাপ সৃষ্টি হয়েছে, গজী ও পোপতলাল সম্পর্কে যে সন্দেহ মহারাজার মনে সঙ্ঘাতের সৃষ্টি করেছে, তা শেষ পর্যন্ত একরকম হিষ্টিরিয়াতেই পরিণত হয়েছে।

'ইচ্ছে করলে আপনি হালটা আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারেন।' আমি বললাম টুলীপের দিকে তাকিয়ে।

'না, ঠিক আছে।' দাঁতে দাঁত চেপে টুলীপ বলেন।

কেবলমাত্র দেওয়ান হিসেবে তাঁর মর্যাদার জন্য নয়, গজীর উপপতি হওয়ার পেছনে যে লুক্কায়িত শক্তিমত্তা রয়েছে, তার অনুভূতি পোপত-লালের মধ্যবয়সী সুন্দর কৃষ্ণবর্ণের মুখখানিকে দীপ্তি-মণ্ডিত করেছে। তিনি আবার বলতে আরম্ভ করেন: 'যাই বলুক না কেন, যে-সমস্ত জিনিস এই মুহূর্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু পরে যখন দেখতে পাওয়া যাবে, তখন হয়তো আর প্রতিবিধানের সুযোগ পাওয়া যাবে না। এই আশঙ্কার জন্যই মানুষকে সব সময়ে অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তৈরি থাকতে হয়।'

'হুঁ, শ্যামপুরের মানুষকেও সতর্ক থাকতে হয়।' আমি বললাম।

'নিশ্চয়ই!' টুলীপ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন।

'দেওয়ান সাহেব কিন্তু সাপ, অজগর, বাঘ ও কীটপতঙ্গের কথাই বলছেন।' রসিকতা ক'রে বুলচাঁদ বলে।

'আমিও তো তাই বলছি!' ইতিপূর্বে যে ব্যর্থ-ব্যঞ্জক মন্তব্য করেছি

তার উপর জোর দিয়েই আমি আবার বললাম, যদিও দেখতে পাচ্ছি যে এই গুরুত্ব আরোপের ব্যাপারটা বুলচাঁদের মোটা বুদ্ধির ওপর কোন রেখাপাতই করল না।

শ্রীযুক্ত পোপতলাল জে. শাহ্ আবার বলতে আরম্ভ করেন। আমার উক্তির পেছনের হুলটা যে বুঝতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই, তাই তিনি এবার ইচ্ছে করেই কথার মার-প্যাঁচে প্রকৃত পরিস্থিতিটা ঢাকবার চেষ্টা করেন।

'জংগলের গুঞ্জন শুনতে পান কি ডাক্তার? বন কিন্তু কখনই শান্ত থাকে না। অসংখ্য জীবনে এ স্পন্দিত। আমাদের এই পৃথিবী গাছপালা ও জীবন্ত প্রাণীতে পরিপূর্ণ। দেখবেন, কত রকমের জীব গাছ বেয়ে উঠছে, এঁকেবেঁকে চলেছে, আবার গড়িয়েও চলেছে। বড় বড় পতঙ্গগুলো ছোট ছোট পতঙ্গগুলোকে ধরে ধরে খাচ্ছে। একটা কথা, দেখতে পাচ্ছি বিশ্বাসঘাতকতা কিন্তু এখানে সব সময়েই জয়লাভ করছে।'

পোপতলালের কথার ধাক্কাটা ধরে আমি তাঁর দিকে উল্টে ছুঁড়ে দিলাম: 'দেওয়ান সাহেব, আমিও একবার দেখেছি পূর্ণ-বিকশিত মনোহর এক মরণ-পদ্মফুল···বিস্মিত হয়ে আমি দেখলাম, তার আঠাল অভ্যন্তরে গান-গাওয়া ছোট্ট একটি পাখীর ঠোঁটটা আটকে গেল···ডানা-ঝটপট-করছে পাখীটা···দেহের চারদিকে মরণ-পদ্মের নরম পাগড়ীগুলো আস্তে আস্তে বুঁজে আসছে···'

এই তুলনাটা কিন্তু ব্যর্থ হলো না। স্থানভ্রষ্ট না হয়ে ঠিক জায়গায় গিয়ে বিঁধল। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে পোপতলাল আমার দিকে তাকালেন, এমনকি গঙ্গীও চোখদুটো অর্ধ-নীমিলিত ক'রে আমাদের সকলের ওপর নিদ্রালস দৃষ্টি হেনে বলল:

'একমাত্র প্রজাপতিরাই কিন্তু সুখী।···'

'আমি কিন্তু একবার এক জাগুয়ারকে দেখেছি তার উদগ্র লালসায় প্রজাপতির গন্ধ শুঁকে তার পা দিয়ে ওর সুন্দর চিত্রবিচিত্র পাখাগুলো ছিঁড়ে পিষে মেরে ফেলতে। কাজেই প্রজাপতিরাও খুব নিরাপদ নয়!'

'প্রত্যেকেরই শত্রু আছে—' আবার নাক গলিয়ে বলে বুলচাঁদ।

'তুমি হচ্ছো বাপু সকলেরই পয়লা নম্বরের শত্রু!' আমার দিকে তাকিয়ে জোর গলায় হিজ হাইনেস বলেন। সকলেই হেসে ফেলে। পরিস্থিতিও সহজ আকার ধারণ করে।

এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলোচনা করছিলাম, অরণ্যের থমথমে সর্বগ্রাসী সৌন্দর্যের মুখে সে-সমস্তই যেন শূন্যগর্ভ আওয়াজে পরিণত হয়ে যায়। অস্তগামী সূর্যের স্বপ্নালস দীপ্তি থেকে যেন একটা গুপ্ত আভা বিচ্ছুরিত হয়ে আয়নার মতো স্বচ্ছ সবুজাভ কালো জলের উপর ছড়িয়ে পড়েছে; মুমূর্ষু সূর্যের ক্ষীয়মান আলোক-রশ্মি ঐ কালো জলকে স্থানে স্থানে উদ্ভাসিত করেছে মাত্র।

কয়েক মাইল এই ভাবে চলার পর আমরা গিয়ে পড়লাম একটা হ্রদের মধ্যে। এই মাইলগুলো মনে হয় যেন অতিদীর্ঘ, সীমাহীন। নাম-না-জানা লতাপাতা ও কচুরিপানার স্থান দখল করতে থাকে অগনিত বিচিত্রবর্ণের পদ্মফুল আর শাপলার লতা। উত্তরদিকের সুউচ্চ পাহাড় থেকে নেমে আসে তমস্বিনী নিশা, আর স্বচ্ছ জলের উপর পদ্মফুলগুলো আস্তে আস্তে তাদের পাপড়ী বুঁজিয়ে দিতে থাকে।

হ্রদের বাঁদিকে মোড় ফিরতেই পাহাড়ের পাদদেশে বড় বড় দেবদারু বনের মধ্যে চোখে পড়ল কতকগুলো পর্ণকুটির, আরো চোখে পড়ল প্যাগোডার কায়দায় নির্মিত এক বড় অট্টালিকার দিকে প্রসারিত গোটাকয়েক গ্রাম্যপথ। ঐ অট্টালিকাটি নিশ্চয়ই মহারাজার শিকার-ভবন।

হ্রদের ঘাটে জনকয়েক পল্লী নারী কলসীতে জল ভরছিল; তারা মোটর-বোট আসতে দেখেই ছুটে পালাল, কারণ, বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে টুলীপের যে দুর্নাম রটে গিয়েছিল, এই সুদূর বনপ্রান্তের মেয়েরাও তা ভুলতে পারে নি। সেই সময় যে-কোন মেয়েমানুষ তার লালসার দৃষ্টি-পথে এসে পড়লে তার আর পার-পাবার উপায় ছিল না।

একজন চাপরাশি, দেখেই মনে হয় শিকার-ভবনের তত্ত্বাবধায়ক, হাজির হয়ে করজোড়ে আমাদের অভিবাদন জানাল। তার ভাব দেখে মনে হয়, আমরা যেন তার সাক্ষাৎ দেবতা!

হিজ হাইনেস ইঞ্জিনের দম বন্ধ ক'রে দিয়ে মোটর-বোটটি লাগালেন ছোট্ট কাঠের অবতরণ-পৈঠার পাশে। মহারাজার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত এই অবতরণ-পৈঠাটি সুন্দর ভাবে সাজান হয়েছে।

আমরা সকলেই নেমে পড়লাম, একদল স্থানীয় পুরুষ ও বালক আমাদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

'সরে যা, সরে যা!' মুন্সীজী চিৎকার ক'রে বলেন। 'মহারানী সাহেবার পাল্কি কোথায়? আর ঘোড়াগুলোই বা কোথায় রাখল?'

লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কিন্তু মুখে তাদের কেমন একটা বিশ্রী হাসি। সেই সময় পাল্কি ও ঘোড়াগুলোও আনা হলো।

আমরা পুরুষেরা সব মহারাজার পিছনে পিছনে ঘোড়াগুলোর দিকে এগোলাম আর পাল্কিখানা মুন্সীজীর তত্ত্বাবধানে নিয়ে যাওয়া হলো বোটের কাছে। সঙ্কীর্ণ হুমড়ি-খেয়ে-পড়া পর্ণকুটিরের সারি থেকে কঙ্কালসার মানুষ সব বেরিয়ে এসে আমাদের সালাম জানাতে থাকে, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার পীড়াদায়ক এক ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা ঘোড়ায় চড়ে লাল চাপকান-পরা চাপরাসির পিছনে পিছনে এগিয়ে চললাম।

পথটি ছিল অতিমাত্রায় বন্ধুর। আমরা যাতে সহজে চলতে পারি, সেইজন্য গ্রাম থেকে জোর ক'রে লোকজন ধরে নিয়ে এসে ঝোপ-ঝাড় পুড়িয়ে রাস্তার দুপাশে দু' তিন গজ পরিষ্কার করা হয়েছে। ঝোপ-ঝাড়গুলোতে তখনও আগুন জ্বলছিল। উৎকট ধোঁয়ার গন্ধে আমাদের পাহাড়ে দ্রুত আহরণে বাধ্য করলেও এই দ্রুতগতি শেষ পর্যন্ত বিপদ ডেকে আনল মহারাজার অতিমাত্রায় উৎসাহে। আমি ছিলাম কালো ঘোড়ার ওপর আর শাদা রঙের ঘুড়ীর ওপর ছিলেন বেত হাতে শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্। মহারাজা হঠাৎ ঘোড়া দুটোকে উসকিয়ে দিলেন। ঘোড়াদুটো সহসা লাফিয়ে উঠল, ফলে আমার জীবন শেষ হওয়ার উপক্রম। দেওয়ান সাহেব কিন্তু শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করেই চললেন। আমার হাত থেকে লাগাম খসে পড়তেই মাথা ঘুরতে আরম্ভ করল, কুলিরাও চারদিকে ছিটকে পড়ল। আমার মনে হলো, এবার বুঝি আমার সব শেষ হয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে এক সাহসী গ্রামবাসী, নগ্নপদে জ্বলন্ত ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটে এসে আমার ঘোড়াটাকে ধরে থামিয়ে দিল।

আমার তখন বেসামাল অবস্থা, রাগও হলো। পেছনে চেয়ে দেখি শ্রীযুত পোপতলালেরও মুখ-চোখ লাল।

এই সময় মুন্সীজী যে টাট্টু ঘোড়ার উপর বসেছিলেন, হিজ হাইনেস সেটাকেও উসকিয়ে দিলেন। বেচারা মুন্সীজী তখন হেলে দুলে তাঁর টাট্টুকে বাগে রাখতে চেষ্টা করছিলেন আর সকলেই তা দেখে হাসছিল। ভাগ্যক্রমে টাট্টুটা ছিল ঠাণ্ডা ধরনের, মুন্সীজী ওটাকে কোনমতে বাগে রাখতে সক্ষম হলেন।

শ্যামপুর ষ্টেটের সবচেয়ে শুষ্ক ও ঊষর অংশের অভ্যন্তরভাগে উচ্চতর পর্বতমালার অবতরণিকার উপর একটা পাহাড়ের উন্নত অংশে

শিকার-ভবনটি অবস্থিত। অনেকখানি উঠবার পরও আমাদের নয়ন মোটেও পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারছিল না. যদিও আমাদের সামনে শিকার-ভবনের চমৎকার বহির্দৃশ্য ও নীচে রূপালী-ধূসর হ্রদ ও হ্রদের চারিপার্শ্বে অরণ্য সমাকীর্ণ উপত্যকায় ফালি ফালি শস্যক্ষেত্র আমাদের চোখে পড়ছিল। উপত্যকার উপর বাষ্পাকারে উত্থিত কুয়াশা ও ধোঁয়া দেখে অদ্ভুত আকারের দোদুল্যমান মালার মতো মনে হচ্ছিল। বহুদূর থেকে এক চাষীর গলার আওয়াজ ভেসে আসছিল,—জমি থেকে পাখি তাড়াচ্ছিল সে। আর সব কেমন যেন শূন্যতায় পরিপূর্ণ, কেবলমাত্র উপত্যকার জলাভূমিতে গোরু-মোষের ঘাস খাওয়ার দৃশ্য কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করছিল।

আর টুলীপ অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিবেগে ঘোড়া চালিয়ে ধরমপুর শিকার-ভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন; তাঁর পেছনে পেছনে আমরাও শিকার-ভবনে প্রবেশ করলাম। ইতিমধ্যে মার্কিন অতিথিরা এসে গিয়েছে। তারা হর্ষধ্বনি সহকারে আমাদের অভিনন্দন জানাল। দীর্ঘ-বপু ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং তাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেছিল।

'আমি মার্কিন দূতাবাসের পিটার ওয়াটকিন্স, মহারাজ—' চার্লি চ্যাপলিনের মতো গুম্ফবিশিষ্ট, গোল গোল চোখ, যোধপুরী পোশাক পরিহিত প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক একটি মোটা লোক এগিয়ে এল এই কথা বলতে বলতে। এগিয়ে এসে মার্কিন কায়দায় আন্তরিকতার সঙ্গে হিজ হাইনেসের করমর্দন করল। তারপর একে একে সঙ্গীদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করল।

'ইনি হচ্ছেন আমাদের দূতাবাসের মিঃ হোমার লেন, ইনি হলেন মিসেস লেন, ইনি যে অরগুয়ের অধিবাসী তা এঁর সোনালী চুল দেখেই বুঝতে পারছেন; এই যে সাংবাদিক মিঃ কুর্ট ল্যাণ্ডুয়ের; আর বৃটিশ

হাই কমিশনারের অফিসের মেজর বেল ও মিসেস বেল নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত।'

মহারাজা যথোচিত রাজকীয় ভঙ্গীতে প্রত্যেক অতিথিকেই সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তারপর অতিথিদের কাছে তিনি একে একে আমাদের সকলেরই পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন: 'শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ গোপতলাল জে. শাহ্। উনি হলেন বুলচাঁদ। ঘোড়ার মতো সব সময় নাসিকা গর্জন করেন মুন্সী মিথললাল, ওরফে মিঞা মিথু, আপনি যা বলবেন তার পুনরুক্তি করতে ইনি ওস্তাদ। আর এই যে দেখছেন, ইনি হলেন আমাদের বাদামী চামড়ার ইংরেজ, ডাঃ শঙ্করলাল। আমার এডিকং হারকিউলিস ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং; আর এ হলো রাজ-প্রাসাদের প্রধান কর্মসচিব চৌধুরী ছোট্টুরাম—এদের দু'জনের দিনরাত ঝগড়া লেগেই আছে!'

রসিকতার এই মৃদু পরশ অল্পবিস্তর সকলেই বুঝতে পারে। মার্কিন ডেমোক্রাটদের পক্ষ থেকে কিন্তু উত্থিত হয় অতিরঞ্জিত দাস-সুলভ উচ্চ হাস্যধ্বনি, রাজ-রাজড়ার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়ে যেন তারা রীতিমত গর্বিত। কিন্তু এই হাস্য-রসিকতার মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যখন গঙ্গীকে নিয়ে পাল্কিখানা হাজির হয় আর মহারাজা তার দিকে অঙুলি নির্দেশ ক'রে বলেন: 'মহামান্যা, মহারানী সাহেবা!' শ্বেতাঙ্গিনী দু'জনার মধ্যে কেমন যেন উসখুস ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর ঐ আস্তরণ-মণ্ডিত বস্তুটার প্রতি ভারতীয় প্রথায় করজোড়ে প্রণাম করবে, না, মহারানী সাহেবা হাত বের করলে করমর্দন করবে, তাই নিয়ে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহোদয়গণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। যাই হোক, বেচারীরা অব্যাহতি লাভ করে, কারণ পাল্কিখানাকে সোজা শিকার-ভবনের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। আর টুলীপও সেই সময়ে অতিথিদের

বারান্দার দিকে নিয়ে গিয়ে বললেন : 'আপনাদের নিশ্চয়ই মদের তেষ্টা পেয়েছে—, বেশ বুঝতে পারছি !'

মিঃ ওয়াটকিন্স আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মহারাজার পাশে পাশে চলতে থাকে। ওদের পেছনে চলে মিঃ ও মিসেস লেন। বেচারা গোয়েবল্‌সের মতো গদা আকারের বেঁঠে পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। সোনালী বাদামী রঙের চুলওলা উজ্জ্বল চাঁদের মতো মুখখানা নিয়ে মিঃ কুর্ট ল্যাণ্ডুয়ের আমার সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মতো অগ্রসর হয় ; আমাদের পেছনে এক সঙ্গে চলে তিনজন : বুলচাঁদ, মেজর বেল—ভদ্রলোক বেঁটে কিন্তু চটপটে—আর সুউচ্চ বুক নিয়ে মিসেস বেল। আর সকলের শেষে চলেন মুন্সীজী, ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং ও চৌধুরী ছোট্টুরাম।

আমরা বারান্দায় উঠবার আগেই গঙ্গী পাল্কি থেকে নেমে পাঞ্জাবী কুর্তা ও সালোয়ার পরে অতুলনীয় ভঙ্গী ও মাধুর্য নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। ঐ পোশাকেই সে এসেছিল। দোপাট্টাখানা এমন অদ্ভুত ঢঙে সে মাথার ওপর টেনে দিয়েছিল যে, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, এক সরলা তন্বী দাঁড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে আমাদের।

এই মাধুর্যমাখান প্রতিমাখানি করজোড়ে মার্কিন অতিথিদের একে একে ভিতরে নিয়ে গেল ; এমনকি অতিথিদের অভিবাদন জানাবার সময়েও তার হাত দু'খানা যুক্ত অবস্থায় রইল।

গঙ্গীর এই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একটা অতিরিক্ত সাড়া পড়ে যায়। বেয়ারা ভগীরথকে শ্যাম্পেন আনতে বলার জন্য ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং, চৌধুরী ছোট্টুরাম ও মুন্সী মিথনলাল একসঙ্গে বারান্দার দিকে ছুটে গেল। এই সুযোগ্য ভৃত্য কিন্তু আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েছিল, কারণ, দেখা গেল, বারান্দার বড় টেবিলটার ওপর ইতিমধ্যেই টাম্বলারগুলো মুছে সারি সারি স্থাপন করা হয়েছে।

অনুসন্ধিৎসু পশ্চিমাদের চোখে প্রাচ্যের গম্ভীর রহস্যাবৃত তনুদেহ চিন্তা শীঘ্রই ১৯০৫ সালের তৈরি মনোহর ফরাসী শ্যাম্পেনের ফেনার মধ্যে ডুবে যায়। আর "প্রিয় মহারাজ সাহেব" ও "প্রিয়তমে মহারানী সাহেবা" এই সম্বোধনোক্তি যেন কতকটা ফরাসী "বনোমে"-র মতোই উচ্চারিত হতে থাকে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেই যেন এটা বিশেষভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মদ্যপানের পর অতিথিরা আস্তে আস্তে দু'জন তিনজন ক'রে দলবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হলো শিকার-ভবনের নবঘনশ্যামদূর্বাদলাবৃত ছোট ছোট মাঠে। এই সময় গ্রামবাসীরা, বিশেষ ক'রে কঙ্কালসার বৃদ্ধ, উলঙ্গ পেটুক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও গোঁয়াড় শিকারীরা বাগানের প্রান্তদেশে সমবেত হলো। এরা সুমহান অতিথিদের উদ্দেশ্যে চাটুবাক্য বর্ষণ করতে থাকে বকশিশ পাওয়ার আশায়।

কিন্তু বকশিশ আদায়ের কলা-কৌশলটা শ্যামপুরের পার্বত্য অধিবাসীদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। নিজের জমিতে স্থানীয় জমিদারদের সুখ-সুবিধার জন্যে বা শিকারে যখন মহারাজা আসেন, তখন তাঁর জন্যে বা তাঁর প্রিয় পাত্রগণ যখন পল্লী অঞ্চলে শুভাগমন করেন তখন তাঁদের জন্যে কিভাবে বেগার খাটতে হয়, এই কলা-কৌশলটাই মাত্র তারা ভালভাবে জানে। বড়লোকদের কাছ থেকে টাকা বের করার কৌশলটা লোকে শুধু শহরেই আয়ত্ত করতে শেখে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি শ্যামপুরের সকলেরই পরিচিত মাদারী যাদুকর তার হাতের মধ্যে ডুগডুগিটা ঘুরোতে ঘুরোতে গেটের দিকে এগিয়ে আসছে। তার বাঁ হাতের শিকলে বাঁধা এক জোড়া ভালুক ও এক জোড়া বাঁদর, আর সঙ্গে রয়েছে যাদুবিদ্যার শিক্ষানবিশ তার ছেলে। লোকটা অত্যন্ত চালাক। সে জানতো যে, স্থানীয় লোকজন প্রায় সকলেই তার খেলা দেখেছে, কাজেই এখন আর তাদের বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই, তবে

ছেলেমেয়েদের কথা আলাদা, যাদুবিদ্যার উপর চিরন্তনী আকর্ষণ তাদের রয়েছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সাহেবরা তো আলাদা জাত, ভারতবর্ষকে জানতে ও চিনতে তারা চায়। আর রহস্যঘন ভেল্কিবাজি ও কলা-কৌশল নিয়ে এই যাদুকরটি বিদেশী দর্শকদের হৃদয় জয় ক'রে বসল, কারণ এই সাহেবরা মনে করে যে, যাদুকরের ভেল্কিবাজির মধ্য দিয়েই তারা অতি সহজেই প্রাচ্যের রহস্যপূর্ণ অন্তস্তলটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

কাজেই সাহেব ও মেম-সাহেবরা অস্তগামী সূর্যের মৃদু আলোকে একত্রে সমবেত হয়, মহারাজাও কর্কশকণ্ঠে মাত্র দু'চারটে কৌশল দেখাবার জন্য যাদুকরকে হুকুম দেন। পরিচারকেরা এইসব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বসবার জন্য চেয়ার নিয়ে এল। লনের চারদিকের নীচু বেড়া ভদ্র দর্শকদের নিম্নস্তরের যাদুকর ও তার চেয়েও নিম্নতর গ্রামবাসী ও শিকারীদের পৃথক ক'রে রাখে। যাদুকরের ভানুমতীর খেলা আরম্ভ হয়ে যায়।

কোমরের সঙ্গে শক্ত ক'রে কাপড় এঁটে, আস্তিন গুটিয়ে মাদলটি বাজাতে বাজাতে প্রথমেই ভালুক ও ভালুক-কনের বিবাহ পর্ব শুরু হয়। জানোয়ার দুটোকে বেশ কিছুটা দূরে বসিয়ে দেওয়া হয়। কনে-ভালুক ভারী লাজুক, সে তার থাবা দিয়ে মুখ ঢেকে বসে থাকে। অবশ্য মাদারীর বাজনার সঙ্কেত-নির্দেশের অপেক্ষা মাত্র।

'এস, এস,' মাদারী গানের সুরে বলে : 'এস, তোমার জীবনের সাথীকে গ্রহণ কর! এস, তোমার স্বামীকে গ্রহণ কর, চিরদিন তার পত্নী হয়ে থাক! ছেলেপিলে নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর! ভগবান ইন্দ্র স্বয়ং তোমাকে এই পুরুষ-প্রবরের হাতে অর্পণ করেছেন! তোমাদের বিশটা ছেলেমেয়ে হোক!'

কনে উঠে দাঁড়িয়ে সলজ্জভঙ্গিতে বরের দিকে এগিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে একচোট উচ্চ হাসির রোল ওঠে দর্শকদের মাঝে। তার ভেতর গম্ভীর গলার ঘড়ঘড় আওয়াজটা বেশ বুঝতে পারা যায় আর এতে যাদুকরের কথাগুলোর প্রতি তার অতিমাত্রায় আসক্তির পরিচয়টাই ফুটে ওঠে।

'আর এখন,' মাদারী আবার বলতে আরম্ভ করে: 'এস এস, ওহে লখিয়া, লখিয়া! এস, তোমার কনের ডান হাতখানা ধর, আর দু'জনে যে একসঙ্গে ঘর বাঁধবে, কনেকে তার প্রতিশ্রুতি দাও!'

ভালুকটি বীরপদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে কনের পাণিগ্রহণ করে। 'ওকে বল,' খোঁচা দিয়ে মাদারী বলে: 'ওকে বল: আমি চাই তুমি আমার স্ত্রী হও, দু'জনে একসঙ্গে বুড়ো হই—; ওকে বল, ওকে বল, ইন্দ্র দেবতা তোমাকে আমার হাতে সমর্পন করেছেন, আমরা দু'জনে একত্রে ঘরকন্না করবো—; ওকে বল, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আমাদের বহু সন্তান দান করুন!'

যাদুকরের নির্দেশ অনুসারে ভালুক ঘোঁৎ ঘোৎ ক'রে গর্জন করতে থাকে, ফলে পল্লী বালকদের মধ্যে রীতিমত আনন্দের সাড়া পড়ে যায়।

'তাহলে ওকে বল, ও লখিয়া, ওকে বল, এস প্রিয়তমে, সুন্দরী, মনোরঞ্জিনী, ওগো মনোলোভা, কোমল হৃদয়া, এস গো, তোমার স্বামীর কাছে এসে বীর প্রসবিনী হও।'

ভালুক আরো জোরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে গর্জন করে, এবং মাদারী ভালুক-কনের হাত ধরে তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'ও লখিয়া, তাহলে এখন আমাদের নাচ দেখাও—' মাদারী নির্দেশ দেয়: 'ইন্দ্র দেবতার প্রিয় সন্তান হিসেবে সাহেবদের নাচ দেখাও!'

যাদুকরের নির্দেশে ভালুক তার নবোঢ়াকে নিয়ে মহা উল্লাসে নাচতে আরম্ভ করে। এই নাচ শুধু লাফ-ঝাঁপের ব্যাপার, নব দম্পতির এই নাচের চোটে বসুন্ধরা কেঁপে ওঠে। এই নাচে তাল-মান বলে কোন কিছু নেই, এক সুমহান কলা-শিল্পের কদাকার প্রহসন হিসেবে চলে মাদারীর ভালুক-নৃত্য।

অতিথি-অভ্যাগতরা বেশ কৌতুক উপভোগ করে। বিশেষভাবে মাদারী যখন বলে ভালুক মহাশয় গ্যারি কুপার ও গ্রেটা গার্বোর প্রেমাভিনয় দেখাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভালুক ভালুক-কনের নাসিকায় চুম্বন করে, তখন মহিলাদের মধ্যে নাকি সুরে কলরব উত্থিত হয়।

'হিন্দু বিবাহ কি এইভাবেই সম্পন্ন হয় নাকি, মহারাজা সাহেব?' পিটার ওয়াটকিন্স জিজ্ঞেস করে।

মহারাজা বলেন: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাদুকর-ব্যাটা বদমাশ! অনেক কিছু ব্যাটা জানে!'

এবার মাদারী হিজ হাইনেসকে জিজ্ঞেস করে: 'মহারাজা, বাঁদরের বিয়ে দেখাব কি?'

'না, না,' ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং চেঁচিয়ে ওঠে: 'এক সন্ধ্যায় একটাই যথেষ্ট। অন্য কিছু জানিস তো দেখা।'

মাদারী আবোল তাবোল মন্ত্র আওড়াতে শুরু করে, তারপর হাতে থুথু ফেলে দু'হাতের তেলো রগড়িয়ে তার ছেলেকে ডেকে ঝুড়ির কসরৎ দেখাবার জন্য তৈরি হতে বলে।

ছেলেটাকে একটা ঝুড়ির ভেতরে পুরে ঢাকনিটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হলো, তারপর চারদিক থেকে, এমনকি ঢাকনির ওপর দিয়ে অনবরত তার মধ্যে ছোরা চালান হলো। কিন্তু ঢাকনিটা খুলে ফেললে দেখা গেল তার ভিতরে কোন কিছুই নেই। বিস্ময়সূচক নাটকীয় চিৎকার সহকারে যাদুকর বালকের প্রেতাত্মাকে স্বর্গ থেকে নেমে

আসতে হুকুম দেয়। আর সেই মুহূর্তে ছেলেটিকে আশেপাশের দর্শক-ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। শরীরের কোন জায়গায়ই একটা আঁচড় বা ছোরার দাগও দেখা যায় না।

শ্বেতাঙ্গ সাহেবরা ছোরা চালাতে দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল, মেমসাহেবরা ভয়ে আর্তনাদ করছিল, কিন্তু এই হত্যার ব্যাপারকে প্রকৃত হত্যাকাণ্ড না হতে দেখে তার স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে আশ্বস্ত হয় এবং যাদুকরকে মোটা বকশিশ দানের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

কিন্তু অতিথিরা কোনকিছু খরচ করবে তা আবার আতিথেয়তার বিরোধী। কাজেই মহারাজা ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিংকে হুকুম দিলেন যাদুকরকে বলতে যে, সে যেন গাঁয়েই অপেক্ষা করে আর শিকার-পার্টির কাছাকাছিই থাকে; তাকে যথাসময়ে পুরস্কার দেওয়া হবে।

যাদুখেলা শেষ হ'লে দেখা গেল যে, অভিজাত ও সাধারণের মধ্যে সামান্য যে একটু বরফ জমেছিল তা একেবারে ভেঙে না গেলেও গলে গিয়েছে। শিকারীরা সরে আসতে আসতে সাহেবদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার মতো নিকটত্বের মধ্যে এসে পড়েছে।

প্রধান শিকারী বুটা হিজ হাইনেস ও মিঃ পিটার ওয়াটকিন্সের কাছে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে এসে চুপি চুপি বলতে আরম্ভ করে :

'হুজুর, এই অঞ্চলে একটা চিতাবাঘ এসেছে। চাষীদের কাছে এটা বিভীষিকার ব্যাপার হয়ে উঠেছে। দিন-দুপুরে চিতাটা গোরু-মোষ যা পাচ্ছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

'আর তুই কি করছিস্, শিকারী!' টুলীপ বিদ্রূপকণ্ঠে বলেন : 'ওটাকে মেরে ফেলিস নি কেন?'

'মহারাজ, সাংঘাতিক ধরনের হিংস্র জানোয়ার যে—দেখা তো দূরের কথা, আমার শিকারী-জীবনে ওরকম ভয়ানক জানোয়ারের কথা কোনদিন শুনিই নি।'

মোটের ওপর বাঘটাকে শিকার করার পারিশ্রমিক আদায়ের জন্যেই বুটা টোপ ফেলছিল।

বুটা আবার বলতে শুরু করে : 'তহসিলদার সাহেব একটা বড় রকমের শিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। বহুলোক খবর পেল, আমিই শুধু বাদ পড়লাম। তহসিলদার সাহেব যখন লোকজন, বন্দুক, লাঠি, ছোরা নিয়ে জংগলের কাছাকাছি গেলেন, তখন এই হিংস্র জানোয়ারটা একজন ঢাকীর ওপর লাফ দিয়ে পড়ল। লোকটার দোষ, সে আঙুল দিয়ে ঐ চিতাবাঘটাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। এতে চিতাটা ভয়ানক রেগে গিয়ে প্রায় ওকে খুন ক'রেই ফেলে। ঢাকীকে ফেলে রেখে তহসিলদার সাহেব লোকজন নিয়ে চম্পট দিলেন। আমি গিয়ে লোকটাকে উদ্ধার ক'রে আনি, অনেক কষ্টে কোনমতে ওর মৃতদেহটা টেনে নিয়ে আসি হুজুর।'

'তুই খুব বীর পুরুষ বটে—!' অর্ধ-ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে টুলীপ বলেন।

'কিন্তু শুনুন মহারাজ, এই চিতাবাঘের উপদ্রব কেবলমাত্র ঢাকীকে মেরেই থামে নি। সে আরো একটা লোককে তাড়া করে। লোকটা তার ধান-ক্ষেতে কাজ করছিল। বাঘটা তাকে রীতিমত ঘায়েল করে, কিন্তু আরো দু'জন শঙ্খ বাজাতেই ওটা পাহাড়ে পালিয়ে যায়। এই সমস্ত শুনে যা-হয় একটা কিছু করবার জন্যে মতলব আঁটলাম আমি। গাদা বন্দুকটা হাতে নিয়ে ঐ খাড়া পাহাড়টার তলদেশ পর্যন্ত গেলাম। একটু খোঁজাখুঁজি ক'রে, যেখানে মুনীষটা ঘা খেয়েছিল সেইখানে হাজির হলাম। গিয়ে দেখলাম জানোয়ারটাও রয়েছে কাছেই। মুখোমুখি তখন আমরা। ওর দিকে বড় বড় চোখ

ক'রে তাকালাম। নিজের নির্বুদ্ধিতায় লজ্জিত হ'য়ে চিতাটা যেন চোখ ছুটো নামাল। পর মুহূর্তে আমাকে আমল না দেওয়ার জন্তেই যেন বেপরোয়া ভাবে ভয়ানক গর্জন করতে শুরু করল। আমি তখন মৃদু হেসে ওটাকে বললাম : "খেয়াল রাখিস রে ব্যাটা, এবার তোর চাচার সামনে পড়েছিস!" চিতাটা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। দুষ্টু ভাইপোকে তার বদমাশির জন্তে তিরস্কার করলে সে যেমন প্রতিবাদ করে, বাঘটাও তেমনি আমার দিকে ধেয়ে এল। আমার বন্দুকটা তো একবার মাত্রই ছোড়া যায় এবং আমিও গুলি ছুড়লাম। অব্যর্থ সন্ধান। গুলিটা বাঘটার গলার ভিতর দিয়ে একেবারে পিঠ পর্যন্ত চলে গিয়ে ওটাকে শেষ ক'রে ফেলল। আমৃরিকান সাহেবকে আমি ওর মাথাটা ও চামড়াটা উপহার দেব, তিনি স্বচ্ছন্দে দেশে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজের শিকারের জিনিস বলে তাঁর মুলুকি লোকদের দেখাতে পারেন। ওসব নিয়ে আমি অত ভাবিনে হুজুর! আমার কাছে মান-সম্মানের চেয়ে সামান্ত কিছু নগদ টাকার দাম অনেক বেশী!...'

বুটার এই দার্শনিকসুলভ অনন্তসাধারণ নির্লিপ্ততায় হিজ হাইনেস ও আমি হেসে ফেলি, এই বিদ্রূপটা যে পিটার ওয়াটকিন্সকে নিয়ে, সে তা বুঝতে না পেরে, শিকারী আমাদের কি বলছে তা জিজ্ঞেস করল। এতে আমরা আবার এক চোট হেসে নিই, শেষ পর্যন্ত আমি একটা কৈফিয়ৎ খাড়া ক'রে বলি :

'লোকটা বলছে, টাকা পেলে সব কিছু বলে ও করতে পারে।'

বুটা বলে : 'আরো একটা বাঘ আছে, হুজুর। যেটাকে গুলি ক'রে মেরেছি, ওটা হচ্ছে তার বাপ। তার ছেলেকে যে মেরে ফেলেছি, আমার ওপর সে তার প্রতিশোধ নিতে চায়। আমার মনে হয়, এই প্রাসাদের উপরের দিকে যে পাহাড়টা রয়েছে, তারি একটা গুহায় সে বাস করে। আমৃরিকান সাহেবকে বলুন হুজুর যে আমি তাঁকে

আর-একটি বাঘের মাথা ও চামড়া সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। আগেরটায় তুলনায় এটাকে তিনি আরও নিজের শিকার-করা জিনিস ব'লে দাবী করতে পারবেন। ঠিক ভাবে বলতে গেলে হুজুর, প্রত্যেক আমৃরিকান সাহেবই এখানে এক-একটা বাঘ পেতে পারেন...'

'দাম দিয়ে তো!' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কি বিজ্ঞ আপনি, ভাগদার সাহেব,' বুটা বলে: 'আপনি তো জানেন, দুর্ভিক্ষের সময় লোনাজলও মিষ্টি লাগে! আর এখন মাগ্‌গির বাজারে প্রত্যেকটা জিনিসেরই দাম আছে হুজুর।'

মিঃ পিটার ওয়াটকিন্স, দু'তিনটে আমৃরিকান সাহেব কথাটার উল্লেখ শুনতে পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহলাপন্ন হয়ে পড়ে।

টুলীপ বলেন: 'লোকটা বাচাল, আর ভয়ানক ধূর্ত! নিজের কাজ বেশ গুছিয়ে নিতে জানে দেখছি!'

আমি ব্যাখ্যা ক'রে বলি: 'ও বলছে, এই শিকার-ভবনের কাছেই একটা চিতাবাঘ লুকিয়ে রয়েছে।'

'তাহ'লে আর অপেক্ষা করা কেন?' অধীরভাবে মিঃ ওয়াটকিন্স বলে।

'শিকারের আগে জটিল ধরনের কিছু ক্রিয়া-কাণ্ডের দরকার রয়েছে,' আমি বললাম: 'আর আমাদের এই ভদ্রমহোদয় বুটা সর্দার তা করতেও চাইবে!'

'মহারাজ, যদি আপনার মরজি হয়,' বুটা বলে: 'তাহলে, মাচার পাশে খুঁটোয় আমি একটা ছাগল বেঁধে রেখে আসি।'

'মহৎ ব্যক্তিরা তাহলে একই ভাবে চিন্তা ক'রে থাকে!' আমি বলি। মার্কিন সাহেব আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে।

'নিশ্চয়ই,' মহারাজা বলেন : 'তোদের মতো ভবঘুরেদের দিয়ে আর কি হতে পারে বল্ ? যা, সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।'

বড় বড় লোকেরা যে একই ভাবে চিন্তা করে, তার আরও একটি নজিরের মতো পিটার ওয়াটকিন্স বলে : 'এক্ষুণি শিকারে বেরিয়ে পড়তে চাই আমি। আমার বন্ধুরা সব চিতাবাঘের সম্মুখীন হবার জন্য অধীর হ'য়ে পড়েছে।'

'কিন্তু এতটা পথ এসে মহিলারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই!' বলি আমি।

'এতো হলো পুরুষদের খেলা,' বীরত্বের বড়াই ক'রে পিটার ওয়াটকিন্স বলে। তার মুষ্টিযোদ্ধা-সুলভ বপুখানা নড়ে ওঠে আর ঐ বীর-ভাষণ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে : 'বেশ তো, মেয়েরা কিছু সময় চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ুক!'

'চাঁদেও মানুষের অনেক উপকার করে কিন্তু।' আমি বলি।

'তা বেশ, আমরা এখানে চাঁদের মুখ দেখে সময় কাটাব বলেই না এসেছি!' ক্ষুণ্ণ মিঃ ওয়াটকিন্স বলে।

'আপনারা যা বলবেন, তাই হবে,' মহারাজ বলেন। তারপর বুটার দিকে মুখ ফিরিয়ে, পাহাড়ী বুলি ঝাড়তে আরম্ভ করেন। এই ভাষার সঙ্গে এক অস্ফুট কটু-বাক্য মিশ্রিত করায় যেন প্রতিটি বাক্য আরও পরিচিত আকার ধারণ করতে থাকে। 'হারামী ব্যাটা, যা, এক্ষুণি গিয়ে বন্দোবস্ত কর, যাতে আমেরিকান সাহেবরা আজই বাঘ মারতে পারে—!'

'মহারাজ,' মহারাজার পায়ের তলায় করজোড়ে লুটিয়ে প'ড়ে বুটা বলে : 'কেবলমাত্র শাদা-চামড়াওলারা নয় হুজুর, হুজুরের পরিবারের সকলেই শিকারের স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে এক-একটি চিতা নিয়ে ঘরে যেতে পারবেন।'

'রাখ তোর ওসব কথা, এই সাহেবের খিদমৎ কর আগে,' বলতে বলতে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদুকণ্ঠে টুলীপ মন্তব্য করেন: 'আমিও যে মানুষটা শক্ত, ওকে আমি ঐ বিশ্বাসটাই করাতে চাই। আর দেখছি, ও-লোকটা আমার কাছে প্রয়োজনীয়ও হতে-চলেছে।'

'আমি সব বুঝে নিয়েছি, হুজুর।' বুটা বলল। ত্বরিত-গতিতে বাঁকান ঠ্যাং দুটো নিয়ে সে জংগলে মাচার দিকে দৌড়ে চলে গেল।

আমরা নবতৃণাচ্ছাদিত শাদ্বলের উপর দিয়ে বেড়াতে শুরু করলাম। দেখলাম, অতিথিরাও দলে দলে ইতস্ততঃ পায়চারী করছে। এদের দল বাঁধবার কায়দাটাও কিন্তু বেশ। মিঃ ও মিসেস বেল পরস্পরের বাহুবদ্ধ অবস্থায় এদিক ওদিক চলাফেরা করছে,—ইংরেজরাই শুধু পারে এইভাবে দৈহিক গতিবেগ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুগলে ঘুরে বেড়াতে। মিঃ হোমার লেন তার মিসেসের হাত ধরে হুইস্কী ও সোডা পান করছে, পাছে মিসেসকে হারিয়ে ফেলে, তার একটা আশংকা যেন ভদ্রলোককে পেয়ে বসেছে। শ্রীযুত পোপাতলাল জে. শাহ্ ও মিঃ ল্যাগুয়ের গঙ্গীকে মাঝখানে রেখে পায়চারি করছেন। গঙ্গী যে মাত্র দু'চারটে মৌলিক ইংরেজী বুলির সঙ্গেই পরিচিত, তা কিন্তু ভুলে গিয়ে দু'জনেই তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বাকবিভূতি রচনা করছেন। কিন্তু এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়, আমি জানতাম, দেওয়ান সাহেবেরই হার হবে। কারণ, লোকটা আসলে বিরক্তিকর, কথাবার্তা বলতে গেলে ক্ষণকাল পরেই দর্শনশাস্ত্র টেনে আনবেন আর লম্বা চওড়া বুলি ঝাড়তে আরম্ভ করবেন। পক্ষান্তরে কুর্ট ল্যাগুয়েরের মোলায়েম তারুণ্যের সান্নিধ্য গঙ্গীর কাছে সত্যসত্যই আকর্ষণীয়, এবং এই আকর্ষণের আরও কারণ, গঙ্গী কৃষ্ণাঙ্গিনী আর কুর্টের রং ফর্সা, এই দুটো বিপরীত বস্তু পরস্পরকে সাধারণতঃ আকৃষ্ট ক'রেই থাকে। মহারাজার আদেশ

পালনের জন্য মিঞা মিথুর সঙ্গে বুলচাঁদ যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে এই ত্রিমূর্তির ওপর তার নজর পড়তেই তাকে যেন একটু উদ্বিগ্ন হতে দেখা গেল।

মিঃ ওয়াটকিন্স হঠাৎ চিৎকার ক'রে ঘোষণা করে : 'নওযোয়ান ও যুবতীরা সব, আজ রাতেই আমাদের শিকারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।'

'ওঃ হুর্‌রা!' কুর্ট চেঁচাতে চেঁচাতে আমাদের দিকে ছুটে আসে। একমাত্র সে-ই ওয়াটকিন্সের আহ্বানে মহানন্দে সাড়া দেয়। অন্যেরা সব মৃদু কথায় কিংবা ঈষৎ মাথা নেড়ে উত্তর দিল।

এই শিকার-পার্টিতে আমেরিকানরা যে টিন-ভরা খাবার এনেছিল তাই আমরা তাড়াতাড়ি সকলে মিলে গ্রহণ ক'রে বেরিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হলাম।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠতেই প্রাসাদ সংলগ্ন তৃণাচ্ছাদিত শাদ্বলের চারদিকের ফুলগুলো সৌরভ ছড়াতে আরম্ভ করল। স্থির বাতাসে সকলের ওপর দিয়ে সুগন্ধ ছড়ালো রজনীগন্ধা। হ্রদের শীতল জলের স্পর্শ নিয়ে যে মৃদু সমীরণ এসে লাগছে গাছে, তাতে ফুলগাছগুলো দুলছে একটু একটু ক'রে। আমার নিজের দিক থেকে, ঐ মাচায় তাড়াহুড়ো ক'রে চিতাবাঘের উপস্থিতির আশায় সারারাত জেগে কাটানোর চেয়ে একটু সকাল সকাল শয্যা গ্রহণ ক'রে নিজের চিন্তায় বিভোর থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

বুটা কিন্তু আমাদের সকলকেই নিয়ে যাওয়ার জন্য হাজির হলো, আর আমরা সকলেই দলবদ্ধ হয়ে শিকারী নামধারী গ্রামবাসীদের হাতের আদিম যুগের মশালের আলোয় তাদের পশ্চাদানুসরণ করলাম।

অরণ্যের ঘন সন্নিবিষ্ট গাছগুলো আকাশের তারাগুলোকে পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে, গাছের চন্দ্রাতপের নীচ দিয়ে দু'ধারের পেয়ারা গাছের ঝোপ, ফণিমনসা ও হিদার গাছ ও গুল্মের বন। তারই মধ্য দিয়ে একটা সরু রাস্তা ধরে আমরা এগোলাম এবং শেষ পর্যন্ত শিকার-ভবন থেকে সিকি মাইল দূরে বুটার তৈরি শিকার-মঞ্চের কাছে উপস্থিত হলাম।

বাঁশের খুঁটির মাচা, চল্লিশ ফুট উঁচু। মাচার নিচু অংশটা সম্পূর্ণ ফাঁকা, উপরে কাঠ দিয়ে ঘেরা একটা বাক্সের মতো বসানো। চারদিক খোলা, সেখান থেকে শিকারীরা নীচের জানোয়ারদের প্রতি-আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থেকে গুলি করতে পারে। মাচার নীচে বাঁশের খুঁটোয় একটা জীবন্ত ছাগল বাঁধা, তারই লোভে হিংস্র বন্য জানোয়ার ছুটে আসবে। কোনমতে বেঁধে তৈরি করা বাঁশের মই বেয়ে শিকারীদের রীতিমত কসরৎ ক'রে মাচায় উঠতে হয়।

স্বভাবতঃই এই মাচায় ওঠা অতিথিদের মধ্যে রীতিমত কৌতুক ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। এত উঁচুতে উঠবার সময় উদ্বিগ্ন মহিলারা চিৎকার ক'রে ওঠে, ভদ্রলোকেরা হাসতে থাকে আর বীরের মতো মহিলাদের মাচার ওপরে উঠতে সাহায্য করবার চেষ্টা করে।

চিতাবাঘটা নিশ্চয়ই এদের উচ্চ হাস্যধ্বনি ও উন্মাদনার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে, নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে এই আনন্দের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিতে সে মোটেই রাজী নয়। কাজেই মাচার ওপরে বাক্সের শক্ত ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর চেয়ারগুলোয় বসে, অথবা এদিকে ওদিকে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বন্য জন্তুর আশায় চুপ ক'রে অপেক্ষা করি। কারণ বুটা আমাদের নির্দেশ দিয়েছে যে, যদি চিতাবাঘকে মাচার কাছে হাজির করাতে হয়, তাহ'লে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করতে হবে আমাদের।

আকাশের এক কোণে টুকরো চাঁদ মুখখানা বের ক'রে যেন হাসছে

আর আমাদের মনের শিকার-প্রাপ্তির উজ্জ্বল আশার চেয়েও আকাশের তারাগুলোকে যেন উজ্জ্বলতর মনে হচ্ছে। অরণ্যের মর্মরধ্বনি, গুবরে পোকার ডাক আর দাদুরীর আনন্দ-সঙ্গীত এই আঁধার-নীরবতার পর্দা ছিন্ন ক'রে দিচ্ছে আর এরই সঙ্গে যোগ হয়ে আমাদের শিকার-প্রাপ্তির অস্থির প্রতীক্ষা প্রতি মুহূর্তে বিস্ফারিত হবার লক্ষণ প্রকাশ করছে।

এই স্নায়ু উৎপীড়নের প্রথম প্রকাশ দেখা যায় মেয়েদের মধ্যে।

গঙ্গী করুণ স্বরে বারকয়েক অভিমান করার পর দেহ এলিয়ে দিয়ে টুলীপের কাঁধের ওপর মাথা রেখে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ে।

'প্রিয়তম, বড় ঘুম পেয়েছে—' গ্রেটা গার্বোর ভঙ্গিতে আলস্য-জড়িত কণ্ঠে মিসেস হোমার লেন বলে।

'আমারও একই অবস্থা প্রিয়ে,' মিঃ লেন বলে: 'আমিও ক্লান্ত, দু'চোখ ভরে ঘুম আসছে।'

শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্ বলেন: 'সকাল সকাল, বিশেষ ক'রে দীর্ঘ ভ্রমণের পর ঘুমোনই শ্রেয়।'

'ঠিক আছে, যারা ঘুম-কাতুরে, তারা সরে পড়ুক,' রুক্ষ স্বরে মিঃ ওয়াটকিন্স বলে।

'আঃ, অত গোলমাল ক'রো না,' মিঃ বেল বলে: 'তাহ'লে বাপু শিকারের দফা রফা।'

'সেম—লজ্জা, চিতাবাঘটা এখনও এল না!' মিসেস বেল বলে।

'তাহ'লে তুমিও যেতে পার,' পত্নীর দিকে মুখ ফিরিয়ে রূঢ় কণ্ঠে মিঃ বেল বলে।

'না, না, আমি থাকতে চাই।' প্রতিবাদ জানিয়ে বলে মিসেস বেল।

'আমি সবাইকে নীচে নামতে সাহায্য করবো,' কুর্ট ল্যাণ্ডুয়ের বলে: 'মহারানী সাহেবার যদি ঘুম পেয়ে থাকে, তাহ'লে তাঁকে আমি পিঠে ক'রে নীচে নামিয়ে দেব।'

টুলীপ কতকটা যেন হতভম্ব হয়ে নিশ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় কুর্টের দিকে মুখ ফেরান। এক লহমায় তিনি উপলব্ধি করেন যে, গঙ্গী নিশ্চয়ই যুবকটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে, এবং নিশ্চয়ই তার ঝোঁকা-ভাবটা প্রকাশও করেছে, কিন্তু ইংরেজী ভাষায় এত অল্প জ্ঞান নিয়ে তা সম্ভব হলো কি ভাবে, তা তিনি বুঝতে পারেন না। তবে মনে প্রাণে তিনি জানতেন যে, যৌন ব্যাপারটা ভাষার অপেক্ষা রাখে না। আবার প্রেমের ছলা কলা আরম্ভ করেছে গঙ্গী। আশ্চর্য, মুহূর্ত পূর্বেও, যেন কিছুই জানে না এমনি ভাবে, তাঁরই কাঁধের ওপর মাথা রেখে দেহ এলিয়ে শুয়ে পড়েছে!

'স্থানীয় শিকারীদের মধ্যে কেউ একজন ওঁকে ধরে নামতে সাহায্য করবে।' জীবনযুদ্ধে পেছিয়ে-পড়া বৃদ্ধের অনিয়ন্ত্রিত ঈর্ষায় হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্‌ বলেন।

'আমরাই তো আছি, মহারানীকে সাহায্য করবো'খন—' অদ্ভুত ধরনের কর্মতৎপরতায় ভরপুর হয়ে বুলচাঁদ বলে।

এই সমস্ত কথাবার্তার শব্দে চিতা মহাশয় কখনই হাজির হবেন না। তাই কণ্ঠস্বরে রাজকীয় চিন্তাধারার ছলটা ফুটিয়ে টুলীপ বলে ফেলেন: 'আমি বলছি, শিকারের আশায় এই প্রতীক্ষা বন্ধ রেখে এখন সহজ-সাধ্য শিকার-খেলার ব্যবস্থাই করা যাক। বিকল্প হিসেবে এর ব্যবস্থার হুকুম আগেই দিয়ে রেখেছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই শিকার-খেলা শেষ হয়ে যাবে। তখন আমরা সকলেই একসঙ্গে নেমে পড়তে পারব।' তারপর কোন সম্মতি বা অসম্মতির অপেক্ষা না করেই, তিনি চিতাবাঘগুলো ও কৃষ্ণসার হরিণ প্রস্তুত ক'রে রাখা হয়েছে কিনা তা ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিংকে জিজ্ঞেস করলেন।

'জি হুজুর,' বলেই ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং ত্বরিতগতিতে নেমে গেল।

মুখে মুখে রাজকীয় হুকুম ছড়িয়ে পড়ল এবং শীঘ্রই আমরা নীচে ফাঁকা জায়গাটায় যথেষ্ট কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করলাম।

প্রায় একশ' গজ দূর দিয়ে গ্রাম্য শিকারীদের দু'খানা গোরুর গাড়ি নিয়ে যেতে দেখা গেল, গাড়ি দু'টোর ওপর এক-একটা চিতা রয়েছে, আশ্চর্য, সেগুলো পোষা বিড়ালের মতো চুপচাপ।

'হরিণগুলো কোথায়?' মাচার ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মহারাজা চিৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করেন।

তন্দ্রা থেকে গঙ্গী চমকে ওঠে—চেয়ার থেকে প্রায় মঞ্চের ওপর পড়ে যেতে নেয়। টুলীপ কিন্তু তাকে সোজা হয়ে বসতে একটুও সাহায্য করলেন না দেখে, নাকী স্বরে গঙ্গী বলে :

'ও, টুলী, কি ঘুমই না পেয়েছে—'

কুর্ট ল্যাণ্ডুয়ের দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে গঙ্গীর নরম কাঁধটা চেপে চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

'হরিণগুলো কোথায়?' মহারাজা আবার চিৎকার করেন।

'মহারাজ, খোঁয়াড় থেকে আনবার জন্য বুটা গিয়েছে।' পিয়ারা সিং উত্তর দেয়।

'চিতাগুলোর কি এখনো চোখ-মুখ বাঁধা রয়েছে?' মহারাজা এত জোরে চিৎকার ক'রে ওঠেন যে, তাতে নিদ্রা আবিষ্ট অরণ্যের নিদ্রা ভেঙে যেতে পারে।

'হাঁ, মহারাজ!' আশেপাশের শিকারী নামধারী গাঁয়ের লোকগুলো সবাই একসঙ্গে উত্তর দিয়ে চিতাগুলোর চোখ থেকে বন্ধনী খুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। বুটা সর্দার কৃষ্ণসারের দল তাড়িয়ে আনছিল; তার কাছ থেকে সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বন্ধনী খুলতে পারা যায়, এইভাবে তারা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

'বুটা হরিণের পাল তাড়িয়ে নিয়ে আসছে।' মহারাজাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য পিয়ারা সিং গোরুর গাড়িগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে বলে। কৃষ্ণসারগুলো যতই এগিয়ে আসছে চিতাগুলো ততই শিকারের গন্ধে গাড়ির ওপর শিকল নিয়ে ভীষণ টানাটানি শুরু করে।

ফাঁকা জায়গার ভিতর দিয়ে কালো কৃষ্ণসারের দলকে নিঃশব্দে আসতে দেখে মহারাজ হুকুম দেন: 'চুপ, সব চুপ।' তারপর বুল-চাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলেন: 'তোমাদের মধ্যে একজন গিয়ে চিতাগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা, পিয়ারা সিংকে জিজ্ঞেস ক'রে এস!'

একমাত্র বেল-দম্পতি ছাড়া শ্বেতাঙ্গ অতিথিদের মধ্যে কেউই কি যে ঘটছে তা বুঝতে পারছিল না। তবুও সকলেই বুঝবার ভান করছে, এক দৃষ্টিতে ফাঁকা জায়গাটার ওপর তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে এই শিকারের অভিনয় উপভোগ করতে থাকে।

খরগোস দেখলে শিকল-বাঁধা কুকুর যেভাবে টানাটানি করে, গো-শকটের ওপর চিতাগুলোও সেইভাবে ছটফট করতে থাকে।

'একটা চিতা ছেড়ে দাও!' পিয়ারা সিংয়ের কাছে খবর দেওয়ার অপেক্ষা না ক'রেই অস্থির অঙ্গভঙ্গি সহকারে মহারাজা চিৎকার ক'রে ওঠেন।

শকটের ওপর অপেক্ষমান ভৃত্যরা সঙ্গে সঙ্গে একটা চিতার চোখ-মুখের বন্ধনী টেনে খুলে দেয় আর জানোয়ারটা আবছা অন্ধকারে কৃষ্ণসার দলের অবস্থান লক্ষ্য ক'রে দাঁত খিঁচোতে খিঁচোতে গর্জন আরম্ভ করে।

'এই শুয়োরের বাচ্চা! শেকলটা খুলে দে!' ক্রমবর্ধমান রাগে গড়গড় করতে করতে মহারাজা হুকুম দেন।

ভৃত্যের দল যেন থতমত খেয়ে যায়। মুহূর্তে তারা শিকল খুলে

দেয়। ধনুক থেকে যেভাবে তীর ছুটে যায়, চিতাটা সেইভাবে এক লাফে এগিয়ে যায়। একটা কৃষ্ণসার বেশ কিছুটা দূরে ছিল, কারণ, বুটা তখন পর্যন্ত চিতাকে যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তা জানতে পারে নি। পোষা চিতাটা রাগে ফুলতে ফুলতে যেন নরম ঘাড় দেখে একটা হরিণ-শাবকের পশ্চাদ্ধাবন করে। বাকি কৃষ্ণসারগুলো ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

'সাবাস! সাবাস!' কাংস্যকণ্ঠে মহারাজা চেঁচিয়ে ওঠেন। অতিথিরা হাততালি দেয়, আর চিতাটা গর্জন করতে করতে কল্পনাতীত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে চেপে ধ'রে মৃগশিশুর জীবন-শোণিত পান করতে থাকে আর চিতাটার সামনে মৃতপ্রায় বেচারা এলিয়ে পড়ে। শিঙগুলোর অগ্রভাগ তখনও আক্রমণকারীর দিকে বাঁকানো থাকলেও ওগুলো কোন কাজেই আর আসে না।

বুটা সর্দার ছুটে গিয়ে বন্ধনী দিয়ে আবার চিতার চোখ ঢেকে দেয়। চিতার দাঁতগুলো তখনও কৃষ্ণসারের গ্রীবা-সংলগ্ন। বুটা নিপুণ হস্তে মৃগশিশুর পেটটা কেটে নাড়ীভুঁড়ি টেনে বের ক'রে চিতার সামনে পরিবেশন করে। কৃষ্ণসারের ঘাড়ের তুলনায় এই আহার্য বস্তুটা অধিকতর লোভনীয় চিতার কাছে। মৃগশিশুর স্কন্ধটি মহারাজার অতিথিদের জন্য রেখে দেয় বুটা।

চিতাকে নাড়ীভুঁড়ি খেতে দেখে মিসেস হোমার লেন মূর্চ্ছা যায়।

দ্বিতীয় চিতাটা তখনও ছাড়া হয় নি, কাজেই সমস্ত তামাসাটা নষ্ট হবার উপক্রম দেখে রেগে গেলেও, মিসেস লেনের দৌর্বল্যে বীরোচিত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে হিজ হাইনেস মহিলার দিকে ছুটে যান।

মিসেস লেন ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে পড়ে; তার শুভ্র মুখ, প্রশস্ত নাসারন্ধ্র ঈষৎ নীলাভ মনে হয়; মুখ দিয়ে একটু একটু ফেনা বের হয়।

টুলীপ যাতে মিসেস লেনের অত কাছাকাছি না যেতে পারেন, তাই মিঃ লেন স্ত্রীর উপর ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে বাতাস করতে থাকে।

অধীরতা ও আতংকের ভাব নিয়ে স্তব্ধবাক অতিথিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে থাকে।

মুহূর্তের মধ্যেই মিসেস লেন অনেকটা নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চোখ উন্মীলিত করে; হিজ হাইনেসকে তার মুখের দিকে ঐ ভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার রক্তিম অধরে স্মিত হাসি ফুটে ওঠে।

পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে অপর নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার তো করতে পারে না গঙ্গী; কাজেই হঠাৎ ক'রে ক্রন্দনের সুরে চেঁচিয়ে উঠে হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ভাব দেখিয়ে মাচার ওপর কাত হয়ে পড়ে যায়।

এবার কুর্ট ল্যাণ্ডুয়েরের বীরত্ব দেখাবার পালা। সে দ্রুত এগিয়ে এসে গঙ্গীকে চেয়ারের উপর তুলে ধ'রে তার জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত শার্টের লাপেল দিয়ে বাতাস করতে থাকে।

আর প্রয়োজনীয় বীরত্ব দেখাতে না পেরে শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্‌র বিমর্ষ চোখে ও ললাটে ব্যর্থতার কুঞ্চিত রেখা ফুটে ওঠে।

শিকারের স্ফূর্তিটা মাঠে মারা যেতে দেখে মিঃ ও মিসেস বেল রেগে যায়।

শিকারের আনন্দ ইতিপূর্বেই প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে নষ্ট হ'তে দেখে পিটার ওয়াটকিন্সও অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে, প্রকৃত খেলা-ধূলার আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে যখন সে নিজে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বাড়িতে রেখে এসেছে।

'বেশ, এবার সব ফিরে গিয়ে ঘুমোন যাক!' ক্ষুব্ধস্বরে সে বলে: 'এক রাত্রির পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে।'

অরণ্যে ঊষার আবির্ভাব যত সুন্দর ও যত সমুজ্জ্বলই হোক না কেন, গতরাত্রির রোমাঞ্চকর ঘটনাবলির পর, ধরমপুর লজে শিকারী দলের শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের কাছে নবারুণের মাধুর্যের কোন মূল্যই আর থাকে না। কাজেই প্রত্যেকটি শয্যার পাশে চা ও টোস্টের ছোট-হাজরী সম্পূর্ণ-রূপে অস্পৃষ্ট অবস্থায়ই পড়ে থাকে। মহারাজার খানসামা-বেয়ারা ভগীরথের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও সাহেবদের বেয়ারারা প্রাতরাশ গ্রহণের জন্য মনিবদের অনুরোধ করতে সাহসী হয় না। সূর্যোদয়ের পর বিছানায় পড়ে থাকতে অনভ্যস্ত শিকারী দলের ভারতীয় সদস্যরা—একমাত্র গঙ্গা দাসী ছাড়া—সকলেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। গঙ্গী সচরাচর যেরকম ক'রে থাকে, সেইভাবে অসুস্থতার ভান ক'রে শুয়ে থাকে।

হিজ হাইনেসকে টেবিলের পাশে চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখলাম; চোখের নীচে কালো দাগ ফুটে উঠেছে, দেখেই বোঝা যায় রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। প্রাতঃভোজনের পর তাঁকে শ্যামল শাদ্বলের ছায়া-শীতল কোণার দিকে ডেকে নিয়ে গেলাম, এবং কোন বাগাড়ম্বর না ক'রেই সংক্ষিপ্ত ও নির্মম ভাষায় তাঁকে মোটামুটি অবস্থাটা বুঝিয়ে বললাম:

'ওঁর রক্তে আবার চাঁদের আমেজ লেগেছে, এখন আপনাকে নির্মম হয়ে ওঁকে ছেঁটে ফেলতে হবে। নইলে গঙ্গা দেবী আপনার সঙ্গে বারে বারে প্রতারণা করবেন আর এর ফল আপনার পক্ষে কি হবে—সে-কথা আমি আর বলব না, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন।'

'ওর কি কোন পরিবর্তনই হবে না?' গঙ্গীকে যে কখনো ত্যাগ করতে হবে তা যেন বিশ্বাস করতেই রাজী নন টুলীপ।

মাথা নেড়ে আমি আবার বলি: 'না, আমার সেরকম মনে হয়না।'

টুলীপ মাথা নত করেন, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, গঙ্গী যে তাঁকে প্রতারিত করবে, তা যেন তিনি বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

'বোধহয় আমি বিনাকারণে ওর ওপর হিংসাপরবশ হয়ে পড়েছি,'

তিনি বলেন : 'ও ঐ পোপতলাল জে. শাহ্ শুয়োরটার খপ্পরে পড়তে পারে না। তবে কুর্ট ল্যাণ্ডুয়েরের সঙ্গে ওর ব্যবহারটা ক্ষণিকের বিলাস বলেই আমার মনে হয়, ডাক্তার।'

'গঙ্গা দেবী যে কারুর পাল্লায় পড়বেন তা কিন্তু আমার মনে হয় না,' আমি বলি : 'বরং আমার মনে হয় পুরুষদের তিনি ঘৃণাই করেন, নির্মম হয়ে নিজের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করতে চান। পোপতলাল তাঁর কাছে আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, কারণ, তাঁর ধারণা পোপতলালের সাহায্যে নিজের ছেলের জন্য গদী দখল করতে পারবেন, আর তাছাড়া নিজের জন্যেও একটা জমিদারীর ব্যবস্থাও ক'রে নিতে পারবেন। আর যুবক কুর্ট তাঁর প্রতি আসক্তি প্রকাশ ক'রে তার দামটাই বাড়িয়ে তুলেছে।'

'ডাক্তার, আমি নিজেও যে মিসেস লেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি,' টুলীপ বলেন : 'কাজেই কুর্টের সঙ্গে গঙ্গীর প্রেমাভিনয়ে আমার বিশেষ কিছুই এসে যায় না।···কিন্তু তোমার কি মনে হয় ডাক্তার, যে গঙ্গী ইতিপূর্বেই পোপতলালের সঙ্গে—' ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে মহারাজা তাঁর কথা শেষ করেন না, ইঙ্গিত দিয়েই থেমে যান। কারণ, উত্তরটা তো তিনি নিজেই জানেন, কিন্তু প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিয়ে ফেললে মনের দোদুল্যভাবের মধ্যে গঙ্গী-প্রেমের যে আশা জেগে থাকে, তা তো আর তখন থাকবে না।

'আমি মনে করি, হাঁ,' কতকটা ইচ্ছে করেই আমি বলি।

'কখন পোপতলালের কাছে গিয়েছিল মনে হয় তোমার? আর কেনই বা তা সন্দেহ করছ? কি প্রমাণ আছে?' দেখলাম মহারাজার কুঞ্চিত মুখখানার ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

'শ্যামপুরে। যেদিন গঙ্গী আপনাকে দরজা বন্ধ ক'রে ঘরের বাইরে রেখেছিল, সেইদিন।'

'কি করলে ও শুধরোতে পারে, বলতে পার ডাক্তার? আমি কোনখানে ওর কাছে অপারগ হয়েছি? আমি ওকে কি দিইনি যে আমাকে ও ছেড়ে চলে যাবে?'

'এটা হচ্ছে তাঁর স্বভাব, জীবনে বহু লোকের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, আবার তাদের ছাড়তেও হয়েছে। আজ এটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে, এটা হচ্ছে তাঁর চরিত্রের এক রকমের দুর্বলতা যা তিনি মোটেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না।'

টুলীপের চোখে ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টি, কোন কিছুর উপরেই তাঁর মন বসতে চাইছে না। একটা উত্তাল আলোড়ন চলেছে তাঁর মনে··· যেন তিনি তাঁর প্রেমের মৃতদেহ গঙ্গীর পায়ের ওপর নিক্ষেপ করবেন। যদি ইচ্ছে হয়, গঙ্গী পা দিয়ে মাড়িয়ে দিক সেই প্রেমের শব। এটা নাটকীও হবে, আর তখন, গঙ্গী হয়তো তার অন্তরের এক কোণে এখনো যে ভালোবাসা আছে মহারাজার প্রতি, এই অনিশ্চয়তার পরিবর্তে তখন হয়তো বিশ্বাসটা তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ার অবকাশ পাবে। চিন্তাক্লিষ্ট মহারাজাকে তাঁর চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে দেখে আর সামনের কেশগুচ্ছ টানতে দেখে আমার মনে হয় যে, নিজেকে নিগৃহীত করার ইচ্ছাটা যেন তাঁর ভালোবাসার চেয়েও প্রবলতর ও অনমনীয় মনোভাবে পরিণত হচ্ছে।

টুলীপকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমি বলি: 'আমার মনে হয়, নিঃসঙ্গ হয়ে গঙ্গা দেবী একাকী থাকতে চান। যে-সমস্ত পুরুষ তাঁকে কলুষিত করেছে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন ও সেই সঙ্গে তাদের এবং আরও যাদের তাঁর প্রয়োজন আছে তাদেরকে নিয়ে জীবনের সক্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখবেন এবং নিজের সত্ত্বা তাদের মধ্যে হারাবেন না —এই যেন তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনি চান তাঁর সত্ত্বা আপনার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে। আর এতেই তিনি বাধা দিচ্ছেন, কারণ, কারুর

কাছেই আর তিনি নিজেকে এ ভাবে ছেড়ে দিতে চান না। অন্তের আয়ত্বে থাকা আবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা, তাঁর মনের মধ্যে এই যে সংঘাত :স্বষ্টি করেছে,—তাই হলো যত গোলযোগের মূল। কিন্তু কোথায় যে তার শেষ তা না জানা থাকলেও, এই অদ্ভুত ধরনের চলার দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে বুনো ছাগলের মতো পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফালাফি ক'রে ছুটে বেড়াতেই আজ ইনি চান।'

গঙ্গীর এই ভয়াবহ ও চমকপ্রদ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে টুলীপ অভিভূত হয়ে পড়েছেন ব'লে মনে হয়। কিন্তু তবুও মনে হয় তিনি যেন এই নির্মম বিশ্লেষণ বিশ্বাস করতে চাইছেন না। তাঁদের দু'জনের মিলনের প্রথম দিনগুলোর কথা, গঙ্গীর অতি নমনীয়তার ছবি···কখনই তিনি ভুলতে পারেন না ; গঙ্গী তখন অদ্ভুত ধরনের ইন্দ্রিয়-লালসা ও যাকে বলে দাস্যভাব, তাই নিয়েই তাঁর সামনে এসেছিল। মহারাজা হিসেবে, টুলীপের মর্যাদা সম্পর্কে গঙ্গী তখন রীতিমত সচেতন ; তখন সে তাঁকে রাজার আসনে বসিয়ে, নিজে ইচ্ছে ক'রেই ক্রীতদাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তনুমন সমর্পণ করেছিল। টুলীপের পদচুম্বন করতো সে, ভক্তিপ্লুতভাবে তাঁর দেহ স্পর্শ করতো, সপ্রেম আদর-যত্নে সেবা করতো। সে সময় তার দুটো সন্তান হয়। তখন সে ছিল তাঁর পদলেহনকারী ক্রীতদাসী মাত্র ; টুলীপকে সে প্রভু ও মনিব হিসেবেই পূজো করতো। টুলীপের নিজের মনটাও ছিল শতধাবিদ্ধ ; যৌবনকালে তিনি কারুর প্রতি স্থায়ীভাবে অনুরক্ত হ'তে পারেন নি। এখন তিনি গঙ্গীর ভেতরেই নিজেকে দৃঢ়-সংবদ্ধ করেছেন, বাইরের প্রণয় ভালোবাসার ওপর একটু আকর্ষণও নেই, যদি না গঙ্গী তাঁকে মরিয়া ক'রে তোলে তার নিজের ব্যবহারে। আর আজ গঙ্গী তার স্বরূপ ধরেছে, এখন সে চায় নিজেকে জাহির করার পুরোপুরি আজাদী, সে চায় নিকৃষ্টতর মানুষদের কাছে দেহদান করতে। এখন সে পারে মহারাজাকে

ত্যাগ করতে, পারে তাঁর মর্যাদায় আঘাত হানতে। কিন্তু এখন চারদিক থেকে বিপন্ন হয়ে পড়ে গন্ধীর কেন এই টুলীপ-বিরোধী মনোভাব? দু'জনের মধ্যে যে মনের মিল নেই, অস্পষ্ট ভাবে একথা মনে এলেও, নিজের প্রকৃতির ভেতর এমন একটা বস্তু ছিল যার প্রকোপে পড়ে মহারাজা এই প্রত্যাখ্যান স্বীকার ক'রে নিতে পারছিলেন না। এ যে এক চরম ব্যর্থতা! প্রেম-ভালোবাসার একটা ভিত্তি খুঁজে নেয়ার জন্য তাঁর জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার ব্যর্থতারই স্বীকৃতি যে এটা; তাঁর আশা ভরসা, রাজ্যের স্বাধীনতার লড়াই—সব যে শেষ হয়ে যাবে এক বিশাল নৈরাশ্যের পঙ্কিলে, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ক'রে দেবে যে।

শিকার-ভবনের বারান্দায় বসে আমি এই সমস্ত ভাবছিলাম। আর আমার মনের মধ্যে যে এইরকম চিন্তাধারা চলেছে, মহারাজা নিজেও যেন তা অস্পষ্টভাবে অনুমান করতে পারছিলেন।

'তুমি কি মনে কর ডাক্তার, গন্ধী কখনও...' টুলীপ বক্তব্যটা শেষ করতে পারেন না।

'আসল কথা হচ্ছে, নিজেকে শুধরান,' আমি বলি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে উত্তরটা বেশ মুরুব্বিয়ানা গোছের হয়ে গেল, তাই আমি আবার বলি: 'কোন নারীর প্রতি আসক্ত হ'য়ে তার সঙ্গে একত্রে বহুদিন ঘর ক'রে প্রত্যাখ্যাত হওয়া যে কিরকম বেদনা-দায়ক তা আমি বুঝি টুলীপ। গতানুগতিক সম্পর্কের বেলায় এই ধরনের ব্যথা-বোধ আসতে পারে না—তা অনুমান করতে পারি। কিন্তু যদি কেউ একবার কারুর প্রতি আসক্ত হয়, আর এই আসক্তি যদি অতিমাত্রায় যৌন লালসা যুক্ত ভালোবাসায় পরিণত হয় এবং তার সঙ্গে এসে পড়ে বিবাহ-জনিত মানসিক অভ্যাস, তাহ'লে, দু'জনের মধ্যে কেবলমাত্র যে বেশী নির্বোধ ও নির্মম, সেই তা পারে ভেঙে দিতে। কারণ, ইতিপূর্বেই

এই ধরনের সম্পর্কের যে আনন্দ, তার কাছে তা অবাস্তব, মায়া-মনোমুগ্ধকর মতিভ্রম হয়ে পড়েছে।'

'কিন্তু এটা তো আমার মায়া বা মতিভ্রম নয়—' অধীর কণ্ঠে টুলীপ বলেন।

'আমি বলেছি, মনোমুগ্ধকর মায়া।' আমি উত্তর দিই : 'এ হলো সংক্রামক ব্যাধির মতো ; একবার ধরলেই কষ্ট পেতে হবে। তবে এও মনে করতে পারেন যে, মক্ষীরানীর মতো মানুষ যারা, যারা যথেষ্ট যৌন-সুখ উপভোগ করেছে, তারা যখনই নিজের লালসার পরিতৃপ্তি করতে যায়, তখনই কষ্টভোগ করে, কারণ, বয়সটা যে তার যথেষ্ট পার্থক্যের সৃষ্টি ক'রে থাকে। যৌন সুখে দেহ বিলিয়ে দিয়ে তিরিশ বছরের যুবতী দৈহিক সমৃদ্ধির অধিকারিনী হ'তে পারে, কিন্তু পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশের কোঠায় ব্যাভিচার তো আর নতুন যৌবন দান করে না। এ শুধু, সে যে আকাঙ্ক্ষিতা—এই মতিভ্রমের সৃষ্টি ক'রে ব্যাভিচারিনীকে বৃথা গর্বের আনন্দ দান করে। কিন্তু সেই মতিভ্রম যেই হ্রাস পেতে আরম্ভ করে, তখনই সে নারী হয় সেই পথ ত্যাগ করে, নয়তো তা অনুসরণ করতেই থাকে।'

'তাহ'লে ওরা সময় সময় মতিভ্রম ত্যাগ করতে পারে?' আশার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি যেন দেখতে পান টুলীপ।

'অতিমাত্রায় কামোন্মাদিনীর মনোরাজ্যের সবচেয়ে বড় ধোকা হচ্ছে এই যে, সে মনে করে, পরবর্তী শিকারটাই তার শেষ শিকার হবে, কিন্তু তা তো আর হয় না, বার বার চলে ঐ একই খেলার পুনরাবর্তন।'

বিরক্তির সুস্পষ্ট মনোভাব নিয়ে টুলীপ উঠে পড়েন এবং গলাটা পরিষ্কার ক'রে নেন। তাঁর চোখ দুটো আমাকে এড়িয়ে চলে, দেখে মনে হয় যে মনে আঘাত পেয়েছেন, আমার দিকে তাকাতেও

পারছেন না। আমার মনটা নরম হয়ে আসে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সন্দেহের আক্রমণে হিজ হাইনেস ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছেন। কাজেই সান্ত্বনা দেবার ভাষায় আমি বলি :

'জানেন তো, ভালোবাসার বিয়েতে উভয় অংশীদারই বিবাহ-বন্ধনের ভেতর এসে পড়ে সমান দায়িত্ব নিয়ে এবং মুক্তভাবে। তা না হলে, যে ভালোবাসে সে, সেরকম গভীরভাবে ভালোবাসায় পড়ে নি এই রকম অপর জীবন-সাথীর কাছে আঘাত পায় এবং শেষ হয়ে যায়। মনমালিন্য শুধু তিক্ততা ও অসন্তোষের সৃষ্টিই করে, এবং উভয়েরই জীবন দুর্বিসহ ক'রে দেয়। এ অবস্থায় অবাধ অধিকার দানই হচ্ছে সমস্যার সবচেয়ে ভাল সমাধান; এতে দেহ ও মনের অপ-ব্যবহারের দরুন যৌন-ব্যভিচারের কাল্পনিক মাধুর্যটা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে পেয়ে মনের গভীরতাটা ফিরে আসে।'

'আরাম-দায়ক সিরাপ আর কি, কি বল !' কাষ্ঠ হাসি হেসে টুলীপ বলেন।

আমি মনে করি, এইবার আটকবন্দীদের কথাটা তোলা যাবে বোধহয়। বলবার মতো সাহস সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আমি চুপ ক'রে থাকি।

'আচ্ছা, এস, এবার একটু মদ খাওয়া যাক,' অন্য কোন গভীর বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলবার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'রে টুলীপ অধীর ভাবে বলে ফেলেই চিৎকার ক'রে ওঠেন : 'কোই হ্যায় ?'

সেই দিন লাঞ্চের সময়, পূর্বরাতের শিকার-লব্ধ হরিণের মাংসই প্রধান ব্যঞ্জনের স্থান দখল করল। টুলীপ বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গেই অতিথি সেবা করেন; আমাদের একসঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় টুলীপ যে আধবোতল হুইস্কী পান করেছিলেন, তাতে অন্তরঙ্গতার পরিমাণ বেশ বেড়ে গিয়েছে দেখলাম। খানা-পিনার মধ্যে বিশেষ সোর-

গোলেরই সৃষ্টি হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে, মহিলারা খাবার টেবিলে ছিল না, কারণ তারা অন্দর-মহলে গঙ্গীর সঙ্গে খানাপিনা করাই শ্রেয়ঃ মনে করেছিল।

ছোট্টুরামকে তৃতীয় বার হরিণের মাংস নিতে দেখে টুলীপ চেঁচিয়ে বলেন: 'ওহে! তোমার ক্ষিধের কথা মনে রেখে, দ্বিতীয় চিতাটা ছেড়ে দিয়ে আরো কিছু হরিণের মাংস যোগাড় করলে ভাল হোত দেখছি! ওর কাণ্ড দেখ, ওর কাণ্ড দেখ তোমরা সবাই!'

শ্বেতাঙ্গ-অতিথিরা ছোট্টুরামকে দেখবার জন্য মুখ ফেরায়। তার গাল দুটো সত্যি বলের মতো ফুলে উঠেছে।

'কি ক'রে যে ও খাচ্ছে তা জানি না!' মিঃ ওয়াটকিন্স বলে: 'মাংসটা যা ঝাল হয়েছে—!'

'হাঁ, সত্যিই ঝাল হয়েছে!' বিজ্ঞতার ভান ক'রে মিঃ বেল বলে। ভদ্রলোক মাংসটা পছন্দ করার ভান করলেও তার মুখ কিন্তু লাল হয়ে উঠেছে।

মিঃ বেল চোখ তুলে চাইতেই তার মুখমণ্ডলের ঘামে তার চশমার কাঁচগুলো ঝাপসা হয়ে যায়।

'উঃফ্!' কুর্ট ল্যাণ্ডুয়েরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ছোট্টুরাম তখন বড় বড় মাংসের টুকরো গিলে ফেলে প্রত্যেক চাপাটির সঙ্গে রান্না করা মাংসের কিছু অংশ সাবাড় ক'রে ফেলছিল। 'আরে আরে ছট্টুরাম!' ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং হঠাৎ বলে ওঠে: 'খাচ্ছ না হয় মহারাজার ওপর, কিন্তু পেটটা তো তোমার নিজের!'

এই কথায় সকলেই হেসে ফেলে, পিয়ারা সিংয়ের কথা বলার ভঙ্গি ছোট্টুরামের ক্ষিধের মতোই বেয়াড়া ধরনের।

ছোট্টু বুঝতে পেরেছিল যে, এখন সে সকলেরই ঠাট্টার পাত্রে পরিণত হবে, তাই সে নাটকীয় ভঙ্গীতে আহারেই মনোনিবেশ করে।

'ছোট্টুর জন্য আমার মন কেমন করছে,' মহারাজা আবার বলেন :
'অন্য চিতাটাকে ছেড়ে দিলেই হতো।'

'একটা হরিণই যথেষ্ট মহারাজ!' ছোট্টু বলে : 'শুধু যদি ভগীরথ মাংসে আরো কিছু লঙ্কা দিত!'

লঙ্কার কথা শুনে বিদেশী অতিথিরা মৃদু হাসে, কারণ তারাও বেশ রসিয়েই খাচ্ছিল।

'আপনারা হয়তো ধারনা করতেই পারবেন না, কি ক'রে এই ছোট্ট মানুষ ছোট্টুরাম এতখানি বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হতে পারল,' ছোট্টুর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়াটা শ্বেতাঙ্গ মহলের মনের থেকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে মুন্সী মিথনলাল বলেন।

'পাকস্থলিটা কত বড় জানেন? হাতটা মুঠো করলে যতটা হয় ততটুকু।' আমি মন্তব্যটা জুড়ে কথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললাম, যাতে ছোট্টুরামের বিশ্রী অমার্জিত কথাটা অন্যের কানে লেগে না থাকে।

ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং বলে : 'আমার মতো লম্বা দৈত্যের মতো লোক এতটা খেলে বেশ মানাত, কিন্তু এই ছোট্টুর মতো বেঁটে-খাটো লোক···!'

ছোট্টু কিন্তু আহারের মাত্রাটা বাড়িয়েই চলে।

'ও যাই খাক না কেন,আমি কিন্তু ওকে হারাতে পারি।' পিয়ারা সিং বলে।

'তাহলে ওটা চ্যালেঞ্জ!' মুখের কুণ্ঠিত ভাবটা সরিয়ে ফেলে একটু সচকিত হাসি হেসে মহারাজা বলেন।

'হ্যাঁ, আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম!' ছোট্টু বলে।

'রাখ, রাখ, আমার কাছে তোমার নির্ঘাৎ হার!' পিয়ারা সিং সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে বলে।

'বেশ, বাজী রাখ।' ছোট্টু বলে।

'আচ্ছা,' পিয়ারা সিং বলে: 'মহারাজাই শর্ত ও বাজী ঠিক ক'রে দিন।'

'এখানে বসেই এক্ষুণি আমি কুড়িটা সিদ্ধ ডিম ও এক বোতল শ্যাম্পেন সাবাড় করে ফেলবো!'

'হুঃ, ভারি তো! আমি খেতে পারি পঁচিশটা!' পিয়ারা সিং বলে।

'আচ্ছা বেশ, যে হেরে যাবে তাকে অপর ব্যক্তিকে পাঁচশ টাকা দিতে হবে,' টুলীপ বলেন: 'আর আমি দেব হাজার টাকা।... ভগীরথ, এক্ষুণি পঁয়তাল্লিশটা ডিম সেদ্ধ ক'রে নিয়ে আয়!'

'হাঁ, মহারাজ, কাল দেব—' ভগীরথ বলে।

'না, আজ, এক্ষুণি।' টুলীপ হুকুম দেন।

ভগীরথ চারদিকে তাকায়, ঠোঁটে তার ক্ষীণ হাসি, ভাবছে মহারাজা তার সঙ্গে তামাসা করছেন কিনা।

'ও ভাবে ড্যাবড্যাব ক'রে তাকাচ্ছিস কি! যা, ডিম নিয়ে আয়।' হিজ হাইনেস চেঁচিয়ে বলেন।

ভগীরথকে যেতেই হয়। মাথা নুইয়ে সে রান্নাঘরে চলে যায়।

মিঃ ওয়াটকিন্স ও মিঃ লেন ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে মিঃ বেলের কাছে জানতে চায়।

হিজ হাইনেসের প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে ব'লে, নিজেই উঠে গিয়ে অতিথিদের শ্যাম্পেন পরিবেশন করেন। আসর গরম রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য।

'খাওয়াতে যে পরাস্ত করতে পারি, তা আজ ছোট্টুকে দেখিয়ে দেব—' টাম্বলারের শেষ শ্যাম্পেনটুকু শেষ ক'রে পিয়ারা সিং গর্ব ক'রে বলে। 'আপনাদের সকলকেই দেখাব!...কেন, কাল রাতে আমি

নিজেই দ্বিতীয় চিতাবাঘ হ'তে পারতাম! আমিও হরিণটার জীবন-শোণিত শুষে নিতে পারতাম!'

'তা বটে। কতকগুলো লোক আছে যারা শুধু দেখতেই মানুষের মতো!' পিয়ারা সিং-এর জানোয়ার সুলভ আস্ফালন থামিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে আমি বলি।

'পোষ মানলে অবশ্য কিছুটা পার্থক্য হয়!' টুলীপ বলেন।

'হুজুর, বন্দী অবস্থায় সিংহও ছাগল বনে যেতে পারে! আর আমি হচ্ছি ধর্ম হিসেবেই সিংহ, পশুর রাজা—!'

'আর তুমি কোনকালেই পোষ মানবে না।' আমি বলি।

ভগীরথ একখানা প্লেটে ক'রে ছটা কড়া সিদ্ধ ডিম নিয়ে এসে বলে: 'মহারাজ, সকালে যে ডিম সিদ্ধ করেছিলাম, তার ছ'টা ছিল, তাই নিয়ে এলাম।'

'কিন্তু আমি চাই পঞ্চাশটা! টুলীপ গর্জন ক'রে ওঠেন।

'মহারাজ, আরো কুড়িটা সিদ্ধ বসিয়েছি। এখন শুরু করবার জন্য এগুলো নিয়ে এলাম।'

'আচ্ছা এখন হালুয়া ও ফল পরিবেশন কর।' টুলীপ হুকুম দেন।

বিদেশী অতিথিরা মাথা নেড়ে জানাল যে আর তারা খেতে পারছে না।

'আমার জন্য শুধু একটু কফি—' মিঃ লেন বলে।

'চালান চালান, মিঃ লেন,' হাসতে হাসতে টুলীপ বলেন: 'দম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যান, তাহ'লে দেখবেন আর কোন বাসনা থাকবে না। আহার বা প্রণয়ের ব্যাপারে এই হচ্ছে সব চেয়ে নিরাপদ রীতি।'

'মহারাজার দেখছি ও-দুটোর সঙ্গেই বেশ পরিচয় আছে!' দুষ্টু হাসি হেসে মিঃ ওয়াটকিন্স বলে।

'মনের কোন বাসনাকেই আমি দাবিয়ে রাখি না,' ওয়াটকিন্সের রসিকতাটাকে গুরুত্ব সহকারে ধরে নিয়ে টুলীপ বলেন: 'কাজেই আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মেছে। মনের কোন আকিঞ্চনকেই আমি অস্বীকার বা দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করি নি, বা তা থেকে দূরে চলে যেতেও চেষ্টা করি নি। যা চেয়েছি তাই-ই পেয়েছি। আমার চলার পথের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করে রাখা হয়, কাজেই যখনই যা আমি চেয়েছি তাই-ই পেয়েছি। আর খুশী মত এইভাবে পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু এখন এই চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যেই আমি কেমন আটকা পড়ে গিয়েছি । ডাঃ শঙ্করের মতে এখন আমার অবস্থা এই রকমই দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ তার মতে লাভ করতে করতেও আমি বলে লোকসান ক'রে বসেছি। এখন যাতে আটকা পড়ে না যাই, সেই কলা-কৌশলটা আয়ত্ব করার চেষ্টা করছি।...'

'আর, তবুও আমার আশঙ্কা হয়,' আমি বাধা দিয়ে বলি: 'হিজ হাইনেস সব সময়েই আটকা পড়ে যান। তাঁর দাম্ভিকতা এত বেশী যে যখন আটকে পড়ছেন তখনও তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না।'

'ডাঃ শঙ্কর হয়তো আমাকে ভালভাবেই জানে,' টুলীপ বলেন: 'কিন্তু, মিঃ ওয়াটকিন্স, ভিতরটায় আমি একেবারে মুক্ত ও নিরাসক্ত। সব কিছুই আমাকে অতিক্রম ক'রে বা এড়িয়ে চলে যায়। কোন কিছুই আমাকে স্পর্শ করতে বা বিচলিত করতে পারে না, যদিও আমি জানি, আমি জড়িয়ে পড়েছি। এটাই হচ্ছে সত্য কথা। একেবারে খাঁটি সত্য—'

'কতকটা, যাকে আপনারা বলেন, যোগীর মতো।' মিঃ লেন বলে।

'বরং বলুন "স্কিজোফোরেন"-এর মতো।' ধূর্ত বেল বলে।

'হাঁ, হাইনেস সেই রকমই বটেন, যাকে বলে যোগী,' আমি বলি। 'কিন্তু তিনি তা আবার নবীনও...মিঃ বেল ঠিক কথাই বলেছেন।

মহারাজ স্থায়ী আসক্তির অযোগ্য—তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি আটকা পড়ে যান!'

'ভগীরথ—! বেয়ারাগুলো সব গেল কোথায়! ডিমের কি হ'লো?' আমার রূঢ়তায় ক্ষিপ্ত হয়ে টুলীপ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন। ছোট্টুরাম ও পিয়ারা সিং-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বলেন: 'তৈরি! এবার বাপু যার যার মায়ের নাম স্মরণ ক'রে নাও!'

কাজেই আমাদের আবার আলোচনার উচ্চ মার্গ থেকে ধপাস ক'রে নেমে পড়তে হয়।

ভগীরথও সেইমুহূর্তে হাজির হয়।

'ডিম! ডিম কোথায়!' টুলীপ চিৎকার ক'রে ওঠেন: 'দেখতে পাচ্ছিস না, দৈত্য দুটোর ক্ষিধে পেয়েছে? যদি ব্যবস্থা না করতে পারিস, তোকেই যে গিলে ফেলবে!'

'এই যে হুজুর বাহাদুর, আরও কুড়িটা এনেছি।' রান্নাঘরের আগুন নিভে গিয়েছে।'

'চালাও!' মহারাজ ছোট্টু ও পিয়ারা সিংকে বলেন।

'ক্যাপ্টেন সাহেবের পরে আমি শুরু করবো।' ছোট্টু বলে।

'না, তুমিই প্রথমে—' পিয়ারা সিং বলে।

'ওসব সৌজন্য এখন ভুলে রেখে আরম্ভ করো তো!' মহারাজ হুকুম দেন।

দৈত্য দু'জন ডিমের খোসা ছাড়াতে আরম্ভ করে।

'নুন, মরিচ—! খানসামা, আরও কিছু শ্যাম্পেন!'

ভগীরথ বোতল-দানটা সামনে টেনে এনে আর-একটা শ্যাম্পেনের বোতল খোলে আর দুই রাক্ষস তখন খাওয়া শুরু করে।

'আচ্ছা, আমরাও ডিমের খোসা ছাড়িয়ে দেই না কেন?' ওয়াটকিন্স বলে।

'তোমাদের দু'জনেরই কামলা রোগে মৃত্যু অবধারিত—' দুই রাক্ষসকে লক্ষ্য ক'রে আমি বলি। দু'জনেই দু'দুটো ডিমের খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরে দেয়।

'আঃ, মুখে ডিমগুলোতে কিছু শ্যাম্পেন ঢেলে নাও!' ভগীরথের খোলা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে ফেনিল পানীয় ঢালতে ঢালতে টুলীপ বলেন।

দুই রাক্ষসই সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নেড়ে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয়। ওদের মুখমণ্ডল যতই লাল হ'য়ে ওঠে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা ততই বিস্ময়াবিষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে।

ছোট্টু ইতিমধ্যেই দশটা ডিম সাবাড় ক'রে ফেলেছে, চশমার আড়ালে তার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বের হচ্ছে; খাওয়া আরম্ভ করার সময়ের তুলনায় তার মুখমণ্ডলও অনেক বেশী ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

'চোদ্দ!' পিয়ারা সিং বলে: 'আমি ছটা বেশী খেয়েছি। ভগীরথ—' টাম্বলারটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে এক চুমুক শ্যাম্পেন পান ক'রে নেয়।

'আমি হ'লে আস্তে আস্তে চিবোতাম।' আমি তাকে বলি: 'ডাক্তার হিসেবে আমি একথা বলছি হে।'

'খাওয়াটা তো আমার খুশীর ব্যাপার হে—' সে বলে।

ভগীরথ আরো এক ডজন ডিম নিয়ে আসে।

ছোট্টুর মুখ-চোখ যেন একটু ফ্যাকাশে মনে হয়।

'এবার থাম তুমি।' আমি তাকে বলি।

'উঁহু ডাক্তার, এটা তো প্রতিযোগিতা!' মহারাজা বলেন।

'শেষ-পর্যন্ত চালিয়ে যাব।' এই ব'লে ছোট্টু আরেকটা ডিম মুখে পুরে দেয়।

কিন্তু ওটা কিছুতেই আর গলার ভেতর দিয়ে নামে না।

'একটু গলা ভিজিয়ে নাও।' ওর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আমি বলি।

ছোট্টু আর পারে না, শেষ পর্যন্ত সামনের টেবিলের ওপর ওয়াক তুলে বের ক'রে ফেলে।

আমার মুখটা তিতে হয়ে উঠেছে, সামলাতে না পেরে আমি উঠে পড়লাম।

দেখলাম, একে একে সকলেই চলে যাচ্ছে। লাঞ্চ-পার্টির পরিসমাপ্তি এমনি করেই ঘটল…

এইরকম লাঞ্চের পর গভীর দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী, এবং বিকেলের চা অতিথিদের শয়নকক্ষেই পরিবেশন করা হলো।

নিজের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে কিভাবে আমেরিকার সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য হিজ হাইনেস আমাকে তাঁর শয়নকক্ষে আসতে বলেছিলেন। সেইজন্য, ভগীরথ তাঁর শয্যা পার্শ্বে চা রেখে বেরিয়ে আসতেই আমি শয়নকক্ষের দোরে করাঘাত করলাম।

আমি মনে করেছিলাম ভগীরথ নিশ্চয়ই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়েছে, কিন্তু প্রবেশ ক'রে দেখলাম, টুলীপ গভীর নিদ্রায় মগ্ন, দরজায় আমার করাঘাতের শব্দই তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়েছে।

আমি ভিতরে ঢুকতেই যেন একটু চমকে উঠে ডান হাতখানা তাঁর রেশমের মতো নরম চুলের ওপর বোলাতে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম আবার তিনি চমকে উঠলেন। মুখ-হা ক'রে চার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন :

'গঙ্গী কোথায়? ও যে আমার পাশেই ঘুমিয়েছিল!…'

তাঁর মনের কথা আমি বুঝেছি। তাঁর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, মনে হয়, তিনি যেন চেঁচাতে যাচ্ছেন। তাঁর মাথাটা দুলতে আরম্ভ করে, নিজেকে ঠিক রাখবার জন্য তিনি নীচের ঠোঁটটা কামড়িয়ে ধরেন।

'হুঁ, বুঝেছি আমি, বুঝেছি—ও কুর্টের ঘরে গিয়েছে—' টুলীপ বলেন: 'তুমি না বলেছিলে, ওর রক্তে চাঁদের পরশ লেগেছে! গত রাত্রে কুর্ট যখন ওর কাঁধ চেপে ধ'রে ওকে মাচার ওপর তুলে ধরেছিলে, তখনই আমার মনে হয়েছিল গঙ্গী এই কাণ্ডটা করবে।...এইজন্যেই আজ সকালে আমার মনটা অস্বস্তিতে ভরে ছিল...'

হিজ হাইনেস তাঁর বক্তব্যটা আর সে শেষ করতে পারেন না।

আমিও হতাশ হয়ে মাথা নাড়লাম।

হঠাৎ টুলীপ শয্যা পরিত্যাগ ক'রে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে বারান্দায় ক্ষণকালের জন্য দাঁড়ালেন, তারপর দৌড়লেন।

তাঁকে ফিরিয়ে আনতে আমার সাহস হলো না, এতে যে হৈ চৈ হবে তাতে অন্যান্য অতিথির ঘুম ভাঙতে পারে এই আশংকায়। শুধু তাঁকে অনুসরণ করলাম আমি।

রণকৌশলের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ এই দারুন উত্তেজনার মুহূর্তেও দেখলাম জানলা ঢাকা জালির ওপর চোখ দুটো রেখে মন্ত্রাবিষ্টের মতো তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ডান হাতখানা দ্রুত সঞ্চালিত ক'রে আমাকে আসতে ইঙ্গিত করলেন।

জানলা পর্যন্ত মাথা উঁচু ক'রে ভেতরে তাকিয়ে আমি থ হয়ে গেলাম। বিছানায় শুয়ে আছে প্রায়-বিবস্ত্র গঙ্গী আর নগ্ন কুর্ট, আলিঙ্গনাবদ্ধ, স্মরাতুর...

আমি তড়াতাড়ি টুলীপকে ওখান থেকে টেনে নিয়ে চললাম।

'ছাড়, ছেড়ে দাও আমাকে!' গর্জন ক'রে ওঠেন টুলীপ:

'ওদের ছু'জনকেই আমি খুন ক'রে ফেলবো!' ক্রোধমিশ্রিত থন-থনে কণ্ঠস্বর অলিন্দের ভেতর দিয়ে কুর্টের কক্ষে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে পদশ্চালনার শব্দ ও ফিসফিস কথা শোনা যায় কক্ষের অভ্যন্তরে।

মহারাজার মুখের ওপর ডান হাতখানা রেখে ও বাঁ হাত দিয়ে তাঁকে জোর ক'রে চেপে ধরে তাঁর শয়ন কক্ষের দিকে টেনে নিয়ে গেলাম। টাট্টু ঘোড়ার মতো তিনি লাফাতে থাকেন, চোখ দুটো তাঁর আগুনের মতো লাল, আমার ওপর অজস্র গালিবর্ষণ চলতে থাকে আর নিজেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে। আমি আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে এবং এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড থেকে তাঁকে মুক্ত করবার জন্য আমি তাঁর ওপর আমার সমগ্র দেহের ভার দিয়ে চেপে ধরি। গন্ধীকে ইতর ভাষায় গালাগাল দেওয়া ছাড়া তাঁর শান্তিলাভের আর উপায় ছিল না। তাঁর উন্মুক্ত মুখ দিয়ে তাঁর উন্মাদনার ছট-ফট আওয়াজ বারান্দার ঘন নীরবতা ভেদ ক'রে চলে।

এই অবস্থায় আমি তাঁর সমস্ত দেহটা তুলে ধ'রে, চিৎকার ও প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও, তাঁকে তাঁর ঘরের ভেতর ঠেলে নিয়ে যাই।

'আমেরিকানরা যদি আপনার এই চিৎকার শুনতে পায়, তাহলে, আপনার সবই যে পণ্ড হয়ে যাবে টুলীপ!' কর্তৃত্বের কঠিন স্বরে আমি তাঁকে আস্তে আস্তে বলি। কথাগুলো তাঁর ওপর যেন যাদুমন্ত্রের কাজ করে, টুলীপ আমার বাহুর মধ্যে শান্তভাবে এলিয়ে পড়েন।

ঘরের ভেতর এনে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিই।

চোখ দিয়ে তাঁর দরদর ধারায় অশ্রু বেরোতে থাকে, মুখ ফিরিয়ে তিনি বালিশের মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদতে থাকেন।

আমি তাঁর পাশে বসে পিঠে হাত বুলোতে থাকি।

মনে হয়, যেন কিছুতেই তিনি সান্ত্বনা পাচ্ছেন না। গঙ্গীকে এক-একবার গাল দিয়ে ওঠেন, আবার পরমুহূর্তে দরদ উপচে পড়ে তাঁর কণ্ঠে: 'কি ক'রে যে ও আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলো!…'

আমি তাঁকে প্রাণভরে কাঁদবার অবকাশ দিলাম, এবং এই কাঁদার মধ্য দিয়ে তিনি একটু শান্তও হলেন।

ক্ষণকাল পরে তিনি বলেন: 'আমি জানি, গঙ্গী এই হঠাৎ উন্মাদনার সময়ে একেবারে অসহায় হ'য়ে পড়ে।'

একটু থেমে আবার বলেন: 'একটা কামনার ঝোঁক নিবৃত্তি করবার জন্ম ও এরকম ক'রে আমার প্রাণে আঘাত হানবে! এত নির্মম ও!'

মনের যন্ত্রনায় ক্লিষ্ট হিজ হাইনেস বিছানায় গড়াগড়ি করেন। এই যন্ত্রণা সহ্য করার মতো মনোবল তাঁর তো নেই, তাই চিরকাল যেভাবে তিনি তাঁর ভাবপ্রবণতার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে এসেছেন, এখনও তাই করছেন।

'পোশাক পরে নিন,' বিরক্তি ভরা কণ্ঠে আমি বলি: 'আপনাকে তো আমেরিকানদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'হ্যাঁ, ওয়াটকিন্সকে খবর দাও।'

আমি নীরবে বেরিয়ে যাই।

'বেড়াতে বেড়াতে আমরা কথা বলব। আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের সঙ্গে বেড়ানোর জন্ম ওয়াটকিন্সকে প্রস্তুত হ'তে বলে দাও।' টুলীপ আমাকে পেছন থেকে বলেন।

মিঃ পিটার ওয়াটকিন্সের সঙ্গে আমাদের যে আলোচনা হবে, হিজ হাইনেস সে-সম্বন্ধে কোনকিছু গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করেন

না। কারণ, বাগানে মুখ্যমন্ত্রী পোপতলাল জে. শাহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তেই তিনি একটু বেড়াতে চান কিনা, মহারাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন।

শ্রীযুত শাহু বলেন: 'মহারাজা, বাগানের শেষ প্রান্তে একটা চমৎকার দোলনা দেখতে পাচ্ছি। ওটার ওপর বসতে ইচ্ছে করছে আমার। ঠিক যেন ছোট ছেলে হয়ে পড়েছি। আসুন না, ওখানে দেখছি একখানা বেঞ্চিও আছে; আপনারা তার ওপর বসে আলাপ করুন, আর আমি দোল খাই।'

'রোমে যখন আগুন জ্বলছিল তখন নীরো বাঁশি বাজাচ্ছিল—' চোখ নাচিয়ে ওয়াটকিন্স বলে: 'বেশ, আমরা আপনাকে একটু দোল খাবার সুযোগ দেব বৈ কি!'

কাজে-কাজেই আমরা বাগানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গেলাম; সেখানে দোলায় বসবার স্থানে কুশান দেওয়া সীটের ওপর পোপতলাল চেপে বসলেন। টুলীপকে দেখে যেন কিছুটা আনমনা ও ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

'লোক বলছে, ভারত যখন পুড়ছে নেহরু তখন বাঁশী বাজাচ্ছেন।' কথাটা আমি বাতাসে ছুঁড়ে দিলাম।

'যাই বলুন, কথাটা কিন্তু সত্যি,' মিঃ ওয়াটকিন্স সায় দিয়ে বলে: 'নেহরু বলে বেড়াচ্ছেন যে, তিনি কম্যুনিজমে বিশ্বাস করেন—'

'না, না, না, মিঃ ওয়াটকিন্স,' পোপতলাল মাথা নেড়ে বলেন: 'পণ্ডিতজী অনেক কথাই বলেন। এককালে তিনি ছিলেন সোস্যালিষ্ট। কিন্তু তিনি রেডিয়োতে বলেছেন যে, মৌলিক সমস্যাগুলো সম্বন্ধে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধিতা নেই। সর্দারজী আবার বলেছেন যে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে তাঁর শেষ বোঝাপড়ার আগে তিনি ভারতে সমস্ত কম্যুনিষ্টকে সাবাড় ক'রে ফেলবেন।' এইকথা

বলবার সময় শ্রীপোপতলাল অনুমোদন লাভের জন্য সহজ সরল দৃষ্টিতে মহারাজার দিকে তাকান।

'কম্যুনিষ্টদের শেষ করাই যদি সর্দারের ইচ্ছে থাকে দেওয়ান সাহেব, তাহ'লে শ্যামপুরে যারা আকাশ পর্যন্ত মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়েছে, সেই গেরিলাদের দমন করার জন্য তিনি আমাকে সাহায্য করছেন না কেন?' বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলেন টুলীপ: 'আশ্চর্য, আমার রাজ্যের অভিজাতেরাও এই জিনিসটি বুঝতে পারছে না, তারাও আমার বিরুদ্ধে লাল-ঝাণ্ডাওলাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে! আর, সর্দার আমার এই সব জ্ঞাতি-ভাইদের সাহায্য করছেন।'

'ও একটা সম্পূর্ণ আলাদা সমস্যা হিজ হাইনেস।' পোপাতলাল বললেন: 'শ্যামপুরের সমস্যাটা হচ্ছে ভারত-ইউনিয়নে যোগদান অথবা যোগদান না-করার সমস্যা। একবার যোগদান করলেই ভারত সরকার লাল-ঝাণ্ডাওলাদের ঠাণ্ডা করবার জন্য আপনার রাজ্যের ফৌজ ও পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করবে। মূল প্রশ্ন হলো ভারত-ইউনিয়নের ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রশ্ন। আর এই ঐক্য-প্রচেষ্টাকে সার্থক করবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আমরা।...'

মিঃ ওয়াটকিন্স এবার বলে: 'আপনাদের দেশে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যে-সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিভেদ রয়েছে, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে চাই না। কিন্তু বিশেষ ধরনের ভৌগলিক অবস্থানের জন্য শ্যামপুর ষ্টেটের অবস্থাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ ক'রে এরোপ্লেনের যুগে এই গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছে। চীনা লাল-ঝাণ্ডাওলাদের সিংকিয়াং ও তিব্বতে অগ্রগতির ফলে উত্তরাঞ্চল থেকে আগত কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে ভারতের আত্মরক্ষার প্রয়োজন উপস্থিত হবে। গেরিলারা যদি আগে থাকতেই এই রাজ্যে হামলা আরম্ভ ক'রে

থাকে, তাহ'লে যত শীগগির এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করা যায়, ততই মঙ্গল!'

আমি যে লাল-ঝাণ্ডাওলাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, অপরের মনে এই সন্দেহ জাগ্রত হবে তা বুঝেই আমি বললাম: 'নিশ্চয়ই, আর শ্যামপুরকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবার পক্ষে একটা উপায় হচ্ছে দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান করা।'

'ঐ মামুলী বুলিটা কিন্তু উদারনীতিক কম্যুনিষ্ট-পন্থী খবরের কাগজগুলো প্রায়ই আওড়াচ্ছে।' শার্ট ও হাফপ্যাণ্ট পরা মিঃ হোমার লেন, তার দলপতিকে সাহায্য করবার জন্য ছুটে এসে বলে। ঐ শার্ট ও হাফ-প্যাণ্ট পরে দুর্বল ও কঙ্কালসার দেহটাকে অনাবৃত অবস্থায় রেখে লোকটা যে সবদিক দিয়েই গোয়েবলসের মতো হাস্যাস্পদ, তাই যেন সে প্রমাণ করছে। 'এখানকার লোকেরা কিন্তু বিপদটা উপলব্ধি করতেই পারছে না। শীঘ্রই চীনের লাল-ঝাণ্ডাওলারা পর্বতমালার ভেতর দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করবে; শুনতে পাচ্ছি, তিব্বতের কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারত জয়ের পরিকল্পনাও স্থির করেছে বলে!'

'কি! লামারা সব লাল ব'নে গিয়েছে?' মহারাজা বলেন।

'তিব্বতের কম্যুনিষ্ট পার্টি-সম্বন্ধে একটা মজার গল্প শুনেছি।' মিঃ লেন বলে: 'তারা সর্ব-শেষ পন্থা জানবার জন্যে মাও-ৎসে তুংয়ের কাছে একজন পার্টি-সদস্য প্রেরণ করেছে। এই কমরেড ছ'মাস ইয়াক ও টাট্টুতে চেপে সেখানে তো উপস্থিত হলো। নির্দেশ গ্রহণ ক'রে ফিরে আসতে তার আরো ছ'মাস সময় লাগল। ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে রিপোর্ট দিতে গিয়ে দেখে যে ইতিমধ্যে পার্টি-নীতির পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই তারা আবার তাকে নতুন "লাইন" জানবার জন্য মাও-ৎসে তুংয়ের কাছে পাঠাল…'

'আর আমার মনে হয়,' মিঃ ওয়াটকিন্স বলে: 'কাহিনীটা আরও

একটু চমকপ্রদ করবার জন্য তোমার বলা উচিত ছিল, মাও-ৎসে তুং লোকটাকে স্টালিনের কাছে পাঠিয়ে দিল—'

'আর স্টালিন তিব্বতীটাকে সাবাড় ক'রে ফেলল!' শ্রীপোপতলাল জে. শাহ্ বললেন।

'আর মার্কিন সংবাদ-পত্রগুলো একে ষড়রকমের একটা পার্টি সাফ-করন ব'লে ফলাও ক'রে প্রচার করতে লাগল!' আমি মন্তব্য করলাম।

কাহিনীটা শুনে মহারাজা শিশুর মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন :

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমাদের পল্লীবাসীদের বিরাট এক জনতা একদিন আমার প্রাসাদ আক্রমণ ক'রে ক্ষমতা হস্তগত ক'রে নেবে। তবুও আমাকে নিষ্ক্রিয় থাকতে হ'বে, কারণ সর্দার কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে, আমার বংশটা লোপ করলে কম্যুনিজমেরই পথ প্রশস্ত হবে!...'

'জানেন তো, গণতান্ত্রিক শাসন নামে একটা বস্তু আছে,' পোপতলাল বলেন : 'আর সর্দারজী মনে করেন যে, ঐ গণতান্ত্রিক কাঠামো এখানেও অবশ্যই স্থাপন করতে হবে যা—'

'কিন্তু এ দেশের পক্ষে গণতন্ত্র পোষাবে কিনা সে-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না—' ওয়াটকিন্স বলে।

'একি কোন আমেরিকান ডেমোক্রাটের কথা শুনছি?' আমি বলে ফেলি।

'হ্যাঁ,' আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সাহেব বলে : 'পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার ধ্যান-ধারণাটা প্রাচ্য দেশে এসে বদলে গেছে।'

'গণতান্ত্রিক প্রথার চরম পরিণতি সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসটা কিন্তু কারুর কথাতেই বদলাতে চাই না।' ইংরেজ মেজর বেল কিছুটা জোর দিয়েই বলে।

'গণতন্ত্র যদি অকেজো ব'লে আপনার ধারণা হয়, তা'হলে বামপন্থীদের ডিক্টেটরী শাসনে আপনার কোন আপত্তিই থাকতে পারে না—কি বলেন মিঃ ওয়াটকিন্স।' আমি বলি।

'আমি বরং দক্ষিণ-পন্থীদের ডিক্টেটরী শাসন মেনে চলবো।' মিঃ ওয়াটকিন্স কোন কথা বলার আগেই মিঃ লেন উত্তর দেয়।

'তাহ'লে হিটলারের সঙ্গে লড়াই করলেন কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমার মনে হয়, রুজভেল্টের চাপে পড়েই আমরা নির্বোধের মতো ঐ কাজ করেছি।'

'হিটলার কিন্তু সব দেশেই ফ্যাসিবাদের বীজ বুনে গিয়েছে।' আমি বললাম।

'তাহলে কি বুঝব যে কম্যুনিজমই আপনার অভিপ্রেত?' ওয়াটকিন্স হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করে।

আমি চুপ ক'রে থাকি।

'মৌনং সম্মতি লক্ষণং!' মিঃ লেনের কণ্ঠে বিদ্রূপের স্পর্শ।

'ডাঃ শঙ্করকে বরং লাল-ঝাণ্ডাদলেরই বলতে হয়।' যেন কিছুটা আমার হয়ে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে মহারাজা বলেন।

মিঃ ওয়াটকিন্স বলে: 'যাই হোক না কেন, এই সীমান্ত-রাজ্যে সব সময়েই যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।'

আমার মনে হোল যে, মহারাজা বোধ হয় তাকে এই আভাসই দিয়েছেন যে, ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের জন্য সর্দার বল্লভ ভাইয়ের দাবীর মুখে রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁর সংগ্রামে সাহায্য পেলে তিনি আমেরিকানদের বিমান-ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার দেবেন।

গম্ভীরমুখ লোকদের এই আলোচনার মধ্যে ওয়াটকিন্সের কথা

শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহুর কাছে বজ্রনাদের মতোই মনে হয়। এই ঝুনো আই. সি. এসের কূটনীতিক মনের কাছে, নিছক আমোদ-প্রমোদই এই শিকারের মূল কারণ বলে মনে হয় না, এর পেছনে অন্য গূঢ় কারণ রয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারেন তিনি।

'আসুন, কিছু মদ গেলা যাক—!' এই গুমোট অবস্থায় অস্থির হয়ে মহারাজা বলেন।

আমার মনে হয়, খোলাখুলিভাবে এইসব আলোচনা ক'রে হিজ হাইনেস আনাড়ীর মতোই কাজ করেছেন। টুলীপের এই অসাবধানতা যে তাঁকে এক ভয়ঙ্কর অন্ধ পরিণতির মধ্য নিয়ে ফেলবে, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই।

রাজনীতি নিয়ে আমাদের এই আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই সকলেই শিকার-ভবনের প্রশস্ত বারান্দায় সমবেত হয়। দিবা নিদ্রার পর সকলকেই বেশ শান্ত দেখাচ্ছে; মহিলাদের নতুন বস্ত্র পরিবর্তনে বেশ লাগছে দেখতে; দিনের উষ্ণতা, এবং প্রেম-পরিণয় ও রাজ-নীতির মনকষাকষির ভাবটা যেন কোথায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। ভগীরথ টেবিলের ওপর মদ্যপানের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ক'রে রেখেছে। মেয়েদের জন্য ককটেল বানানোর কাজে সে এখন ব্যস্ত, বেয়ারারাও ভদ্রলোকদের জন্য হুইস্কী আর সোডা ঢালতে আরম্ভ করেছে।

কুর্ট ল্যাণ্ডুয়ের সঙ্গে ক'রে যে গ্রামোফোন নিয়ে এসেছিল, তাতে একখানা রেকর্ড বসিয়ে চালিয়ে দিয়ে মিসেস বেলকে তার সঙ্গে নাচবার জন্য আহ্বান জানাল। মিঃ ও মিসেস লেনও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আর মিঃ ওয়াটকিন্স আহ্বান জানায় গঙ্গীকে; অপরাহ্নে কুর্টের সঙ্গে তার ঐ ব্যাপার সত্ত্বেও দুধের মতো অতি সুন্দর শাদা সিল্কের শাড়ী পরা গঙ্গীকে দেখে যেন পবিত্রতার প্রতিমা বলে মনে হয়। মহারাজা

ইতিমধ্যেই মদ খেয়ে টং হয়ে পড়েছেন। আর শ্রীযুত গোপালজলাল জে. শাহ্ তাঁর চোখের কোণ দিয়ে মহারাজার প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ হেনে আস্তে আস্তে মিঃ বুলচাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। ভোজন-প্রতিযোগিতায় খুব বেশী ডিম খাওয়ার জন্য ছোট্টুরাম বে-সামাল হয়ে পড়ে আছে। তাই মুন্সী মিথনলাল নিজেই মদ ও ভোজ্যবস্তুসমূহ পরিবেশনের ভার গ্রহণ করেছেন। বেয়ারারা যখন এধার-ওধার যাচ্ছে, সেই ফাঁকে ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং যতটা পারে পবিত্র হুইস্কী নিজের জন্য যোগাড় ক'রে নিচ্ছে। আমিও গ্লাসটা হাতে চেপে ধরে, চুমুক দিয়ে বা চুক চুক ক'রে একটু একটু মদ খেতে খেতে বে-সামাল টুলীপের এলোমেলো বক্তৃতা শুনতে থাকি।

'আশ্চর্য, লক্ষ্য করেছ কি ডাক্তার, গঙ্গী আমাকে একদম ভুলেই গিয়েছে, আমার যেন অস্তিত্বই নেই আর ওর কাছে!'

গঙ্গী নাচছিল বিশ্রীভাবে, ভয়ে আড়ষ্ট যেন। আর ওয়াটকিন্স যে তাকে এই বিলিতি নাচে বিশেষ সাহায্য করতে পারছিল বলে মনে হয় না। সৌভাগ্যক্রমে রেকর্ডখানা শেষ হয়ে যায় আর ওয়াটকিন্স গঙ্গীকে ভদ্রভাবে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। কুর্ট রেকর্ডের উল্টো পিঠটা চালিয়ে দিয়ে দু'বাহু প্রসারিত ক'রে গঙ্গীর দিকে ছুটে আসে। দেখলাম, গঙ্গীও টুলীপের দিকে চোরা চাউনি হেনে উঠে গেল।

হিজ হাইনেসের মুখ হঠাৎ কালো হয়ে ওঠে; তাঁর ভুরু দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ও চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোয়।

'কুত্তি!' চাপা গলায় বলেন হাইনেস। কিন্তু চোখ দুটো তাঁর যেন আনত; মনে হয়, গঙ্গীর ওপর তাঁর এই রাগের জন্য তিনি নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছেন।

'পরের নাচটা আপনার সঙ্গে নাচবার জন্য ওকে ডাকছেন না কেন হাইনেস?' আমি বলি।

'না, না, আমি আর সইতে পারছি না।' হাঁপাতে হাঁপাতে টুলীপ বলেন।

'জানি না পোপাতলাল ঠিক কি করেছে…বুলচাঁদের ওপর কিন্তু কেন যেন আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'আমার মনে হয়, দেওয়ানের সামনে ওভাবে আপনার আমেরিকানদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত হয় নি।' আমি বললাম।

'বেশ! বেশ! জাহান্নমে যাও তুমি, সব সময়েই কেবল উপদেশ!' ভীতভাবে কথা কয়টা বলে তিনি আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে সোজা মিসেস লেনের দিকে চলে যান। মহিলাটি তখন একটু জিরোচ্ছিলেন। কোনরকম অনুমতি প্রার্থনা না করেই টুলীপ তাকে তুলে নিয়ে নাচের আসরে যান।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ লেনের মুখের অবস্থাটা বদলিয়ে গেল। সমস্ত মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে, তার মনে যে একটা ভীষণ তোলপাড় শুরু হয়েছে সাহেবের মুখ দেখেই তা বেশ বুঝতে পারছি।

হিজ হাইনেস আমাকে অপমান ক'রে উঠে গেলেন, দেখলাম এবার তিনি নিজেই নিজের আত্মসম্মান পদদলিত ক'রে বর্বরের মতো মিসেস লেনের কাছে গিয়ে যেভাবে তাকে বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে নিলেন, তা দেখে শ্বেতাঙ্গ স্বামীটির মনের কুসংস্কার অদ্ভুত ও বিশৃঙ্খল ভাবই সৃষ্টি করল। মিঃ লেনের মনের মধ্যে এই ভাবধারা যে প্রকট আকার ধারণ করছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মত্ততার জন্য সামান্য একটু বিষদৃশ্য হলেও, টুলীপ মনোহর ভঙ্গিতে নাচতে থাকেন, তাঁরি সামান্য একটু দূরে নিবিড়ভাবে কুর্টের বাহুপাশে আবদ্ধ গঙ্গা দাসী নাচছে। সামান্য একটু জায়গার মধ্যে ফরাসী লম্পটের মতো নাচছে কুর্ট আর তারই ফলে গঙ্গীর পা থেকে এক বিশ্রী ধরনের আওয়াজ বেরোতে থাকে, তবুও কিন্তু তার মুখখানা

লালিমারাগে রঞ্জিত; এ রক্তিম আভা দেখে মনে হয় যেন গঙ্গা এক অদ্ভুত আত্ম-প্রসাদে দীপ্ত। যখনই কোন নতুন প্রণয়ী তার মধ্যে এই গর্ববোধটা জাগ্রত করেছে, তখনই তার মনের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, তার এই নতুন প্রণয়ী তার চরণে প্রাণ-ভরা অকৃত্রিম ভালবাসাই ঢেলে দিচ্ছে। এবারকার এই নতুন আত্ম-প্রসাদ সেই চির-পরিচিত আত্ম-প্রসাদেরই নতুন রূপ মাত্র। পরস্পর বিরোধী ভাব-ধারার সংঘাত সহ শব্দমুখর এই সন্ধ্যার মধ্যে যে এক মহাবিপর্যয়ের বীজ লুকোন রয়েছে, তার সামগ্রিক পরিণতির কথা ভেবে ভেবে আমি ভীত হয়ে উঠছি। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এই নাটকীয় ঘটনাবলির প্রধান অভিনেতা শ্যামপুরবাসীদের কথাই আমার সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে; যদিও তারা রঙ্গমঞ্চে এখন পর্যন্ত অনুপস্থিত, তবুও এই মহানাটকের তারাই হচ্ছে সব চেয়ে শক্তিশালী অভিনেতা। তারা আজ এখানে অদৃশ্য। এই ষড়যন্ত্র পরায়ণ, অদ্ভুত ভাবপ্রবণ মুমূর্ষু সামন্ত-ব্যবস্থার রাজা ও তার পারিষদদের ঘাড় মটকে দেওয়ার জন্য যেন অপেক্ষায় বসে আছে; সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার অতি নোংরা ঘুণধরা সমাজ-ব্যবস্থার অশ্বশালাটা পরিষ্কার ক'রে দেবার উদ্দেশ্যেই নির্মম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা প্রতীক্ষা করছে।

গ্রামফোনে রেকর্ড শেষ হয়ে যায়; নৃত্যরত যুগলরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্পষ্ট নিস্তব্ধতার মধ্যে আপন আপন আসন গ্রহণ করে। পরস্পর বিরোধী ভাব সমূহের চাপে পড়ে ঐ নিস্তব্ধতা যেন আরও ঘন ব'লে মনে হয়।

মিঃ লেনকে দেখে মনে হয়, সে তার স্ত্রীর ওপর বেশ চটে গিয়েছে। স্বামীর এ মনোভাব বুঝতে পেরেই মহিলা সঙ্কুচিত হয়ে মিঃ লেনের পাশেই চেপে বসে।

হিজ হাইনেস গঙ্গীর মুখে-চোখে দীপ্তির আভা দেখতে পান আর

সে-দীপ্তি যে তাঁর জন্ম নয়, তাও তিনি বেশ বোঝেন। ভিতরে তাঁর যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল তা তিনি জোর ক'রে মুখ বন্ধ রেখে গঙ্গীর প্রতি তাঁর সীমাহীন ঘৃণার নিষ্পেষণে নিজের হৃদয়টাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করছিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে শিকারী বুটা দৌড়োতে দৌড়োতে বাগানের ভিতর এসে চেঁচিয়ে বলে :

'মহারাজ, চিতাবাঘটা ছাগলটকে মেরে ফেলেছে! আমার মনে হয়, মাচার নীচে ঝোপের মধ্যে ব্যাটা বসে আছে আর নিশ্চয়ই ছাগলটার কাছে আবার আসবে!'

'বেশ,' টুলীপ বলেন : 'চিতাটা ছাগলটাকে শেষ করার পর মিঃ ল্যাণ্ডুয়েরের তরুণ রক্তের গন্ধ পেয়ে পাছে তাকেই না গিলে ফেলে সেইজন্য চলুন আমরা একসঙ্গেই যাই।'

টুলীপের কণ্ঠস্বরের তিক্ততা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবুও গঙ্গী সম্বন্ধে তাঁর মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তিলাভের আশায় তাঁর মুখমণ্ডলে একটা ক্ষীণ আনন্দের ভাব যেন ফুটে ওঠে। কারণ এখন কুর্ট যেতে উঠবে শিকারে আর কুর্টের অনুস্থিতিতে গঙ্গীর দিবা-স্বপ্নের ঘোরটাও হয়তো কেটে যাবে।

'মহিলারা বরং এখানে থাকুন।' টুলীপ বলেন।

সকলেই এই প্রস্তাবে মৌন সম্মতি জানায়।

'আমি যাচ্ছি নে প্রিয়ে।' মিঃ লেন তার পত্নীকে বলে।

এ অনিচ্ছা চিতাবাঘের জন্য নয়, পক্ষান্তরে বাঘিনী স্ত্রীর কাছে নিজের দুর্বলতার জন্ম এক অজানা আশংকায় তার মনটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। ভদ্রলোক অনুভব করেছে যে তার স্ত্রী যেন তার কাছ থেকে ক্রমশঃই মহারাজার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। হয়তো কাছে কাছে থাকলে স্ত্রীর মনের মধ্যে যে চোরা আকর্ষণের স্রোত বইতে শুরু করেছে

মহারাজার প্রতি, যা একেবারেই দৈহিক, তা হয়তো দমিত হতে পারে। স্ত্রীর ওপর যে চাপা ক্রোধ মনের গহনে জমে উঠেছে, তার প্রকাশ কিছু কিছু হলেও, মিঃ লেন স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে সংগোপনে। তারপর সময় বুঝে নিজের দৈহিক বিচ্যুতি ও দুর্বলতার জন্য পত্নীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করবে।

'ডাঃ শঙ্কর, তুমিও চলো।' টুলীপ চিৎকার ক'রে বলেন : 'চিতাবাঘ দেখলে সাহেবদের মধ্যে যদি কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।' কুর্টকে লক্ষ্য করেই যে তাঁর এই হিংসা-মেশানো বিদ্রূপোক্তি তা বেশ বোঝা যায়।

আমিও শিকারীদের পেছনে পেছনে মাচার দিকে চলি।

বাঘের আগমন প্রতীক্ষায় আমরা অপেক্ষা করি। কিন্তু জানোয়ারটা দেখছি মোটেই আমাদের আনন্দদানের জন্যে প্রস্তুত নয়। কাজেই অরণ্যের মাঝে "বিটার"-দের নির্দেশ দানের জন্য ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিংকে নীচে পাঠাতে হয়। "বিটার"-রা এমন কিছু করুক যাতে চিতাবাঘটা তার শিকারের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। আর মুন্সীজীকে আদেশ দেওয়া হলো ক্ষুধার্ত অতিথিদের জন্য কিছু খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে।

কিছুক্ষণ পরেই বিটারদের ঢাকের ঢুম ঢুম আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, সেইসঙ্গে পাখী তাড়ানোর জন্য চাষীদের খটখট শব্দ আঁধার-অরণ্যের স্তব্ধতা ভেঙে দেয় আর আমরা সকলেই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আশংকায় ঘামে সিক্তদেহ হয়ে পড়ি। আমাদের পাঁচজন হিজ হাইনেস, কুর্ট, ওয়াটকিন্স, বেল ও স্বয়ং আমি—প্রত্যেকেই বন্দুক তাক ক'রে গুলি করবার জন্য বসে থাকি। একাদিক্রমে তিন-চার ঘণ্টা বসে থাকবার দরুন মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়ে আসে, এবং বেশ অস্বস্তি

বোধ করি। দম বন্ধ ক'রে হা ক'রে চেয়ে থেকে অপেক্ষা করার ফলে মাথায় যেন রক্ত উঠে আমাদের প্রায় সবাইকেই আধ-পাগলা, নির্বোধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে পরিণত ক'রে দেয়। হত্যা করার সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া যেন আমাদের মধ্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

আমাদের সামনে অরণ্য এক রহস্য-পূর্ণ দেবতার মতো ঠেকে; ঐ দেবতার চোয়াল থেকে যেন ভুম ভুম শব্দ বের হচ্ছে আর সেখান থেকেই যেকোন মুহূর্তে চিতাবাঘটা যেন বেরিয়ে আসবে।

পরিবেশের এই দুর্বহ ভার আর সইতে না পেরে আমি চুপি চুপি টুলীপকে জিজ্ঞেস করি: 'বিটারদের শব্দে বাঘ যে আসবেই তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে টুলীপ? ওটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে না তো?'

'মাইলের পর মাইল ঘোরাফেরা ক'রে বাঘ তার শিকার-করা জীবটির কাছে সাধারণতঃ ফিরে আসে, আবার খিদে পেলে যেকোন মুহূর্তেই হাজির হতে পারে।'

'কিন্তু বিপদের আশংকা কি একেবারে নেই?'

'বিপদ কিসের?' ঠাট্টা-ছলে টুলীপ বলেন: 'তুমি বোধ হয় কোনদিন জীবনে একটা খরগোসকেও মারো নি!'

তাঁর এই স্থূল রসিকতায় স্বস্তি বোধ ক'রে আমি উত্তর দিই:

'না, খরগোস করিনি, তবে নরদেহ কাটাকাটি করেছি।'

'আর এই যে মিঃ ল্যাণ্ডুয়ের,' টুলীপ রসিকতা ক'রে বলতে থাকেন: 'দেখ, কতগুলো কার্তুজ সে রেখেছে...তুমি দেখবে মিঃ ওয়াটকিন্স বাঘটাকে গুলি করবার আগ পর্যন্ত কুর্ট একটা গুলিও ছুড়তে পারবে না।' কুর্টকে আঘাত ক'রে ওয়াটকিন্সের প্রতি তোষামোদই যেন ফুটে ওঠে তাঁর কণ্ঠে।

'ও মহারাজ!' মিঃ ওয়াটকিন্স চেঁচিয়ে বলে: 'এই ধরনের

শিকারে আমি একেবারেই অভ্যস্ত নই। আপনি যে গুলি করবেন তাতে আমার সন্দেহ নেই।'

আমি বলতে চাইলাম, বুটাই ওটাকে ধরাশায়ী করবে, কিন্তু এই ধরনের নির্মম বাস্তব সমালোচনা বনেদী যারা তাদের গর্ব ক্ষুণ্ণ করে, তাই আমি নিরস্ত রইলাম।

এইভাবে চিতাবাঘের আগমন ও আমাদের মতো বীরদের স্থির-লক্ষ্য গুলির আঘাতে ওটাকে নিহত করার আশা নিয়ে আমরা বসে বসে মুহূর্ত গুনি।

'রাত্রির পর রাত্রি ধরে আমি বাঘের প্রতীক্ষায় বসে থেকেছি,' আমেরিকান সাহেবদের ওপর প্রভাব-বিস্তারের উদ্দেশ্যে হিজ হাইনেস এই মিথ্যা কথাটা বলেন।

'উঃ, এত মশা!' বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে মিঃ বেল বলে: 'আমি আর থাকতে পারছি না।' পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ওপর ভর দিয়ে ইংরেজ সাহেব সরে পড়ে।

মিঃ বেল কিছুটা দূরে চলে যাবার পর হিজ হাইনেস তাঁর স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আমেরিকানরা তাঁকে কতটুকু সাহায্য করতে পারবে তা জেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে কথা শুরু করেন এবং নীরব অরণ্যের দম-বন্ধ-করা শূন্যতাকে কথার গুঞ্জনে ভরে দেবার চেষ্টা করেন।

'মিঃ ওয়াটকিন্স, শিকারীদের স্বর্গ হিসেবে আমার এই ষ্টেটের মূল্য সম্বন্ধে ইংরেজরা সব সময়েই সচেতন ছিল। আর এটা যে একটা 'বাফার ষ্টেট' তাও তারা জানতো। আজ তাদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে মিঃ বেলদের 'আঙুর-টক' মনোবিকার আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু উত্তর দিক থেকে লাল আতংককে ঠেকিয়ে রাখা এখন শুধু আমেরিকানদেরই কর্তব্য বলে আমরা মনে করি এবং এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই—'

'গত দু-হাজার বছরের ইতিহাসের যদি পাতা উল্টাই,' আমি বলি : 'রুশরা কিন্তু কোনদিনই ভারত আক্রমণ করেনি। আক্রমণ করেছে হুনরা, মোঙ্গলরা, তুর্কী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী আর ইংরেজরা, কিন্তু কোনদিনই রুশরা করেনি। আপনার কি মনে হয় যে ওদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার কোন প্রয়োজন আছে?'

'আপনি ভাল ডাক্তার হ'তে পারেন,' অধীরভাবে মিঃ ওয়াটকিন্স বলে : 'কিন্তু রাজনীতিক হিসেবে আপনি একেবারেই ছেলেমানুষ।'

মিঃ ওয়াটকিন্স ও আমার সমালোচনা উপেক্ষা ক'রে মহারাজা বলেন : 'মার্কিন বন্ধুদের ও আমার নিজের মধ্যে একটা সহযোগিতার প্রয়োজন। আপনারা শ্যামপুরে আসায় আমি সত্যিই আনন্দিত, কারণ আপনারা আমার রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানটা বুঝতে পারবেন। শুনেছি, আপনাদের দেশের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ অনুসারে ভারতে আপনারা কয়েকটা বিমানঘাঁটী তৈরি করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন। আপনাদের আমি আমার শ্যামপুরের দু'-একটা জায়গা দেখাতে চাই যা আপনাদের পক্ষে উপযোগী হ'তে পারে—'

'এদেশের সকলেরই শুভেচ্ছা আমরা চাই,' প্রশ্নটা এড়াবার উদ্দেশ্যে মিঃ ওয়াটকিন্স বলে : 'নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য পৃথিবীর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও অনগ্রসর দেশগুলোকে সাহায্য করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই মহারাজা।'

চীন, তুরস্ক, গ্রীস, জার্মানি, কোরিয়া ও জাপান সম্বন্ধে এদের কার্যকলাপ নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি ক'রে এই গাল-গল্প বন্ধ করবার জন্য আমার তীব্র ইচ্ছা হলো কিন্তু আমার বিদ্রুপোক্তিতে যদি আমেরিকানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ভেঙে যায়, তাহলে টুলীপ আমাকে দোষী মনে করবেন। আমি তাই চুপ ক'রে থাকি ; যদিও শ্যামপুর রাজ্যের

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমেরিকানরা যে কিছুই করবে না, তা আমি বেশ বুঝে গিয়েছি।

'আমার মনে হয় এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটান যাক,' কুর্ট বলে : 'আমরা বরং আবার পরে ফিরে আসবো…'

'তা মন্দ নয়।' মিঃ ওয়াটকিন্স কুর্টের কথায় সায় দেয়।

তারা উঠে পড়বে এমন সময় ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং ফিরে এসে ফিস ফিস ক'রে বলল যে, বাঘটার আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে। খুব সম্ভব ছাগলটার দিকে ওটা এগিয়ে আসছে। বুটাও তাই বলেছে…এখন বন্দুক ঠিক ক'রে আপনারা বসুন।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঘটে গেল শিকারীরা গুলি করার জন্য ঠিক ঠিক হয়ে বসবার আগেই। গুবরে পোকার গুঞ্জন-ধ্বনিতে ব্যাহত রহস্যাবৃত নিস্তব্ধতার বুক ভেদ ক'রে যে বংশদণ্ডের সঙ্গে ছাগলটা বাঁধা ছিল, তার ওধারে ঝোপের মধ্য থেকে শোনা যাচ্ছিল অতি ধীর খস-খস শব্দ। সেখানে বাঘটা সকলের অজ্ঞাতসারে মৃত ছাগলটার গায়ে নখরাঘাত শুরু করেছে মাত্র।

'ছুড়ুন, গুলি ছুড়ুন!' টুলীপ ফিস ফিস ক'রে বলেন।

কিন্তু হিজ হাইনেস অথবা ওয়াটকিন্স, কুর্ট বা আমি তাক ক'রে বন্দুকের ঘোড়ায় চাপ দেওয়ার আগেই বুটার বন্দুক গর্জে ওঠে।

'গুলি ছুড়ুন! গুলি ছুড়ুন!' টুলীপ চিৎকার করেন, শিকারটা আমেরিকানরাই করুক, এই চাইছিলেন হিজ হাইনেস।

মিঃ ওয়াটকিন্স ও মিঃ ল্যাগুয়ের দু'জনেই গুলি ছুড়ল বটে, কিন্তু দু'জনেরই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

বুটার গুলিটা চিতাবাঘের মাথায় লেগেছে। বাঘটা গর্জন ক'রে মাটির ওপর গড়াগড়ি দিতে থাকে…ক্ষণকাল পরে উঠে দাঁড়ায়…একটা ভীষণ হিংস্র মূর্তি…

এবার হিজ হাইনেস গুলি চালান ওটার পেটে। কিন্তু তবুও উত্তেজিতভাবে চিৎকার করেন :

'গুলি করুন, মিঃ ওয়াটকিন্স গুলি করুন!'

ওয়াটকিন্স এবার বন্দুক থেকে গুলি ছুড়তে সক্ষম হন।

ল্যাণ্ডুয়েরের গুলি এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

আমি বন্দুকের ঘোড়ায় চাপ দিই বটে, কিন্তু আমারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব…বাঘটা তখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে …একটা সাংঘাতিকভাবে আহত ব্যাঘ্রশাবক…

বুটার বন্দুক থেকে আর একটা গুলি সশব্দে বের হয়।

আর সেই আঘাতেই বাঘটা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট-ফট করতে করতে ধরাশায়ী হয়, তারই শিকার করা ছাগলটার ওপর সে ধড়াস ক'রে পড়ে যায়।

পরদিন ভোর বেলায় ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং আমাদের ঘুম ভাঙ্গাল। বলল, বুটা খবর দিতে এসেছে যে, গত রাত্রিতে নিহত ব্যাঘ্রশাবকের মা এসে তার পুত্রের জন্য বসে বসে শোক করছে; আমরা গিয়ে ওটাকেও মারতে পারি।

হিজ হাইনেস ভাবেন, ওয়াটকিন্স যাতে নিজের হাতে শিকার করতে পারে, তাকে তার একটা সুযোগ দেওয়া দরকার। কারণ, গত রাত্রিতে ওয়াটকিন্স বা ল্যাণ্ডুয়েরের গুলিতে যে ব্যাঘ্রশাবটি মরে নি, ওটা মরেছে বুটার গুলিতে, সে-সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাই বুটার এই সংবাদে আমেরিকান সাহেবদের মধ্যে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। ওরা সত্যসত্যই উৎসুক হয়ে ষ্ট্রাইপ দেওয়া পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন পরেই বেরিয়ে পড়ে।

বুটা নীচতলায় আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছিল। অতিথিদের মনোরম সাজ-সজ্জা দেখে সে বলল, যদিও সাহেবরা নিঃসন্দেহে স্থির-লক্ষ্যে গুলি ছুড়তে পারবেন সন্দেহ নেই, তবুও সকলেরই সতর্ক হ'তে হবে। এবার মাচার ওপর না উঠে আমাদের বিপদের ঝুঁকি নিয়েই ঝোপের ভেতর দিয়ে চুপি চুপি শিকারের কাছে পৌছোতে হবে ; বুটা অবশ্য আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

পাহাড়ের ওপর মানুষ চলার পথ ধরে যখন আমরা বুটার অনুসরণ ক'রে চলছিলাম তখন ঔৎসুক্যের ধাকায় আমাদের চোখগুলো যেন ফেটে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হলো। অতি সাবধানে এগোতে থাকলেও সেই দমবন্ধ নীরবতার মাঝে মাঝে দু'একটা শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ হয়, পত্রমর্মরের শব্দও ওঠে কচিৎ আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ভয়ে আমরা বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে যাই। আমার মনে হয়, আমরা সকলেই এক দুঃসাহসিক শিকারের বিপদ সম্বন্ধে মনে মনে রীতিমত ভীত হয়ে পড়েছি, কারণ এবারের চিতাটি পূর্ণ যৌবনা ব্যাঘ্রী, মৃত শাবকের জন্ত ক্ষিপ্ত এবং হয়তো আমাদের সোজাসুজি আক্রমণ ক'রে বসবে। সুউচ্চ মাচার আশ্রয় ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকার উপায়ই তখন থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত কতকগুলো ঘন গুল্মের পেছনে আমরা প্রায় নিঃশব্দে এসে তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম, বুটা আমাদের সেখান থেকে সামনের দিকে তাকাতে ইশারা করলো।

সম্মুখের ঘনঝোঁপের আড়াল ভেদ ক'রে শাবক-হারা ব্যাঘ্রীর হৃদ্‌কম্প জাগানো আক্রোশ, শোক আর ক্রোধের ভীষণ দৃশ্য দেখে আমাদের সকলেরই মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, আর আমি নিজেই বুঝতে পারছি যে আমার পা-দুটো আমার অজান্তেই আপনা-আপনি ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে…

বুটা ইঙ্গিত করে গুলি ছুড়বার।

ওয়াটকিন্স ও ল্যাণ্ডুয়ের দু'জনেই বন্দুক তাক ক'রে গুলি ছোড়ে; দু'জনেরই গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়।

আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি নি কি এক সাংঘাতিক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি আমরা।

'মাদার চোদ! শালা—!' রাগের চোটে বুটা গাল দিয়ে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে গালটা ছিল পাহাড়ী ভাষায়, যার বিন্দু-বিসর্গও আমেরিকান সাহেবরা বুঝতে পারে না। 'ওটা আমাদের দিকে যে তাকাচ্ছে, তাকাচ্ছে…'

আর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লক্ষ্যস্থির না করেই বুটা-শিকারী বন্দুকের মুখ ঘুরিয়ে ব্যাঘ্রীর মাথায় গুলি ছোড়ে।

গগনভেদী তীব্র আর্তনাদ ক'রে ব্যাঘ্রী মরনের কোলে ঢলে পড়ে। মনে হয়, শাবক-হারা হয়ে বেঁচে থাকতে সে রাজী নয়।

'ওটা এখনো মরে নি, হঠাৎ উঠে আমাদের আবার আক্রমণ করতে পারে। আর একটা গুলি দরকার।'

ওয়াটকিন্স এবার স্থির লক্ষ্যে গুলি চালাতে পারে বটে কিন্তু অন্ধ শিকারীর মতো ল্যাণ্ডুয়ের এবারও বাঘটাকে আঘাত করতে পারল না।

'আর সব ব্যাপারেও যদি ছোকরা ঐরকমই হয়,' টুলীপ হিন্দুস্থানীতে আমাকে বলেন: 'হুঁ, শুধু ব্যস্ততা কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস …তাহলে ওকে আর ভয়ের কিছু নেই।'

সেদিন সকালে আমাদের প্রাতঃরাশ গ্রহণের সময় যত গোলমাল ও চেঁচামেচি ছিল সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একে সোমবার এবং তার উপর আজ আমাদের শ্যামপুরে ফিরে যেতে হবে, সেই কারণেই এই নীরবতা,—সম্পূর্ণ কারণ তা নয়। ইতিমধ্যে আরও অনেক কিছু ঘটে

গেছে যার ফলে আমাদের চারধারের অবস্থাটা রীতিমত থমথমে হয়ে উঠেছে। সকলেরই মেজাজটা কেমন যেন রুক্ষ, এবং তারই ফলে এই থমথমে ভাব।

কারণ তো আমি বুঝতে পারছি। শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্ মহারাজার কাছে বিদায় না নিয়েই শিকার-ভবন পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে গিয়েছে বেনিয়া-নন্দন বুলচাঁদ।

যাবার সময় পোপতলাল দিল্লীর স্টেট-ডিপার্টমেন্টের একখানা টেলিগ্রাম রেখে গিয়েছেন। সেই তারবার্তায় যত শীঘ্র সম্ভব, মহারাজাকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই বার্তার ভাষ্য হিসেবে শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্ কোন ভূমিকা-লিপি পর্যন্ত লিখে যান নি। একজন বাহক টেলিগ্রামটা যেভাবে নিয়ে এসেছে, ঠিক সেই ভাবেই তিনি তারবার্তাটা রেখে গিয়েছেন।

ভ্রূ-যুগলের উপর মহারাজার কপালটা কালো হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকিরণ-দীপ্ত এই সকালেও যেন চারধারে আঁধার নেমে এলো। এবং তমসার সহোদরা নিস্তব্ধ নীরবতাও শিকার-ভবনের ওপর তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল···তারই পশ্চাতে হাজির হলো তার বয়ঃকনিষ্ঠ জ্ঞাতিভ্রাতা যার নাম ক্রোধ···সে এসে সংগোপনে আসন বিস্তার ক'রে বসল মহারাজার রক্তিমআঁখি যুগলে ও সুবিস্তৃত নাসারন্ধ্রে।

ঐ তারবার্তাটা হচ্ছে এক চরম পত্র বিশেষ, কারণ এরই মধ্যে রয়েছে তাঁর নিজের অস্তিত্ব বিলীনের হুল, যার ফলে তাঁর রাজবংশটাই লুপ্ত হয়ে যাবে, লুপ্ত হয়ে যাবে সূর্য-চন্দ্র, রাজর্ষী রামচন্দ্র এবং সমগ্র হিন্দু দেব-দেবীর শক্তি সম্ভূত মহারাজা টুলীপের এই রাজবংশ। দেখলাম, টুলীপের মুখমণ্ডল সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে।

'আমি একটু শোব, ওপরে যাচ্ছি—' আমাকে বললেন টুলীপ।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেই সঙ্কুচিত ভাবটা যেন একটু নরম হয়েছে।

বুঝতে পারলাম, তাঁর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মনোভাবটা শিথিল হয়ে পড়েছে, ষ্টেট-ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে যে-লড়াই আর চলবে না বুঝতে পেয়েই যেন নিজের পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছেন।

অদৃষ্টের যে নির্মম বাস্তবতা হিজ হাইনেসের ওপর এসে পড়েছে তা যেন আঁচ ক'রেই অতিথি-অভ্যাগতবর্গ এদিক-ওদিক দূরে সরে যেতে শুরু করেছে অথবা শিকার-ভবনের বারান্দায় বা তৃণাচ্ছাদিত শাদ্বলের কোণে কোণে বেঞ্চিতে ব'সে সিগারেট বা পাইপ ধরিয়ে ধূমপানে মনোনিবেশ করছে।

এই পরিস্থিতিতে শিকারী বুটা হঠাৎ এসে হাজির হলো। বক-বকানিতে এই ঘনঘোর পরিবেশে বেসুরো অবস্থার সৃষ্টি করল।

'সাহেবরা যাতে ফটো তুলে নিতে পারেন, তাই চিতাবাঘ ছুটো এখানে নিয়ে আসতে বলেছি।' বুটা বলে।

'বেশ, বেশ, ভালোই করেছ।' বললাম আমি। এবং অতিথিদের ফটো নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে ব'লে আমি কিছুটা উৎসাহ উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করলাম।

'খুব বেশী সময় লাগবে না হুজুর।' বুটা বলল।

'বেশ, বেশ, আমি আমার ক্যামেরাটা নিয়ে আসছি।' কুর্ট বলল।

আমি ছিলাম বারান্দার রেলিঙের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে; তারই অনতিদূরে বীথির ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কৃষ্ণাঙ্গ, জীর্ণ বাস পরিহিত রোদেপোড়া, নগ্নপদ বুটা। ওয়াটকিন্স আমার কাছে এসে বলে: 'ডাক্তার, কেন ও শিকারী হয়েছে, তা ওকে জিজ্ঞেস করুন তো।' আমি বুটাকে জিজ্ঞেস করলাম সাহেবর হয়ে।

'সে এক উপাখ্যান সাহেব। শুনতে যখন চাইছেন বলছি। এক চিতাবাঘের ধৃষ্টতায় আমি ভীষণ চটে গিয়েছিলাম। ও ব্যাটা আমার বন্ধু শিবুকে মেরে ফেলেছিল—' বুটা তার কাহিনী আরম্ভ করে। গল্প বলবার জন্যে তাকে সামান্য একটু উৎসাহ দিলেই হলো। 'সেই দিন থেকেই হুজুর, ঐ চিতাবাঘ ও অন্যান্য যত জানোয়ার আছে মারব ব'লে আমি ঠিক ক'রে ফেললাম। এই হিংস্র বাঘটা একটা লোককে গাছ থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে এনে ক্ষত বিক্ষত করে। তারপর গাঁয়ের এক গোয়াল ঘরে এক ছোকরাকে জখম ক'রে জলার ধারের ধান ক্ষেতে পালিয়ে যায়। আমিও আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে থেকে ওটাকে গুলি করি।'

বুটার কাহিনীটি আমি হুবহু ইংরেজীতে ওয়াটকিন্সকে বুঝিয়ে বলতে থাকি।

'আমি তো জানতাম, হিন্দুরা সব নিরীহ নিরামিষ ভোজী—'

সাহেবের এই অজ্ঞতার কথা আমি বুটাকে বললাম।

'হুজুর তাহলে জংগলের আইন-কানুন কিছুই জানেন না দেখছি।' অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বুটা বলতে শুরু করে: 'জংগলে বাঘ, চিতা এবং নানধারনের বুনো জানোয়ার সব বাস করে। হুজুর, অন্য শিকার যতদিন পর্যন্ত পায়, ততদিন ওরা মানুষ বা গোরু মোষ ছোঁয় না। কিন্তু ওরা যখন মানুষকে আক্রমণ করে, তখন কি আর আমরা মহাত্মা গান্ধীজীর মতো ওদের ক্ষমা করতে বলবো? আমি, সাহেব, বুঝি না ওসব কথা! একটা কথা বুঝুন সাহেব, বনে জন্তুরা নিজেদের বাঁচাবার জন্যে সহজাত প্রবৃত্তিবসে কিংবা সঙ্গী-সঙ্গিনী ও বাচ্চাদের রক্ষার জন্যই শিকারী এবং গাঁয়ের লোকদের আক্রমণ ক'রে থাকে। বুঝলেন হুজুর, ওরা যে-ভাবে চলে না, তাতে মানুষেরই উপকার হয়। ওরা হরিণ শুয়োর এবং খরগোস মারে। এসব জানোয়ারদের যদি না

মারত, তাহ'লে সমস্ত শস্ত-সম্পদই তো নষ্ট হয়ে যেত। কি বলেন, তাই না? এক তহশীলদার সাহেব একবার বলেছিলেন যে, বনের কাঠ চুরি বন্ধ করবার সব থেকে ভাল উপায় হচ্ছে প্রত্যেক পনের বিঘে জঙ্গলের জন্য এক-একটি বাঘ রাখা। আর প্রাণী রাজ্যে জীবন-মৃত্যুর সমতা রক্ষার সেরা উপায় হচ্ছে শিকারীদের বেশ ভাল ভাবে বাঁচিয়ে রাখা, হুজুর···!'

আমি জানতাম, বুটা আলাপ-আলোচনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠিক বকশিশের প্রশ্নে নিয়ে যাবেই। বুটার সব কথা আমি ওয়াটকিন্সকে ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলাম। যেরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে আলোচনা শেষ পর্যন্ত রুটির প্রশ্নে নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে আমেরিকান সাহেবটি বেশ কৌতুক অনুভব করে।

ঠিক এই সময় টুলীপ এসে পড়েন। তিনি বলেন :

'নাঃ, পারলাম না বিশ্রাম করতে···! তা, ও-পাজিটা কি বলছে?'

'সে বকশিশ চাইছে!' আমি মুখ খুলবার আগেই মার্কিন সাহেবটি বলে ফেলে : 'আর যা কাজ করেছে না, তার জন্য ও সেটা অবশ্যই চাইতেও পারে।'

'ওরে, শূয়োরের বাচ্চা!' টুলীপ চিৎকার ক'রে উঠেন : 'তোদের না বলেছি রায়বাহাদুর ছোটুরামের কাছে যেতে, তা সাহেবদের কাছে আবার বকশিশ চাইতে এসেছিস কেন?.. বেতমিজ, উল্লুক!'

'ক্ষমা করুন মহারাজা—' আভূমি মাথা নুইয়ে বুটা বলে।

'যা, নিজের কাজে যা!' চিৎকার ক'রে বলেন মহারাজা।

'কিন্তু ফটো তোলবার জন্য যে বাঘ দুটোকে বাগানে নিয়ে আসতে বলেছি।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফটোটা আমরা তুলে নি, মিঃ ওয়াটকিন্স,' টুলীপ

বলেন : 'তারপর আবার আমাদের এক্ষুণি শ্যামপুর রওনা হতে হবে। আজ রাত্তেই আমাকে দিল্লী যেতে হবে।'

কুর্ট ল্যাণ্ডুয়ের ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে ক্যামেরা নিয়ে কসরৎ আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু ফটো তোলার জন্য সমস্ত অতিথিকে একস্থানে সমবেত করাতে বেশ কিছু সময় কেটে যায়, বিশেষ ক'রে মহিলাদের। তারা আবার গিয়েছে নাকে মুখে পাউডার বুলিয়ে নিতে, আর তাদের পথ চেয়ে পুরুষেরা সব প্রতীক্ষা করতে থাকে।

আমি এই সময় প্রস্তাব করলাম, মহিলাদের তৈরি হয়ে আসতে আসতে আমরা বরং যারা শিকারে অংশ গ্রহণ করেছে তাদের একটা গ্রুপ ফটো নেওয়া হোক, তারপর যেসব ভদ্রলোক এসেছে সঙ্গে তাদের নেওয়া হোক একটা, তারপর সকলের একটা গ্রুপ ফটো নেওয়া যেতে পারে। মহারাজাও আমার প্রস্তাবে রাজী হলেন। শুধু গ্রুপগুলো সংগঠনের ভার তিনি নিজে গ্রহণ করলেন, যাতে প্রত্যেক ছবিতে ওয়াটকিন্স কেন্দ্রস্থলে থাকতে পারে। ওয়াটকিন্স যদিও একটু লজ্জানুভব করে, চোখ-মুখ কিছুটা লাল হয়ে ওঠে, তবুও এই ব্যবস্থার পূর্ণ সহযোগিতা সে করে, এমনকি, বুটার প্রস্তাবানুসারে, একটা মৃত বাঘের ওপর তার পা পর্যন্ত রেখে ছবি তোলে, যাতে ছবি দেখে মনে হয় সে-ই এই বাঘটিকে শিকার করেছে। প্রায় সব ফটোই তুলল কুর্ট, আমি এবার তার হাত থেকে ক্যামেরাটা নিলাম, যাতে কয়েকটি ছবির গ্রুপে তারও ফটো স্থান লাভ করতে পারে। এক গঙ্গাদাসী ছাড়া সব মহিলাই এলেন। গঙ্গী তখনও সামলিয়ে উঠতে পারে নি। তারপর সমবেত মহিলাদের সামনে বোকা বোকা হাসি ঠাট্টা মসকারা, মৃত চিতার সংস্পর্শে তাদের অকারণ চিৎকারের মধ্যে অনেকগুলো ফটো তোলা হলো। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ফটোতে প্রকৃত শিকারী বুটার ছবি আদৌ স্থান পেল না।...

অতঃপর একটি কুৎসিৎ ঘটনা ঘটল।

অতীত যুগে বুটা হাসিমুখেই মহারাজার তিরস্কার সহ্য করতো, আর তাকে যে ফটো থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে, তাতে আদৌ সে মনে কিছুই করতো না, কিন্তু এখন যেন এক নতুন যুগের একটা চাপা প্রভাব তাকে হঠাৎ পেয়ে বসেছে। দেখা গেল, 'বিটার'দের ও বেগার মজুরদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ছোট্টুরামের সঙ্গে বুটা রীতিমত বচসা আরম্ভ করেছে।

'এত বক্ বক্ কিসের?' কঠোর কণ্ঠে হাইনেস জিজ্ঞেস করেন।

'ও-ভাবে কথা বলবেন না, হুজুর বাহাদুর!' কালো কালো রুক্ষ হাত দু'খানা একত্রে সংযুক্ত ক'রে এবং মাথা নত ক'রে কথা বললেও বুটার কণ্ঠস্বরে কিন্তু রীতিমত দুঃসাহসী ধৃষ্টতা ফুটে উঠল।

'কুকুরের মতো অত ঘেউ ঘেউ করছিস্ কেন?' লোকটার ধৃষ্টতায় কুপিত হয়ে টুলীপ চিৎকার ক'রে ওঠেন।

'আমি কুত্তা নই, হুজুর! আমরা হিসাবের পাওনা চাইছি। আর রায়বাহাদুর আমাদের তা দিচ্ছেন না।'

'এসব ক্ষেত্রে ওরা আগে যা পেত, এবারও তাই দিচ্ছি মহারাজ।' ছোট্টুরাম বলে।

হিংস্র ও নির্মম হয়ে টুলীপ রাগে ফুলতে থাকেন। যে-সমস্ত অদৃষ্ট-চক্র সাঁড়াশীর মতো তাঁকে চেপে ধ'রে তাঁর সমস্ত তেজ-নিষ্কাশিত ক'রে তাঁকে ধ্বংস করছিল, বিলীন ক'রে দিচ্ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর রাজমহিমা, ছিন্ন ক'রে দিচ্ছিল তাঁর শক্তি ও মর্যাদার উৎস-স্থলের শিকড়গুলো, সেই সবের বিরুদ্ধে তাঁর হৃদয়ে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, তাঁর অন্তরের এই ক্রোধের সঙ্গে যেন তাও মিশে যায়। একটা তীব্র উত্তেজিত অবস্থায় তিনি চিৎকার ক'রে ওঠেন:

'যা! বেরিয়ে যা এখান থেকে।...' তাঁর কর্কশ কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে

উঠে যায়, চোখ দুটো আগুনের গোলার মতো লাল, সমস্ত দেহ ক্রোধে কাঁপতে থাকে।

'আর বেগার-খাটতে আমরা নারবো মহারাজ।' করজোড়ের আড়ালে মুখখানা রেখে বুটা বিনয়ী অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

বাঘের মতো লাফ দিয়ে ক্রুদ্ধ মহারাজ বুটার মাথায় তাঁর থাবার মতো হাতের তেলো দিয়ে চপেটাঘাত করেন, সঙ্গে সঙ্গে পা ছুঁড়ে দেন বুটার তলপেটে। তাল সামলাতে না পেরে বুটা মাটিতে পড়ে যায়, তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ফিনিক দিয়ে বেরোয়।

আমরা হিজ হাইনেসকে টেনে এনে তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে ক্রোধে কম্পমান তাঁর রক্তিম মুখের কষ দিয়ে ফেনা বেরোয় আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে অশ্রাব্য কুৎসিত ভাষার খৈ ফুটতে থাকে।

শিকার-পর্বের শেষ অধ্যায়টা এইভাবে গড়াবার পর আমেরিকানরা নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে এবং বিকেলের ট্রেনেই দিল্লী রওনা হয়ে যেতে চায়। কড়া পুলিস প্রহরা সত্ত্বেও ছোট ছোট গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের গাড়ীর ওপর ইটপাটকেল পড়তে থাকে; রাজধানীতে ফিরে এসে দেখলাম হরতালের জন্য শহরে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। এইসব দেখে, শ্যামপুরে যে এক বিরাট ঝড়ো-ঘূর্ণীর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে পাছে আবার জড়িয়ে পড়ে, সেই ভয়ে মার্কিন সাহেবরা তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারলেই যেন বাঁচে। হিজ হাইনেস বললেন যে, সাহেবরা যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তাহ'লে তিনিও তাদের সঙ্গে একত্রে যেতে পারেন; কিন্তু সাহেবরা দিল্লীতে তাদের জরুরী কাজকর্মের অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

'আশা করি ভবিষ্যতে আরও বেশী দিনের জন্য আপনারা আবার আসবেন।' অতিথিদের তিনি যে রাখতে পারলেন না, সেই ব্যর্থ আতিথেয়তার দায়িত্ব টুলীপ যেন সহ্য করতে পারছিলেন না। অতিথিদের জন্য শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত স্পেশ্যাল কামরা ও তাদের সর্বতো-ভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবার জন্য মহারাজা ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং, ছোটুরাম ও মুন্সীজীকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন।

মহারাজার হুকুম হলো আমাকেও আজই রাত্রে তাঁর সঙ্গে দিল্লী যেতে হবে। যাত্রার পূর্বে কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি তাই নিজের কক্ষে গেলাম। ঘরে ঢুকেই দেখি, বুলচাঁদ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ ক'রে নিলাম যে টুলীপের পক্ষ পরিত্যাগ করেও লোকটা নিজের মুখরক্ষা করবার চেষ্টা করছে। আমি দেখলাম, সে চুপচাপ বসে আছে আর্ম-চেয়ারটায়, দুশ্চিন্তার সামান্য রেখাও খুঁজে পেলাম না তার মুখে। মহারাজার প্রতি এই যে বিশ্বাসঘাতকতা সে করছে, তাতে একটুও দুঃখিত নয় সে। কিন্তু আমি তো তাকে চিনি, সে কাপুরুষের মতো ভিতরে ভিতরে কাঁপছে, কিন্তু পরম নিশ্চিন্ততার ভান ক'রে বসে আছে।

আমিই আক্রমণ শুরু করলাম: 'তুমি বাপু লোক ভাল নও!' সত্যিই আমার রাগ হয়েছিল, এবং বসতে পারছিলাম না। গায়ের কোটটা খুলে ফেলে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য আমি পাখার নীচে দাঁড়ালাম। ফ্রান্সিস আমার কোটটা নিয়ে গেল।

ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসি নিয়ে বুলচাঁদ বোকার মতো ক্ষণকাল আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করে:

'দেওয়ানের সঙ্গে আমি যে চলে এলাম তার জন্য মহারাজা কি কিছু বলেছেন, ডাক্তার?

'না। তবে তিনি তা লক্ষ্য করেছেন এবং বিপদের মুখে ডুবন্ত

জাহাজের ইঁদুরের মতো তুমি যে সকলকে ছেড়ে পালিয়ে যাও তাও তিনি বুঝেছেন।'

'আমাকে যা খুশি তুমি বলতে পার ডাক্তার,' বুলচাঁদ তার স্বভাব-সিদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দেয় যা দিয়ে সাধারণতঃ সে সকলকেই নিরস্ত ক'রে থাকে: 'কিন্তু বর্তমান অবস্থা' হিজ হাইনেসের পক্ষে সত্যিই ঘোরাল হয়ে পড়েছে। আলোচনার মধ্য দিয়ে কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে, তারই জন্য আমি দেওয়ানের সঙ্গে চলে এসেছিলাম। হিজ হাইনেসের জন্যই আমার এই ওকালতি।'

'মীমাংসা একটা হবেই, গোলটেবিলের চারধারে শান্তির মধ্য দিয়েই তো সমস্ত যুদ্ধেরই পরিসমাপ্তি ঘটে।'

'তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে ডাক্তার, যে আলাপ-আলোচনা জিনিসটা সত্যিই শক্ত ব্যাপার। একদিকে মহারাজার স্বাধীন থাকবার ইচ্ছা ও চেষ্টা, আর একদিকে ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের জন্য ষ্টেট-ডিপার্টমেণ্টের দাবী—এ দুইয়ের মধ্যে কোনরকম সমঝোতা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। মীমাংসার জন্য যথেষ্ট কলা-কৌশলের প্রয়োজন। মহারাজার এই মার্কিন সাহায্য প্রার্থনা দেওয়ান সাহেব কিন্তু মোটেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।'

বুলচাঁদ বেশ পরিষ্কার ভাবেই তার বক্তব্যটা বলে গেল। তার পূর্ব পুরুষ মারোয়াড়ী বেনিয়াদের ভাব-প্রবণতাশূন্য ভাবে অবস্থা বিচারের ক্ষমতাটা সে উত্তরাধিকার-সূত্রেই পেয়েছে। কিন্তু হিজ হাইনেসের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা বা অনুরক্তি আমার পক্ষে যুক্তিযুক্তভাবে অবস্থা বিশ্লেষণে যে বাধার সৃষ্টি করে, বুলচাঁদ কিন্তু সে-সব ভাব-প্রবণতা থেকে একেবারেই মুক্ত।

'শ্যামপুর শহর এবং গ্রামাঞ্চলের বর্তমান অবস্থাটি কিরকম বুলচাঁদ? কিছু শুনেছ?'

'এখনও হরতাল চলেছে। রাস্তায় নিশ্চয়ই দেখে থাকবে যে দোকানপাট সব বন্ধ। শহরের লোকেরা এখন শুধু প্রজামণ্ডলের নেতাদেরই মুক্তি দাবী করছে না, তারা মহারাজাকে "শ্যামপুর ছাড়ো!" ব'লে হুঙ্কার ছাড়ছে।'

'সামরিক অভিযানের কি খবর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জেনারেল রঘবীর সিং শ্যামপুরে ফিরে এসেছে। সে মহারাজার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে। শুনলাম, রাজা প্রদ্যুম্ন সিং, ঠাকুর মোহন চাঁদ ও ঠাকুর শিবরাম সিং বলে দিল্লী গিয়েছেন সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতে। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে বলে এঁদের মনোমালিন্য ঘটেছে, কারণ, কম্যুনিষ্টরা এই সমস্ত অভিজাতদের জমিজমা চাষীদের মধ্যে বিলি করতে শুরু করেছে। রাজ্যের সৈন্যবাহিনী গোটাকয়েক গ্রামের ওপর কব্জা ক'রে আছে বটে, তবে কম্যুনিষ্ট ও চাষীরা অন্য গ্রামে গিয়ে চাষীদের মধ্যে জমি বিলিয়ে দিয়ে গাঁয়ের মাঝে 'কমিউন' রেখে আরও দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। সরকারী সৈন্যদের সঙ্গে তারা 'ঘা দিয়েই সরে পড়ার' গেরিলা কায়দায় বলে লড়াই চালাচ্ছে। সরকারী সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকেই বলে তারা রাইফেল আর কার্তুজ লুট ক'রে নিচ্ছে। আজ বিকেলে যখন জেনারেল রঘবীরের সঙ্গে দেখা হলো, মনে হলো, সে অত্যন্ত মন মরা-হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারছি, হিজ হাইনেসের জন্য আরও অনেক দুঃসংবাদ জমা হয়ে রয়েছে।...'

বুলচাঁদের শেষ কথাটার অর্থটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হলো না, কিন্তু একটা কথা বেশ বুঝতে পারছি যে, চরমভাবে এবং চিরদিনের জন্যে টুলীপের সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছে, যদিও এই বাস্তব সত্য স্বীকার ক'রে নিতে তাঁর কিছু সময় লাগবে। ইতিপূর্বেই তিনি সব দিক দিয়েই পরাজিত হয়েছেন, এখন এটাকে বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার ক'রে নেওয়াই তাঁর

উচিত। আমি ছিলাম ভাবপ্রবণ ভিত্তিমূলের উপর দাঁড়িয়ে। এর তুলনায়, শুনতে খারাপ হ'লেও, বুলচাঁদের নির্লজ্জ ও কুৎসিৎ সুবিধাবাদ ঢের বেশী বাস্তবমুখীন ও কার্যকরী। এবং এইভাবে ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের সব আশা-ভরসাই যেন লুপ্ত হয়ে গেল, আমাকে নিষ্ক্রিয়তায় পেয়ে বসল। আমি যে এই ঘটনার সমস্ত ব্যর্থতা এবং তার নির্মম বাস্তবরূপ এতদিন উপলব্ধি করতে পারিনি, শেষ পর্যন্ত ধূর্ত বুলচাঁদই আমাকে তা বুঝিয়ে দিল দেখে আমি সত্যিই বিস্মিত হলাম। প্রজামণ্ডলের নেতা পণ্ডিত গোবিন্দ দাস তো বিপ্লবী নন, তবুও কেনই বা তিনি মহারাজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করলেন: সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতরাই বা কেন প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ক'রে, সাময়িক হলেও, কম্যুনিষ্টদের হাতে হাত মিলাল: দিল্লীর ষ্টেট-ডিপার্টমেণ্ট শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্‌কে পাঠিয়েছেন, মহারাজা তাঁর পরামর্শ উপেক্ষা ক'রে আমেরিকানদের শরণাপন্ন হয়েছেন: মহারানী ইন্দিরা তাঁর অধিকারের জন্য লড়ছেন: রাজপুত্র হিসেবে তার ছেলেকে মেনে না নিলেও ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধনরত্ন, টাকাকড়ি, জমি-জমা এবং মহারানীর মর্যাদা লাভের দাবী আদায় করার পরেও গঙ্গী তার দেহের দিক থেকে টুলীপের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই বা কেন করছে! এবং এই সমস্ত বাস্তব ঘটনার পরেও অপেক্ষা করছিল আরও বেশী ভয়াবহ সব ঘটনা—ভয়াবহ, কারণ তা হলো আরও বাস্তব—শ্যামপুর রাজ্যের প্রজাবৃন্দ—চাষীর দল, যাদের কাছ থেকে তিনি জোর ক'রে নজরানা ও বেগারী আদায় ক'রে আসছেন; জোতদার তালুক-দারদের দত্তক গ্রহণের সময় তাঁর কর্মচারীরা মোট টাকা আদায় ক'রে থাকে, উত্তরাধিকারী না রেখে যাদের হয়েছে মৃত্যু তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁর অনুগ্রহ বা বিরাগের জন্য বড় বড় ভূস্বামীদেরও নানাপ্রকার উপগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। টুলীপের ম্যাকেয়াভেলী-

কূটনীতি কিছুতেই এই অত্যাসন্ন ভয়াবহ প্রতিশোধ গ্রহণের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। এই সমস্ত বিপর্যয়ের পূর্ণ ছবি যখন তাঁর কাছে খুলে ধরা হবে, তখন তিনি দেখতে পাবেন যে, তাঁর পাশে আর কেউ নেই, সবদিক থেকেই তিনি কোনঠাসা হয়ে পড়েছেন। আমি জানি যখন তাঁর ভুল ভাঙবে, তখন এই হতোদ্দম মানুষটি একেবারেই ভেঙে পড়বেন। বেশ দেখতে পাচ্ছি যে চারধার থেকে এক নিশ্ছিদ্র জমাট-বাঁধা অন্ধকার দ্রুত নেমে আসছে তাঁকে ঘিরে ফেলবার জন্য।

'আমি মনে করি ডাক্তার, ভারত-ইউনিয়নের পবিত্র ভূমিতে মহারাজার অবস্থিতি আজ অনধিকার প্রবেশের মতো।' চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বুলচাঁদ বলে : 'বিচার ক'রে দেখলে বুঝবে যে লোকটা রীতিমত অপরাধী! রাজাদের আর ভগবানদত্ত ব'লে কোন অধিকার নেই!'

হা ক'রে তাকিয়ে আমি বুলচাঁদের কথা গিলতে থাকি।

'মহান ভারত-ইউনিয়নের বাইরে শ্যামপুরের স্থান হতে পারে না। এর নিজস্ব কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে দেশবাসীর হাতে!...আর নজর দিয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখ ডাক্তার, নিজের পরিবারের লোকেরাও আজ টুলীপের বিরুদ্ধে!...'

এই সমস্ত কথার মধ্যে সততা থাকলেও যে-লোকটির শ্রীমুখ দিয়ে এইসব বের হচ্ছে, তা শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। আমি তো দেখেছি, এ হচ্ছে সেই ধূর্ত-শ্রেষ্ঠ শৃগাল যে পদলেহনকারী, তোষামোদকারী দালালের মনোবৃত্তি নিয়ে দিনের পর দিন কুকুরের মতো লেজ নেড়ে নেড়ে মহারাজার অনুগ্রহ কুড়িয়ে বেড়িয়েছে।

'তুমি তো জানো ডাক্তার, শ্যামপুরের প্রাকৃতিক সম্পদ কি বিপুল, আমাদের এই দেশ কিরকম সমৃদ্ধশালী!'

আমার মুখোমুখি হয়ে বুলচাঁদ আবার বলতে শুরু করে: 'কিন্তু মহারাজার শাসনে শ্যামপুর, শিল্প ও আর্থিক দিয়ে সবচেয়ে অনগ্রসর থেকে গিয়েছে। আজ এর সামরিক গুরুত্ব সাংঘাতিক বেড়ে গিয়েছে। এখানে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা কিছুতেই থাকতে দেওয়া যায় না। মহারাজার স্বাধীন থাকার প্রয়াসটা স্রেফ কল্পনা-বিলাস। আমি চাই, মহারাজা সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করুন, আর ভারত-ইউনিয়নে শ্যামপুর-ভুক্তির দলিলে সই না করা পর্যন্ত, দেওয়ান পোপতলাল জে. শাহ্ রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করুন। আমার মনে হয়, তুমি টুলীপকে এ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো। দেওয়ানের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার দিয়ে তিনি যদি না যান, তবে সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে তিনি কিছুই পাবেন না, এমন কি, ব্যক্তিগত খরচের টাকাও তিনি পাবেন ব'লে আমার মনে হয় না—'

বুলচাঁদের অন্তরাত্মার তলদেশে যে কুৎসিৎ নোংরামির স্তরটা লুকনো ছিল, এই বাগাড়ম্বরের ভেতর দিয়ে তা এক অস্বাস্থ্যকর অশুভ আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠল, আমি লক্ষ্য করলাম, তার ছোট্ট মুখখানা এক মিথ্যা সজীবতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। লোকটার অভ্যস্ত নাসিকা-গর্জনও আর তার এই অপূর্ব বাগ্মীতা নষ্ট হতে দিচ্ছে না, নিজের নাসিকাকে সংযত রেখে তার এই নতুন মর্যাদা সে যেন রক্ষা করছে।

'এই কথাই বলার জন্য তোমার কাছে এসেছি আমি, ডাক্তার।'

বুলচাঁদের ব্যবহারের পরিবর্তন আর তার এই কথা বলার ঢঙ দেখে আমি সত্যিই মর্মাহত হয়েছি, একটা চাপা ক্রোধে আমার অন্তর ফুলে ফেঁপে উঠছে। কোন রকমে নিজেকে চেপে রেখে বললাম: 'আচ্ছা—'

টুলীপের ব্যাপারটার যে কি করা যায় নিজেই আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এতদিন তো শুধু নিজের মনের সব দ্বন্দ্বের ওপর নেতিমূলক

আবরণ টেনে দিয়ে এক অস্বস্তিকর জীবনের মধ্য দিয়েই চলেছি, কিন্তু আজ কঠিন বাস্তবতার সামনে পড়ে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। এই নোংরামির মধ্যে আমাকে নামতে হয়েছে ব'লে জীবনের ওপর একটা কেমন যেন ঘৃণা জমে উঠেছিল, আজ এই অবস্থায় পড়ে নিজেকে একটা শূন্য গেলাস বলে মনে হতে লাগল। তবুও তো আমি বেশ জানি যে শ্যামপুরে আমার জীবনের এই শেষ পর্যায়ে আমাকে পূর্ণ মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আর এই সময়টাই তো দেশের ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করবে। বিষবৃক্ষের বীজ রোপণে যখন অংশ গ্রহণ করেছি, তখন তার ফল ভক্ষণ ক'রে শাস্তি ভোগ তো আমাকে করতেই হবে। আর শেষ পর্যন্ত নোংরা নদীর অপর পারে নিজেকে ক্লেদমুক্ত অবস্থাতে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো, অন্তত, এই আশা নিয়েই এই নরককুণ্ডের আবিল জলে আমাকে নেমে পড়তে হবে।

'স্নানটা সেরে নেব এবার বুলচাঁদ। তারপর যাবো হিজ হাইনেসের সঙ্গে দেখা করতে।' বললাম আমি।

খুশিতে টগবগ করতে করতে হ্রেষাধ্বনির মতো নাক দিয়ে আওয়াজ ক'রে ওঠে বুলচাঁদ। তারপর যায় বেরিয়ে।

হতাশ চিত্তে আমি বাথরুমের দিকে পা বাড়াই।

আমি যখন মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, দেখলাম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চৌধুরী রঘবীর সিং তখনও তাঁর সঙ্গে কি সব আলোচনা করছে। দুই আত্মীয় ভাইকে এভাবে আলোচনা করতে দেখে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজার কাছ থেকে আমি ফিরে দাঁড়ালাম। কিন্তু মহারাজা আমাকে দেখতে পেয়েছেন, তিনি আমাকে ডাকলেন। রঘবীর সামরিক কায়দায় ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে কথা

বলছে আর হিজ হাইনেস দরজার পাশে বসে তার কথা শুনছেন। আমি কক্ষে প্রবেশ করতে করতে শুনলাম :

'...আপনার বাবার সঙ্গে যে সব পুরোনো মনোমালিন্য ছিল, তা তারা ভুলতে পারে নি। এখন তারা গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে, পরলোকগত মহারাজা সাহেবকে যেভাবে বৃটিশ সরকার অপমান করেছিল, ঠিক সেইভাবে আপনাকেও এখনকার কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার বেইজ্জৎ করছে। একটা পুরোনো কাহিনীও তারা বেশ ছড়াচ্ছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে যে, বছর কয়েক আগে, পরলোকগত মহারাজা বড়লাট বাহাদুরের দিল্লী-দরবারে যোগদানের জন্য যখন গিয়েছিলেন, তখন ঠাকুর প্রদ্যুম্ন সিং ও ঠাকুর মোহনচাঁদকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। "রাজেন্দ্র মণ্ডল" গঠনের জন্য সে-দরবারে সমস্ত দেশীয় রাজা ও অভিজাতবর্গ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ওরা বলছে যে, সেই দরবারে আপনার শ্রদ্ধেয় পিতাকে আসন দেওয়া হয়েছিল কপূরতলা, এমনকি মান্দীর-এর রাজারও নীচে। এতে নিজেকে অপমানিত মনে ক'রে তিনি দরবার থেকে বেরিয়ে আসেন। বড়লাট বাহাদুর বলে এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলে মহারাজা সাহেবকে তাঁর রাজ্যে ফিরে যেতে হুকুম দেন এবং তাঁর সম্মান-প্রদর্শনের জন্য যে তেরটি তোপধ্বনি হতো, তাও বলে বন্ধ ক'রে দেবার আদেশ দেন। আমরা তো তখন ছেলে মানুষ, এবং এই সরকারী নির্দেশ অমান্য ক'রে আপনার বাবা, আমাদের বুড়ো মহারাজা যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, তা আমরা সেদিন জানতে পারি নি, বরং বলা যেতে পারে, আমাদের মনে নেই...কিন্তু রটনার সার মর্ম হচ্ছে এই যে, আমাদের এই দুই শত্রুর একজন ঠাকুর প্রদ্যুম্ন সিং বড়লাটের খোসামুদি ক'রে, নাইট উপাধি লাভ করে, আর ঠাকুর মোহন চাঁদও দিল্লী থেকে ফিরে এসেই বুড়ো রাজাকে এড়িয়ে শ্যামপুরেরই একটা অংশ দাবী ক'রে

নিজের জন্য স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করে। আর সেই কাজে তারা ঠাকুর শিবরাম সিংকেও সঙ্গে নিয়েছিল। সেই থেকে বছরের পর বছর তার জমিদারীর আশেপাশে আদিবাসী 'সানসী' উপজাতিদের উস্কিয়ে আক্রমণ করাতে থাকে। পান্না ও উধমপুরের চারদিকে এইভাবে তাদের আতংক সৃষ্টির খেলা চলেছে। রায়তরাও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। শিবরাম ঠাকুর প্রদ্যুম্ন সিংকে লাভের অংশ দিচ্ছে, চলছে এদের লুটতরাজ, আর সেই সঙ্গে চলেছে ডাকাতির সংখ্যাও দিন দিন বাড়াবার উস্কানি!···

'আর আমাকে বোঝান হচ্ছে যে, রায়তদের মধ্যে অসন্তোষের জন্যে আমিই দায়ী!' অন্তরের চাপা ক্রোধ মুখের ভাষায় ফুটিয়ে বলেন হিজ হাইনেস।

'মনে আছে মহারাজ, বছর দুই আগে, সানসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য আমি আপনাকে বলেছিলাম। আমার পরামর্শ উপেক্ষা ক'রে আপনি বুড়ো প্রদ্যুম্ন সিংকে রাজস্ব-মন্ত্রী নিয়োগ ক'রে তার হাতে আরো সরকারী ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন···'

'আমি বুঝতেই পারিনি ভাই যে, আমার জ্ঞাতি হ'য়ে চাচা সাহেব আমাকে গদী থেকে হঠাতে চেষ্টা করবেন।' মুখখানা আঁধার ক'রে টুলীপ বলেন।

'দু'পুরুষ ধরে তারা আপনাদের গদীচ্যুত করতে চেষ্টা ক'রে আসছে আর আপনি শুধু আমাকেই সন্দেহ ক'রে আসছেন।'

টুলীপ মাথা নত ক'রে কিছুক্ষণ বসে থাকেন, তারপর জানলা থেকে সরে এসে বলেন:

'আমাকে ক্ষমা করো রঘবীর। একটা মেয়েমানুষকে নিয়েই আমাদের মধ্যে যত গণ্ডগোল। যাই হোক, ওটা হচ্ছে একটা বারমুখ্যা, কসবী! আর তুমি যদি তাকে নিতে চাও, বেশ—সে-কসবীর কথায়

আর আমি আমাদের মধ্যের এই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা নষ্ট করবো না—' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে টুলীপ বলেন, জ্ঞাতি ভাইয়ের প্রতি স্নেহ-মমতায় তাঁর চোখ দুটো ছল ছল করতে থাকে।

'আমাদের শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে,' রঘবীর বলে: 'এখনও আমি ওদের ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারি।...'

'শুধু আমি যদি দিল্লীতে ভালোয় ভালোয় একটা ফয়সালা ক'রে ফেলতে পারি—' হতাশ কণ্ঠে টুলীপ বলেন। শিশুর মতো তাঁর ঠোঁট দুটো ঝুলে পড়েছে, কণ্ঠস্বরও স্তিমিত। 'কিন্তু...আমার আগেই ওরা দিল্লী রওয়ানা হয়ে গিয়েছে।...'

টুলীপকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমি বলি: 'সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করা ওঁদের পক্ষে কিন্তু খুব সহজ হবে না। আপনি যদি মীমাংসা করতে চান, এখনও তার সময় আছে।'

'এ-সম্বন্ধে তোমার পরামর্শ চাই, ডাক্তার।' আমার দিকে তাকিয়ে টুলীপ বলেন।

ফৌজী অফিসার হিসেবে রঘবীর কথার এসব ইঙ্গিত সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ। মহারাজার একথার ইঙ্গিত বুঝেই কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে সে পা বাড়ায়। মহারাজা তার দিকে চেয়ে বলেন:

'আমি চাই তুমি নিজেকে আমার সব রকমের স্বার্থের রক্ষাকর্তা বলে মনে করো রঘবীর। দিল্লীতে মীমাংসা-বৈঠক শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেওয়ান পোপতলালকে কোন কিছুতেই হাত দিতে দেবে না। দু'দিনের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।—' এই বলে তিনি দু'বাহু প্রসারিত ক'রে এগিয়ে এসে রঘবীরকে আলিঙ্গন করেন।

টুলীপের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে সালাম বাজিয়ে বীর পদক্ষেপে কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে যায় রঘবীর। টুলীপ তখন

পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছেন। প্রথমে রঘবীরের নিষ্ক্রমণ ঠিক বুঝতে পারেন নি হিজ হাইনেস। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেকে শক্ত ক'রে তুলছেন, বেশ বোঝা যায়। তাঁর মুখখানা ফ্যাকাশে ও অস্বাভাবিক দেখায়, যা ঠিক বলা উচিত নয় তা বলবার তীব্র বাসনায় তাঁর মুখটা একটু একটু নড়ে ওঠে। ঝটিকার পূর্বমুহূর্তে গাছের মাথা যেমন কাঁপতে থাকে, টুলীপও তেমনি তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য যেন কাঁপতে থাকেন।

'আমি ওকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না, ডাক্তার—' বলে ফেলেন হিজ হাইনেস। তারপর জানালা থেকে সরে এসে সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েন। তাঁর এই গা-ছাড়া ভাব দেখে মনে হয় তাঁর দেহাভ্যন্তর থেকে যেন কোন কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পা দু'খানা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন, চোখ দুটো তাঁর অদ্ভুত রক্তিম হয়ে উঠেছে, মনে হয়, যেন ঘরের শিলিং ভেদ ক'রে তাঁর দৃষ্টি কোথায় চলে গিয়েছে। মাথাখানা তিনি এদিক ওদিক নাড়ছেন, মুখখানা এক অনিশ্চিত অস্পষ্ট ভাবধারায় ক্লিষ্ট, যেন মেঘাবৃত। জলে-ডোবা মানুষের অন্তিম নিশ্বাসের মতো একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

মুহূর্ত পরে হঠাৎ তিনি উঠে বসেন। বলেন :

'ছাড়ব না, আমি ছেড়ে দেব না। শেষপর্যন্ত আমি লড়বো।'

'জিনিসপত্তর গোছ-গাছ ক'রে নেবার জন্য কি জয় সিংকে বলেছেন, টুলীপ?' আমি বললাম।

'না, না।' তারপর চিৎকার ক'রে বলেন : 'কই হ্যায়?'

চাপরাশি জয় সিং সামনে এসে দাঁড়ায়।

'মহারাজা সাহেবের জিনিসপত্তর গোছ-গাছ করো। রাত্রি সাড়ে এগারোটার ট্রেনে আমরা দিল্লী যাব।' আমিই বললাম চাপরাশিকে।

'কিছু গরম কাপড় দেব হুজুর?' চাপরাশি জিজ্ঞেস করে।

'উঃ—, যা বেরিয়ে যা, যা গোছ-গাছ করগে!' টুলীপ চেঁচিয়ে ওঠেন।

কিছু সময়ের জন্য দু'জনেই আমরা চুপ ক'রে থাকি, এই সময়টুকুর মধ্যে হিজ হাইনেস তাঁর অন্তরের ঝড়ের দাপট থেকে নিজেকে একটু সামলে নেন। তারপর সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, আবার জানালার কাছে গিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে বলেন :

'এই সঙ্কট আমাকে পার হতেই হবে।…এবং আমি তা হবোও। হ্যাঁ, আমি বেশ বুঝতে পারছি যে দিল্লী জয়লাভ করছে, আর আমাকে ভারত-ইউনিয়নের শ্যামপুর-ভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর ক'রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে থাকতে হবে।… কিন্তু…'

এই সহজ সত্যটা বুঝতে গিয়ে কি তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই না তাঁকে অতিক্রম করতে হলো। তাঁর পক্ষে এই রকম একটা অবস্থা মেনে নেওয়ার পূর্বে, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাতন্ত্র ও ক্ষমতার যে ধরা-বাঁধা রীতিগুলো, তিনি পুরুষানুক্রমে ভোগ ক'রে আসছেন, যে অহমিকা ও মর্যাদাবোধের বহিরাবরণ তাঁর ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, সেসব ভেঙ্গে চুরমার ক'রেই তাঁকে এই কঠিন বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটা মেনে নেওয়া সহজ নয়, তাই এই কথাগুলো তাঁর মুখ দিয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চুপ ক'রে যান, এক অসহায় অবস্থায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, পাছে তাঁর সজল চোখের ওপর আমার দৃষ্টি পড়ে যায় এই ভয়ে। তাঁর মনের এ-অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, আমি দেখেছি তাঁর সজল চোখ যখন তিনি কথা বলতে বলতে এক পলকের জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

কিছু সময়ের জন্য তিনি ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমার মনে

হলো, নিজের স্বভাবের সব শক্তিগুলোকে বাগ মানিয়ে তিনি তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষারও খর্বতা সাধন ক'রে নিজের মনটাকে শক্ত ক'রে বাঁধবার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্ব যে এবার শেষ হয়ে আসছে, তা আমি বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, তিনি টলতে টলতে এসে আবার সোফায় শুয়ে পড়লেন, একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, তারপর শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠে দু'হাত দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেললেন, পাছে তাঁর এই শোচনীয় অবস্থাটা কেউ দেখে ফেলে।

আমি এগিয়ে এসে তাঁর পাশে বসে পিঠে হাত বোলাই। জানি, এই সান্ত্বনা দেওয়ার প্রচেষ্টা একেবারেই অর্থহীন, এতে শুধু তাঁর দুঃখ আরও বাড়িয়েই দেবে।

দেখলাম, মুহূর্তের মধ্যে তিনি বিশেষ চেষ্টা ক'রে উঠে বসলেন, রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে বললেন :

'আমার মনে হয়, দিল্লীর কাছে আমার পরাজয় স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার কাছেও আমার পরাজয় স্বীকার ক'রে নেওয়াই উচিত। ···তোমার কি মনে হয়, ওর কোন পরিবর্তনই হবে না?'

'আমার মনে হয়, গঙ্গা দেবীর পরিবর্তন খুব সহজে হবে না।'

'তুমি জান না ডাক্তার,' তিক্ততার স্পর্শ লাগান অদ্ভুত এক কোমলতায় কুঞ্চিত মুখ নিয়ে তিনি বলেন : 'আজ সকালে শিকার-ভবনের বাথরুম থেকে গঙ্গী এমন করুণ ও বিষণ্ণ মুখে বেরিয়ে এল যে, ওকে দেখে মনে হলো, ও যেন কুর্টের সঙ্গে ওর ঐ কাণ্ডের জন্য অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছে···অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ও, ও চাইছে আমার ক্ষমা।··· অপাপবিদ্ধা, কোমলতার নগ্ন প্রতিমা যেন গঙ্গী···! আমি পারলাম না নিজেকে ধরে রাখতে, এগিয়ে গিয়ে ওকে আমার বাহুডোরে টেনে নিলাম। মুহূর্তে আমার মনের সমস্ত ক্রোধ কোথায়

চলে গেল। গঙ্গাও দেহলীন ক'রে দিল আমায় আলিঙ্গনের মধ্যে…ও যেন আমারই, শুধু আমারই।…কিন্তু আজই বিকেলে, আমরা এখানে ফিরে আসার পর, আবার ওকে দেখলাম অসহিষ্ণু ও অস্থির অবস্থায়। আমার পাশেই ও ছিল ঘুমিয়ে, জেগে দেখলাম, ও নেই, আবার কোথায় চলে গিয়েছে।…জানিনে হঠাৎ কি হ'লো আবার! আমি ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, কিন্তু বুঝতে পারি না… !'

'অসুস্থা নারী।' সান্ত্বনা জানিয়ে আমি বলি : 'কি যে তাঁর চাই, তা নিজেই জানেন না। হঠাৎ-হঠাৎ তাঁকে খেয়াল ও কল্পনার পরী পেয়ে বসে। তখন আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে লাভ করার জন্য হন্যে হয়ে বেরিয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় তিনি বেপরোয়া। আকাঙ্ক্ষিত-বস্তু লাভ করার পর আবার আগের সেই দুর্বলতা পেয়ে বসে, তখন তিনি আবার সেই মন-মরা নারীতে পরিণত হয়ে যান। গঙ্গা দেবীর মতো মেয়ে মানুষের চরিত্রই হলো এই রকম।'

'আশ্চর্য জিনিস কি জানো ডাক্তার, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ধরে, ও আমার মনে এই বিশ্বাসই জন্মায় যে, ও আমারই অস্তিত্বের অংশ-বিশেষ, আর তখন আমি নিজেকে সত্যিসত্যিই অত্যন্ত শক্তিমান মনে করি। ও আমার মধ্যে সাহস যোগায়…'

'ডাক্তার হিসেবে আমার বক্তব্য হলো, গঙ্গা দেবীর প্রভাব থেকে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ, তিনি আপনাকে, দেহে মনে ও প্রবণতার দিক থেকে একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলছেন। উনি হচ্ছেন একেবারে যাকে বলে জংলী অভ্যাসের মেয়ে, পোষ তিনি মানবেন না কখনও। আপনার জীবন-শোনিত শুষে নিয়ে ছিবড়ের মতো আপনাকে দূরে ফেলে দেবেন। ওঁর কবল থেকে মুক্ত হতে হবে আপনাকে। এ-মেয়ের হৃদয়-নীতি ব'লে কোন কিছুর বালাই নেই টুলীপ।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও জানিনে কেন ওকে আমি এত ভালোবাসি!' টুলীপ বলেন।

'এবার আমাদের উঠতে হবে টুলীপ। ট্রেনের জন্য তৈরি হতে হবে।'

মহারাজা নয়াদিল্লীর ইম্পীরিয়াল হোটেলে একটা স্যুট ভাড়া করেছেন। সেপ্টেম্বরের দিল্লী, গরম অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু দিল্লীর আকাশ-বাতাস যেন টুলীপের ভেতর থেকে তাঁর শেষ সম্বলটুকুও নিংড়ে বের ক'রে নেবার জন্য ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছে। ক্রমবর্ধমান উন্মাদনা ও কয়েক সপ্তাহব্যাপী মানসিক দুর্ভোগ শেষপর্যন্ত যেন তাঁর মনের সব আশা-ভরসা বাস্তবতার হিমেলে আঘাতে ভেঙে দিচ্ছে। এই রকম অবস্থায় তখন চুপচাপ শুয়ে থাকাই জীবনের পক্ষে সবচেয়ে কাম্য মনে হয়। তবে এই ভেঙে-পড়াটা অবশ্য ঘটে ধীরে ধীরে, প্রত্যেকটি বড় ঘটনা তার ছাপ রেখে যায় ভেঙে-পড়া লোকটার দেহ ও মনের ওপর। শেষ পর্যন্ত টুলীপের দেহ ও মন নানামুখী চাপে তাঁর অজ্ঞাতেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জানতে পারি যে, ঠাকুর প্রত্যুম্ন সিং ও ঠাকুর শিবরাম ইতিপূর্বেই পুরোনো দিল্লীর মেইডেন্স হোটেলে আস্তানা নিয়েছে। তা সত্ত্বেও এখন বলে এই ইম্পীরিয়াল হোটেলেই তারা অবস্থান করছে সর্দার প্যাটেলের সাক্ষাৎ লাভের জন্য।

অহমিকা ও নিজের ওপর অতি-আস্থাই ছিল টুলীপ-চরিত্রের একটি মূল জিনিস। তার ফলে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, টেলিফোনযোগে সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেই সঙ্গে সঙ্গে সর্দার প্যাটেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন। বাস্তব অবস্থাটা টুলীপ মোটেই বুঝতে পারেন নি। দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র-সচিব হিসেবেও

সর্দার প্যাটেলের বহু কাজ করতে হয়। কাজেই নয়াদিল্লীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ অত সহজ নয়। টুলীপ সরকারীভাবে সর্দারজীর কাছে চিঠি লিখবার পর, ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং, কখন এই সাক্ষাৎ সম্ভব হবে তা জানবার জন্য ষ্টেট-ডিপার্টমেণ্টে টেলিফোন করল। ষ্টেট-ডিপার্টমেণ্ট থেকে তাকে বলে দেওয়া হলো যে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ-সম্বন্ধে বিবেচনা করছেন এবং যথাসময়ে তাঁর সাক্ষাৎ-সময়, স্থান ও তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। হিজ হাইনেস পরদিন আমাকে টেলিফোন করতে বললেন, এবং আমার কাছেও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি এল। মহারাজা পরদিন মুন্সীজীকে পাঠালেন সেক্রেটারিয়েটে, যাতে তাড়াতাড়ি এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা যায়, এবং তার জন্য যদি দরকার হয়, স্থানে-অস্থানে কিছু তৈলমর্দনও যেন তিনি করেন। মুন্সীজী ষ্টেট-ডিপার্টমেণ্টের কারুর সঙ্গেই দেখা করতে পারলেন না। কিন্তু দেখা হলো তাঁর শ্রীখোসলা নামক জনৈক কেরানীর সঙ্গে। কেরানী বাবুও বলে দিল যে যথাসময় সাক্ষাৎকারের চিঠি যাবে। এইভাবে প্রত্যাখ্যানের ফলে টুলীপ বুঝতে পারেন যে, সাক্ষাৎ-লাভের ব্যাপারে তাঁর অবস্থা চাচা সাহেবদের মতোই একই স্তরে। কাজেই নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেই একদিন তিনি সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে হাজির হলেন। এবারেও সেই শ্রীখোসলাই দেখা করল। কেরানীটি তাঁকে বলল, সর্দারজীর মনের কথা তো কেউ জানতে পারে না, আর এসব ব্যাপারে তিনি নিজেই সব কিছু ক'রে থাকেন। তবে মনে হয়, তিনি রাজা-বাহাদুরের সঙ্গেই আগে দেখা করবেন। মুন্সী মিথনলাল কোনকথা না বলে শ্রীখোসলার হাতে একশ' টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়েছিলেন। তার ফলে কেরানীবাবুটি একটু নরম হয়েছিল, কিন্তু সামান্য এক কেরানীর অনুগ্রহ লাভের জন্য মহারাজার এই আগমনে টুলীপ নিজেই নিজের মর্যাদাটা যেন অবনমিত ক'রে ফেললেন। এর

থেকে নিজের মানমর্যাদা নিয়ে হোটেলে অপেক্ষা করাই ছিল তাঁর পক্ষে ভাল।

এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের দিন আর কাটছিল না। টুলীপও তাঁর দুশ্চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাই একদিন আমরা গেলাম দাস-সুলতান কুতুবউদ্দিনের তৈরি বিরাট কুতুব-মিনারের ওখানে পিকনিকে। এই মিনার থেকে আগ্রা পর্যন্ত সমগ্র পল্লীঅঞ্চল চোখে পড়ে। আমরা প্রাচীন হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজের তৈরি ভগ্ন দুর্গ এবং শাহজাহানের তৈরি লালকেল্লা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেখলাম লোদী সুলতানদের গোরস্থান আর হুমায়ুনের সমাধি। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সরদারজং প্রভৃতি স্মৃতি-সৌধগুলো। এই ভ্রমণ টুলীপের মন-মরা দেহে একটু প্রাণের সঞ্চার করল, কারণ প্রত্যেকটি স্মৃতি-স্তম্ভই তো কৃতী রাজার শক্তি ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক, আর বীরত্বমূলক কাজ-কর্মে রাজাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে যে ধারণা ছিল, এতে তা আরো বদ্ধমূল হওয়ারই অবকাশ পেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সমাধিগুলো যতই প্রাচীন ও মহিমান্বিত হোক না কেন, ওগুলো আমার মনে মৃত্যু ও ধ্বংসের অনুভূতিই জাগায়। আর যেহেতু দিল্লীর অধিকাংশ প্রাচীন-ভবনই সমাধি-মন্দির, সেইজন্য আমার মনটা নৈরাশ্যেই ভরে থাকে। টুলীপ, ক্ষমতা, বীরত্ব, আড়ম্বর, দৃঢ়তা, নৈপুন্য, মহানুভবতা ইত্যাদি রাজকীয় গুণাবলী সম্বন্ধে অনবরত বকে যাচ্ছিলেন। তাঁর সব কথাই আমার কান দিয়ে প্রবেশ করছিল ঠিকই, কিন্তু আমার মনে তার কোন রেখাপাতই হচ্ছিল না। দিল্লীর চারদিকে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে আর সকলের মনে এইরকম অনুভূতির উদয় হয়েছিল কিনা জানি না, তবে আমার মনে এই অনুভূতিই জাগছিল বার বার। ভারতের আশা-ভরসার এই সুবিশাল সমাধি-ভূমিতে আমি যেন প্রেতাত্মার মতোই বিচরণ করছি।

হিজ হাইনেসের মনে এই রকম কিছু না হলেও তাঁকে কিন্তু ঠিক সেই রকমই দেখায়। যখন তিনি জেগে থাকেন, বা হোটেলের ভয়াবহ ইংরেজী খানা গ্রহণের সময় হয়, সেই সময় প্রেতাত্মার মতোই বিশ্রী ভঙ্গিতে তিনি ইতস্তত ঘুরে বেড়ান।

এই কয়েক দিনের মধ্যে এখানে বসে বসে আমি ভারতের রাজা-মহারাজাদের বিয়োগান্ত জীবন-নাট্য এবং তাঁদের ভাগ্য সম্বন্ধে চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ পেলাম।

এক সময় ছিল, যখন দারিদ্র্য ও ঋণভারে প্রপীড়িত এই দেশের হতভাগ্য প্রজাদের সামনে তাঁরা নিজেদের ধন-সম্পদের গৌরব জাহির ক'রে বেড়াতেন, যখন তাঁরা নীস্ ও মন্টিকার্লোর ঘোড়দৌড়-ক্লাবের জুয়ার আড্ডায় আসর জমিয়ে অকাতরে টাকা পয়সা ও রাজ্যের ধনদৌলত ওড়াতেন, তখন ভারতের পল্লীঅঞ্চলে সেই সুপ্রাচীন প্রবাদ বাক্যটিকে প্রচলিত রাখা হতো : "রাজার মুখদর্শন করলে প্রজা ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করে।" পেশাদার বিদেশী সংবাদপত্রের ভাড়াটিয়া লেখকরা এই সমস্ত রাজা-মহারাজাদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে কতই না গালগল্প এবং সময়ে সময়ে 'প্রকৃত' কাহিনীও পরিবেশন করতো আর ইউরোপের নির্বোধ দোকান-পরিচারিকারা রোমাঞ্চকর জীবন-যাপনের লালসা-মিশ্রিত ঔৎসুক্য নিয়ে সেইসব কাহিনী চোখ দিয়ে গো-গ্রাসে গিলত।

এই সমস্ত কাহিনী হলো নেটিভ মহারাজারা তাঁদের চমক লাগানো রোলস-রইস গাড়িতে বসে বসে তাঁদের অরণ্য-রাজ্যে কি রকম রোমহর্ষক কায়দায় দেড় শ' বাঘ শিকার করেছেন ; কত সব অমূল্য মণি মাণিক্যেরই না মালিক তাঁরা। রক্তিমাভা মুক্তো, ডিমের মতো বড় বড় চুনী ও পান্না আছে তাঁদের ধনাগারে ; একজন মহারাজা বলে তাঁর পানীয় জল পবিত্র গঙ্গা নদী থেকে একেবারে লণ্ডনের স্যাভয়

হোটেলে নিয়ে এসেছিলেন; সম্রাটের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোন্ কোন্ নেটিভ রাজা নিঃস্বার্থ ভাবে ৯০,০০০ সৈন্য ও ২০,০০০ পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেছেন তারও ইতিকাহিনী লেখে ভাড়াটিয়া লেখকরা। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা তাদের ক্লাবে ব'সে এই সমস্ত কাহিনীর পরিশিষ্ট হিসেবে, গৌরব-রাগ-রঞ্জিত মুখমণ্ডল নিয়ে গল্প জুড়ে দেয়, কি ক'রে একজন মহারাজাকে নিয়ে কিরকম 'ফূর্তির জ্বালাতন' ভোগ করতে হয়েছিল তাদের, নেটিভ মা'রাজা একাদিক্রমে তিরিশ বছর ধরে তাদের এই আনন্দবর্ধক সমিতির সভ্য হলেও তিনি বলে বৈদিক মন্ত্র আওড়াতেন ঠিকই; তাঁর লাল পাথরের মর্মর-মেঝে সম্বলিত রাজপ্রাসাদের দরজা-জানালা ও আসবাবে মনোরম সূক্ষ্ম কার্য থাকলেও স্নানাগারের জলাধারগুলো বলে সব "শাঙ্কের"ই তৈরি; আর কোন্ একজন নবাব সাহেব বলে হঠাৎ একসময়ে গণতান্ত্রিক মনভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন; তিনি তাঁর পরামর্শদাতাদের মন্ত্রণা-গৃহে এক ওলন্দাজ স্থপতির সাহায্যে আধুনিক নয়নাভিরাম নরম চেয়ার ও কাঠের দেয়াল-আবরণ দিয়ে সাজিয়ে ফেলেছিলেন, তারপর জলরঙা করেছিলেন জে.সি. ডোল-ম্যানকে দিয়ে এবং সেই মন্ত্রণাকক্ষে শিল্পী দ্য-লাজোকে দিয়ে নিজের একখানা তৈল-চিত্র আঁকিয়ে প্রাচীর গাত্রে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এই রাজা-নবাববাহাদুরদের মধ্যে যাঁরা আবার মানবদ্বেষী তাঁরা কিন্তু অনেক শক্ত, অনেক রূঢ়। যেমন হিজ হাইনেস আগা খান গলাবাজী ক'রে বলে বলতেন: 'মদ আর ডাণ্ডাগুলি খেলে তো বাপু আর ভগবান সাজা যায় না?' কিন্তু চন্দ্রসূর্যের বংশাবতংশরূপে প্রকীর্তিত এই সমস্ত রাজা-মহারাজাদের যেরূপ সুন্দর ও সুঠাম দৈহিক সৌন্দর্য এবং তাঁদের মহারানীদের যে অতুলনীয় স্বর্গীয় রূপ লাবণ্যের বিবরণী প্রচার করা হয়ে থাকে, তা অবশ্য খুব অল্প লোকই বিশ্বাস করে। এই সব কথা সত্য হোক আর নাই হোক, বৃটিশ সরকার কর্তৃক ফাঁপানো এই সব

রাজা-মহারাজাদের মান-মর্যাদা কিন্তু এখন ক্রমেই হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে।

তা সত্ত্বেও উত্তর না পেলেও যারা প্রশ্ন করতেই অভ্যস্ত সেই সব বেহায়া লোকই হয়তো প্রশ্ন ক'রে বসবে: "এই সমস্ত স্বৈরাচারী শাসকদের পক্ষে একটি কথাও কি সত্যিই বলবার মতো নেই?" "ওঁরা কি রুসোর প্রাকৃতিক মানুষ ভূমি-কর্ষকদের চেয়েও ভাব-ভঙ্গির দিক থেকে আরো বেশী আভিজাত্যের অহমিকাপূর্ণ?" অথবা, "ওঁরা কি সব দস্যু-তস্করের দল যাঁরা রাজা সেজে বসেছেন?" রোমান্স-সমুদ্রের ডুবুরী এই সব রাজারা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোন নীতিরই ধার ধারেন না: দিনের বেলায় এঁরা ঘুমোন আর নিশিভর শুধু ফূর্তি লোটেন, হোটেলের বাটলারদের মোটা বকশিশ দেন কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সব প্রজারা শস্য উৎপাদন করে, তাদের কঠোর ভাবে নিপীড়ন ক'রে খাজনা ও ট্যাক্স আদায় করেন। এঁরা কি সত্যিই এত পবিত্র যে এদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তোলা চলে না? ছোট বড় ৫৬২টি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে ভারতের এক-তৃতীয়াংশ তো এঁরা দখল ক'রে বসে আছেন, পুরুষানুক্রমে চলেছে এঁদের কুশাসন। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আত্ম-পূজারী বৃটেন কি ক'রে এবং কোন্ প্রয়োজনে ক্ষুদে রাজতন্ত্রের এই অবশিষ্টাংশগুলোকে বরদাস্ত করে? বর্তমান যুগ হলো সাধারণ মানুষের যুগ—এই জনগণের যুগে যথেচ্ছাচারী রাজারা, এমনকি যাঁরা গণতন্ত্রী হওয়ার ভান করেন, তাঁরা পর্যন্ত প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারেন কি? আমূল সংস্কারপন্থীরা জোর গলাতেই হেঁকে বলছেন: এই সমস্ত সেকেলে ও ঘুনধরা যথেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে সাম্রাজ্যবাদী সরকার, এঁদের কুশাসনের দায়িত্ব তাদেরই।

দেশ-শাসকরা অবশ্য কতকগুলো ধরা-বাঁধা অন্তঃসারশূন্য পূর্ব-প্রস্তুত

যুক্তিজাল বিস্তার ক'রে বসবে। তারা বলবে: বড়লাটের সঙ্গে দেশীয় রাজাদের সম্পর্ক এক চির-আচরিত প্রথা এবং সন্ধি চুক্তির ওপর নির্ভরশীল। বড়লাটকে এঁদের জন্য রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়েই থাকতে হয়। আজকাল দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসন-ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, আজকাল অনেক সুশাসকেরও সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা নিজের দায়িত্ব ও মর্যাদা বেশ বোঝেন। আর বেশী বেয়াড়ামি করলে, গদিচ্যুত করবার মহৌষধ তো সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বৃটিশরাজের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে। তবে এই অধিকারটি কালেভদ্রে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে, ভারত সচিবের সঙ্গে রীতিমত আলোচনা ক'রে তবেই প্রয়োগ করা হয়।

কিন্তু এই সব দেশীয় রাজাদের সব কিছু খাম-খেয়ালী ও অসদাচার যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন ভারতীয় প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুনই যে এরকম ঘটে, এই জাতীয় যুক্তি ইংরেজরা দেখায়।

আর শেষপর্যন্ত বৃটিশ যখন তার আর্য-ভাইদের হাতে ভারত-সরকারের শাসনদণ্ড ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো, তখন তাদের অত্যন্ত আদরের দেশীয় রাজাদের ভারত-ইউনিয়নে যোগ দেওয়া বা না-দেওয়ার ইচ্ছামত অধিকারও দিয়ে গেল।

সময়ের ঘূর্ণাবর্ত কিন্তু আশ্চর্য রকমের প্রতিশোধ গ্রহণ করল। এক কর্কশ প্রকৃতির গুজরাটি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী, নিজেকে যিনি ভারতের বিসমার্ক বলে মনে করেন, শীঘ্রই রাজা-মহারাজাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক হিসেবে দিল্লীর মসনদে চেপে বসলেন। বিপুল ব্যক্তিগত তহবিল ও বড় বড় পদের প্রলোভন দেখিয়ে এই ভারতীয় বিসমার্ক রাজা-মহারাজাদের ভারত-ইউনিয়নে যোগদানে প্রলুব্ধ করতে শুরু করলেন।

সর্দার বল্লভভাই (বিসমার্ক) প্যাটেল দিল্লীর রঙ্গমঞ্চে আরোহন ক'রেই দুই তিনবার ক্রোধোন্মত্ত ষণ্ডের মতো গর্জন ছাড়লেন। আর সেই

হুঙ্কারে সূর্য-চন্দ্রের অধিকাংশ বংশধরই নিতান্ত মাটির সন্তান হিসেবে লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অনুরক্ত অধীন জীব হিসেবে তাঁরা বৃটিশের সেবা করেছেন, কিন্তু আজ আবার মাথার ওপর নতুন নক্ষত্র ও ধূমকেতু গজাতে দেখে তাঁরা এখন ঐ সবেরই বশংবদ হিসেবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নতুন যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার প্রলোভন তাঁদের দেখানো হলো, তাতে তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্য অনেকাংশে রক্ষিত হবে মনে ক'রে নতুন শক্তি সমাবেশে লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন; মনে আশা, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যের প্রজারা তাঁদেরকে গদিচ্যুত করতে না পারছে ততক্ষণ প্যাটেলের ছায়াতলে মনের সুখেই নিজেদের খুশীমত জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে তাঁরা পারবেন। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও হলো। শুধু আমাদের ছোট শ্যামপুরের মহারাজাই নন, বড় বড় রাজবংশ-সম্ভূত কয়েকজন উদ্ধত প্রকৃতির রাজাও এই নতুন ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী হলেন না।

উদাহরণ হিসেবে বৃটিশ আমলের "নরেন্দ্র মণ্ডলের" চ্যান্সেলার ভূপালের নবাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মুসলিম নবাব, নবগঠিত ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতির দরুন খাঁচায় আবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় বছর খানেক ধরে ভারতীয় বিসমার্কের বিরুদ্ধাচরণ করলেন।

কিন্তু ভূপালের চেয়েও শক্তিশালী ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাঁর প্রধান মন্ত্রী স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ারের মারফত বললেন যে, ভগবান পদ্মনাভ ছাড়া অন্য কারুর নিকট মাথা তিনি নোয়াবেন না, পৃথিবীতে তিনি হচ্ছেন তাঁরই প্রতিনিধি, কাজেই তিনি, ভগবান পদ্মনাভকে বাদ দিয়ে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে নেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। স্যার সি.পি. একদিকে প্রাচীন ভারতীয় কৌটিল্য আর ম্যাকেয়াভেলির 'দি প্রিন্স' থেকে জ্ঞানগর্ভ উক্তি

উদ্ধৃত করেন এবং তাঁর বক্তব্য আরো বেশী জোরালো করার জন্য বলেন যে, ত্রিবাঙ্কুর কোনদিনই কারুর দ্বারা বিজিত হয় নি। কেউ কেউ অবশ্য এর উত্তরে যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, ত্রিবাঙ্কুর কারুর দ্বারা বিজিত না হ'লেও, এই রাজ্যকে এত বেশী নতি স্বীকার করতে হয়েছে যে, আড়াইশো টাকার বেশী মাইনের চাকুরিগুলোর নিয়োগ করার সময়ও বৃটিশ পলিটিক্যাল রেসিডেন্টের মঞ্জুরি নিতে হয়। কংগ্রেসের ঝাঁঝাল গোষ্ঠী এবং ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটস পিপলস্ কংগ্রেস স্যার সি. পি.-র বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান। আর কম্যুনিষ্টরা ত্রিবাঙ্কুর সৈন্য-বাহিনী ও পুলিস বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালান। স্যার সি. পি. হাজার হাজার লোককে গুলি ক'রে হত্যা করেন। এই শহীদদের এক আত্মীয়ের হাতে স্যার সি. পি. প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। বেগতিক দেখে শেষ পর্যন্ত চাকুরি ছেড়ে তিনি সরে পড়েন। বছর দুই পর একমাত্র পদ্মনাভের পূজারী ত্রিবাঙ্কুর মহারাজাকে খুশী করা হয় ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের আইনে একটি নতুন ধারা সংযোজিত ক'রে। এই ধারা বলে, কতকগুলো সম্পত্তির ওপর ভগবান পদ্মনাভের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকার মেনে নেওয়া হলো এবং তখন মহারাজা ভারত-ভুক্তির দলিলের ডট্-দেওয়া লাইনের ওপর নাম স্বাক্ষর করলেন।

মধ্য ভারতেও ইন্দোরের মহারাজা হোলকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করেছিলেন। বৃটিশের আমলে একবার ইনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং নিয়মানুগ বিরোধী হাব-ভাবের জন্য বড়লাটের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট তাঁকে প্রায় গদিচ্যুত করতে চেয়েছিল। এঁর পিতৃদেবকেও গদিচ্যুত হতে হয়েছিল, কারণ তিনি মমতাজ বেগম বাঈজীর প্রণয়ী বাওলাকে গুণ্ডা লাগিয়ে হত্যা করিয়েছিলেন।[১]

১ বাওলা হত্যার বিবরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পড়তে পারেন "বিচার কাহিনী" নামক গ্রন্থে।—অনুবাদক।

তরুণ হোলকারের সঙ্গে আমাদের হিজ হাইনেসের হাব-ভাবের মিল রয়েছে, তবে হোলকারের দরবারে যেরকম চাটুকারের আবির্ভাব হয়েছিল, আমাদের মহারাজার চারধারে অতটা ছিল না। এই চাটুকাররাই রাজনীতির নতুন ভাষ্যের সৃষ্টি ক'রে হোলকারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়েছিল।

দেশীয় রাজাদের মধ্যে ধনীক শ্রেষ্ঠ দুইজন, মহামহিমান্বিত হিজ এক্সল্টেড হাইনেস মীর স্যার ওসমান আলী খান, হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর এবং কাশ্মীরের মহারাজা স্যার হরি সিং। এঁরাও এই না-মানাদের মধ্যে আছেন।

দিল্লীর মোগল সম্রাটদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পর থেকে নিজাম বংশ বৃটিশের বিশ্বস্ত মিত্ররাজ্য হয়ে আছে। নিজাম ছিলেন দাক্ষিণাত্যে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি। আয়তনে প্রায় ফ্রান্সের সমান হলো নিজামের রাজ্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন নিজাম। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সাহায্যের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে লর্ড ওয়েলেসলি নিজামকে তাঁর রাজ্য থেকে বেদখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি উত্তর-সরকার, কর্ণাটক ও বেল্লারি জেলা নিজামের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন, রাজ্যের পররাষ্ট্র নীতিও এখন থেকে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এলেন এবং নিজামের ব্যায়ে হায়দারাবাদে বৃটিশ ফৌজ মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করলেন। বকেয়া কঁর বাবদ জামিন হিসেবে কম্পানি নিজাম রাজ্যের শস্যভাণ্ডার বিদর্ভও নিজেদের অধীনে নিয়ে নিলেন। তারপর অর্ধশতাব্দী পর, লর্ড কার্জন বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা খাজনায় বৃটিশ সরকারকে বিদর্ভের স্থায়ী ইজারা দানে নিজামকে বাধ্য করলেন। কুড়ি বছর পর, নিজাম বৃটিশ সরকারের এই বিদর্ভ বা বেরার ছিনিয়ে নেওয়ার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু

তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রেডিং সঙ্গে সঙ্গে এই দাবী নাকচ ক'রে দেন এবং সার্বভৌম বৃটিশ রাজের কাছে তাঁর পরাধীন অবস্থাটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই হায়দারাবাদে একটি স্থায়ী সৈন্যাবাস স্থাপন করেন। বৃটিশের ভারত ত্যাগের পর নিজাম নিজেকে আবার স্বাধীন বলে দাবী করেন এবং ভারত-ইউনিয়নকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে রাজাকর বাহিনী নামে এক বেসরকারী "ফ্যাসিষ্ট বাহিনী" গঠনে সাহায্য করেন। এই পরিস্থিতিতে গভীর আলোচনার পর পণ্ডিত নেহরু ভারত-ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীকে নিজাম-রাজ্যে প্রবেশ করবার আদেশ দেন।

একইভাবে কাশ্মীরে মহারাজা হরি সিংও তাঁর প্রধান মন্ত্রী, জনপ্রিয় নেতা শেখ আবদুল্লাকে, যিনি মহারাজার বিরুদ্ধে "কাশ্মীর ছাড়" ধ্বনি তুলে আন্দোলন করেছিলেন, তাঁকে জেলে বন্দী ক'রে রাখেন। কিন্তু এখানে, ভারত-ইউনিয়ন কোন কিছু করবার আগেই, সীমান্তের উপজাতীয়রা কাশ্মীর উপত্যকা আক্রমণ করল। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট প্রথমে অজ্ঞতার ভান করেন, তারপর নিয়মিত পাকিস্তানী ফৌজ দিয়ে এই উপজাতীয় হামলাদারদের সাহায্য করেন। ভারত-ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হামলাদারদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কারণ শেষ মুহূর্তে মহারাজা ভারত-ইউনিয়নে যোগ দেওয়ায় ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরকে সাহায্য করার জন্য ছুটে যায়। ভাগ্যের পরিহাস সচরাচর যেভাবে ঘটে থাকে, সেইভাবে এখানেও জনপ্রিয় নেতা শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের নতুন প্রধান মন্ত্রী হয়ে এখন রাজ্যের প্রধান নায়কের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হলেন। অদৃষ্টের ফেরে মহারাজা এখন জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিল্লীর ষ্টেট-ডিপার্টমেণ্টের কৃপায় সাক্ষী-গোপাল রাজার ভূমিকায় থেকে গেলেন তবে তাঁর এই রাজা থাকা খুব বেশী দিনের জন্য হলো না, কারণ পরবর্তীকালে কাশ্মীর সরকার এই রাজতন্ত্রেরই অবসান ঘটিয়ে দিল।

এই একই কাহিনীর প্রায় পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আরও কয়েকটি রাজ্যে। কাল-দেবতা ইতিপূর্বেই দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে রাজা-মহারাজাদের স্বর্গীয় অধিকারের ধ্যান-ধারণা এখন অতীতের জিনিস। আর সর্দার প্যাটেল যদিও মহাত্মা গান্ধীর রাম-রাজত্বের মতবাদে ছিলেন বিশ্বাসী, (যে-মতবাদ অনুযায়ী সিংহ ও মেষ-শাবকের এক সঙ্গে একই শয্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দিবানিদ্রা উপভোগ করা সম্ভব, অথবা আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে, রাজা-প্রজার পাশাপাশি বসবাস সম্ভব)—তা সত্ত্বেও এই গান্ধী-শিষ্য কিন্তু "সার্বভৌম ক্ষমতাই সর্বাধি-নায়ক"—ভারতে বৃটিশ মধ্যবৃত্তশ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত সার্বভৌম ক্ষমতার এই অম্লান মতবাদটিও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। কারণ, তিনি হলেন বৃটিশ বুর্জোয়ার বৈধ উত্তরাধিকারী, ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিরোমণি আর সেইজন্য দেশীয় রাজা-মহারাজাদের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচালক, তাঁদের দেবতা, তাঁদের স্রষ্টা, তাঁদের রক্ষাকর্তা, (এবং যা তিনি নিজেও জানতেন না,) তাদের ধ্বংসকর্তাও বটে! তিনি তো তাঁর অনুসৃত নীতির দ্বারা জন-সাধারণের মনে তাঁর আশ্রয়াধীন দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে বিরোধীতার ভাব জাগ্রত করেছিলেন, যার পরিণতি স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে রাজা-মহারাজাদের ভগবৎদত্ত অধিকারের ধ্বংসের মধ্য দিয়েই।

এইভাবে পুরাতনকে স্থানচ্যুত ক'রে এক নতুন যুগেরই সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশ সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি এখন অতীতের বিষয়-বস্তুতে পরিণত, আর সমস্ত দেশীয় নৃপতিদের দিল্লীর বুর্জোয়াজাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্টের সার্বভৌম প্রভুত্ব মেনে নিতে হয়েছে, প্রজামণ্ডলের নেতাদের ওপর তাঁদের রাজ্য শাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিজেদের টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, স্বার্থ নিজেদের হাতে রাখার অধিকার লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, নতুন ব্যবস্থায় রাজাদের মর্যাদা ও শক্তিও বেশ বেড়ে গিয়েছে,

কারণ, বিলিতি সম্মান "ফয়জন্দ-ই-খান-ই-দৌলৎ-ই-ইংলিসিয়া" (গ্রেট বৃটেনের সরকার বাহাদুরের বিশেষ সন্তান!) পদবীর স্থানে নতুন সম্মান বর্ষণ শুরু হয়েছে, প্রাচীন হিন্দু উপাধিগুলো টেনে তুলে এনে এখন "রাজপ্রমুখ" এবং "উপ-রাজপ্রমুখ" প্রভৃতি উপাধি দ্বারা তাঁদের ভূষিত করা হচ্ছে। আর পুঁজীবাদী শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বিক্রয়-যোগ্য-মজুতমাল "গণতন্ত্র", "স্বাধীনতা" ও "দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট" প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর কথার অলঙ্কার মালার আড়ালেই এইসব পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বিভিন্ন-প্রজামণ্ডলের অত্যুৎসাহী "নিঃস্বার্থপর" "অহিংস" ও "সত্যপ্রিয়" কর্মীরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, এতদিন ধরে তারা যে বিরাট স্বার্থত্যাগ ক'রে এসেছে, আজ ক্ষমতা পেয়ে শুধু "আত্ম" স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তারাই অতিমাত্রায় যত্নশীল হয়ে উঠেছে। এরা এখন প্রকাশ্যেই দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে: এমন নির্লজ্জভাবে স্বজন-প্রীতির পরিচয় দিচ্ছে, এমন ভাবে টাকা পয়সা-আত্মসাৎ এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে গুলি চালিয়ে সমস্ত বিরোধী শক্তির শ্বাসরোধ করছে যে, এদের এইসব কার্যকলাপের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট চোখে হা হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। ইতিমধ্যে সৎবুদ্ধি ও শুভেচ্ছা প্রণোদিত মানুষ যাঁরা, তাঁরা একটি প্রাচীন উক্তি থেকে মাত্র এইটুকু সান্ত্বনা লাভই করতে পারবেন যে, "যে-দুঃশাসনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে, দেশ শাসকদের সমগ্র পরিবার, মহিমা ও ধন-প্রাণ ভস্মস্তূপে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সেই ধূমায়িত অসন্তোষ কখনই স্তব্ধ হবে না।"

সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হলো আমাদের। আর তাতে যে বিরক্তিকর আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে কাটিয়ে তোলবার জন্য ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং হিজ

হাইনেসকে বলল : 'সন্ধ্যের দিকে একটু গান-বাজনা শুনলে কেমন হয় মহারাজ!' মুন্সীজীর সামনে প্রস্তাবটা উত্থাপন করতে হলো ব'লে বে-পরোয়া পিয়ারা সিংকেও কথাটা বলতে হলো বেশ একটু ঘুরিয়ে। আসলে পিয়ারা সিং বলতে চেয়েছিল, কোন দেহ-পশারিণীর ঘরে গিয়ে একটা রাত একটু স্ফূর্তিতে কাটিয়ে আসা যাক্! লক্ষ্য করলাম, টুলীপ সাধারণতঃ এইসব ব্যাপারে যেরকম আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন, এখন কিন্তু সেরকম দেখালেন না। কারণ, গঙ্গীদাসী তাঁর সারাটা মন জুড়ে রয়েছে। তা ছাড়া সর্দার প্যাটেলের হাতে তাঁর ভাগ্যের কি পরিণতি হয়, সে-সম্বন্ধেও তাঁর মনে রীতিমত ভীতি আর সন্দেহ বাসা বেঁধে আছে। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন যে, শ্যামপুরে যে-ক্ষমতার খেলা তাঁরা দেখিয়ে আসছিলেন পুরুষানুক্রমে, তার মমতা কাটিয়ে তাঁকে ভারত-ভুক্তির সনদে সই করতেই হবে। তাই কয়েকদিন ধরে পিয়ারা সিং-এর বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও এইসব স্ফূর্তির প্রস্তাবে তিনি কান দিতে পারছিলেন না। তারপর একরাতে খাওয়া-দাওয়ার শেষে প্রচুর মদ্য পানের পর পিয়ারা সিং যখন বলল যে, সে এবং মুন্সীজী গিয়ে আমাদের জন্য এক 'মুজরা'র ব্যবস্থা ক'রে এসেছে তখন হিজ হাইনেস বললেন : 'যদি যেতেই হয়, তবে মুন্সীজীকে "ইম্পীরিয়াল"-এর বারাণ্ডায় রেখে তাঁরা কেটে পড়বেন।' এবং সেই ভাবেই এক রাতে আমরা পুরোনো দিল্লীতে সরে পড়লাম।

'আমরা কি বাব্বুজানের কাছে যাচ্ছি?' টুলীপ জিজ্ঞেস করলেন পিয়ারা সিংকে।

'হাইনেস, দাঙ্গা আর দেশ-বিভাগের পর দিল্লীতে আর-একজন মুসলমান বাঈজীও নেই; আর বাব্বাজান তো চলে গেছে লাহোরে। তবে হ্যাঁ, আমি যে একটি হিন্দু মেয়ে খুঁজে বের করেছি না—নাম তার লক্ষ্মী—একেবারে দেবী প্রতিমা—গলাখানা যেন বুলবুল!'

নোঙরা বাজারের পিছন দিয়ে জ্বালানীর ধোঁয়ায় ক্লান্ত লোকের খক্-খক্ কাশি আর ঘেও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের মধ্য দিয়ে পিয়ারা সিং-এর নির্দেশে ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। অবশেষে আমরা ঘড়ি-ঘর ছাড়িয়ে চাঁদনি চকের উত্তর প্রান্তে এসে পৌঁছলাম।

তারপর একটা অন্ধকার গলিতে গাড়ি থেকে নেমে সরু সিঁড়ি বেয়ে আমরা কুখ্যাত এক বাড়ির দোতলায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

পিয়ারা সিং দরজায় টোকা দিতেই মাঝবয়সী জনৈকা স্ত্রীলোক বেশ কায়দা ক'রে দোপাট্টা দিয়ে তার পক্ককেশ ঢেকে বেরিয়ে এল।

'আসুন, আসুন সর্দারজী, সত্যি আপনি এসেছেন বলে কি আনন্দই না হচ্ছে!' একটা শুকনো হাসির মধ্য দিয়ে অদ্ভুত একটা কাম-ভাবাপন্ন নিম্নোষ্ঠের সঙ্গে তার সুন্দর প্রশস্ত মুখখানা ভেসে উঠলো। 'মনে করেছিলাম আপনি বোধহয় আর এলেন না···হ্যাঁ, উনিই তো মহারাজা সাহেব?···আসুন, আসুন, সরকার সাহেব, আমার ঘরে পা দিয়ে আমাদের ভাগ্যবতী ক'রে দিন! আর সেই মোটা মুন্সীজী কোথায়—সেই যে তিনি তিনরোজ আগে আপনার সঙ্গে এসেছিলেন?'

একটা জীর্ণ কক্ষে আমাদের নিয়ে এল, মেঝের ফরাস মলিন চাদরে ঢাকা। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে পিয়ারা সিং জিজ্ঞেস করল: 'লক্ষ্মী কোথায়?' মুন্সাজী সম্বন্ধে প্রায়-বিগত-যৌবনা স্ত্রীলোকটি যে কৌতূহল প্রকাশ করল, সে সম্বন্ধে পিয়ারা সিং বিশেষ আমল দিল না, কারণ সেই অতি শুদ্ধাচারী ভদ্রলোকটি যে এখানে এসেছিলেন, হিজ হাইনেস তা জানুন, পিয়ারা সিংও ঠিক তা চায় না।

'লক্ষ্মী শুয়ে পড়েছে। তবলচী ও ওস্তাদ দুর্গাদাসও তাই। এক আমি আছি জেগে আপনাদের পথ চেয়ে। আচ্ছা, আমি ডেকে তুলে দিচ্ছি ওদের সবাইকে। আসুন আসুন, মহারাজা, বসুন!'

আমরা সলজ্জভাবে ফরাসের ওপরে বসে পড়লাম। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরনে ছিল আঁটসাট পায়জামা ও আচকান। ওগুলো পরে অনেকটা সহজে বসা যায়। তাকিয়ে দেখলাম, টুলীপ অনেকটা সহজভাবে দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে পড়েছেন।

'সত্যি কি মেয়েটা ভালো গান গায়, না, এমনি সখের গাইয়ে?' টুলীপ পিয়ারা সিংকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হুজুর, সেদিন আমি এসে সে-সব ঠিক-ঠাক পরখ ক'রে দেখে গিয়েছি—'

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, বাঈজীর ঘরের পরিচিত জিনিসপত্র —হুকো, পানের ডিবে, তবলা ও হারমোনিয়াম—সব চারদিকে ছড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সামনের দেয়ালে টাঙানো রয়েছে অতি পরিচিত এক লাস্যময়ী জাপানী নর্তকীর ছবি সম্বলিত ক্যালেণ্ডার···নর্তকীর পরনে কিমোনো, হাতে ছোট্ট পাখা, সুস্মিতা তরুণী। ঘরখানিতে আসবাবের বেশ অভাব। এ যেন সেক্সপীয়রের ভাষায় একটি রঙ্গ-মঞ্চ···এখানে কত লোক আসে এবং তারা যে-যার ভূমিকা অভিনয় ক'রে চলে যায়।

গায়িকা ও তার সাকরেদদের প্রতীক্ষায় বসে বসে মনে হলো টুলীপ যেন ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে উঠছেন। তিনি যেন কোন্ এক স্মৃতির অতলে ডুবে গেছেন—তাঁর অতীত জীবনের অভ্যাস···নতুন নতুন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে আনন্দ উপভোগ করবার স্পৃহা···তেমনটি যেন আর নেই।

আমি ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞেস করলাম: 'এখনো কি অন্তর্দর্শন চলছে টুলীপ?

কতকটা ভাঁওতা দেবার জন্যে আর কতকটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার পিয়ারা সিংএর কাছে আড়াল করবার উদ্দেশ্যে টুলীপ বললেন:

'আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন এক অন্ধকারের মধ্যে নেমে এসেছি—চারদিকে কিছুই দেখা যায় না, কেবল সেই আলো—যা ও জেলেছিল আমার জীবনে—! তুমি জানো প্রথম যেদিন আমি ওকে পেয়েছিলাম, আমি অন্তর দিয়ে চেয়েছিলাম ও যেন চিরদিন আমার কাছে থাকে, গোটা দুনিয়া মুছে যাক্, চেয়েছিলাম যেন চিরস্থায়ী হয় আমাদের সে-মিলন। কামনার উচ্ছ্বাস নিয়ে সেই সোনার মেয়ে যখন আমার জীবনে এসেছিল, আমি চেয়েছিলাম আজীবন কাটিয়ে দেব ওকে নিয়েই। কিন্তু তবুও মনে ভয় ছিল, হয়তো আমার এ সুখ টিকবে না। সেই মুহূর্তটির কথা যখন মনে পড়ে, তখন আমি সেই সুখ স্মৃতির পিঞ্জরে আটকে যাই। তখন চারধারে যে আর কিছু আছে তার কোন খেয়ালই আমার থাকে না…।'

মহারাজা যে তাকে তাঁর আস্থার মধ্যে নিয়েছেন তাতেই পিয়ারা সিং পুলকিত হয়ে উঠল এবং এ অবস্থায় হিজ হাইনেসকে কি ক'রে অন্যমনস্ক করতে হয় তার কতকগুলো ফন্দি-ফিকিরও তার জানা ছিল।

সে বলল : 'দেখবেন হুজুর, লক্ষ্মীবাঈ কি সুন্দর!'

কিন্তু টুলীপ তখন তাঁর অতীত স্মৃতিতেই তন্ময় হয়ে আছেন।

'তুমি তো জানো, ডাক্তার, গঙ্গী কেমন মেয়ে। আমার আলিঙ্গনে ধরা দেবার আগে ইচ্ছে ক'রে কতোই না লুকোচুরি খেলত, সলজ্জ ভাবে মুখখানা সরিয়ে নিত আমার চুম্বন এড়াবার জন্যে। এমনি করেই ও টেনে নিত আমাকে ওর দিকে।— বিশ্বাস করেছিলাম আমি এমনদিন আসবে আমাদের জীবনে, যখন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মতো আমাদের প্রেমও চিরন্তন হয়ে থাকবে।'

'কে জানে সে-প্রেম চিরন্তন হয়ে থাকতো কি না! যাই হোক, রাধা-কৃষ্ণের কিন্তু বিরহ ও মিলন দুই-ই ছিল।' আমি সান্ত্বনা দিলাম।

ক্ষুণ্ণ টুলীপ বলেন : 'কিন্তু সত্যিই গঙ্গী অদ্ভুত মেয়ে!'

'একটা সাপ বিশেষ।' পিয়ারা সিং মন্তব্য করে।

টুলীপ এবার তাঁর দেহ-রক্ষীর কথায় চটলেন না। এসব ব্যাপারে পিয়ারা সিং-এর মতামতের তিনি কোন মূল্যই দেন না। পিয়ারা সিং-এর সামনে যতটুকু তিনি বলতে চেয়েছিলেন, তা থেকে বেশীই বলে ফেলেছেন, তাই এখন সতর্ক হয়ে গেলেন টুলীপ, নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন।

ক্ষণকাল পরে, সেই মাঝ-বয়সী স্ত্রীলোকটি সদলবলে লক্ষ্মীসহ উপস্থিত হলো। তারা সবাই একসঙ্গে হিজ হাইনেস্‌কে অভিবাদন জানাল। এরা বনেদী বাঈজীদের আদব-কায়দা জানে না। কারণ এদের দেখে বেশ বোঝা যায়, এরা উদ্বাস্তু, এ লাইনে নবাগতা।

মাঝ-বয়সী স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এসে বলল: 'মহারাজ, আমার নাম রুক্মিণী, আর এ মেয়েটির নাম লক্ষ্মী।' মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে বলে: 'মহারাজের কাছে কোনও লজ্জা নেই রে ছুঁড়ি···এতদূরের পথ ভেঙে তিনি তোকে দেখতে এসেছেন—!'

ওস্তাদ দুর্গাদাস বলে: 'লক্ষ্মী বেশ ভালো মেয়ে, মহারাজা। বসো, বসো, মহারাজের পাশে বসো। আমি তবলাটা বেঁধে নিচ্ছি, ততক্ষণে তুমি ওঁকে গরম ক'রে রাখ!'

লক্ষ্মীর নরম মুখখানা নীচে ঝুঁকে পড়েছে। শ্যামা মেয়েটির নাকটি টিকোল, যেন বাটালী দিয়ে খোদাই করা, সুন্দর বাদামী রঙের ছোঁয়া লাগানো ডাগর চোঁখ, সুগঠিত চিবুক। মনে গেঁথে থাকার মতো। চাঁদের আলোয় সন্ধ্যা যেমন ঝল্‌মলিয়ে ওঠে, মানুষের মন নেয় টেনে, তেমনি সাদা ওড়নায় মুখ ঢাকা লক্ষ্মীর শ্যামলী মুখখানাও মুহূর্ত দর্শনেই মনটাকে টেনে নেয়।

রুক্মিণীর কথায় লক্ষ্মীকে একটু এগিয়ে যেতে হলো, তবে তখনও হিজ হাইনেসের নাগালের বাইরেই ভীত মেয়েটি বসে রইল।

চোখে একটা তীব্র ক্ষুধা নিয়ে টুলীপ শ্যামাঙ্গী মেয়েটির দিকে তাকালেন—কি বিপুল উত্তেজনা আর মাদকতা মেশানো সে-চাউনি!

হিজ হাইনেসের মনের বাসনা বেশ বুঝতে পেরেছে লক্ষ্মী। তবুও নির্বাক হয়েই বসে রইল সে, যেন বিক্ষুব্ধ এক সাগর-বুকের একখণ্ড দ্বীপে আটকে গিয়েছে সে। রুক্মিণীর দিকে মুখ তুলে তাকাল একবার, কিন্তু প্রতিহত হয়ে এল সে-দৃষ্টি, অসহায়, একাকিনী...

আদর মেশানো তিরস্কারের ভাষায় রুক্মিণী বলল: 'বেশ, এবার তাহলে গাইতে বোস!'

লক্ষ্মী নীরবে বাড়িউলির দিকে মাথা তুলে তাকাল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নীচের দিকে তার দৃষ্টি নেমে গেল।

'ওর ইচ্ছে না থাকলে ওকে জোর করো না। আগে আমাদের সঙ্গে ওর চেনা-পরিচয় হোক, পরে আপনিই কথা বলবে।' টুলীপ বললেন।

'দেখ, দেখ ছুঁড়ী তোর ওপর মহারাজার কেমন দয়া! আমি জানি, যেমন তাঁর দয়ার প্রাণ, তেমনি তাঁর দরাজ হাত।'

'সে সব পরে হবে'খন, আগে ওকে আরম্ভ করতে বলো।' পিয়ারা সিং রূঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে।

নৈরাশ্যে ভারী হয়ে ওঠলো লক্ষ্মীর মুখখানা, ঠোঁট দু'খানা একটু কেঁপে ওঠলো এবং কসাইয়ের সামনে অসহায় জীবের মতোই তাকে করুণ দেখাতে লাগলো।

'মহারাজ, এ-ভীরুতার জন্যে ওকে ক্ষমা করুন।' তবলচি দুর্গাদাস অনুরোধ করে টুলীপের দিকে তাকিয়ে।

মেয়েটিকে দেখবার পর থেকেই টুলীপের নিঃসঙ্গতা এবং বিচ্ছিন্ন-ভাব দূর হয়ে গেল। তাঁর মুখখানা মৃদু মৃদু কাঁপছে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে লক্ষ্মীর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বোলাতে বোলাতে

বললেন : 'ঘাবড়িওনা মেয়ে, আমি তো আর খেয়ে ফেলব না তোমাকে !'

একথা শুনে অশ্রুবিগলিত নয়নে মৃদু হেসে লক্ষ্মী তাঁর দিকে একটু তাকাল।

তবলায় চাটি মারতে মারতে সুর বাঁধছিল তবলচী, এবার সঙ্গীর দিকে একটু তাকিয়ে সে বলল : 'ওহে, শুরু করো।'

লক্ষ্মীর মাথা আবার নুয়ে পড়ে।

'তোর ওই কালো মুখখানা মহারাজকে দেখা না ছুঁড়ী!' রুক্মিণীর কণ্ঠে আদেশের সুর : 'উনি তোর ওপর কত সদয় !'

রুক্মিণীর রাগ দেখে লক্ষ্মী মুশড়ে পড়ে। পরমুহূর্তে তার তনু দেহখানা একবার নাড়িয়ে কিছুটা সাহস সঞ্চয় ক'রে একটা ক্ষীণ হাসি সে ফুটিয়ে তুললো তার ঠোঁটে, কিন্তু মেয়েটির চোখের নীচে অশ্রু, যেন হীরের দুল। কিন্তু এত ক'রেও, মুখ থেকে তার কথা ফোটে না। শুধু বার বার কেঁপে ওঠে তার অধর দু'টো ; বেশ বোঝা যায় নিজেকে সামলে নেবার কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করছে হতভাগিনী।

'এসো বিবি, আমাদের একটা গান শোনাও!' পাছে হিজ হাইনেস তার এই নীরবতার জন্য বিরক্ত হয়ে চলে যান, তাই পিয়ারা সিং লক্ষ্মীকে মিষ্টি কথায় ভোলাবার চেষ্টা ক'রে বলে।

'হ্যাঁ রে ছুঁড়ী, মহারাজাকে একটা গান শোনা না এবার!' রুক্মিণীর কণ্ঠে চাপা ক্রোধ, মুখের চেহারাটাও তার ক্রমশঃই কঠিন হতে থাকে।

'হ্যাঁ, একটা গান গাও দেখি মেয়ে।' টুলীপ বলেন। একটু উৎসাহ দেবার জন্যে এগিয়ে এসে আদর ক'রে মেয়েটির মাথায় মৃদু করাঘাত করেন।

সহজাত-প্রবৃত্তির ঝোঁকেই মেয়েটি মাথাটা সরিয়ে নেয়। কিন্তু

তক্ষুণি তার মনে হয়, তার এই বিরূপ আচরণে হিজ হাইনেস হয়তো অসন্তুষ্ট হতে পারেন। কপালের ওপর ওড়নাটা একটু টেনে দিয়ে মুখখানা একটুখানি এগিয়ে এই প্রথম সে একটু মৃদু হাসি হাসল; তারপর টুলীপের ওপর সলজ্জ অপাঙ্গ দৃষ্টি হেনে মোলায়েম পাঞ্জাবী ঢঙে বলল: 'চেষ্টা ক'রে দেখি, পারি কিনা। এইমাত্র খেয়েছি, তাই হাঁপ ধরেছে—'

'বেশ, বেশ, একটু বিশ্রাম ক'রে নাও।' টুলীপ পাঞ্জাবীতে বলেন।

এরপর এসে পড়ে ক্ষণিকের সেই বিশ্রী নিস্তব্ধতা, গায়ক গান আরম্ভ করবার পূর্বে যেমনটি হয়ে থাকে।

লক্ষ্মী তার গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নেয়, পাখীর মতো গুন্ গুন্ করে, একটু থেমে যায় একবার এবং তারপরই সেই জনপ্রিয় সিনেমা সঙ্গীতের প্রথম কলিটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠে:

'হৃদয় আমার ভেঙে যায়
ভেঙে যায় বারে বারে···'

গানটা যেন একটা অমঙ্গলের বার্তা বয়ে আনে। তবলার চাটি ও হারমোনিয়মের সুর ঐ অশুভ ভাবটাকে যেন আরও বাড়িয়ে তোলে। টুলীপের বর্তমান মানসিক অবস্থায় গানটা আবার অন্য দিক দিয়ে অর্থ বহন করে। অন্তরের গভীরতম তলদেশের আলোড়নেই যেন তিনি ধীরে ধীরে মাথা দোলাতে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিতে লক্ষ্মী যেন ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সম্পন্না এক ঋষি-কুমারী···যে-সাংঘাতিক বিপদ-ঝটিকা তাঁকে গ্রাস করতে ছুটে এসেছে, লক্ষ্মী যেন তা বুঝতে পেরেছে বলেই টুলীপের মনে হয়। মন্ত্র-মুগ্ধের মতো নিস্পন্দ হয়ে লক্ষ্মীর মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে থাকেন। তন্ময় হয়ে যান টুলীপ সে-কণ্ঠস্বরে।

'হৃদয় আমার ভেঙে যায়
ভেঙে যায় বারে বারে···'

গানের কলিটি পুনরাবৃত্তি করে লক্ষ্মী, তারপর গেয়ে যায় :

'সে-ভাঙা হৃদয়খানি
পড়ে থাকে পর পারে।
ভেঙে যায় বারে বারে।...'

গানের বিষয় বস্তুটা হিজ হাইনেসকে এমন গভীর ভাবে অভিভূত ক'রে ফেলে যে, তাঁর মুখখানা যেন দুঃখ-যন্ত্রণার এক ছাঁচের মধ্যে আটকে যায়। জীবন-কেন্দ্রের অত্যাসন্ন বিপর্যয়টাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকেন আর সেই সঙ্গে আপনা-আপনিই মাথাটা তাঁর দুলতে থাকে। আর অমার্জিত পিয়ারা সিং চেঁচিয়ে ওঠে : 'বাঃ বাঃ!' ব'লে। টুলীপ তার দিকে এমন কটমট ক'রে তাকান যে, বিরাট-বপু ক্যাপ্টেন শেষ পর্যন্ত শামুকের খোলসের মধ্যে আত্ম-গোপনের মতো নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে নেয়।

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।

লক্ষ্মীর গানের সুর আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ে এক হৃদয়ভাঙা ফোঁপানিতে। সে পারছে না তার চোখ দুটোকে অশ্রুরুদ্ধ রাখতে। বার বার জলে ভরে আসে। চেষ্টা করে সে তার সুরটি গলায় ধরে রাখতে, কিন্তু সুর যায় ছিঁড়ে।

দু'হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে হঠাৎ কিরাত-তাড়িত হরিণীর মতো তীরবেগে সে ছুটে চলে যায় পেছনের কক্ষে।

'লক্ষ্মী! লক্ষ্মী!' রুক্মিণী আকাশ-ফাটা কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে : 'বেহায়া মাগী, আয়, আয় ফিরে আয়!'

'হেই! ইধার আইয়ে!' দুর্গাদাসও চিৎকার ক'রে ওঠে।

'থাক, থাক, ওকে যেতে দাও—' আদেশের কণ্ঠে টুলীপ চেঁচিয়ে বলেন। লক্ষ্মী যে আর গান গাইতে পারবে না, তা যেন তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছেন, হতভাগিনীর জন্য সমবেদনায় তাঁর

মনটা ভরে ওঠে। অন্তরের গভীরে কোথায় যেন তাঁর পুরুষ-প্রকৃতিতে চাপা পড়ে আছে একটা মেয়েলী ভাব—যার ফলে মেয়েদের ওপর তাঁর এই অদ্ভুত দুর্বলতা। বলা যেতে পারে একটা সমবেদনা। অতীত জীবনের বহু পাপের কিছুটা ক্ষতিপূরণ করবার জন্য তিনি আন্তরিক ব্যথা অনুভব করতেন বলেই তাঁর এই সহানুভূতি, সমবেদনা। এই প্রায়শ্চিত্ত-বোধই তাঁকে যেন টেনে নিয়ে যায় মেয়েদের দিকে। হয়তো এরই জন্যে তাঁর অন্তরাত্মা গঙ্গীর সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে থাকতে চায়, কারণ গঙ্গীই তো টুলীপের চোখে মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল!

হঠাৎ মেজাজ দেখাবার পর নিজেকে সামলিয়ে নিলেও তিনি আসরের সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে নীরবে বসে থাকেন। আপাততঃ লক্ষ্মী যেন তাঁকে ভরিয়ে রেখেছে।

'আমাদের ক্ষমা করুন মহারাজা,' দুর্গাদাস বলে ওঠে: 'লক্ষ্মী ভালো ঘরের মেয়ে। ওর স্বামী ছিল এক হিন্দু—লাহোরের এক উকিল। ওকে মুসলমানরা নিয়ে যায়…যে-লোকটা ওকে চুরি ক'রেছিল, সে-ই শিয়ালকোটে লক্ষ্মীকে জোর ক'রে বিয়ে করে। তারপর শ্রীমতী সরাভাই ওকে উদ্ধার ক'রে জলন্ধরে ফিরিয়ে আনেন। লক্ষ্মীর উকিল স্বামী তখন সেখানেই ছিল। মুসলমানের ছোঁয়া লক্ষ্মীকে সে আর ফিরিয়ে নিতে রাজী হয় না। …রুক্মিণী একদিন তাকে দিল্লী ষ্টেসনে পেল, কুড়িয়েই পেল বলতে পারেন, ঘর নেই, ক্ষুধায় কাতর ক্ষীণাঙ্গিনী মেয়েটিকে এখানে নিয়ে এল রুক্মিণী।…'

'শূয়োরের বাচ্চা!' শুনতে শুনতে টুলীপ গর্জন ক'রে ওঠেন।

'এই মুসলমানরা কি সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব কাজই না করেছে!' দুর্গাদাস বলে।

'হ্যাঁ, মহারাজ, আমাকেও তারা কতো কষ্ট দিয়েছে, এমনাক

আমার সতীত্ব পর্যন্ত নষ্ট করেছে, বুড়ি আমি, আমারও…' রুক্মিণী বলে: 'যার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাকে এই বিশ্রী কাজে নামতে হয়েছে মহারাজ।'

সামনের এইসব অসার লোকগুলোর বিরুদ্ধে টুলীপের মুখখানা রাগে রাঙা হয়ে ওঠে। লোকগুলো সবাই তাঁর মনের ভাবটার বিকৃত অর্থই করেছে। আমি জানি, মুসলমানদের নয়, রুক্মিণীর উকিল স্বামীকেই টুলীপ গাল দিয়েছিলেন। মাথা নত ক'রে বসে থাকেন তিনি—নিরাশার অতল গহ্বরে ডুবে গেছেন যেন। হৃদয়ের তিক্ততাটাকে চিবিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যেই যেন তিনি দাঁত কড়মড় ক'রে ওঠেন। রাগে ক্রোধে অনুভূতির স্ফুরণে ফুঁসতে থাকেন টুলীপ।

এই ঘোরালো অবস্থায় কি যে ঘটবে, তা ঠাহর করতে না পেরে আমরা সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যেন বোবা হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তিনি কি সেখানকার প্রতিটি জিনিস সহ আমাদের পিষে ফেলবেন? অথবা শিকারী-তাড়িত বাঘের মতো গর্জন ক'রে উঠে আমাদের সকলকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলবেন? কি করবেন তিনি? আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, ক্ষণমুহূর্তের জন্য তাঁর হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিটি গঙ্গী থেকে লক্ষ্মীর ওপর স্থানান্তরিত হয়েছে, তারপর করুণারসে সমৃদ্ধ হয়ে ঐ অনুভূতিটাকে আবার তিনি তাঁর সেই রক্ষিতার দিকেই ফিরিয়ে এনেছেন। গঙ্গীকে টুলীপ ভালোবাসেন, তার নারীত্ব তাঁর কাছে যে ভীষণভাবে কাম্য; কিন্তু সে তো এখানে নেই। টুলীপের মন আকাঙ্ক্ষার দোলায় দোল খেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু গঙ্গী! গঙ্গী যে নেই এখানে! এখন নিতান্ত অসহায় অবস্থায়ই নির্বাক হয়ে বসে থাকেন তিনি।

তাঁর নির্দেশের প্রতীক্ষায় স্থির হয়েই আমরা বসে রইলাম।

'অপহৃতা হয়েছে এই অপরাধেই যে-স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তাকে আমি একশ' বার বলি শূয়োরের বাচ্ছা।' হঠাৎ চোখ ঝল্সানো ঝক্ঝকে কোষ-মুক্ত তরবারির মতো দীপ্ত চাউনি হেনে টুলীপ আকাশ-ফাটা কণ্ঠে বলে ওঠেন।

একটা কথা বলার সাহসও কারুর হয় না, শুধু দুর্গাদাসের ড্যাব-ডেবে চোখের মধ্যে একটা দ্বিধা-সংকোচ উঁকি মারে।

হঠাৎ এমন সময় দরজায় জোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা যায়।

যে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল, সে লাফিয়ে ওঠে।

'আগে লোকটাকে জেনে নিবি,' শঙ্কিত কণ্ঠে রুক্মিণী বলে: 'তারপর দুয়ার খুলিস।'

'কোন হ্যায়?' ছোক্‌রা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'মহারাজ সাহেব এখানে আছেন? আমি মুন্সী মিথনলাল... দুয়ার খোল।' ব্যস্ত মুন্সীজীর ছড়ির আঘাত পড়ে দরজার ওপর।

পিয়ারা সিং দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

'সর্দার প্যাটেলের সেক্রেটারীর কাছ থেকে এইমাত্র খবর এসেছে, মহারাজ—' হাঁপাতে হাঁপাতে মুন্সীজী বলেন। তাঁর চশমার কাচ দু'টো ঘামের ভাপে ঝাপসা হয়ে উঠেছে। 'ভোর পাঁচটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সর্দারজী সময় দিয়েছেন।'

টুলীপের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মুখখানাও তাঁর পাণ্ডুর হ'য়ে উঠেছে। তিনি বলেন: 'মুন্সীজী, সময়টা কি বললেন? ভোর পাঁচটা?'

'হ্যাঁ মহারাজ!' করুণ কণ্ঠে উত্তর দেন মুন্সীজী।

উত্তর শুনে টুলীপ উন্মাদের মতো কৃত্রিম অট্টহাসি হেসে ওঠেন, যা নির্বাক শ্রোতাদের কানে শূন্যগর্ভ খনখনে শুষ্ক হাসি বলেই মনে হয়।

'চলো!' হাত তুলে তিনি বলে ওঠেন। তারপর ঐ কক্ষের হতচেতন লোকগুলোর মধ্যে বিরাট একটা প্রস্তর মূর্তির মতোই উঠে দাঁড়ান। 'ওদের পাঁচশ টাকা দিয়ে দাও পিয়ারা সিং—' হুকুম দিয়ে প্রৌঢ়া বাঈজীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন: 'দেখো, এই টাকার তিনশটা কিন্তু লক্ষ্মীর জন্য! টাকাটা ওকে দিয়ে দিও। এই হলো আমার হুকুম!'

মুহূর্তের জন্য আশাহত অন্ধ দৃষ্টি দিয়ে টুলীপ কক্ষটার চারদিকে তাকিয়ে দেখেন। তারপর এগিয়ে যান দরজার দিকে।

আমারা তাঁকে অনুসরণ করি।

পৌনে পাঁচটার আগেই আমরা মোটরে চেপে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বাস-ভবনে পৌঁছিয়ে গেলাম। আঁধার রজনী তখন সবে ধূসর ঊষায় রূপান্তরিত হচ্ছে। কুয়াশাচ্ছন্ন গাছের পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত দীর্ঘ রাজপথ আর নিভৃত বাংলোগুলোর অনৈসর্গিক নীরবতার মধ্যে নির্জীব দিল্লী নগরী যেন আরও বেশি ভয়াবহ বলেই মনে হচ্ছিল। ভারতের শূন্যগর্ভ হৃদয়হীন রাজধানী থেকে যে সামান্য একটু জীবনের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছিল, তা রাস্তার ঐ ল্যাম্প-পোষ্টগুলোর মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ।

বাংলোর দ্বাররক্ষী প্রহরীর নির্দেশে আমাদের পথের ধারে গাড়ি থামাতে হলো। সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল পঞ্চাশ গজ দূরে এক ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে আমাদের অপেক্ষা করতে।

প্রহরীর নির্দেশ মেনে চলবার সময় আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছি এই সাক্ষাৎকারের অদ্ভুত সময় সম্বন্ধে। এই রাজনৈতিক বারোয়ারী-তলা সম্বন্ধে মনে মনে রাগ হলেও সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে কৌতুকও জাগে। আমার মনে হয়, মুখে বলার সাহস না থাকলেও আমাদের চিন্তাধারা

প্রায় এই ধরনেরই। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, দিল্লীতে এই দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করার জন্যে হিজ হাইনেস্ নিজেকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করেছেন, কিন্তু এখন এই ভাবে প্রত্যূষের আবছা অন্ধকারে ফটকের বাইরে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা যে আরও বেশী অপমানের! তিনি, মহারাজা দলীপ সিংজী, সূর্যবংশের রাজা, তাঁকে কি না ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে এক সাধারণ ঘরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে! হতে পারে কোন এক সৌভাগ্যের কল্যাণে লোকটা আজ ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী এবং দেশীয় রাজা-মহারাজাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক!

'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে!' একটুখানি কেঁপে উঠে অভিযোগের স্বরে টুলীপ বলেন।

'মহারাজ, আমার মাফলারটা নিন।' বশংবদ মুন্সীজী বলেন।

'না, না, বরং এস ডাক্তার একটু হাঁটি, তাহলেই শরীরটা গরম হবে।' গর্ব-আহত কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে স্বল্পভাষী টুলীপ বলেন।

ল্যাম্প-পোষ্ট পর্যন্ত এবং ল্যাম্প-পোষ্টটা ছাড়িয়ে যাওয়ার পরেও আমার মনে হলো, নতুন দিল্লীর এই আবছা অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হতে শুরু করেছে। চৌ-মাথার মোড়ে গোল বাগিচার ফুটন্ত-ফুলগুলোর রঙ চিনতে চেষ্টা ক'রে দেখি,—গোলাপী, নীল ও লাল ফুলগুলো আমি বেশ কষ্ট করেই চিনতে পারছি। বুঝতে পারলাম, নিদ্রাহীনতা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা এবং মনের ওপর অত্যধিক চাপের জন্য আমার নিজের মানসিক অবস্থাও বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। এবং তারই ফলে গোটা জগৎটাই আমার কাছে যেন আরও বেশি তমসাচ্ছন্ন ঠেকছে। আমাদের দুশ্চিন্তার পঙ্কিল জলাভূমিতে আমরা এতখানি ডুবে রয়েছি যে, বাইরের সব কিছুই যেন আমাদের কাছে আরও বেশি সঙ্কুচিত, নির্জীব এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হতে থাকে।

রাস্তার ধারে ধারে যে শিশির-সিক্ত দূর্বা পড়ে আছে, তারই ওপর দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। আমাদের জুতোগুলো ভিজে উঠেছে। আমরা এবার সর্দার প্যাটেলের বাংলোর ফটকের দিকে ফিরে চলেছি।

বাংলোর কাছে এসে মোটরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। প্রহরী যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে পৌঁছে দেখলাম, সর্দারজী পায়ে হেঁটে এগোচ্ছেন। তাঁর অর্ধ-নিমীলিত ছোট্ট চোখ দু'টোর নীচেই গাঢ় বাদামী রঙের দৃঢ়-কঠিন গণ্ডদেশ ও চোয়াল দু'টো সঙ্কুচিত। তাঁর মজবুত দেহটার ওপর চাপানো রয়েছে একখানা শাল। তারই নীচে ঘরে-বোনা একটা সাধারণ ফতুয়া। পরনের ধুতিখানা হাঁটু ছাড়িয়ে সামান্য একটু নেমেছে। পায়ে এক জোড়া চপ্পল এবং হাতে একখানা লাঠি। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর আগমন মুহূর্তটি ভয়াবহই লাগছিল। তাঁর জীবন-কাহিনী আমাদের ওপর এমনিই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তাঁকে দেখেই আমরা সবাই একই সঙ্গে দু'হাত মেলে নমস্কার জানালাম।

'রাজা—' মাথাটা একটু নেড়ে তিনি বললেন।

টুলীপের মুখখানা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। তাঁর উপাধি হলো মহারাজা, আর তা সত্ত্বেও তাঁকে মাত্র 'রাজা' বলে সম্বোধন করায় তাঁর মনে যে একটা ক্রোধ দেখা দিল, তার সুস্পষ্ট প্রকাশ আমি লক্ষ্য করলাম হিজ হাইনেসের চোখে-মুখে।

সর্দার প্যাটেলের সর্ব শক্তির আধার হলো তাঁর ভ্রূকুটি, যা দিয়ে তিনি সকলের ওপর দৃষ্টির আঘাত হানেন। সর্দার প্যাটেলের মুখমণ্ডলের পরুষভাবের তুলনায় টুলীপের মুখখানা ছিল অপেক্ষাকৃত মোলায়েম, যদিও সে-মুখে উন্মাদ-প্রায় রাজ-সুলভ ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠেছে এখন।

সর্দার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার, খেয়াল ক'রে দেখলেন তাঁর অনুসরণকারী সাদা পোশাক পরা দু'জন লোক ঠিক আছে কিনা।

সর্দারের এই দৃষ্টি দেখে হঠাৎ আমার মনে হলো দেশীয় রাজন্যবৃন্দের ভাগ্য-নিয়ন্তা, ভারতের ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী, লৌহমানব সর্দার প্যাটেলও যেন একটু ভীত।

'আমার সঙ্গে হাঁটুন রাজা, আপনার সঙ্গে কথা-বার্তা শেষ ক'রে ফেলব বেড়াতে বেড়াতেই।' এই ব'লে প্যাটেল এগিয়ে গেলেন। চাষী সুলভ হলেও সর্দারজীর ছোট ছোট চোখ দু'টো শঠতায় পরিপূর্ণ। তাঁর কুঞ্চিত কপালে শক্তিমানের অহমিকা যেন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

ট্রলাপ প্যাটেলকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গেলেও তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে চেষ্টা করেন। একটু অসুবিধার মধ্যেই তাঁকে হাঁটতে হয়। কারণ, সর্দারজীর পায়ের ধাপ ছিল ছোট ছোট। নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পর ঐ মহান ব্যক্তিই প্রথমে কথা শুরু করবেন ব'লে হিজ হাইনেস অপেক্ষা করতে থাকেন।

কিন্তু শুরু না-করাটাই ছিল এই মহান ব্যক্তিটির মহত্ত্বের চাবিকাঠি। যার দফা তিনি ঠাণ্ডা করতে চান, তার সঙ্গে একটি কথাও না ব'লে তার স্নায়ুগুলোকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়াই ছিল এই মহান ব্যক্তির রণকৌশল। হতভাগ্য বলির পাঁঠা তখন ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে বোকার মতো কথা বলতে শুরু করে এবং তারই মধ্য দিয়ে নিজেই নিজের ধ্বংসের পথই পরিষ্কার ক'রে ফেলে। হিজ হাইনেসরা যদি আজীবন রাতের অন্ধকারের মধ্যেই বসবাস ও চলাফেরা ক'রে থাকেন, তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব যদি ঐ অন্ধকারের জিনিসই হয়ে থাকে, তবে সর্দারও তাঁদের তুলনায় উষার স্নিগ্ধ আলোর দিকে খুব বেশি এগোতে পারেন নি। কারণ, তিনি তাঁর হতভাগ্য শিকারের ওপর তাঁর মতামতের চোখ-ধাঁধানো আলো ফেলবার সময় নিজেই বেশ একটু দ্বিধা-সঙ্কোচের সঙ্গেই তা' করছেন। এই মুহূর্তে আঁধারের ভেতর তাঁরা কেউ-ই হাউই ছাড়তে রাজী নন।

সর্দার প্যাটেল হিজ হাইনেসকে যে ভয়াবহ-নীরবতা অবলম্বনে বাধ্য করেছেন তার জন্ম টুলীপ অপমান বোধ করছিলেন,—অপমান-বোধে তাঁর শরীরটা যেন ভেঙে পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত টুলীপই হিন্দুস্তানীতে শুরু করেন: 'স্যার, আপনি আমায় ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ,' দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ কণ্ঠস্বর সর্দারজীর: 'শ্যামপুরের ভারত-ইউনিয়নে যোগদান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র স্বাক্ষরের জন্ম আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি রাজা।'

কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা নয়, কোনও বিশদ বিবরণীর অবতারণারও প্রয়োজন বোধ করেন না সর্দারজী। দৃঢ়কণ্ঠে অতি সংক্ষিপ্ত কথায় তাঁর সিদ্ধান্তটা শুনিয়ে দেন মাত্র। শক্তিমত্তার ন্যায়-শাস্ত্র কোনও রকম যুক্তি তর্কেরই ধার ধারে না।

'দেওয়ান পোপতলাল আপনার নির্দেশনামা নিয়েই গিয়েছিলেন সর্দার প্যাটেল...' সাহসে ভর ক'রে কথা বলতে শুরু করেন শ্যামপুর-অধিপতি।

'আর আপনি তা উপেক্ষা করেছেন!' রুক্ষ ভাষায় সর্দার টুলীপের কথার মধ্যে তাঁর মন্তব্যটা ছুঁড়ে দেন। চোখের দৃষ্টি তাঁর রুষ্ট, একবার তিনি তাকালেন হিজ হাইনেসের দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকালেন আমাদের দিকে। তাঁর সেই দৃষ্টি যেন আমাদের বিদ্ধ ক'রে ফেলে বলতে চায়: 'মূর্খ সমাজবিরোধী দুর্বিত্তের দল, এতবড় তোদের বুকের পাটা যে, এই রাজকুমারকে তোরা আমার আদেশ অমান্য করতে সাহায্য করেছিস্!'

'স্যার, আমি...বলতে...চাই.. যে...' টুলীপ বলতে আরম্ভ করেন, কিন্তু পারেন না, তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

আমার মনে হয়, তিনি বলতে চেয়েছিলেন: 'তোমার এই নতুন আদেশ জারি হওয়ার পূর্বে, এক সুপ্রাচীন রাজবংশের মহারাজা

হিসেবে আমি আমার প্রজাদের ওপর একচ্ছত্র শাসনদণ্ড পরিচালনা ক'রে এসেছি।' টুলীপ কিন্তু সর্দার প্যাটেলের নব্য-ন্যায়ের তাৎপর্যটা বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তিনি এখনও বোঝেন নি যে এই দিল্লী নগরীতে তাঁর রাজ্যভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করা ছাড়া উত্তর দেওয়ার মতো তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

সর্দার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে আরম্ভ করেন। টুলীপ এজন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাড়াতাড়ি, প্রায় দু' এক পা দৌড়িয়েই তিনি সর্দারের সঙ্গ ধরলেন। পেছন দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে টুলীপ দেখে নিলেন…তাঁর এই অবমাননাকর অবস্থার নীরব দর্শক হয়ে আমরা শান্ত ভাবেই তাঁদের অনুসরণ করছি। তিনি আমাকে এগিয়ে আসার জন্য ইশারা করলেন; বোধ হয় আশা করছিলেন আমি তাঁকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবো।

আমি জোরে চলতে চেষ্টা করি; কিন্তু আমার মধ্যে তখন বিপর্যয়ের পূর্ববর্তি অবসাদ মুহূর্ত সক্রীয় হয়ে উঠছে, সর্দারের বিভীষিকা আমার অন্তরের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত অসাড় ক'রে ফেলেছে। ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং ও মুন্সাজীকে অতিক্রম ক'রে মাত্র দু' এক পা আমি এগিয়েছি, এমন সময় শুনলাম:

'যে নতুন দেওয়ানকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তাঁকে আপনি উপেক্ষা করেছেন!—এ-সম্বন্ধে আপনি কি বলতে চান রাজা?' হায়না ও নেকড়ের মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে সর্দার প্যাটেল গর্জে উঠলেন।

'আপনার দেওয়ান সাহেব যে আমার সিংহাসন-ত্যাগই দাবী ক'রে ছিলেন, মিঃ প্যাটেল!' সন্ত্রস্ত হয়েছেন হিজ হাইনেস, কিন্তু উদ্ধত কণ্ঠস্বরেই তিনি উত্তর দিলেন।

নিজের হাঁপ-ধরা থেকে একটু সামলিয়ে নেবার জন্যেই যেন সর্দার জোরে জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেললেন, তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে

বললেন : 'ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের অর্থ সিংহাসন-ত্যাগ নয়, রাজা !'

'কিন্তু দেওয়ান পোপতলাল হলেন একজন অবসর প্রাপ্ত আই. সি. এস. অফিসার মাত্র—' উদ্ধত স্বরে বললেন টুলীপ : 'আর যে রাজ-বংশে আমার জন্ম, তার মর্যাদা হানি ক'রে প্রকাশ্যেই দেওয়ান—'

'আমিই দেওয়ান পোপতলালকে পাঠিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য। ষ্টেট-ডিপার্টমেন্টের নির্দেশেই তিনি ওখানে গিয়েছেন !' সর্দার আবার পায়চারী শুরু করেন। টুলীপ তাঁর দেহ-ভার রক্ষার জন্য আমার হাত দু'টো ধরেন এবং আমরা আবার সর্দারের সঙ্গ ধরবার জন্য হাঁটতে আরম্ভ করি।

সর্দার বলতে থাকেন : 'জামনগর ষ্টেটে শ্রীযুক্ত ডেবর নামে একজন লোক ছিলেন। জামনগর শহরে তিনি একবার একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। অগ্রিম ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তাঁর জিনিস-পত্র সব সেখানে রেখে তিনি কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।··· তার সেই অনুপস্থিতিতে জামসাহেবের সরকার বাড়ির মালিককে একদিন ডেকে পাঠান, এবং ডেবরকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেওয়ার জন্য তাকে হুকুম দেন। নিরুপায় বাড়িওলাকে সেদিন তাই করতে হয়েছিল। আজ সেখানে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডেবরভাই এখন জামসাহেবের যে-ক্ষুদে রাজ্যটি একদিন তাঁকে তাঁর ভাড়া-করা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছিল, তার চেয়ে দশগুণ বড় এক রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, রাজা! বাইবেলে কথিত আছে : "ভাঙার প্রাণীদের বাস করিবার জন্য রহিয়াছে তাহাদের বাসস্থান, আকাশচারী পক্ষিদের জন্য আছে নীড়, কিন্তু মানব-সন্তানের মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই।" কিন্তু এখন, দেশের এই নতুন পরিস্থিতিতে, যে-কোন মানুষের পক্ষে, যে-রাজ্য একদিন জন-প্রিয় নেতা হওয়ার জন্য তার ওপর ঘোরতর অবিচার করেছিল, সে-রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হওয়াও

সম্ভব। সাবেক সমাজ-ব্যবস্থার দিন যে ফুরিয়ে গিয়েছে, রাজা, এ কথাটা আপনারা বুঝলেই আপনাদের পক্ষে মঙ্গল'...

'কিন্তু স্যার, শ্যামপুর যদি স্বাধীন থাকে তাতে ভারত-ইউনিয়নের কতকগুলো রাজনৈতিক সুবিধেও তো হয়—' সাহসে ভর ক'রে বলেন টুলীপ : 'এটা প্রায় একটা ক্ষুদে বাফার ষ্টেটের মতো...'

'তাহলে আপনার ধারণা, ভারত-ইউনিয়নের মঙ্গল কোথায় তা আমরা জানি না?' রীতিমত শক্ত হয়ে দেশীয় রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সর্দারজী প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে চুপ ক'রে যান।

আমাদের শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে। লক্ষ্য ক'রে দেখি, সর্দার প্যাটেলের পদক্ষেপ দৃঢ়তর হয়ে উঠছে, তাঁর হাঁটার গতিটাও কমে এসেছে। এখন তিনি তাঁর স্বাভাবিক গতিতেই হাঁটছেন। দক্ষিণে বা বামে, ওপরে বা নীচে—কোনও দিকেই তাঁর দৃষ্টি নেই। মনে হয়, সোজা সকলের দিকেই তাঁর দৃষ্টি যেন প্রসারিত। মুখখানা বেশ সুস্পষ্ট ও দৃঢ়। দূর দিগন্তে উষার প্রথম আলো ফুটে উঠবার প্রাকমুহূর্তে নিশি-রজনীর শান্ত সমাহিত ভাব কেটে গিয়ে চারধারে যে ধ্বনি ও অস্পষ্ট আকার ফুটে উঠতে থাকে, বাইরের সেই প্রাকৃতিক রূপান্তরের প্রতিফলন নিজের মধ্যে উপেক্ষা ক'রেই সর্দারজী তাঁর মুখের কঠিন ভাব বজায় রাখছেন বলেই আমার মনে হয়। হতে পারে সর্দার সম্বন্ধে আমার এই চিন্তা স্রেফ একটা কল্পনা মাত্র, আমি তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতেই আমার এই কল্পনা গড়ে উঠেছে। তাঁর সম্বন্ধে কত ধরনের আখ্যায়িকা এবং গালগল্পই না চলেছে। কিন্তু কোন ইতিহাসখ্যাত মানুষের সঙ্গে এই ধরনের সাক্ষাৎকার সাধারণতঃ ব্যক্তিবহির্ভূত, কতকটা নিদর্শন স্বরূপ বা প্রতিরূপক হয়ে দাঁড়ায়... কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার মতো যে-কেউ তার নিজের মতো ক'রে তার ব্যাখ্যা করে।

এই নীরবতা এখন সত্যিই পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, টুলীপের মুখখানা যেন ফুলে ফুলে উঠছে, তিনি যেন দাঁত দিয়ে তিক্ততার বিষ চিবোচ্ছেন আর সেই বিষ তাঁর মুখ-বিবরে জমা হচ্ছে। এইভাবে হাঁটতে তাঁর রীতিমত কষ্টই হচ্ছে এবং আমার মনে হলো তাঁর ভাগ্যবিধাতা সর্দার বল্লভভাই বিসমার্ক প্যাটেলের দুরভিসন্ধিপূর্ণ কার্যকলাপে তিনি যেন সমস্ত আস্থাই হারিয়ে ফেলছেন। টুলীপ বলেন :

'স্যার, ভারতের নেতৃবৃন্দ কম্যুনিজমের বিপদ যে খুব বোঝেন, তা কিন্তু আমার মনে হয় না।'

সর্দারের মুখভাব তিলমাত্রও পরিবর্তিত হলো না। কেবলমাত্র তাঁর তীক্ষ্ণ ছোট্ট চোখ দু'টো দিয়ে তিনি হিজ হাইনেসের ওপর হাতীর মতো শঠতা-ভরা দৃষ্টি ফেললেন। আবার শুরু হলো নীরবতার পালা।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। মাথার ওপর দিয়ে চক্রাকারে উড়ে গেল এক ঝাঁক পায়রা। দু'একটা কাকের ডাকও শোনা যায়।

সর্দার তাঁর গোটা বাংলোটাই প্রায় প্রদক্ষিণ করলেন। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারিনি। বুঝলাম তখনই যখন দেখলাম বিলিতী রেশমী স্যুট পরা জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ষ্টেট-মিনিষ্টারের বাসভবন থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। লোকটি আমার পরিচিত। মিঃ ভি. এফ. বর্মা। ইনি ষ্টেট-মিনিষ্ট্রির অন্যতম সহকারী অফিসার।

ষ্টেট-ডিপার্টমেণ্ট ও রাজন্যবর্গের মধ্যে যোগাযোগকারী এই অফিসারকে টুলীপও চিনতে পারেন। 'হ্যালো, মিঃ বর্মা—!' ব'লে তিনি তাঁকে সম্ভাষণ জানালেন।

তাঁর মনিবের মতো মিঃ বর্মাও স্বল্পভাষী। উত্তরে শুধু মাথাটা একটু নাড়ালেন।

'আর সবাইকে জানিয়ে দাও, আজ সকালে আর কারুর সঙ্গে দেখা হবে না।' সাদা পোশাক পরা অনুচরদের দিকে মুখ ফিরিয়ে সর্দার প্যাটেল বললেন। তারপর তিনি বর্মার দিকে মুখ ফেরালেন: 'এই কাজটা আমাদের আজই শেষ করতে হবে। কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে কি, বর্মা?'

'হ্যাঁ, স্যার।' শান্ত এবং অবিচলিত কণ্ঠে বর্মা উত্তর দেন।

আমি এক পা পিছনে গিয়ে বর্মাকে আমার স্থান ছেড়ে দেই।

'দলিলে কি আজই স্বাক্ষর করতে হবে?' টুলীপ জিজ্ঞেস করেন। বাংলোতে তাঁর জন্য কি এক ভীষণ পরিণতিই না অপেক্ষা করছে, সে-সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত তিনি কিছুই জানেন না।

'মহারাজা সাহেব,' বর্মা বলেন: 'শ্যামপুর ষ্টেট সম্বন্ধে আমাদের কাছে সে-সমস্ত খবর পৌঁচেছে তা সত্যিই শোচনীয়। গ্রামগুলের লোকদের গুলি করার ব্যাপারে আপনার যে হাত ছিল, মিঃ শাহ্ সে-সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণাই পোষণ করেন। যে-রকম নির্মমতার সঙ্গে আপনি দমন-নীতি চালিয়ে আসছেন, তাতে সকলেই আপনার ওপর বিরূপ। আপনার আত্মীয় ও জ্ঞাতি-ভাইরাও আপনার বিরুদ্ধে। আপনার মহারানীর অভিযোগের কথা যদি নাও ধরি, তবুও বলতে হবে শাসন-ব্যবস্থায় আপনি যথেষ্ট ঔদাসীন্যই দেখিয়েছেন। আপনার খোদ অফিসাররাই বে-আইনী খাজনা, বেগার ও দাসত্ব-প্রথার কথা সমর্থন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্যামপুরের শাসনভার গ্রহণ করা উচিত—মিঃ শাহ্ এই স্পষ্ট অভিমতই প্রকাশ করেছেন। আমরা কিন্তু অন্যান্য দেশীয় রাজাদের বেলায় যেরকম ব্যবহার করেছি, আপনার বেলায়ও সেই রকম ব্যবহার করারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আপনার ব্যক্তিগত ধন-দৌলত নিরাপদেই থাকবে এবং—'

'মিঃ বর্মা, আমি আপনার কাছে প্রকৃত ঘটনা বলতে চাই—' টুলীপ বলে ওঠেন।

'প্রকৃত ব্যাপার কি, তা আমরা জানি, রাজা সাহেব,' যেন কৃপা-পরবশ হয়ে তাঁর দিকে হুইয়ে পড়ে সর্দার বলেন : 'শ্যামপুর রাজ্যে যা যা ঘটেছে সে-সম্বন্ধে যে বিষদ বিবরণ আমাদের হাতে এসেছে, তাতে তো আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, রাজা!'

'এক কথায় বলতে হলে বলতে হয়, এসব হচ্ছে অবাধ স্বৈরাচারের কাহিনী।...' বর্মা যোগ দেন।

বর্মার কথার মধ্যে কেমন একটা চরম কথাবার্তার সুর যেন ফুটে বের হয়। এবং তার ফলে টুলীপ একেবারে চুপ ক'রে যান। একটা কালচে ছায়া তার মুখখানাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, দেখে মনে হয়, যেন তিনি ভেতরে ভেতরে একেবারে ভেঙে পড়ছেন। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে মেনে নিতেই হবে। রাজকীয় অহমিকা চুর চুর ক'রে ভেঙে পড়ছে, তা সত্ত্বেও বাইরে তিনি বেশ শান্তই থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি, যদিও টুলীপ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ষ্টেট-মিনিষ্ট্রির শর্তগুলো তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে, তবুও কি ক'রে যে সে-সব তাঁর সামনে রাখা হবে তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। কি-ভাবে সর্দার প্যাটেল তাঁকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করবেন, তা বুঝতে পারলে তার মধ্যেই পাশ কেটে বেরিয়ে পড়ার একটা ফরমূলাও হয়তো উদ্ভাবন করা যেতে পারে ব'লে তাঁর মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা জাগছিল। সাক্ষাৎকারের যে বিভীষিকা তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল, তা তো আর এখন নেই। সর্দারজীর ইচ্ছাকৃত নীরবতা গোড়ায় তাঁর মধ্যে যে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল, তা তাঁকে প্রথমে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। বড় রকমের আঘাত বা ঝাঁকুনি পেলে যেমন হয়, তাঁর সর্ব দেহ যেন সেই রকম

পঙ্গু মনে হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের ব্যথা যেমন অনেক পরে বোঝা যায়, ব্যাণ্ডেজ বাঁধাবস্থায় পড়ে থাকার অনেক পরে, এখানেও তেমনি প্রকৃত অবস্থাটা টুলীপ টের পেতে আরম্ভ করেন বেশ খানিকক্ষণ পরে।

সর্দার প্যাটেলের বাড়ির দ্বারদেশে যখন আমরা পৌছোলাম, তখন নয়াদিল্লীর বিশাল ধূসর অন্ধকার কেটে গিয়েছে, তারই স্থানে এক রক্তিম শুভ্রতা ধীরে ধীরে পক্ষ বিস্তার ক'রে আসন নিতে শুরু করেছে। গাছগুলোর আকারও ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সর্দারজী প্রবেশ করতেই গেটের শান্ত্রী তাঁকে সালাম জানাল।

কঠোর ও ন্যায়-নিষ্ঠ, দৈত্যের মতোই যেন অনুভূতি শূন্য, সর্দারজী বাইরের দৃশ্যাবলির ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। সেই পীড়াদায়ক নীরবতার মধ্যে কাকের উদ্ধত কা-কা ডাকই একমাত্র ব্যতিক্রম ঠেকছিল।

পরাজয়ের ভাঙন থেকে নিজেকে শক্ত ক'রে ধরে রাখবার চেষ্টা করেন টুলীপ, আর তার ফলে তাঁর সর্বাঙ্গে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

বর্মা তখন নির্বাক, যেন অস্তিত্বহীন।

'কাগজ-পত্র সব ভেতরে আছে, বর্মা?' সর্দার বলেন: 'রাজা সাহেবকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নাও।'

আমরা নীরবে তাঁকে অনুসরণ করি। দেউলের ক্ষুদে দেবতার প্রহরায় নিযুক্ত দৈত্যের মতো সাদা কাপড় পরা পুলিশের মূক লোকগুলো যে-যার স্থানে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

টুলীপ আজ পরাজিত···অবসন্ন···মোহমুক্ত···বে-পরোয়া তবুও নির্বাক···

ফিরে চললাম এবার আমরা···প্রত্যাবর্তনের পথে···আবার শ্যামপুরের ট্রেনে।

স্তব্ধবাক টুলীপ ট্রেনের কামরায় হাঁটছেন···যেন স্বয়ংক্রিয়-যন্ত্র। মুহূর্তপরে আবার হয়তো শুয়ে পড়লেন বাঙ্কের ওপর·· হৃতচেতন···

রাজ-প্রাসাদে যখন আমরা পৌঁছোলাম, তখন তিনি সত্যি-সত্যিই ক্লান্ত, অবসাদে ভেঙে পড়েছেন। শুধু আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় তাঁর চোখদুটো জ্বলে ওঠে।

'উত্তরাধিকারসত্ব থেকে বঞ্চিতা গঙ্গীর মতোই এখন আমার অবস্থা! যাক্, এবার আমরা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ভাবেই মিশতে পারবো।'

প্রাসাদে পৌঁছে প্রথমেই তিনি 'মহারানী সাহেবা'কে আনবার জন্য জয়সিংকে অন্দরে পাঠালেন। রেল-ভ্রমণের ক্লান্তি ও অবসাদে তিনি শুয়ে পড়লেন, তবুও, লক্ষ্য করলাম, গঙ্গীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় তাঁর দেহে উত্তেজনার মৃদু কম্পন বয়ে যাচ্ছে।

'ও না-আসা পর্যন্ত তুমি চলে যেও না, ডাক্তার।' হিজ হাইনেস আমায় বলেন। অনুরোধের সুর তাঁর কণ্ঠস্বরে।

মূর্চ্ছার মতো পড়ে থাকেন; হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে শূন্য নয়নে চেয়ে থাকেন।

ক্ষণকাল পরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন: 'আমার সঙ্গে কথা বলো, তোমার নিজের কথাই বলো ডাক্তার। তোমার জীবনের কথা তো কোন দিনই আমাকে বল নি।'

'নিজের ওপর অতটা গুরুত্ব কোনদিনই তো দেই নি হাইনেস।'

'সমস্ত ঘটনাটা বিচার ক'রে তোমার কি মনে হয় ডাক্তার?'

বুঝলাম, "সমস্ত ঘটনা" বলতে তিনি দিল্লীর ঘটনাবলীর কথাই বলছেন। একটু মুস্‌কিলেই পড়লাম; কারণ আমি তো মনে মনে জানি যে, টুলীপের এখন যে অবস্থা, তা হলো একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মুহূর্তে সুবিধাভোগীর যা হয় তাই এবং সেও একটা বিরাট

কিছুর অংশ-বিশেষ মাত্র। এ পরিবর্তন এখনো শেষ হয় নি। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও বেশি মানসিক আঘাত এবং ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে এঁদের। টুলীপের কাছে এর ব্যাখ্যা যতটা সম্ভব সহজভাবে করা যায় তাই আমি করতে চাইলাম। কতকটা ভাসা ভাসা ভাষাতেই আমি শুরু করলাম :

'দেখছেন তো টুলীপ, পৃথিবী এবং পৃথিবীর অংশ হিসেবে ভারত একটা বিরাট "চেসিস্"-এর ভেতরেই পড়েছে।'

' "চেসিস্" আবার কি ?' বিস্ফারিত চোখ দু'টো দিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই পরমুহূর্তে চোখ দুটো বুজে ফেলেন টুলীপ।

'পরিবর্তন বোঝাবার জন্য আইরিস কবি ও'কেসি এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই পরিবর্তনটা চলে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত—মানুষের দৃঢ় পদ-বিক্ষেপে চলার কাল থেকে। ইউরোপীয় রেনেশাসেঁর ভেতর দিয়ে মানুষ যে বিরাট জ্ঞান সঞ্চয় করে, তারই ফলে এই পরিবর্তনটি এক বিশেষ দিকে মোড় নেয়, বিশেষ ক'রে, ফরাসী ও রুশ-বিপ্লব এটাকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে এসেছে। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের ইতিহাস ছেড়েই দিলাম...উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই সহজ সরল ও পুরোনো পৃথিবীর পরিবর্তন শুরু হয়, অতীতের ধরা-বাঁধা নিয়ম-কানুনগুলো ভেঙে পড়তে আরম্ভ করে। আমাদের পৃথিবীর অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে আগ্নেয়গিরির মতো...এর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে সব সময় আর প্রতি পাঁচ বা দশ বছর পর পর এর বিস্ফোরণ হচ্ছে। একদিন আমাদের এই পৃথিবী সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর সেই বিস্ফোরণের পরে যে লাভা-স্রোত বয়ে যাবে, তাতে এই পৃথিবী ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। হয়তো এক নতুন জীবনী-শক্তি এই ধরণীকে নতুন ভাবে উর্বরা ক'রে দেবে। ইতিমধ্যে গোটা পৃথিবী-ব্যাপী এক ভয়ানক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপের জ্ঞানের

আলো থেকে উদ্ভূত ভাব-ধারা নিয়ে যথেষ্ট কচকচানি ও সংগ্রামের সৃষ্টি হলেও, ঐ জ্ঞানালোকের মধ্যে আরও অনেক নতুন ভাব-ধারা নিহিত রয়েছে। আমি এখানে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার, ধর্ম ও নতুন জ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাই বলছি—যার ফলে আজ এক নতুন ধরনের মানুষ এসেছে। এই নতুন মানুষের সাক্ষাৎ আজ পাওয়া যাবে সর্বত্র। চারধারের অন্ধকারের ভেতরে আলোক-বর্তিকার মতোই উন্নতশির সেই মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব-মানবতা-ধর্মী। এরকম কিছু কিছু লোকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। কাজেই, আপনি বুঝতে পারছেন, আমাদের সামনে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটছে, তার মধ্যে আমি কিন্তু একটা ঐক্যই দেখতে পাই। আর আমি এইসব পরিবর্তনে মোটেই উৎকণ্ঠিত হই না, কোনরকম বাধা দিতেও চাই না। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আহার-বাসস্থানের সুব্যবস্থার জন্য মানুষের মধ্যে যে তাগিদ দেখা যায়, তাকে তো আমি জীবনী-শক্তিরই নিদর্শন হিসেবে মনে করি। পরিবর্তনে আতঙ্কিত মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীন মানুষ যদি আণবিক যুদ্ধের মধ্যে মানব-জাতিকে ধ্বংস করার জন্য বিজ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে আমরা সকলেই এক প্রাচুর্যের পৃথিবীর অধিকারী হবো। এই ভবিষ্যৎ চিত্রই আমাকেও পরমোৎসাহী করেছে। এরই কল্যাণে যে 'শিজোফ্রেনিয়া' আপনাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছে, টুলীপ, তা আমি দু' পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। আপনি আপনার অতীত জীবনকে ছাড়তে পারছেন না, ছাড়তে সক্ষম হচ্ছেন না বলেই উচ্ছল জীবনী-শক্তির যে স্ফুরণ নিপীড়িতদের মুক্তিদান করছে, তা মেনে নিতে আপনি পারছেন না। এ অক্ষমতা আপনারই একলার নয়, টুলীপ, আপনার মতো আরও অনেকেরই। তাদের একগুঁয়ে ঔদ্ধত্য এবং স্বেচ্ছাচার তাদেরকে আমাদের এই যুগে সৃষ্টিছাড়া জীবে

পরিণত করেছে আর এর জন্য আমাদের যুগের আবহাওটাও এমনই বিকৃতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানব-প্রগতির অন্তর্নিহিত শক্তি ও গতির নিয়মাবলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কিছু কিছু লোক আমাদের মধ্যে আছেন ব'লেই নানারকমের অন্তরায় সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ-দুনিয়ার ওপর কিছুটা আশা-ভরসা ও আস্থা রাখতে আমরা অনুপ্রাণিত হই। কিন্তু এই পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের দূরদর্শিতা এবং এমনকি ঐ পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করার সময়েও এই বাস্তব সত্যটা খেয়ালে রাখতে হয় যে, ক্ষমতাসীন মালিকগোষ্ঠী হলো অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, প্রায় ক্ষেত্রেই তারা অন্ধ এবং আক্রমণ ক'রে বসে…'

'বুঝলাম, তুমি তাহলে বিশ্বাস কর যে, অনভিজ্ঞ মূর্খরাও দুনিয়াটা শাসন করতে পারে!'

'মানুষের ওপর আমার আস্থা আছে টুলীপ। এত লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রয়েছে এক অসীম জীবনী-শক্তি।'

'হ্যাঁ, এ পর্যন্ত তারা দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করার শক্তিরই শুধু পরিচয় দিয়ে এসেছে! হিটলার তাদের প্রায় পর্যুদস্ত ক'রে বশে আনতে পেরেছিলেন। ফ্রান্স তাদের পরাভূত করেছিল। শক্তিশালী যারা, তারা তোমার এই জনসাধারণদের সর্বত্রই দাবিয়ে রাখে। অস্বীকার করতে পারবে না যে, তোমাদের জনগণ এক অন্ধ শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়!'

'কিন্তু অধিকাংশ শক্তিশালী মানুষই তো দেখা যায় তাদের সত্যিকারের কল্পনা-শক্তি হারিয়ে ফেলে অন্ধকারের বিরাট গহ্বরে নিজেরাই ডুবে যায়। হিটলারের কথাই ধরুন, লোকটা নির্ভর করতো রহস্যাবৃত কতকগুলো প্রতীক-চিহ্ন ও ভবিষ্যদ্-বক্তাদের ওপর আর—'

'তাহলে দেখছি তুমি আত্মায় বিশ্বাস কর না ডাক্তার!'

'দেহ ছাড়া আত্মার কোন অস্তিত্ব আছে ব'লে আমি বিশ্বাস

করি না, টুলীপ। আত্মাই দেহ, দেহই আত্মা—দু'টো এক হলেই তো সত্যিকারে মানুষের সৃষ্টি হয়।'

'ঈশ্বরবাদীদের, এই ধর শ্রীঅরবিন্দ—তাঁদের সম্বন্ধে তুমি কি বলতে চাও?...তাঁর কাছে যাব ভাবছিলাম।'

'মরমীবাদ হচ্ছে মুমূর্ষু লোকের দৃষ্টিভঙ্গি, টুলীপ। এ হচ্ছে ভগবানের কাছে পৌছোবার একমুখো গলি। ভগবানের কাছ থেকে কিন্তু একজন পথিকও আজ পর্যন্ত ফিরে এসে বললো না পরকালটা কেমন জিনিস—'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এসব ব্যাপার খুব জানো-শোন! তুমি যে এতসব জানো, তাতো জানতাম না!...একবার আমার এক পূর্বপুরুষ সংসার পরিত্যাগ ক'রে সাধু হয়ে যান, এবং—'

জয় সিংয়ের মৃদু পদধ্বনি তাঁর কথায় বাধা দেয়। তিনি সোজা হয়ে উঠে বসেন।

'মহারাজ,' জয়সিং কক্ষে প্রবেশ ক'রে বলে: 'মহারানী সাহেবা এখানে নেই। তিনি তাঁর মায়ের গ্রামে গিয়েছেন—'

'মায়ের গ্রামে?' টুলীপ চেঁচিয়ে ওঠেন: 'তার মায়ের গাঁয়ে কেন? কখন?'

'আমি জানতাম তিনি অন্দরমহলে নেই, মহারাজ, কারণ আমিই তাঁর জিনিসপত্তর মোটরে উঠিয়ে দিয়েছি।'

প্রায়-বিবর্ণ টুলীপ জয় সিংয়ের সামনে সোজা উঠে এসে দাঁড়ান।

'কিছু বলে গিয়েছে? কোন খবর?'

'জী হুজুর, তিনি বলেছেন কিছুদিনের জন্য তিনি ফিরবেন না।' বলেই বৃদ্ধ চাপরাসী টুলীপের পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে দুই হাতের ওপর তার মাথাটা রাখে। তার সারা দেহ ভয়ে কাঁপতে থাকে।

'দূর হ', নিকাল যা, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা—' টুলীপ গর্জন ক'রে ওঠেন। চোখ দু'টো তাঁর পাগলের মতো উদ্দীপ্ত।

জয়সিং হামাগুড়ি দিয়ে সরে পড়তে চায়, কিন্তু টুলীপ তাকে অনুসরণ করেন। হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেন :

'যাবার সময় তোকে কি বলেছে ? ঠিক কোন্ কথা—?'

'মহারাজ, তিনি যে-সমস্ত জিনিস-পত্তর নিয়ে গিয়েছেন, সে-কথা হুজুরকে বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে একখানা একশ' টাকার নোট দিয়েছেন।' জয় সিং কাঁদতে কাদতে বলে, কারণ টুলীপের মতো সেও এখন বুঝতে পেরেছে যে গঙ্গাদাসী পালিয়ে গিয়েছে।

'সঙ্গে কি কি জিনিস নিয়ে গিয়েছে ?' মরিয়া হয়ে টুলীপ জিজ্ঞেস করেন। এখনও তাঁর আশা, হয়তো গঙ্গীকে তিনি আবার পাবেন।

'মহারানী সাহেবার সমস্ত জিনিস-পত্তর হুজুর।' জয় সিং উত্তর দেয়। 'বুলচাঁদ বাবুও তাঁর সঙ্গে ছিলেন···'

'বুলচাঁদ ! এঁ্যা ! তুই বাধা দিলি না ? তুই বাধা দিতে পারতিস না ?' টুলীপ জয় সিংয়ের দিকে দু'হাত তুলে আর্তনাদের স্বরে বলেন। চোখ দিয়ে তাঁর দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে আর তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন : 'দূর হ', যত সব বুড়ো হাবা বলদ জুটেছে এখানে ! আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা !···কেন বাধা দিলি না ?···সঙ্গের লোকটা বুলচাঁদ, না, পোপতলাল ?'

'বুলচাঁদ বাবু।'

'দূর হয়ে যা, নিমক হারাম কুত্তা! দূর হয়ে যা।···' বলেই তিনি জয় সিং-এর পায়ের নলির উপর এক লাথি মারলেন।

লাথি-খাওয়া কুকুরের মতো বৃদ্ধ জয় সিং বেরিয়ে যায়। টুলীপ কক্ষের চারধারে ঘুরে বেড়ান, এক গভীর নৈরাশ্যে উন্মাদের মতো তিনি অনবরত নিজের মাথায় নিজেই করাঘাত করতে থাকেন। তারপর

পা দু'টো যেন অবশ হয়ে আসছে—এইভাবে তিনি কেঁপে ওঠেন এবং 'সেটী'র উপর এলিয়ে পড়েন। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। আমার মনে হয়, বহুদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখের মেঘ হঠাৎ যেন তাঁর মনের শিখরদেশে উঠে কাল-বৈশাখীর ঝড়ের তাণ্ডবে তাঁকে পিষে ফেলছে।

মুহূর্তের মধ্যেই তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। সংসারের যাবতীয় দ্বেষ-হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ভঙ্গিতে তিনি তাঁর হাত দু'খানা মোচড়াতে থাকেন। ঘরের মধ্যে যে দর্শক কেউ রয়েছে, এই উন্মাদ-অবস্থাতেও সে-সম্বন্ধে তিনি কিন্তু সজাগ, আত্ম-বিলাপের ভাষায় জোরে জোরে বলে উঠেন :

'কোথায় গেলে ? ওগো, কোথায় গেলে ?···আমায় এ-ভাবে ফেলে গেলে কেন গো ?···আমি তোমাকে চাই! আমি যে তোমার জন্য মরে যাচ্ছি···কেন এরকম করলে ? কেন ?···কেন তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও ?···'

এইভাবে প্রলাপ বকতে বকতে আবার তিনি ভেঙে পড়েন। ঠেস-দেওয়া কুশানে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

আমার ভারী বিশ্রী লাগে, টুলীপকে কোন রকম সাহায্য করতে পারছি না ব'লে আমার নিজের ওপরই কেমন ঘৃণা জাগে। তিনি কাঁদেন, আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি। যেখানে তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যথা পাচ্ছেন, তাঁর সেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে প্রবেশ করতে পারছি না,—এই অনুভূতিতে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কাছে গিয়ে তাঁর গলাবন্ধটা আলগা ক'রে দেই, কারণ গলাবন্ধটার চাপে রক্তের ছোপে তাঁর চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল।

'আমাকে একলা থাকতে দাও—একলা থাকতে দাও—' চিৎকার ক'রে তিনি বলেন : 'যাও! তুমি চলে যাও এখান থেকে!'

আমি কিন্তু জানতাম আমার চলে-যাওয়া তিনি সত্যিই চাইছেন না।

তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তাঁর পাশে বসে নজর রাখবো বলে আমি স্থির করলাম।

*   *   *

একটা চলতি কথা আছে যে, জনগণই হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কেন্দ্র। জনসাধারণের বলে একটা দ্বিতীয় বোধ-শক্তি আছে। তারা জানতো যে, শ্যামপুরকে হিন্দুস্থানের অংশে পরিণত করার জন্য দিল্লী সরকারের সঙ্গে মহারাজার কথাবার্তা চল্‌ছে আর মহারাজা বলে তাতে রাজী হচ্ছেন না। শ্রীযুত গোপতলাল জে. শাহ্ যখন এই রাজ্যে আসেন, তখন জনসাধারণ সত্যিই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল; কারণ, বাইরে রাজার প্রতি করজোড়ে শিষ্টাচার দেখানোর অন্তরালে অত্যাচারিত প্রজাসাধারণ যুগ-যুগ ধরে তাদের অন্তরে দারুন অসন্তোষই চেপে রেখে এসেছে : দিল্লী-সরকারের সমর্থন পেলেই এই অসন্তোষ মুখর হয়ে উঠবেই। মুখে বড় বড় কথা ব'লে প্রজামণ্ডলের ক্ষুদে নেতারা এখন গণ-উৎসাহের উর্মি-শিখরে চেপে বসেছেন। হরতাল, শোভাযাত্রা, গরম গরম বক্তৃতা শেষপর্যন্ত মহারাজার প্রাসাদ-আক্রমণের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকল। হিজ হাইনেস শেষপর্যন্ত গুলি চালিয়ে, প্রজা-মণ্ডলের নেতাদের গ্রেপ্তার ও পুলিসী শাসন প্রতিষ্ঠিত ক'রে এই আক্রমণ প্রতিহত করলেন। পোলো খেলার মাঠে যাবার সময় আমাকেও অহেতুক ভাবে এই পুলিসী জুলুম সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু টুলীপের ঐ শিকার-পর্বের প্রকৃত তাৎপর্য এবং মহারাজার বিদ্রোহী জ্ঞাতিভাই, এবং সোস্থালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের কার্যকলাপের ফলে পল্লীতে পল্লীতে ও শহরে শহরে যে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছিল, তা' থেকে নানা ধরনের জনরবে

আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপক উপদ্রব ও অশান্তির পেছনে যে-কার্যকারণটি কাজ করছিল, তা কমবেশী অনেকেই বুঝেছিল : মহারাজার স্বৈর-শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের জন্য একটা প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রই আত্ম-প্রকাশ করছিল। এর মূল উদ্দেশ্যটা অবশ্য কতকাংশে বৃটিশ-ভারতের জনসাধারণের মুক্তি-সংগ্রামেরই প্রতিফলন। বৃটিশ শাসকদের হাত থেকে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের কর্ণধারদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে বৃটিশ ভারতের মানুষ অন্ততঃপক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সিকি-পথ অতিক্রম করতে পেরেছে। বহু ঘোষিত এই "স্বাধীনতার প্রস্তাব" থেকেই এই আন্দোলন অনুপ্রেরণা লাভ করেছে যার অংশ বিশেষ হলো : "আমাদের 'দৃঢ়বিশ্বাস, অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মতো ভারতবর্ষের জনসাধারণেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, নিজেদের পরিশ্রমের ফল নিজেরাই ভোগ করিবার, আত্ম-বিকাশের উপযোগী পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, কোনও সরকার জনগণকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে এবং তাহাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করিলে, ঐ সরকারের বিলোপ সাধনের অধিকারও জনগণের আছে।" আত্ম-সচেতন ভাবে কখনও তারা এই শ্লোগান উচ্চারণ না করলেও, এই প্রতিশ্রুতি দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে। এবং তার জন্য রীতিমত আন্দোলনও শুরু করেছে। এই সব দেশীয় রাজ্যে তো খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে মিশে আছে নবম শতাব্দীতে, মিশে আছে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে ; ফলে প্রগতির পথে দামের মতো রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ইতি-হাসের যতসব পিছটান—যেমন স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, প্রকাশ্য

ডাকাতি, অবজ্ঞা, ভগবানের অবতার হিসেবে রাজার প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি,—আবার সেই সঙ্গে আছে মানব-সমাজে প্রগতি-আন্দোলনের প্রতিফলন ফরাসী ও রুশ-বিপ্লবের ভাবধারা, এমন কি বাকুনিনের ভাববাদী নৈরাজ্যবাদ। আর এইসবের সঙ্গে মহারাজা ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে থাকায় আরও বেশি গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক্, ইতিহাসের গতিপথে রাজা-রানীদের যেসমস্ত প্রেম-ভালোবাসার কেচ্ছাকাহিনী জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচারিত হয়, সেগুলো কিন্তু আন্দোলনে বেশ কাজ করে। রাজনীতিকরা অবশ্য আমার এ মত মানতে চাইবেন না। বাজারের গাল-গল্পগুলো বাস্তবতার কিনারায় ভেসে-ওঠা ফেনার মতো হলেও, আমার মনে হয়, নিপীড়িত মানবতা নির্মম বাস্তবতাকে ভুলে থাকবার জন্যই এগুলোর আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকে। দেশীয় রাজাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য-করবার জন্য সর্দার প্যাটেলের অভিলাষ, মহারাজার জ্ঞাতি-ভাইদের সুবিধাবাদ, প্রজামণ্ডলের নেতাদের ক্ষমতালাভ-স্পৃহা এবং সমস্ত ভেঙে-চুরে দু' হাজার বছরের ধ্বংসস্তূপ নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে বলশেভিক রাষ্ট্র গড়ে তুলবার জন্য কম্যুনিষ্টদের বৈপ্লবিক প্রয়াসের ফলেই যতসব শঙ্কা, গোলযোগ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের সৃষ্টি হয়েছে। মহারাজা ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের জন্য দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছেন, এ খবর রটনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেরই দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়েছে। স্বভাবতই এজন্য জনগণের আনন্দের আজ সীমা নেই।

নতুন দিল্লী থেকে আমাদের ফিরে আসার পরের দিন, রাজ-প্রাসাদের বাইরে সমবেত জনতার গোলমাল ও চিৎকার-ধ্বনিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। টুলীপ পায়জামা পরে আমার কামরায় ঢুকে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন যে, আমাদের বেরিয়ে গিয়ে কি ঘটেছে তা দেখা উচিত। ভিক্টোরিয়া বাজার মুখো প্রধান ফটকের কামরা-

গুলোয় উঠে আমরা খড়-খড়ি দেওয়া জানালার ভেতর দিয়ে দেখি, প্রায় একশ' গজ দূরে রাজপথ ধরে এক ঘন-সজ্ঞবদ্ধ শোভাযাত্রা প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

টুলীপ কেঁপে ওঠেন, মনে হয়, প্রাসাদের দিকে অগ্রসরমান এই বিরাট জনতা যেন এক বিপদাশঙ্কা বহন ক'রে আনছে। তাঁর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, কি যে ঘটছিল তা বুঝবার জন্য তিনি গবাক্ষপথে প্রখর দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে রইলেন। মুহূর্তের জন্য তিনি যখন আমার দিকে তাকালেন তখন তাঁর বিস্ফারিত চোখে আশ্চর্য ধরনের এক আতঙ্ক দেখলাম। পায়ের নীচের মাটি ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তারই নীচের বিরাট এক গহ্বরের মধ্যে যেন তিনি ডুবে যাচ্ছেন। আকাশ পথে "প্রজামণ্ডল কি জয়!" "পণ্ডিত গোবিন্দ দাস কি জয়!" ধ্বনি উত্থিত হতেই টুলীপের জোরে জোরে নিঃশ্বাস বইতে আরম্ভ করে।

'ওরা কি প্রাসাদ আক্রমণ করবে?' তিনি জিজ্ঞেস করেন।

'না, তা মনে হয় না।' আমি বলি: 'এখনও আপনিই শ্যামপুরের আইনসম্মত রাজা। আপনি ভারত-ভুক্তির দলিলে সই দিয়েছেন মাত্র, সিংহাসন তো ত্যাগ করেন নি! চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সঙ্গে কত সদয় ব্যবহার করলেন সর্দার প্যাটেল...'

নিজের দুর্বলতায় যেন কিছুটা লজ্জিত হয়েই টুলীপ দৃষ্টি নামালেন। বংশানুক্রমিক রাজা হওয়ার রোমান্স ও মর্যাদা যেন তাঁর মধ্য থেকে দূর হয়ে গিয়েছে; জনগণের জয়লাভ প্রত্যক্ষ ক'রে একদা চতুর্দশ লুই হয়তো যেভাবে মাটিতে বসেছিলেন, সেইভাবেই সিল্কের ড্রেসিং গাউন প'রে বেসামাল অবস্থাতেই হিজ হাইনেস মহারাজা মেঝেতে বসে থাকেন।

'পণ্ডিত গোবিন্দ দাসকে কিন্তু জড়ভরতের মতোই দেখাচ্ছে।' কঠোর সমালোচনার ভঙ্গীতে তিনি মন্তব্য করেন।

সত্যি কথা বলতে গেলে, প্রজামণ্ডলের নেতা পণ্ডিত গোবিন্দ দাসকে অনেকটা বিবর্ণই দেখাচ্ছিল। দশ জোড়া বলদ-পরিবাহিত রথে সিংহাসনের মতো মঞ্চের ওপর তিনি বিগ্রহের ন্যায় বসেছিলেন। তাঁর পেছনে পেছনে আসছে শোভাযাত্রীদের পুরোধা হিসেবে বহুমূল্য সোনার ঝালর দিয়ে সাজানো একদল হাতী।

'আমার মনে হয়, আজ তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন, তারই জন্যে যেন তিনি বিবর্ণ হয়ে উঠেছেন, অথবা এ তাঁর অহমিকারই একটা বিকৃত রূপ...'

'ও মরে গিয়েছে! ওকে দেখলে মরা লোক বলেই মনে হয়! ওর নাদুস-নুদুস দেহটার দিকে তাকিয়ে দেখ ডাক্তার। লোকটা একটা আস্ত গাধা! কি ক'রে ও শাসন করবে? শালা, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে...'

আমার মনে হলো, এক সময় টুলীপের মধ্যে যে আভিজাত্য ছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যত তিক্ততা ও বেসামাল গালিগালাজ তাঁর মুখ থেকে বের হচ্ছে। কারণ, আমি তো স্পষ্টই দেখছি যে পণ্ডিত গোবিন্দ দাস মৃত নন, চারপাশে বিরাট জনতাকে সমবেত হতে দেখে আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। মুখে তাঁর হাসি। জনতা তাঁর ওপর ও তাঁর পাশে উপবিষ্ট নেতাদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করছে, তাদের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে। শোভাযাত্রাও ক্রমে এগিয়ে আসছে করতালি দিতে দিতে ও ঢোল বাজাতে বাজাতে উন্মত্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। জনতা এলোমেলোভাবে এগিয়ে আসছে, আসছে মন্থর গতিতে, তবুও মনে হয়, একটা অতিকায় দৈত্য যেন সর্পিল গতিতে সমস্ত শক্তি ও সুযোগ-সুবিধার সিংহাসনে উঠে বসবার জন্য এগিয়ে আসছে।

'হ্যাঁ, আমি পারতাম, আমি ওদের পিষে ফেলতে পারতাম!'

দাঁত কড়মড় করতে করতে টুলীপ বলেন : 'শুধু সর্দার প্যাটেল যদি আমার হাত দু'খানা বেঁধে না রাখতেন, আমি ওদের এই আস্ফালন ধ্বংস ক'রে ফেলতাম!'

'কি দিয়ে? শুধু আপনার গর্ব আর নিরস্ত্র হাত-দু'খানা দিয়ে!... দুর্বল হয়ে পড়বেন না, টুলীপ। ভুলে যাবেন না যে আপনি রাজপুত!'

প্রজামণ্ডলের নেতাদের নিয়ে অগ্রসরমান রথখানার পরেই একখানা পাল্কী। তাতে বসে আছেন শ্রীপোপতলাল জে. শাহ্ আর বুলচাঁদ।

বুলচাঁদকে দেখেই টুলীপ একেবারে পাগল হয়ে পড়েন। নৈরাশ্যের বেদনায় আর বোকামিতে ভরা অসাড় উন্মত্ত ও বিহ্বল চোখে তিনি জোরগলায় চিৎকার ক'রে ওঠেন :

'কাল সাপ! রক্তচোষা বাদুড়! আঁস্তাকুড়ের কীট! বুলচাঁদ—হারামী ব্যাটা, তোর দফা আমি ঠাণ্ডা ক'রে তবে ছাড়বো, হারামীর বাচ্চা!...'

চিৎকার ও শ্লোগানের ধ্বনিতে এখন কিছুই শোনা যায় না। শোভাযাত্রা এখন প্রাসাদের সামনে এসে পড়েছে। টুলীপের মধ্যে যে অনুভূতির কালবৈশাখীর তাণ্ডব বইছিল তা আরও বাড়িয়ে দেবার জন্যই যেন ঐ হট্টোগোল স্তিমিত হয়ে যায় আর তার স্থলে, ক্লারিওনেট, ফ্লুট, ড্রাম নিয়ে গঠিত ব্যাণ্ডদল বিশ্রী ধরনের বেসুর বাজনা বাজিয়ে চলে।

"বলো শ্যামপুর প্রজামণ্ডল কি জয়!" "বলো শ্রীগোবিন্দ দাস কি জয়!" "বলো শ্রীরামচন্দ্রজী কি জয়!" "বলো শ্রীকৃষ্ণজী মহারাজ কি জয়!..."

শ্লোগানের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলে। ব্যাণ্ড-বাজনার সোরগোলও বেড়ে যায়। আকাশের সূর্য জনতার উপর গৌরবোজ্জ্বল কিরণমালা ছড়িয়ে দেয়...হর্ষোৎফুল্ল জনকোলাহলের ভেতর থেকে হঠাৎ একটা রুক্ষ আওয়াজ বেরিয়ে আসে :

'চুপ, চুপ, এবার পণ্ডিত গোবিন্দ দাস বক্তৃতা করবেন।'

টুলীপ যেখানে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, একথা শুনে তিনি উঠে পড়েন ভিতরে চলে যাবার জন্য।

'বক্তৃতাটা শোনাই যাক না।' আমি তাঁকে নিরস্ত ক'রে বলি।

টুলীপ অগত্যা বসে পড়েন।

পণ্ডিত গোবিন্দদাসের খনখনে রুক্ষ কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়, জনতার সোরগোলও কমতে থাকে।

"ভাইসব, আজ একটা শুভদিনই সমাগত বলতে হবে, কারণ প্রজামণ্ডলের সমস্ত প্রচেষ্টা আজ জয়যুক্ত হয়েছে। শ্যামপুরের মহারাজা সাহেব রাজ্য কংগ্রেসের প্রধান দাবী—ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের প্রস্তাব—মেনে নিয়েছেন। মহারাজা সাহেব হলেন বিপথগামী যুবক··· তবুও তিনি বুদ্ধিমান এবং সহৃদয়, এবং তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি সকল সময়েই জনসাধারণের মঙ্গল-কামী।···'

মহারাজা যদি, প্রজামণ্ডলের নেতার ভাষায়, অদ্ভুত প্রকৃতি ও কতকটা বিপথগামীই হয়ে থাকেন, তাহলে পণ্ডিত গোবিন্দ দাসও কম 'অদ্ভুত ও বিপথগামী' নন। তিনি আজ হিজ হাইনেসের ওপর যে সাধুবাদ-বর্ষণ করলেন, মাত্র এক সপ্তাহ আগে তিনি ও প্রজামণ্ডলের নেতারা মহারাজা এবং তাঁর শাসন-ব্যবস্থার ওপর যেসমস্ত কটূক্তি ও নিন্দাবাদ বর্ষণ করেছেন, তার সঙ্গে এই সাধুবাদের কোন মিলই নেই। সর্দার প্যাটেলের পরিকল্পিত তথাকথিত "রক্তপাত হীন বিপ্লব"-এর ভিত্তির ওপর ভারত সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজাদের সমন্বয় যে কিভাবে ঘটতে চলেছে, তার প্রকৃত তাৎপর্যটা যেন আমার চোখের সামনে এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম টুলীপও পণ্ডিত গোবিন্দ দাসের বক্তৃতায় কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন।

'যতটা খারাপ ভেবেছিলেন, ততটা কিন্তু নয়।' আমি বললাম।

টুলীপ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

কিন্তু আমার মন্তব্য প্রকাশ যেন একটু তাড়াহুড়ো করেই হয়েছিল। পণ্ডিত গোবিন্দ দাস মহারাজার ওপর দোষারোপ করতে শুরু করলেন :

'...কিন্তু তিনি অস্থির-চিত্ত, চরিত্রহীন ; হৃদয়, মস্তিষ্ক ও দেহ—শরীরের এই বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুসংবদ্ধ ক'রে রাখার কোন ক্ষমতাই তাঁর নেই। শুধু শরীরের বিভিন্ন অংশের গতিবেগে আর...'

পরবর্তি কয়েকটি কথা, রুচিহীন বর্ণনার ফলে শ্রোতাদের হাসির সমুদ্রে ডুবে গেল। কিন্তু পণ্ডিত গোবিন্দ দাসের কণ্ঠস্বর এখন প্রাসাদ-দেওড়ির গম্বুজগুলোতে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনি তোলে। তাঁর সম্মুখে সমবেত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে থাকে :

'কংগ্রেস কর্তৃক শাসন-ভার গ্রহণের পর মহারাজারা ইংরেজদের পরামর্শে ভারত-রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান হয়েছে—এই মতবাদ অনুসারে চলতে থাকেন।... এখন আমাদের দেশের বুক থেকে বৃটেনের প্রেতাত্মা অপসারিত হওয়ার পর আবার তাঁদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। আমাদের মহারাজা সাহেব এখন যিশুখৃষ্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ, তিনি গদিত্যাগের দলিলে স্বাক্ষর ক'রে প্রজাদের মুক্তি এনেছেন, প্রজামণ্ডলের সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দিন কয়েকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে স্থানীয় জন-প্রিয় সরকার, এবং শ্রীযুক্ত পোপতলাল জে. শাহ্ ভারত সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীকে সাহায্য করবেন।...'

শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্‌র এই নতুন ভূমিকার সংবাদটি আমার কানে একটু অদ্ভুতই লাগল। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় প্রজামণ্ডলের নেতৃত্বের ওপর সর্দার প্যাটেলের সেরকম আস্থা নেই ব'লেই তিনি শ্যামপুরে তাঁর নিজের লোক রেখে দিলেন।

'...যে সব শয়তান তাঁকে ঘিরে ধরেছিল, তাদের কুপরামর্শে যে তিনি কর্ণপাত করেন নি, এজন্য মহারাজাকে ধন্যবাদ। তিনি সত্য সত্যই তাঁর চরিত্রের দুর্বলতাগুলোকে জয় ক'রে নিজের ইচ্ছাশক্তির রূপ দিয়েছেন। বলো, বলো ভাই তোমরা সব, হিজ হাইনেস মহারাজা সাহেব কী জয়!'...শ্রোতাদের অল্প সংখ্যক কিছু লোক উদাসীন কণ্ঠে ঐ চিৎকারে যোগ দিল। কারণ, মহারাজা সম্বন্ধে জনসাধারণের হৃদয়ের শত্রুভাব ছিল গভীর ও অত্যন্ত বাস্তব। কাজেই গোবিন্দ দাসের বক্তৃতার এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তনের জন্য তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। পরমুহূর্তেই নেতা গোবিন্দ দাস চিৎকার ক'রে ওঠেন:

'বলো প্রজামণ্ডল কি জয়!'

এবারে ঐ চিৎকার ধ্বনি আরো জোরে প্রতিধ্বনিত হলো। সমগ্র প্রাসাদ-দেউড়ি ঐ প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠল। এই যে কক্ষে আমরা বসে আছি, যদি তার প্রাণ থাকত তা হলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা এই ঘটনাটি মনে রাখতে। কারণ, যদিও এই প্রাসাদ প্রকৃতপক্ষে আক্রান্ত হয়নি, তবুও জনগণের প্রখর কণ্ঠ-ধ্বনিতে এর যুগ-যুগান্তের সমস্ত মহিমা ও আভিজাত্যই যেন চূর্ণ হয়ে গেল।

পণ্ডিত গোবিন্দ দাসের বক্তৃতার পর, শোভাযাত্রা ভিক্টোরিয়া বাজারের পথ ধরে চলে গেল।

টুলীপ উঠে দাঁড়ান। তাঁর ক্রোধে কম্পমান চোখ দু'টো আগুনের ভাটার মতো, ঠোঁট দুটো দৃঢ়-সংবদ্ধ,—সমগ্র দেহ কঠিন ও নিথর হিমেল ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধবার পূর্বমুহূর্তে—যেন মৃত্যুর আগে জমাট হয়ে যাওয়ার মতো।

'শয়তানের দল!' তিনি চিৎকার ক'রে ওঠেন: 'শয়তান! শয়তান!'

আমি তাঁর কথার কোন প্রতিবাদ করলাম না, মাত্র সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে শুধু তাঁর বাহু স্পর্শ করলাম।

'ওরা আমাকে সর্বস্বান্ত করেছে—' অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে তিনি বলেন: 'কিন্তু ওরা অন্তত আমার মেয়ে মানুষটাকেও তো ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পারতো…কিন্তু আমি ঐ বেনিয়া বুলচাঁদকে তার জীবনের শেষ শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব!'

পরবর্তি কয়েকদিনের মধ্যেই শ্যামপুরে নয়া শাসন ব্যবস্থার প্যাটার্ণ বেশ রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করল। প্রজামণ্ডলের তরফ থেকে এক মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হলো। মুখ্যমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করলেন পণ্ডিত গোবিন্দ দাস, এবং তিনি তাঁর অধীনস্থ লোকজনের মধ্যে এইভাবে আসন বণ্টন করলেন: হিজ হাইনেসের জ্ঞাতি ভাই রাজা প্রত্যুম্ন সিংকে দেওয়া হলো বিচার-সচিবের পদ, রাজ্য-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চৌধুরি রঘবীর সিং-এর সম্বন্ধে অন্য রকম গুজব রটলেও, তাঁকে তাঁর পদেই বহাল রাখা হলো। এবং সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলী, এবং সরকারী 'পরামর্শদাতা' শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্ পর্যন্ত সকলেই মহারাজ সাহেবের প্রতি আশ্চর্য ধরনের সম্মান দেখাতে আরম্ভ করলেন। এঁরা সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রচার ক'রে বললেন, হিজ হাইনেস ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের দলিলে স্বাক্ষর করেছেন, ভারত সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তিনি যে অপূর্ব মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য পুরোনো যতকিছু বাদ-বিসম্বাদ ছিল, এখন সেসব ভুলে গিয়ে এই সহৃদয় উচ্চ শিক্ষিত তরুণ দেশ-শাসকের ওপর যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করা এ রাজ্যের সকলেরই কর্তব্য।

হিজ হাইনেস কর্তৃক নব-বিধান মেনে নেওয়ার ফলেই এই

দাক্ষিণ্য। বিশেষ ক'রে দিল্লীর ষ্টেট-ডিপার্টমেন্ট বছরে মাত্র ত্রিশ লাখ টাকা ভাতা আর নীতিগতভাবে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পত্তির ওপর তাঁর এখতিয়ার মেনেও নিয়েছেন। মহারাজা সাহেবের ব্যক্তিগত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সবকিছুর স্থায়ী বন্দোবস্ত পরে করা হবে।

যাইহোক, টুলীপ কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হৃদয়ের দিক থেকে এই পরিবর্তিত অবস্থা মেনে নিতে পারছেন না। বিশেষতঃ এই "রক্তহীন বিপ্লব" তাঁর পারিবারিক বিপর্যয় ডেকে আনায় তাঁর অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। তিনি যখন জানতে পারেন যে, তাঁর গঙ্গীকে নিয়ে যে সরে পড়েছে, তাঁরই কৃপা-ভিখারী প্রাক্তন মোসাহেব সেই বুলচাঁদকে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করা হয়েছে, তখন হিজ হাইনেস একেবারে ভেঙে পড়েন।

এই অবস্থার ফলে গত কয়েকমাস ধরে টুলীপের ওপর যে স্নায়ুর তীব্র চাপ পড়েছিল, তা এখনই তাঁকে একরকম অসাড়ই ক'রে ফেলেছে; নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রায়ই তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন। আজ এই ঘটনার পরে তা প্রায় স্থায়ী হয়ে দাঁড়াল। দেহের দিক থেকে তাঁর কোন ত্রুটি নেই, রক্তের চাপও তাঁর বেশ স্বাভাবিক, শরীরের আভ্যন্তরিণ অবস্থাও ঠিক আছে, দেহও অটুট; কিন্তু এখন প্রায়ই তিনি অভিযোগ করছেন যে, তিনি ঘুমুতে পারছেন না, হৃদযন্ত্র সব সময়েই যেন ডুগির মতো ধপ ধপ করছে। আমার মনে হয়, গভীর কোন রোগ তাঁকে আস্তে আস্তে ক্ষয় ক'রে ফেলছে। ক্রমশঃ তিনি রোগা হয়ে পড়ছেন। বিবর্ণ মুখখানা দুঃখ-কষ্টের কুঞ্চিত দাগে ভরা, চোখের চারদিকে কালিমা। গঙ্গীকে নিয়ে তিনি যে অন্তরঙ্গ ও অটুট জীবন-যাপন করতেন, সেটা যেন তাঁর মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। আগের দিনের মতো স্বচ্ছন্দ উদ্যমপূর্ণ জীবন নিয়ে তিনি

যেন আর বেঁচে কোনদিন উঠতে পারবেন না। কিন্তু এই মৃত্যু-যন্ত্রণা চোখে দেখা বাস্তবিকই কষ্টকর। কারণ এই মৃত্যু-যন্ত্রণা চলেছে দিনের পর দিন ধরে। দিব্যদৃষ্টিতে তিনি গঙ্গীর চরিত্র ও মতিগতি এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ বুঝতে পারলেও, দীর্ঘকাল ধরে তার সঙ্গে একত্রে অবস্থানের অভ্যাসের দরুন অনুশোচনা ও মনোস্তাপ তাঁর এই দৃষ্টিকে ঝাপসা ক'রে দিচ্ছে। গঙ্গীর সঙ্গে তাঁর কি কি ঘটেছে এবং কতটা নির্বোধ আর নির্মমের মতো গঙ্গী সেই জীবন ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়েছে, এ-সম্বন্ধে অনবরত তিনি প্রলাপ বকছেন আজকাল।

কোন দর্শকের পক্ষে একটা মানুষের ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্য দেখার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো এই যে, ঐ অভিশপ্ত মানুষটির হৃদয়ের মধ্যে যে ক্লেশ ও যন্ত্রনার ঝড় বইতে থাকে, সেখানে তার পক্ষে সহজে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও ভেঙে-পড়া মানুষটির ভগ্ন হৃদয়ের দুঃখ তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর দুর্বিসহ চাপের মতোই চেপে বসে। ইংলণ্ডে অবস্থানের সময় আমি নিজেও তো এই যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম এবং একমাত্র তার স্মৃতিই আমাকে এই অবিশ্রান্ত যন্ত্রনার দুর্বিসহ বোঝা থেকে রক্ষা করছে। বিলাতে এক মেডিকেল ছাত্রীর সঙ্গে তিনটিমাস কী রঙীন নেশাতেই না আমার অতিবাহিত হয়েছিল! শেষপর্যন্ত কলেজ্ কর্তৃপক্ষ জাতি-বৈষম্য ও বর্ণ-বৈষম্যের সমস্যা তুলে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ির বিধান জারি করেছিলেন। আমার অভিজ্ঞতা কিছুটা অন্য ধরনের হলেও, আমি জানতাম যে, ভালোবেসে এবং ঐ ভালোবাসা হারাবার সময়, যখন চরম বিচ্ছেদ এসে পড়ে, তখন প্রেমিকের হৃদয় শতধা না হয়েই পারে না। একত্র বসবাসের অভ্যাস ছাড়াও দৈহিক সম্ভোগের মধ্য দিয়ে একটা ভাবগত সম্পর্কও গড়ে ওঠে, যে-সম্পর্ক অব্যাহত থাকলে তা ক্রম-বিকাশমান মানসিক সুখে পরিণত হয়। কিন্তু সে-বন্ধন যখন ছিন্ন হয়, তখন তা হয়ে দাঁড়ায়

মনস্তাপের এক ক্যান্সার ব্যাধি। এই ক্যান্সার বেড়েই চলে ও প্রেমের সমাধির পরেও সেই হারানো ব্যথার তীব্র খোঁচা কিছু কিছু মানুষকে অহরহ সইতে হয় হৃদ্‌-যন্ত্রের ব্যথার মতো, যা দেহ দাহ করার সময়ও বলে পুড়তে চায় না, বরং আগুনের স্পর্শে আরও শক্ত হয়ে যায়।

টুলীপ গঙ্গাদাসীকে ফিরে পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে খুঁজে বের করবার জন্য তিনি শ্যামপুরের চারদিকে চর পাঠান, কিন্তু কিছুতেই তার হদিশ পাচ্ছেন না। অবশেষে ফিরে আসার জন্য মর্মভেদী আর্তনাদের ভাষায় অতি করুণ ভাবে তার নামে একখানা চিঠি পাঠান বুলচাঁদের ঠিকানায়। তিনি লেখেন,—কেন সে তাঁকে ছেড়ে গেলো—তাকে ফিরে না পেয়ে আজ তাঁর এ কী মর্মান্তিক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন! এস গো, দেখে যাও!

কোন উত্তরই আসে না। শেষ পর্যন্ত নিজেকে ছোট ক'রে তিনি গঙ্গীকে ফেরৎ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন বুলচাঁদের কাছে। এরও কোন জবাব এল না। তাঁর অবস্থা হয়েছে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগরবুকে নিমজ্জমান মানুষের মতো। কোন রকমে নিজেকে ভাসিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং আমি যেন একখানা পিচ্ছিল দাঁড়, প্রাণপণে চেপে ধরে ভয়াবহ মৃত্যুর মতোই সেটাকে তিনি আলিঙ্গন ক'রে ভেসে থাকবার চেষ্টা করছেন।

'যদি ও আমার কাছে ফিরে আসে, একটি কড়া কথাও বলব না ওকে···যদি দেখা হয়, দয়া ক'রে ওকে এই কথা জানিও···'

ঘুমের ঘোরেও চলে তাঁর এই প্রলাপ। এমনকি আমার সঙ্গে কথা বলবার সময়েও মনে হয়, যেন তিনি নিজের মনেই জোরে জোরে বকে যাচ্ছেন, অভিযোগ ক'রে তিনি বলছেন, নিতান্ত অসহায় ও অসতর্ক অবস্থাতেই তাঁর ওপর এই আঘাত হানা হয়েছে।

তাঁর মনে হয়, গঙ্গাদাসী এমন এক স্থানে অবস্থান করছে, যা তাঁর নাগালের বাইরে। তাঁর চিঠিপত্রে এত কাকুতি-মিনতি থাকা সত্ত্বেও হৃদয় হীনা মেয়ে এমনি ক'রে কেমনে নীরবে অবস্থান করছে!

প্রেমের জন্ম বহু কবির সমাধি লাভের কথা শুনেছি, এবং নারীর জন্ম রাজ্য ত্যাগ করেছেন এমন অনেক বীর রাজার গাথাও পড়েছি। কিন্তু আশাহত ব্যর্থ প্রণয়ীর দুঃখ-যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে একটা মানুষের এই ভাবে শতধা চূর্ণ হওয়ায় বাস্তব দৃশ্য কোনদিনই আমার চোখে পড়েনি।

টুলীপের এ-শোক তো নীরব নয়। প্রাসাদ-কর্মচারীরা মহারাজের দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত। মুন্সীজী সান্ত্বনা দেন টুলীপকে :

'আমাদের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে তিন শ্রেণীর মানব-প্রকৃতির অস্তিত্ব রয়েছে মহারাজ : সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। প্রথমটি হচ্ছে পবিত্র ও সত্যবাদী, দ্বিতীয়টি মহানুভব, আর তৃতীয়টি হচ্ছে হীন, কু-প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ। গঙ্গাদাসী তৃতীয় প্রকৃতির মেয়েমানুষ। কাজেই, মহারাজ, ওকে ভুলে যেতে চেষ্টা করুন।...'

বৃদ্ধের হৃদয়হীনতায় কুপিত হয়ে টুলীপ তাঁর কোটরগত চোখ দু'টি বিস্ফারিত ক'রে শূন্য দৃষ্টিতে মুন্সীজীর দিকে চেয়ে থাকেন।

'মুখে বলা বেশ সোজা।' টুলীপের পক্ষ হয়ে আমি বলি।

'পৃথিবীতে কঁতো মেয়েমানুষ রয়েছে,' মুন্সীজী আবার বলতে শুরু করেন : 'আর টুলীপের পক্ষে এদের সকলকে বিয়ে করা তো সম্ভব নয়। কাজেই গঙ্গাদাসীকে ঐসব বাজে মেয়েমানুষেরই একজন মনে করলেই তো হয়।'

এই সহজ সরল বিশ্লেষণে আমি বেশ একটু কৌতুক অনুভব করি, এমনকি টুলীপের মুখেও সামান্য একটু হাসি ফুটে ওঠে।

'আমাকে ঠাট্টা করতে পারেন,' মুন্সীজী বলেন : 'কিন্তু ভগবানের

সুমহান সত্যের কাছে আমাদের তুচ্ছ প্রেম ও আত্মম্ভরিতার কোন স্থানই নেই! আমাদের সবাইকেই একদিন মরতে হবে। ভেবে নিন না কেন যে, গঙ্গাদাসী মরে গিয়েছে।...'

টুলীপের কাছে এই যুক্তিটা ভালই মনে হয়। কিন্তু তাঁর আহত মন তো যুক্তি মানতে চায় না। সাধারণতঃ মানুষ রক্ত-মাংসে সীমাবদ্ধ; সন্ন্যাস-ধর্ম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ক'রে খাটি সাধুর দৃঢ়তা নিয়ে তার অনুসরণ করা না হলে, বৈরাগ্য বা নির্লিপ্ততা দুটোই পার্থিব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে অর্থহীন হয়ে যায়। গৃহী-সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য অনুসরণ—সে তো এক আত্ম-বঞ্চনারই নামান্তর; তলস্তয় ও গান্ধীর পক্ষেও তা অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছে কিনা সন্দেহ। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সহজিয়া প্রেমের আকর্ষণ স্বীকার করার মতো সাধুতা উভয়েরই ছিল। লেভ তলস্তয় ছিলেন শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী। তাঁর মৃত্যুর পর "শয়তান" নামে তাঁর লেখা এক অপূর্ব গল্প পাওয়া গিয়েছে। জীবনের শেষের দিকে, এক সুতন্বী কিষাণ তরুণীকে দেখে তাঁর মনে যে দৈহিক কামনার তীব্র ক্ষুধা জেগেছিল এবং সেই মানসিক অনুপ্রেরণার দরুন তাঁর মনে যে নৈতিক আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল, এই আখ্যায়িকায় তিনি তারই বর্ণনা দিয়েছেন।

'দৈহিক কামনার ভূতই আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে।' মুন্সীজী বলেন।

মুন্সীজীর একথা টুলীপ স্বীকার ক'রে নেন। লজ্জিতভাবে তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

'তাহলে আপনাকে অবশ্যই ওকে ভুলতে হবে,' মুন্সীজী আবার বলেন: 'আপনাকে থাকতে হবে একাকীই। প্রত্যেক মানুষই যে নিঃসঙ্গ ও একাকী, এই বাস্তব সত্যটা একবার আপনি স্বীকার ক'রে নিতে পারলেই আপনি কুপ্রবৃত্তিগুলোকে জয় ক'রে মুক্ত হতে পারবেন।'

'বৃদ্ধ মুন্সীজী, আপনি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন নি!' বৃদ্ধের সহৃদয়তা উপলব্ধি করতে পারলেও, তাঁর আধ্যাত্মিকতায় অতিষ্ঠ হয়ে টুলীপ বলেন। 'আমার জীবন যে কিভাবে ওর সঙ্গে বাঁধা ছিল, তা আপনি বুঝতেই পারেন নি। ও যে আমার সত্তার সঙ্গে, আমার নাড়ীর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।...'

'নাড়ী হচ্ছে কামনালোক—হীনতর পাশবিক প্রবৃত্তির আশ্রয়-স্থল!' দর্শনের ভাষায় মুন্সীজী কথা বলছেন: 'মানবাত্মার এই পাশবিক দিকটা জীবনের মূলদেশে ক্যান্সারের মতো জন্মে মনটাকে খেয়ে ফেলে, জীবনের সুমহান সামঞ্জস্য ধ্বংস করে আর মনের ভেতর এমন প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি করে যে, যার কোলাহল ও বিলাপ জীবনের সমস্ত সুখ ও শান্তি নষ্ট ক'রে দেয়।'

মুন্সীজীর উক্তির ভেতরে যথেষ্ট পরিমাণে বাগাড়ম্বর থাকলেও তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে কিছুটা গভীরতাও ছিল; কিন্তু তাঁর কথা টুলীপের ভগ্ন-হৃদয়ের ওপর মোটেই রেখাপাত করতে পারছিল না। ভাববাদী আত্ম-সন্তুষ্টির খোলসের মধ্যে মুন্সীজী নিজেকে এতদূর আবৃত ক'রে রেখেছিলেন যে, টুলীপের দেহ-পিঞ্জরের বামভাগে অবস্থিত বেদনাহত পাখীটির পাখার ঝটপটানি তাঁকে আদৌ স্পর্শ করতে পারছিল না। আমার মনে হলো, মহারাজার প্রতি তাঁর অনুরক্তি, এবং এই রুগ্ন লোকটির জন্য তাঁর সাধারণ উদ্বেগ ছাড়াও তাঁর কথা-বার্তার ভেতরে ভগবচ্চিন্তায় উন্মত্ত বৈদান্তিক-সুলভ মুরুব্বিয়ানার একটা উদ্ধত ভাবও ফুটে উঠেছিল। বেদান্ত-বাগীশরা সব কিছুকে মায়া বলেই মনে করে থাকেন।

'যদি শুধু—যদি শুধু ও ফিরে আসতো!' টুলীপ বলেন: 'আমি ওকে নিয়ে যেতাম মধুমালতীর দেশে—কাশ্মীরে, নিয়ে যেতাম দক্ষিণ ফ্রান্সে, আমি ওকে নিয়ে যেতাম সাগরপাড়ে অথবা কোন পাহাড়-অঞ্চলে,

যেখানে কেউ আমাদের দেখতে পেতো না, যেখানে পরীদের দেশের মতো সব কিছুই থাকতো ইন্দ্রজালে ঘেরা, সেখানে নীল আকাশের-নীচে আমি ওকে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতাম। আকাশ-বাতাসের যাদুস্পর্শে ও আমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়তো, আমরা সাত বছর যে-ভাবে কাটিয়েছি, যেভাবে ও আমায় জড়িয়ে ধরে থাকতো ছোট শিশুর মতো, আমার ভালোবাসা ও আদর-সোহাগের সমুদ্রে অবগাহন স্নান করতো—হায়, কেন আমি একটুও ভাবিনি ? ও যা চাইতো—ঘর-বাড়ি, টাকা কড়ি, মণি মুক্তা—কেন ওকে দিই নি ?' হঠাৎ টুলীপ থেমে যান, তারপর আবার বলতে আরম্ভ করেন : 'আমি জানি, ও বারমুখ্যা ! মিঞা মিথুর পরামর্শানুযায়ী ওকে দূর ক'রে দেওয়াই উচিত…' বলতে বলতে মহারাজা যেন মনে মনে সত্যিই গঙ্গীকে দূর ক'রে দিচ্ছেন বলে মনে হয়। আত্মপীড়নের একটা ছাপ ফুটে ওঠে তাঁর চোখে-মুখে। 'বাঘিনী কন্যা, একটা কুত্তি, একটা সত্যিকারের কসবী, খানকী !…'

কিন্তু যতই বলুন, টুলীপ পারছিলেন না গঙ্গীকে মনের কোণ থেকে দূর ক'রে ফেলতে।

এবং কোন খবরই নেই গঙ্গীর। শ্যামপুরের আকাশ-বাতাস যেন মুখ এঁটে বসে আছে, গঙ্গীর কোন খবরই কোথাও পাওয়া যায় না। পিয়ারা সিং-এর নেতৃত্বে যারা অন্বেষণে বেরিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে। মহারাজা আজ সত্যিই পরাজিত, নিজের পরাজয়ের স্বীকৃতি তাঁকে যেন মেনে নিতেই হবে। গঙ্গী যদি সত্যিই ফিরে আসতে চাইতো, এ কয়দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা খবর, যে ক'রেই হোক, পাঠাতো।

পিয়ারা সিং টুলীপের কাছে এসে বলে : 'একটা কথা বলবো হিজ হাইনেস। হয়তো আমার কথা আপনার পছন্দ হবে না—'

কঠোর দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকান টুলীপ। পরমুহূর্তে মনে হয়,

হয়তো পিয়ারা সিং কিছু খবর দিতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি নরম হয়ে আসে।

'হুজুর, আপনারও তো আত্মসম্মানবোধ আছে। আপনার রাজপুত পূর্বপুরুষদের কথা একবার ভাবুন। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, ও-মেয়েকে আপনি ভুলে যান। আপনি যে পুরুষ মানুষ, সে-কথা মনে করেই তাঁকে ভুলে যান।'

টুলীপ মাথা নাড়েন।

মুহূর্তপরে তাঁর দু' চোখ ভরে জল আসে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেন।

'আরও তো অনেক মেয়ে পাওয়া যাবে হাইনেস! মেয়েদের কি দাম! গণ্ডায় গণ্ডায় মিলবে পয়সা ফেললে!'

টুলীপ পিয়ারা সিংয়ের দীর্ঘ দেহটাকে স্নেহের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর মনের নিভৃত কোণে অন্য মেয়েমানুষের কথা উঁকি দিয়ে গেল। আরও মেয়েমানুষ! অগনিত মেয়ে মানুষ! হয়তো বা এদেরই একজনকে তিনি গ্রহণ করতেও পারেন। তিনি বলেন:

'পিয়ারা সিং, তুমি জান না···হয়তো ওর দেহের গন্ধটাই আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।···'

তাঁর হাত-পা যেন বাঁধা গঙ্গীর সঙ্গে। কিন্তু কেন? কেন গঙ্গীর এই প্রভাব? সে-সম্বন্ধে অনবরত তিনি ভাবছিলেন। আপন মনেই বলেন: 'ও আমার সর্বস্ব কেন, কোন্ গুণে?···'

'পাহাড়ী-মাগীরা যে যাদু জানে!' মুন্সীজী বলেন।

'ওরা পুরুষকে ভেড়া বানাতে পারে।' পিয়ারা সিং মন্তব্য করে।

'একমাত্র মরে গেলেই ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টুলীপ বলেন।

'বাঁধনটা হচ্ছে মনের—' দর্শনের ভাষায় মুন্সীজী আবার বলেন:

'আপনার মন যদি ওর কাছ থেকে মুক্ত না হয়, তাহলে কিছুতেই আপনি মুক্ত হতে পারবেন না। মনই সব কিছু…'

'আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, আমি জানি, একমাত্র মৃত্যুই আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে, অথচ মরতে আমি চাই না।'

'অতটা দুর্বল হয়ে পড়বেন না মহারাজা', পিয়ারা সিং বলে: 'আমি বলি, গঙ্গা দেবী মরে যাক্। ওঁর প্রণয়ী বুলচাদ মরে যাক্, কিন্তু আমাদের মহারাজার যেন একটুও ক্ষতি না হয়।'

'সত্যিই আমি দুর্বল।' টুলীপ নিজের ত্রুটি স্বীকার করেন। তারপর তাঁর প্রতি পিয়ারা সিংয়ের অনুরক্তির দৌড় যে কতটুকু তা জানবার জন্যই তিনি যেন তার দিকে তাকান। তাঁর চোখে অদ্ভুত উন্মাদের দীপ্তি দেখে বেশ একটু অস্বস্তিই অনুভব করি। 'আমি দুর্বল—!' পিয়ারা সিংয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তিনি আবার বলেন।

'সামান্য জীবের মতোই আপনিও যদি মনে করতে থাকেন…' রুক্ষ ভাষায় মুন্সীজী বলেন।

টুলীপ নীরবে তিরস্কার স্বীকার ক'রে নেন এবং কোন উত্তরই দেন না।

'মিঞা মিথুর ধর্মোপদেশ চুলোয় যাক্, হুজুর—' পিয়ারা সিং বলে: 'চলুন, আমরা হাওয়া-প্রাসাদে গিয়ে একটু ফুর্তি করি।'

'আমার জন্যে কাকে নিয়ে আসবে?' টুলীপ জানতে চান। তাঁর মুখে কাম-লালসার একটা মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। যতদূর সম্ভব তিনি সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই পিয়ারা সিংয়ের ফরমূলা সম্বন্ধে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। মনের মধ্যে তিনি হয়তো অনুভবও করছিলেন, একটি নারী, যে-কোন একটি নারীই তাঁর অভাব হয়তো পূরণ ক'রে দিতে পারবে।

'আপনাকে নরম একটা পেয়ারা ফল এনে দেবো হুজুর!' পিয়ারা সিং বলে।

'আপনাকে কিন্তু এই কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করতে হবে।' মিঞা মিথু উপদেশ দেন: 'তা যদি না পারেন, আপনাকে আরও কষ্ট ভোগ করতে হবে।'

'সব কিছুই ত্যাগ করতে পারব মুন্সীজী—' পাশ ফিরে টুলীপ বলেন: 'কিন্তু গঙ্গীর কবল থেকে রেহাই আমার নেই। কেন, বোধ হয় একমাত্র ডাক্তার শঙ্করই তা বুঝতে পারে।...'

'হ্যাঁ,' আমি বলি: 'মনে হয়, বেশ বুঝতে পারছি, যদিও বাইরে থেকে তা উপলব্ধি করা কঠিন। কামনার উন্মাদনা ও আশাহত হওয়ার দারুণ জ্বালা কিছুটা অনুভব করতেও পারছি টুলীপ!'

'কিন্তু কি করবো আমি?' টুলীপ জিজ্ঞেস করেন।

'বোধহয় আপনাকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে—' আমি বলি: 'শিবের মতোই আপনাকে বিষ পান ক'রে নীলকণ্ঠ হতে হবে। শিবের মতোই মহাকালীকে আপনার দেহ পদদলিত করতে দিতে হবে —তারপর আপনার নিগ্রহ ভোগ শেষ হলে আস্তে আস্তে নিরাময় হতে থাকবেন, কিছুটা সোয়াস্তিও লাভ করবেন। কিন্তু শান্তি পাবেন না মনে।...

'যে যতই উপদেশ দিক, তোমার উপদেশটাই সব চেয়ে খাঁটী। এ আমাকে ভোগ করতেই হবে। রাত্তির বেলায়ই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাই। শুধু এপাশে আর ওপাশে গড়াগড়ি করি। মনে হয়, যেন গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছি। বুলচাঁদ ওকে উপভোগ করছে—একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা আমার ভেঙ্গে যায়। যদি ও অন্য কাউকেও গ্রহণ করতো!... আমার বুক-ভরা ভালোবাসা আমি কাকে দিয়েছি? ও যে অবিশ্বাসিনী...উঃ, আমি যে ভাবতেও পারছি না, পাগল হয়ে

যাবো আমি! কেন ইন্দিরাকে ভালোবাসতে পারি নি? কেনই বা ঐ কসবীর প্রেমে পড়লাম?'

মহারাজার এই কথাগুলো শেষ হওয়ার পর একটা বিশ্রী ধরনের নীরবতা বিরাজ করে।

'কষ্ট ভোগ করুন, দুঃখ সহ্য করুন।' আমি বললাম: 'নিরন্ধ্র অন্ধকারের ভেতর দিয়েই আপনাকে এগুতে হবে টুলীপ!'

রাজ্যে নতুন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামপুরে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। একটি মাত্র দলের শক্তি ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষার জন্য যখন গণতন্ত্রের ছদ্ম আবরণ সাজানো হয় তখন সে গণতন্ত্র কখনই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে না। যেমন নষ্ট হয়ে যায় প্রকৃত প্রেম যখন তাকে স্রেফ দেহভিত্তিক ক'রে দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়। সর্দার প্যাটেল সত্য সত্যই প্রজামণ্ডল পার্টির হাতে অধিকাংশ ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। এই পার্টি বহুলাংশে গণতান্ত্রিক নীতি অবলম্বনও করেছিল, সামন্ততান্ত্রিক সর্দারদের মাত্র একটি মন্ত্রিপদই দেওয়া হয়েছিল, সোশ্যালিষ্টদেরও কিছু দেওয়া হয়নি, আর কম্যুনিষ্টদের কথা তো উঠতেই পারে না। কিন্তু এই সব শক্তির মধ্যে সাম্য রক্ষার, কাজেই অনর্থ সৃষ্টির, চাবিকাঠি রয়ে গিয়েছিল শ্রীগোপতলাল জে. শাহুর হাতে। শ্রীযুত শাহু কেবলমাত্র সর্বতোমুখী নির্লজ্জ ডিক্টেটরী মনোভাবই প্রদর্শন করছেন না, সোশ্যা-লিষ্টদের দাবিয়ে রাখার জন্য এবং কম্যুনিষ্টদের চূর্ণ করার প্রয়োজনে বামপন্থী-বিরোধী অভিযান সংগঠিত করবার চেষ্টাই শুরু করলেন, বিভিন্ন দলের মধ্যে ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করলেন এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি ক'রে শ্যামপুরে নিজের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার প্ল্যান ক'রে কাজ শুরু করলেন। নিজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আইন-সম্মত

ক'রে নেওয়ার উদ্দেশ্যে, সর্দার প্যাটেলকে দিয়ে তিনি শ্যামপুরের পোলিটিক্যাল এডমিনিষ্ট্রেটর রূপে আপনাকে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ক'রে নিলেন।

প্রথমের কাজ প্রথমে করাই কর্তব্য। তাই কালবিলম্ব না ক'রে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে উধমপুর ও পান্না জেলার কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি নিয়োগের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চৌধুরী রঘবীর সিংকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখাতে চাইলেন তিনি। কম্যুনিষ্ট বিরোধী অভিযান সফল হলে তাকে উচ্চতর পদের লোভ দেখান হলো। প্ল্যানটি রঘবীরের বেশ মনে ধরল, কারণ, প্রথমতঃ রাজ্যের ফৌজ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে এ যেমন তার কর্তব্যও, তেমনি এডমিনিষ্ট্রেটরের এই অনুগ্রহ প্রদর্শনের মধ্যে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, মহারাজার সঙ্গে তার সম্পর্কের জন্য শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্ তাকে সত্যিই বিশ্বাস করে কিনা, তা বুঝতে না পেরে তার মনে কিছুটা আশঙ্কাও রয়েছে। বুলচাঁদকে হামেশাই এড্‌মিনিষ্ট্রেটরের কাছে যাতায়াত করতে দেখে সে একটু অস্বস্তি বোধ করে, এই বিশ্বাসঘাতক বেনিয়াকে মনে মনে ঘৃণাই সে করে। আজ সে গঙ্গীদাসীকে নিয়েই সরে পড়েছে। গঙ্গাদাসী, রঘবীরের মতে ঘৃণিত গর্দভ বুলচাঁদের উপযুক্ত হতে পারে না, গঙ্গী থাকবে হিজ হাইনেস অথবা কম্যাণ্ডার-ইন্‌ চীফ অর্থাৎ তার রক্ষিতা হয়েই। তাছাড়া সে বুঝতে পেরেছিল যে, রাজা প্রদ্যুম্ন সিংয়ের সঙ্গে পোপতলালের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্যামপুরের রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ ঠিক ধরতে পারছে না ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রঘবীর সিং এবং তারই ফলে শ্যামপুরের রাষ্ট্র-জীবনে প্রথম বড় রকমের একটা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করেই সে বসল।

শ্যামপুরে দ্বিতীয় অসামঞ্জস্য ঘটল এডমিনিষ্ট্রেটর ও পণ্ডিত গোবিন্দ দাসের মধ্যে। সবচেয়ে সুসময়েও দ্বৈতশাসন হলো নিকৃষ্ট ধরনের শাসন ব্যবস্থা। আর শ্যামপুরে এখন এডমিনিষ্ট্রেটরের অফিস ও মুখ্য-মন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েট থেকে দু'রকমের হুকুম জারি হতে থাকে, ষড়যন্ত্র-বিদ্যায় সুনিপুণ দুই ওস্তাদই কেরামতি দেখাতে শুরু করলেন এবং তার ফলে এক সাংঘাতিক ধরনের অবস্থারই সৃষ্টি হলো।

আর একটা অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হলো ছোটখাট মন্ত্রীদের আত্ম-কোলাহলের মধ্যে। এদের মধ্যে পূর্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুত ওমপ্রকাশ শাস্ত্রী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র ও পুলিস বিভাগ নিজের হাতে নেবার দাবী করেন। শিক্ষা-বিভাগ ছাড়াও এই দুটো বিভাগই মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছিলেন।

আর একটি অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করলেন সমাজতন্ত্রী নেতা প্রকাশচন্দ্র বর্মা ও স্বামী শ্যামসুন্দর। নিখিল ভারত সমাজতন্ত্রী অভিযানের অংশ হিসেবে এঁরা কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে গদিচ্যুত করতে চেষ্টা করলেন।

আর এই সমস্ত অসামঞ্জস্যকে ছাপিয়ে উঠল রাজ্যবাহিনীর সঙ্গে কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের সংগ্রাম। বন-জঙ্গল ও পল্লী-অঞ্চল হলো কম্যুনিষ্টদের অবাধ বিচরণ ভূমি।

বাদ-বিসম্বাদ, দম্ভ, গালগল্প আর ঘৃণায় সমগ্র আবহাওটাই বিষিয়ে উঠেছে আর ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি ও চোরা বাজারের ধূম্রজাল শ্যামপুরের অন্দর-বাহির, অফিস-কাছারীতে দিবালোকেও এমন আঁধারের সৃষ্টি করল যে, নিজেকে বা অন্য কোন জিনিসকেই আর চিনবার উপায় রইল না।

এবং এ সত্ত্বেও এই সুপ্রাচীন ভূমিতে আকাশ-বাতাস কম্পিত হয়ে উঠল গুলি-গোলার আওয়াজে। কম্যুনিষ্ট গেরিলারা রাজ্য-বাহিনীর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকার ও ধূম্রজালের মধ্যে গুলি

চালিয়ে এমন বহ্নিশিখার সৃষ্টি করেছিল, এবং তার থেকে এমন একটা অপার্থিব জ্যোতি বের হচ্ছিল যার সাহায্যে শ্যামপুরের ভাগ্য লিপি পাঠ করা অসম্ভব।

চাষীদের সরলতা প্রায়ই বিজ্ঞ-লোকদের চিন্তার আবিলতা কেটেই সোজা বেরিয়ে যায়। এবং যেহেতু ভারতবর্ষে পুরাতন মূল্যমানের ওলোট-পালট হলেও তার স্থলে নতুন কোন মূল্যমানের সৃষ্টি হয়নি, আর স্কুল-ইনস্পেক্টারের চেয়ে পুলিস ইনস্পেক্টার যেখানে বেশি সম্মান পেয়ে থাকে, এবং যেখানে ধনী চোরা-কারবারীরা তাদের অসাধু উপায়ে অর্জিত টাকা দিয়ে খুশিমত সবই করতে পারে, সেখানে টাকার মূল্যমানের সার্থকতা এইভাবে চালু হওয়ার ফলে এক নতুন ধরনের বর্বরতা সমাজের বুকে তার শুঁড় বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে।

শ্যামপুরের এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে চিন্তাশীল যাঁরা তাদের অবস্থা ভারি বিশ্রী হয়ে উঠেছে। আমিও তো এই পরিস্থিতিরই অন্তর্ভুক্ত, এই মরণোন্মুখ সমাজের দূষিত আবহাওয়া বুকে ভরে গ্রহণের জন্য আমারও আত্মা মোটেই সুস্থ নয়। টুলীপের নাটকীয় ব্যাধি সম্বন্ধে আমি প্রায়ই চিন্তা করি···তাঁর মনটা তো আমার চেয়েও অনেক বেশি ব্যধিযুক্ত। পুতুল-নাচের পুতুলের মতো তাঁর জীবনটা পুরোনো নৃত্যমঞ্চ থেকে স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছে। সামাজিক ও মানবিক শক্তির টানা-পোড়েনে তিনি ধাক্কা খেতে খেতে শুধুমাত্র সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক জীবনের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে ছোটখাটো সংঘর্ষেই নয়, শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর নিজের প্রজাদের সঙ্গেও চরম সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছে।

বাস্তবিক পক্ষে আমার মনে হয়, পরিবর্তনের যুগে টুলীপের মতো লোকদের এই যে ব্যাধি হয়েছে, তা হলো তাঁদের ছিন্ন মূল অবস্থা থেকে উদ্ভূত।

এক সময় এই বংশের সর্বশেষ নামকরা ব্যক্তি টুলীপের পিতামহ, ছিলেন প্রায় দেবতার সামিল, প্রজাসাধারণের ভয়-ভক্তিতে পরিবেষ্টিত এক কড়া মহারাজা। ব্রাহ্মণদের রচিত তাঁর কোষ্ঠীপত্রে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল : মহারাজাধিরাজ শ্রী১০৮ নরনারায়ণ শ্রীমান মহাপণ্ডিত, মহাশর্মা, শ্রীশ্রী বিক্রম সিংজী। দশহরা, শিবরাত্রি, দেওয়ালি, পূর্ণিমায় রাজ্যের সমস্ত অনুষ্ঠানেই মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতেন। রাজ্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কও ছিলেন তিনি। আর এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সময়, মন্দিরে মন্দিরে বাজতো ঘণ্টাধ্বনি, বাজতো ব্যাণ্ড আর রাজধানীর বড় বড় রাজপথের ভেতর দিয়ে মহারাজাকে যখন শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হোত, তখন প্রজাসাধারণ সমস্বরে চিৎকার ক'রে তাঁকে অভিবাদন জানাতো। আর এই সমস্ত পূজা-অর্চনার প্রতিদান হিসেবে রাষ্ট্রের অধিনায়ক গরিব দুঃখীকে লক্ষ্য ক'রে মুঠো মুঠো মুদ্রা নিক্ষেপ করতেন। রাজ-প্রাসাদ ও বিভিন্ন মন্দির থেকে খয়রাত হিসেবে ভিখারীদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হতো। দেশের আইন-কানুনের ওপর ছিল তাঁর স্থান। খুব সম্ভব তিনি জীবন যাপন করতেন, পুরোনো রীতি-নীতি—শতাব্দীর পুরোনো প্রথা এবং সকলের ওপর, হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত রাজধর্মের অনুশাসন ও অনুজ্ঞা অনুযায়ী।

টুলীপের পিতার শাসনকালেও এই পুরোনো প্রথাই অব্যাহত ছিল।

এই রাজ-উদ্যানের মুষ্টিমেয় জনকয়েক লোকের জন্য সব কিছুই সুন্দরভাবে রাখা হতো, কারণ এঁরাই তো বহু লোকের হয়ে চিন্তা করতেন! পৃথিবীটা যে ইতিমধ্যে একটা আগ্নেয়-গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, তা এই চিন্তাবীররা কেউই অনুভব করতে পারেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন আরম্ভ হলো, তখন কিছু কিছু লোক, দু'টো প্রতিযোগী সাম্রাজ্যের মধ্যে লড়াই হচ্ছে ব'লে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকে "বদমাশ কাইজার" ও "ন্যায়ধর্মী

ব্রিটেনের" মধ্যে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। অনেকে আবার নেতি-বাচক গড্ডালিকার স্রোতে ভেসে-যাওয়া জীবনের অনুসরণ করে চলাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা ক'রে ধর্ম, মেয়ে মানুষ বা অপর কোন কানাগলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। রুশ দেশ ছাড়া সর্বত্রই কেমন যেন একটা দিশেহারা ভাব। রুশিয়ায় লেনিন ও বলশেভিকরা জার-সাম্রাজ্য সমূলে উৎপাটিত করেন এবং সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে দেন যাতে মানুষ একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে এক নতুন ধরনের একটা যৌথ জীবন-যাপন করতে পারে। কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ায় যেসব মানুষ, পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেও, প্রাচীন জীবন-যাত্রার কাঠামো আঁকড়ে ধরে বসে আছে, তারাই কিন্তু সমাজ-জীবনে কতকটা ছিন্নমূল অর্থাৎ নিরাশ্রয় বলে মনে করে। উদারনীতিক গণতন্ত্রের অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এ ফলপ্রসূ হতে অনেক সময় লাগে এবং একমাত্র অতিমাত্রায় স্থিতিস্থাপক মানুষেই গণতান্ত্রিক ভাবধারার টানা-পোড়েনের মধ্যে যথোপযুক্ত জীবনযাত্রার পথ স্থির ক'রে নিতে পারে। স্বাতন্ত্রতাবাদী মানুষকে অন্তরের অনুপ্রেরণা বশতঃ শুধু ঘুরে বেড়াতে হয়। একটা জিনিস থেকে অপরটির এবং একটি মূল্যমান থেকে অপর মূল্যমানের পার্থক্য সে সবসময় ঠাহর করতে পারে না। কাজেই তার "স্বাধীনতা"-উপলব্ধিকে কাজে লাগাতে না পেরে, তাকে চিরদিন অপরাধী ও অসুখী অবস্থায় ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত অন্তরাত্মা নিয়েই জীবন কাটাতে হয়।

শ্যামপুরের নতুন অবস্থায় টুলীপের মনের উৎসাহ দমে যাওয়ায় তাঁর মূলহীন অবস্থাটা তাঁকে তাঁর নিজের কাছেই যেন অপদেবতায় পরিণত করে দিল। মহারাজা হিসেবে সমস্ত অধিকারই তিনি দাবী করছেন, অথচ, সাবেক কাঠামো অনুযায়ী কোন দায়িত্বই তিনি পালন করছেন না, আবার নতুন জীবনের মূল্যমান মেনে নিতেও তিনি অক্ষম।

অথচ নতুন অবস্থার মধ্যেই তাঁর এই সব হারানোর মূল খুঁজে নিতে হবে।

শ্যামপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পরবর্তী কয়েক দিন ধরে যে-সব খবর আসতে থাকে, তাতে এবং রাজপ্রাসাদে দিনরাত তাঁর বিশৃঙ্খল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে টুলীপের রোগটা আমার কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

একদিন শুনলাম যে, কম্যুনিষ্ট গেরিলারা লালচীন ও হায়দারাবাদের তেলেঙ্গানার মতো কেবলমাত্র চাষীদের মধ্যে জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা করেই থেমে থাকে নি, তারা এখন রাজ্যের সৈন্যদলকে পরাস্ত ক'রে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। শ্যামপুরের পুরোনো দুর্গ থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে নাকি তারা এসে গিয়েছে। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ দাস একদিন সকালে হিজ হাইনেসের সঙ্গে জরুরী পরামর্শের জন্য এলেন।

টুলীপের জ্বর হয়েছে, তাঁর দেহের উত্তাপ আজ সাতদিন হলো একশ'র নিচে নামে নি। খৃষ্টান তরুণী নার্স ডরোথি উষ্ণ তোয়ালে দিয়ে তাঁকে মাত্র গা মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। একটু ঠাণ্ডা ও শান্ত হয়েই পড়ে রয়েছেন তিনি। এরই মধ্যে এল গোবিন্দ দাসের আগমন-সংবাদ। হিজ হাইনেসের শরীরের যে অবস্থা তাতে দেখা-সাক্ষাৎ করা উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে এই কথা বলতে যাব, এমন সময় টুলীপ জিদ্ ধরলেন যে, পুরোনো শত্রুকে তিনি একবার দেখবেন।

চপ্পল পায়ে দিয়ে এবং পাছে কোন কিছুতে ধাক্কা লাগে এইজন্য তাঁর ঘরে-তৈরি ধুতি সামলাতে সামলাতে পণ্ডিত গোবিন্দ দাস একটু বেসামাল অবস্থাতেই কক্ষে প্রবেশ করেন। ছোট্ট গান্ধী-টুপিটা

ভদ্রলোকের গোলমাথায় মোটেই মানাচ্ছিল না। মৃদু হাসিতে মুখখানা কুঞ্চিত, এবং তারই জন্যে তাঁর মুখখানা আরো সাদা মনে হয়। কপালটা বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে আছে। দেখে মনে হয়, ভয় আর আশার দোলায় ভদ্রলোক যেন রীতিমত উত্তেজিত।

টুলীপ ইশারায় তাঁকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দেন।

হিজ হাইনেসের কাছে মাথা নোয়াবেন, না, প্রচলিত হিন্দু কংগ্রেসী প্রথায় হাত জোড় করবেন, পণ্ডিত গোবিন্দ দাস তা ঠিক করতে পারছিলেন না। মহারাজার ইউরোপীয় প্রথায় সাজানো শয়নকক্ষ পাশ্চাত্য সৌজন্য প্রকাশই দাবী করছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর মনের ভেতরেও নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শ্যামপুর রাজ্যে যে ভীষণ রাজনীতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা চলেছে, তারও মধ্যে মহারাজাকে ভয়টি প্রধান। কারণ, মহারাজাকে গদিচ্যুত করার মূলে তো তিনিই আর তাঁরই কল্যাণে রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশৃঙ্খলা। হিজ হাইনেসের প্রতি দুই ধরনের অভিবাদন জানানোর রীতির মধ্যে কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে সে-সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতেই ভদ্রলোক তাঁর বিরাট নিতম্বখানা আর্ম চেয়ারে স্থাপন করার সময় প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে নেন।

'মহারাজার মেজাজ-শরীফ তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে তিনি জিজ্ঞেস করেন।

'না, মেজাজটা আমার ভাল নয়,' বলেন টুলীপ: 'আমি আমার গদি হারিয়েছি, আমার মেয়েমানুষটিকেও হারিয়েছি...'

'আমি দুঃখিত হিজ হাইনেস।' পণ্ডিত গোবিন্দ দাস বলেন।

'ভণ্ডামি করবেন না!' হিজ হাইনেস চেঁচিয়ে ওঠেন: 'আপনিই আমার এই দু'টো দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী; আর আপনি কিনা...'

'মহারাজ, গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আমি প্রজামণ্ডলের

আন্দোলন পরিচালনা করেছি বটে কিন্তু মহারাজের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর কোন হস্তক্ষেপই আমি করি নি।' পণ্ডিত গোবিন্দ দাসের মাথাটি আপনা-আপনি নড়ে উঠে, কারণ একটু উত্তেজিত হলেই তাঁর মাথাটা কাঁপতে থাকে।

'কিন্তু আপনিই নেমকহারাম বুলচাঁদকে কাজে নিয়োগ করেছেন আপনার সেক্রেটারী হিসেবে! ঐ হারামী ব্যাটাই আমার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছে!' বালিশ থেকে মাথাটা একটু তুলে উত্তেজিত টুলীপ বলেন।

'পণ্ডিত গোবিন্দ দাস যদি আপনাকে এইভাবে উত্তেজিত করেন, তাহলে তাঁকে হয়তো চলে যেতেই বলতে হবে—' গম্ভীর-ভাবে আমি বলি।

'কিন্তু মহারাজ, আমি জানতাম না যে, শ্রীমতী গঙ্গা দাসী আপনাকে ছেড়ে গিয়েছে।' পণ্ডিত গোবিন্দ দাস বলেন। তাঁর নিরপরাধ সেকেলে বৈরাগী মনটা এই খবরে বিরক্তিতে ভরে ওঠে। 'আমি সত্যিই ঘূণাক্ষরেও জানতে পারিনি যে, বুলচাঁদ তাকে নিয়ে গিয়েছে। এডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীযুত পোপতলালই বুলচাঁদকে আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন।'

'এডমিনিষ্ট্রেটর নয়, মাগীর দালাল!' টুলীপ চেঁচিয়ে ওঠেন: 'সে নিজেও গঙ্গীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতিয়েছিল। ও ব্যাটা তো আবার বিয়ে করা লোক, তাই এখন গঙ্গীকে বুলচাঁদের হাতে তুলে দিয়েছে!...'

মেয়েমানুষের ওপর আজন্ম বীতস্পৃহ পণ্ডিত গোবিন্দ দাসের অতিমাত্রায় সংযত খাঁটী মনটা এ কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মুখখানা রাগে লাল হয়ে ওঠে। তাঁর ঘর্মাক্ত দেহ আরও ঘেমে ওঠে। নীরব হয়ে যান তিনি। কিন্তু এ তিনি যেন মেনে নিতে পারছেন না, তাই মাথাটা

তাঁর কেবল জ্বলতে থাকে। বিবেকবুদ্ধিহীন তিনি নন, যদিও যে-সমস্ত প্রভাব ও ভাব-ধারণা প্রাদেশিক রাজনীতিবিদ্দের মনোভাবটা গড়ে তোলে, তাঁর মধ্যে সেগুলোর মোটেই কমতি নেই। এই সমস্ত মনোভাব হলো: উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আজন্ম শঠতা, অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্তর্নিহিত ষড়যন্ত্র পরিচালনের যোগ্যতা,—ঠিক ক্ষমতার লোলুপতা বলা হয়তো ঠিক হবে না, বরং সম্মান-লাভের মনোভাবযুক্ত সঙ্কীর্ণ-চিত্ততা বলাই ঠিক—যদিও দু'টোই, আমার মতে, পদকের এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

'আপনার ঘরের মেয়েমানুষ যাতে আপনার কাছে ফিরিয়ে দিতে বুলচাঁদ বাধ্য হয়, তার ব্যবস্থা আমি করবো মহারাজ।' প্রতিটি কথার ওপর বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে জোর দিয়ে পণ্ডিত গোবিন্দ দাস বলেন। 'আমি বুলচাঁদকে বরখাস্ত করতে পারছি না, কারণ এডমিনিষ্ট্রেটর সাহেব তাকে আমার কাজে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছেন। আর এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার জন্যই তো আমি আপনার কাছে এসেছি। এডমিনিষ্ট্রেটর সাহেব যা ইচ্ছে তাই করছেন, মহারাজ। আমি হলাম রাজ্য কংগ্রেসের নেতা, মুখ্যমন্ত্রী, অথচ শ্রীযুত শাহুর বিনা অনুমতিতে আমি কিছুই করতে পারি না! আর·· কি করেই বা এ সব কথা আপনাকে বলি?···কিন্তু ঐ···ঐ কম্যুনিষ্টরা রাজ্যের সৈন্যদলকে হারিয়ে দিয়ে শ্যামপুর শহরের কাছে এসে পড়েছে—'

টুলীপ ক্রোধের আগ্নেয়গিরির মুখে চেপে বসে আছেন। একটা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তিনি হানলেন গোবিন্দ দাসের দিকে। যদি তাঁর রাজকীয় বা দৈহিক, কোন একটা ক্ষমতাও পুরোপুরি থাকতো, তাহলে তিনি এই কংগ্রেসী নেতাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতেন। দাঁতগুলো শুধু তাঁর কড়মড় ক'রে ওঠে। মুখ চোখ তাঁর লাল টকটকে, কিছু বলবার জন্য তিনি মাথাটা জোর ক'রে তোলেন, কিন্তু অবসন্ন হয়ে আবার পড়ে যান।

'এভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবেন না।' টুলীপের বালিশের কাছে বসে মাথায় মৃত্ করাঘাত করতে করতে আমি বলি।

'এই খবরটা দেবার জন্যই আমার কাছে এসেছেন, এ্যাঃ—?' টুলীপ চিৎকার ক'রে বলে উঠেন : 'আপনারা যখন আমার কাছ থেকে আমার সবকিছুই ছিনিয়ে নিলেন, তখন আমি আর কি করতে পারি?'

'মহারাজ,' পাণ্ডিত গোবিন্দ দাস উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন : 'দয়া ক'রে রাগ করবেন না, ভীতও হবেন না। সর্দারজী বলেছেন যে, কংগ্রেস রাজাদের শত্রু নয়। বাস্তবিক পক্ষে, সীমান্ত রাজ্যগুলোকে নিয়ে সর্দারজী যে ইউনিয়নের পরিকল্পনা করেছেন, তার রাজপ্রমুখ পদের জন্য মহারাজের নামই সুপারিশ করেছেন! আমার সমস্ত বক্তৃতায় আমি বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলে আসছি যে, আপনার দৈহিক নিরাপত্তা ও আপনার ধন-সম্পত্তির যাতে কোন ক্ষতি না হয়, রাজ্যের প্রজাসাধারণের এ-সবের ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, এ তাদেরই দায়িত্ব।··· শুধু, কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের মোকাবিলার জন্য এই সঙ্কটের সময়ে আমাদের এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। কারণ,—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ভাষা উদ্ধৃত ক'রে বলছি : "আমাদের সকলকেই একসঙ্গে ঝুলতে হবে, অন্যথায় আমাদের পৃথক পৃথক ভাবে ঝুলে মরতে হবে।"' বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের এ উক্তি উদ্ধৃত করতে পারার জন্য বাহবা লাভের আশায় মুখ্যমন্ত্রী আমার দিকে বড় বড় চোখ ক'রে তাকালেন।

কতকটা ভয়ে ভয়েই অমি উপলব্ধি করলাম যে, এখানে আমি মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছি এক প্রাদেশিক পলিটিসিয়ানের। খুব সম্ভব কর্তব্য-জ্ঞান সম্বন্ধে এঁর নিজস্ব একটা ধ্যান-ধারণা আছে। কিন্তু অতি সাধারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্যকিছু বোঝবার তাঁর কোন ক্ষমতা আছে ব'লে মনে হয় না। তাঁর কাছে মহারাজার ব্যক্তিগত জীবনের কোন মূল্যই নেই, কারণ, গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত এক-একটি

ইউনিট রূপে গণ্য হওয়া ছাড়া ব্যক্তির অন্য কোন মূল্যই তিনি বোঝেন না। মুখে উদার নীতির যত বুলিই তিনি আওড়ান না কেন, তিনি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, কাজেই গণতন্ত্রী তিনি নন। তিনি শাসক-গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত একটা অংশ মাত্র। নিজের এবং অন্যান্য মানুষের প্রকৃত জীবন সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুভূতিহীন; প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন সম্বন্ধেও তিনি একেবারে অন্ধ। অবশ্য আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের মনই সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ভয়, দ্বেষ-হিংসা, কুসংস্কার ও অনুভূতির মধ্যেই থাকে সীমাবদ্ধ, তবুও, দুনিয়ার বিভিন্ন ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের চেতনাকে বাড়িয়েই দেয়। আর আমরা যদি চিন্তাশীল হই, তাহলে আমাদের সংকীর্ণ জীবনযাত্রায় আমরা যে ঈর্ষার প্রতিযোগীতা ক'রে থাকি তার বাইরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে মধ্যে সচেতন ক'রে তুলে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে একেবারে বাদ না দিয়েও আমরা অধিকাংশ মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল সাধনের জন্য চেষ্টাও করি আর এইভাবে আমরা যে মানুষ, মনুষ্য-সমাজের প্রতি যে আমাদের একটা কর্তব্য আছে, তা খেয়ালে রেখে কিছু করতে চেষ্টা করি। কিন্তু পণ্ডিত গোবিন্দদাস দলগত রাজনীতিতে এতদূর জড়িয়ে আছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে পুরুষ বা নারী মানুষ হিসেবে তাঁর কাছে গণ্য নয়, তাঁর দৃষ্টি, দৈনিক সংবাদ পত্রের "সমসাময়িক চিন্তাধারা"র স্তম্ভ থেকে বাছাইকরা বড় বড় লোকদের কতকগুলো বুলি ছাড়া শ্যামপুরের দিক-চক্রবালের বাইরে যেতে চায় না।

'আমার নিজের রাজ্যে আমার স্ত্রীকে খুঁজে বার করবার শক্তিও যে আমার নেই আজ—' হতাশ ভাবে বিছানার ওপর বাহু দু'টো প্রসারিত ক'রে টুলীপ বলেন।

'খুব সম্ভব শেঠ সদানন্দের বাড়িতে আছে—' পণ্ডিত গোবিন্দ

দাস অনুমান করেন। কারণ, তিনি শুনেছিলেন যে, সুদখোর পুঁজিপতি সদানন্দের স্ত্রীর সঙ্গে মহারাজার এই রক্ষিতার হৃদ্যতা রয়েছে।

'ছেলেমানুষ মনে করেছেন আমাকে!' বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো টুলীপ চেঁচিয়ে ওঠেন। তিনি জানতেন যে শেঠ সদানন্দ গঙ্গাকে কখনই আশ্রয় দেবে না। টুলীপ এখনও বুঝতেই চান না যে, নিজের নিরাপত্তার জন্যে গঙ্গীর এ চলে-যাওয়া নয়। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ধনিকের কাছে সে অনায়াসেই আশ্রয় লাভ করতে পারতো। কিন্তু গঙ্গীর এবারের যাওয়ার পেছনে রয়েছে তার নতুন আর-এক কারণ।

'আমি মনে করেছিলাম, শেঠ সদানন্দের সঙ্গে যখন মহারাজার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে—,' মহারাজের পারিবারিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভান করবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুঁজিপতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর এই কটাক্ষ একেবারে অর্থহীন নয়, কারণ সদানন্দ সবসময়েই প্রজামণ্ডলের বাইরেই থেকেছে।

'হুঁ, সামান্য দু'একজন বন্ধু যে আমার আছে, তাও আপনারা বরদাস্ত করতে চান না।' পণ্ডিত গোবিন্দদাসের কটাক্ষের উত্তরটা তিনি ছুঁড়ে দিলেন : 'এবার তো আপনারা বিড়লা ও ডালমিয়াকে শ্যামপুরে আহ্বান করবেন। বেশ, তাই করুন। বাধা দেওয়ার এখন আর আমি কে? আপনারা আমাকে ধুলোয় পরিণত করেছেন। এবং আমি আজ একেবারে ভেঙে পড়েছি। নতুন নতুন যে-সমস্ত বিপর্যয় এগিয়ে আসছে, তাও মেনে নেব এমনি ভাবেই। মাথার ওপর তাল পাকিয়ে, আমার টুটি চেপে ধরে, বর্ষাকালের মেঘের মতোই বিপদ সব উড়ে আসছে দেখতে পাচ্ছি। আমি বাঁচতে চাই। সংগ্রাম করতে চাই। কিন্তু আপনারা আমার জীবনটাকে ধুলোয় পরিণত করেছেন। আমি যেন ঘূর্ণীর ধূলিকণার মতোই চক্রাকারে উড়ে চলেছি ...'

আমি বেশ বুঝতে পারি, এই পাগলামোর মধ্যেও, তাঁর রাজ্যে

"রক্তপাতহীন বিপ্লবে"র তাৎপর্যটা টুলীপ বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কংগ্রেস ও প্রজামণ্ডলের লোকেরা সত্যসত্যই অনগ্রসর অঞ্চলগুলো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পুঁজি নিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে উন্মুক্ত করতে চায়।

'মহারাজ,' হিজ হাইনেসের কথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন পণ্ডিত গোবিন্দদাস এবং তাঁর কাছে সাধু সাজবার প্রচেষ্টায় বলেন : 'আমি আপনাকে বলেছি যে, দেশীয় রাজ্যগুলোর ভারত-ভুক্তির পর মহা-রাজাদের পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে সর্দার প্যাটেল কথা দিয়েছেন।'

'ঠিক বলেছেন!' রুক্ষ ও উদ্ধত স্বরে টুলীপ বলেন : 'এই জন্যই সর্দার প্যাটেল আমার জ্ঞাতি খুড়ো রাজা প্রদ্যুম্ন সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, না! আর এই জন্যই আপনি তাকে মন্ত্রিসভার একটা পদ দিয়েছেন!···আচ্ছা, কম্যুনিষ্টরা যদি বিদ্রোহ করেই থাকে, তার কারণ হলো চাচাসাহেব ও অন্যান্য জায়গীরদার আমাদের ব্যক্তিগত জমিদারী-গুলোর প্রজাদের জমি-জমা ও ঘরবাড়ি জোর ক'রে দখল করেছে ব'লেই তো! আমি কম্যুনিষ্টদের ঘৃণা করি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ঘৃণা করি আমার আত্মীয়দের। কারণ তারাই তো আমার সর্বনাশের মূলে! আর আপনি, পণ্ডিতজী, রাজা প্রদ্যুম্ন সিং-এর পাশেই ব'সে তারই পরামর্শে চলেন!··· আর এখন বিপদে পড়ে ছুটে এসেছেন আমার কাছে।···'

আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, যে-মূল কারণ ও সেই প্রয়োজনে মৈত্রীচুক্তির ফলে তাঁকে সিংহাসন-চ্যুত হতে হয়েছে, তা টুলীপ বেশ বুঝতে পেরেছেন! আমি বুঝতে পারি যে, আত্মম্ভরিতা সত্ত্বেও, রাজনীতিবিদের মতোই তিনি নিজের দেনা-পাওনাগুলো মোটামুটি সহজ সরল ভাবেই হিসেব করতে পেরেছেন।

'চৌধুরী রঘবীরসিংয়ের জন্তেই সৈন্যদলের নিয়ম-শৃঙ্খলা না থাকায় কম্যুনিষ্টরা পল্লী-অঞ্চলে লুট-তরাজ করছে আর তার ফলেই আজ পান্না ও উধমপুরের এই গোলযোগ।' মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেষ্টা করেন।

'আবার আপনি আমার বন্ধু-বান্ধবদের আক্রমণ করছেন—' সিংহের মতো গর্জন ক'রে টুলীপ বলেন : 'জেনারেল রঘবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আমি শুনতে রাজী নই পণ্ডিতজী—'

'মহারাজ, অধীর হবেন না।' মুখ্যমন্ত্রীবলেন : 'চৌধুরী রঘবীর সিং নতুন সরকারের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। আমি তার ওপর দোষারোপ করছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি যে, দ্রুত পরিবর্তনের সময় যতসব বদমাশ আমাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করছে।'

'ও—! আমি ভেবেছিলাম, দুর্বল দেশ-শাসক হওয়ার বিশেষ অধিকার বুঝি শুধু আমারই আছে!' বিদ্রূপকণ্ঠে টুলীপ বলেন : 'আপনাদের প্রজামণ্ডল তো স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন!'

'মহারাজ, মিছিমিছি রাগ করছেন,' কুণ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠস্বরে অনুনয় ফুটে ওঠে : 'ধৈর্য ধরুন, আপনার সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত মনোভাব কি, তা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। আমাদের ঝগড়াটা ছিল ঘরোয়া ঝগড়া। আপনার ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের দলিলে স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে তা মিটে গেছে। অতীতকে ভুলে গিয়ে আমরা যাত্রা করতে চাই নতুন ভিত্তিতে। আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও টাকাকড়ি অব্যাহত থাকবে। এখানে নানাধরনের শিল্প গড়ে তোলবার যদি কোন পরিকল্পনা থেকে থাকে,—আর এসব নিশ্চয়ই থাকবে,—তাহলে যে-সমস্ত কম্পানী গঠন করা হয়েছে, তাতে আপনি বড় রকমের অংশীদার হিসেবে থাকতে পারবেন। শেঠ সদানন্দকেও আমি তা বলেছি। কলকাতা ও বম্বাই থেকে পুঁজিপতিরা এসে তাকে স্থানচ্যুত করবে বলে সদানন্দ বিশেষ ভীত হয়ে পড়েছে। শাসনতন্ত্র রচনাতেও আমাদের

রীতিমত হাত থাকবে। তা ছাড়া, কর-নির্ধারণ ও সম্পত্তি-রক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য রক্ষা-কবচেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই মনের কোণে কোনরকম ভয়ই রাখবেন না হুজুর।...'

'টাকাপয়সাতে আর আমার আকর্ষণ নেই,' অবসন্নভাবে টুলীপ বলেন: 'আমি শুধু চাই, বুলচাঁদকে আপনি বলুন, ও ব্যাটা যেন আমার গঙ্গীকে ফিরিয়ে দিয়ে যায়...'

কিছু সময়ের জন্য, পণ্ডিত গোবিন্দদাস হা ক'রে বসে থাকেন। পার্থিব ধন-সম্পদ ও সমাজের সর্বোচ্চ মঙ্গল সাধনের যে আদর্শ এতক্ষণ ধরে তিনি প্রচার করলেন, তার কোনটাই মহারাজার হৃদয় স্পর্শ করতে পারল না। একটা সামান্য মেয়ে মানুষ তাঁকে যে এতখানি পেয়ে বসেছে, তা দেখে বৃদ্ধ বিস্মিত হয়েছেন।

'রাতে আমি ঘুমুতে পারি না!' রোদন-ভরা কণ্ঠ টুলীপের: 'এক ঘণ্টা বা দু' ঘণ্টার বেশি ঘুমুতে পারি না। ঘুমের ঘোরে কথা বলতে বলতে জেগে উঠি, দেখি ঘেমে নেয়ে গেছি। আমার পাশে শুয়ে থাকতো গঙ্গী, আর আজ সেই স্থান শূন্য!...আমি পারি না সইতে! ওকে ছাড়া আমার বিনিদ্র রজনী যেন আর শেষ হতে চায় না। আমি জানি, ও-মেয়ে ব্যাভিচারিণী, তবুও চাই ওকে। ও যে আমার, শুধু আমার, এটুকু বুঝবার জন্য ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাই। যদি ও ফিরে না আসে, আমি পাগল হয়ে যাবো।...' বলতে বলতে হাত দু'খানা মাথার ওপর তুলে মোচড়াতে মোচড়াতে আবার দু'পাশে ফেলে দেন, আহত কণ্ঠে বির বির ক'রে বলেন: 'হায়, আমি ভেঙ্গে পড়েছি, ভেঙ্গে পড়েছি!

আমার ভেতর দিয়ে একলজ্জা ও করুণার স্রোত বয়ে গেল। এই সর্বপ্রথম আমি উপলব্ধি করলাম যে, এক গুঁয়ে হলেও টুলীপকে যদি তাঁর ইচ্ছে মতো চলতে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি সত্যিই পাগল হয়ে

যাবেন। বিপদাশঙ্কার সীমারেখা পর্যন্ত পৌছোবার আগেই যে তিনি একেবারে ভেঙে পড়বেন, ডাক্তার হিসেবে আমি তাও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু যদি নিদ্রা-হীনতা এইভাবে চলতে থাকে আর গজীকে পাওয়ার তীব্র বাসনা ও ক্রমবর্ধমান বিরোধী পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মনের অসুস্থতাটাও চরমে পৌছোয়, তাহলে টুলীপ একেবারেই শেষ হয়ে যাবেন। একমাত্র আশা, তাঁর অন্তরের আঘাতটা যদি ধীরে ধীরে মন্থর ও মৃদু ব্যথায় পরিণত হয়, যা তিনি অনায়াসেই সহ্য করতে পারবেন, তাহলে বাইরের পরিস্থিতিটা তাঁর অবস্থাকে আর বেশি কিছু খারাপ করতে পারবে না। কারণ, যদিও তিনি নিরাশার অতল গহ্বরে ডুবে গিয়েছেন এবং এখন আগামী বেশ কিছুদিনের জন্য তাঁকে কোনরকম সাহায্য করা সম্ভব হবে না, তবুও সময় বুঝে প্রকৃত অবস্থাটা তাঁর কাছে বিশ্লেষণ ক'রে তাঁকে তাঁর জীবনের এই সমস্ত ব্যর্থতা সহ্য ক'রে চলতে হয়তো আমি সাহায্য করতে পারব।

'মহারাজ, আপনি ভাল হয়ে উঠবেন,' সান্ত্বনা জানিয়ে পণ্ডিত গোবিন্দ দাস বলেন : 'যেমন করেই হোক, কচ্ছু নিজমের বিপদাশংকা আমাদের দূর করতেই হবে।'

'আমি বুঝতে পারছি আরও অনেক বিপদ আমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে,' আপন মনেই বলতে থাকেন টুলীপ : 'আমার ভয়! ভবিষ্যৎকে আমার ভয়! নিজেকেই আমি ভয় করছি—ভীত হয়ে পড়ছি আমার নিজের চিন্তাতেই! কি একটা সাংঘাতিক বিপদের আশংকা করছি যেন। আমার চারদিকে সমস্ত অন্ধকার, অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।...'

'হাইনেস, এ ভাবে আর আপনাকে উত্তেজিত হতে দিতে পারছি না,' আমি এবার বলি : 'এ-ভাবে চললে আপনার অসুস্থতা কিছুতেই কমবে না।'

'কায়মনে আমি প্রার্থনা করি, মহারাজ সাহেব সেরে উঠুন,' হিষ্টিরিয়া রোগীর মতো মাথা নাড়তে নাড়তে পণ্ডিত গোবিন্দ দাস বলেন : 'আমি যাচ্ছি। মহারাজা শুধু এডমিনিষ্ট্রেটারের ওপর এইটুকু প্রভাব বিস্তার করুন, যাতে তিনি আমাদের কাজে বাধা না দিয়ে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন। মোটের ওপর শ্যামপুরবাসী আমরা আমাদের দেশকে তাঁর তুলনায় ভাল করেই জানি। আর তাঁর এটা বোঝা প্রয়োজন যে, কম্যুনিষ্টরা মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে রয়েছে…'

'পণ্ডিতজী, যে-লোকটাকে আপনারা অত্যাচারী ব'লে ঘোষণা করেছিলেন, তারই কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছেন—আজ এটা পরিহাসই বলতে হবে! বেশ, তাহলে একটা কথা বলে দিই, নতুন অত্যাচারীরা আমাদের সকলকেই ঠিক ঠিক স্থানে বসিয়ে দেবে। কম্যুনিষ্টদের অগ্রাভিযান পোপতলালও চাইছেন এখন, কারণ এরই সুযোগ তিনি নেবেন নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে।'

'তাই যদি তাঁর অভিসন্ধি হয়, তবে আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করবো!' পণ্ডিত গোবিন্দ দাস চিৎকার ক'রে বলে ওঠেন : 'তখন আমরা আর অহিংস থাকব না—'

'আচ্ছা, দেখব কতোটা আমি কি করতে পারি,' টুলীপ প্রতিশ্রুতি দেবার ভঙ্গিতে বলেন : 'কিন্তু আমি আশা করব, আপনি বুলচাঁদকে পদচ্যুত ক'রে এবং তার কাছ থেকে আমার স্ত্রীর ঠিকানাটা বের ক'রে দেবেন।'

'নিশ্চয়ই দেব, মহারাজ,' অপাঙে তাকিয়ে গোবিন্দ দাস বলেন। তারপর তিনি চেয়ার থেকে তাঁর ভারী দেহটাকে টেনে তোলেন, তখনও তাঁর অজ্ঞাতসারেই মাথাটা নড়তে থাকে। নমস্কার জানাতে জানাতে তিনি দু'গজ পেছিয়ে যান। তারপর কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে বাইরে বেরিয়ে যান।

সেদিন অপরাহ্নে টুলীপের সঙ্গে চা পান করতে বসেছি, এমন সময় ফিকে নীল রঙের দু'ফর্দ কাগজ আমার সামনে নাড়তে নাড়তে উত্তেজিত ভাবে তিনি বলে ওঠেন:

'শেষ পর্যন্ত চিঠি লিখেছে— !'

'কি লিখেছেন চিঠিতে? কোথায় আছেন?'

'ও আছে এখন শতদ্রু নদীর ধারে মাধোপুরের বড়-দাড়ী প্রাসাদে। বাড়িটি আমিই ওকে দিয়েছিলাম। ও বলছে, ও ওখানে একাই আছে, যদিও আমি জানি হারামী বুলচাঁদও ওর সঙ্গে আছে।...'

'কিন্তু গঙ্গা দেবী কি বলতে চান? কেনই বা তিনি এভাবে চলে গেলেন?'

'ভারী বিশ্রী ব্যাপার ড্যক্তার!' অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো তুলে টুলীপ বলেন: 'আমার বিরুদ্ধে কতকগুলো আজেবাজে অভিযোগ ও করেছে। কি ক'রে যে এরকম হীন হলো ও?...আমি মনে করতাম, আমার সঙ্গ পেয়ে কত আনন্দিতই না হতো, রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারেও ও প্রায়ই আমাকে সাহায্য করেছে। সাত বছর আমাদের একসঙ্গে বাস করার পর কি ক'রে ও এরকম হতে পারে! চিঠিখানা ইংরেজীতে টাইপ করা, নিশ্চয়ই ঐ শূয়োরের বাচ্ছা বুলচাঁদ চিঠিখানা লিখেছে—'

'কিন্তু গঙ্গা দেবী কি বলতে চান?' আমি আবার জিজ্ঞেস করি।

'ও বলেছে, আমি বলে মহারানী ইন্দিরাকেই পিয়ার ক'রে এসেছি, আর গঙ্গীর উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকার ক'রে নেবার কোন ব্যবস্থাই আমি করিনি!' এক নিশ্বাসেই তিনি কথাগুলো বলে ফেলেন। 'টাকা-পয়সা-সম্পত্তি এই সব আর কি!...ওর পূর্ব প্রেমিকদের কথা বললেই সব সময়েই ওকে আমি তিরস্কার করি কেন। ওকে বিয়ে করার কোন ব্যবস্থাই আমি করি নি কেন...ওকে সকলেই আমার রক্ষিতা ব'লে

তাকে এবং সে-সুযোগ আমিই বলে তাদের ক'রে দিয়েছি ওকে বিয়ে না ক'রে! আমি ওকে বেশি টাকা-কড়ি কোনদিনই দিতে চাই নি!...'

'হুঁ—' আমি বলি: 'কিন্তু এ-রকম নীচ-জাতের মেয়ের সঙ্গে আপনি পারবেন না টুলীপ—'

'ডাক্তার!' উত্তেজিতকণ্ঠে টুলীপ চেঁচিয়ে ওঠেন।

'আপনাদের সম্পর্কটা ঠিক সমানে সমানে ছিল না টুলীপ,' দৃঢ় কণ্ঠে আমি বলে ফেলি: 'আপনি যত অনুগ্রহই দেখান না কেন, ঠিক রক্ষিতা হিসেবেই তো গঙ্গাদেবী ছিলেন। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে রাজ্য-শাসনের ব্যাপারে এই জাতীয় সঙ্গিনী যে-ভাবে সাহায্য করতেন, সেই রকম শক্তিদায়িনী জীবন-সঙ্গী তাঁকে ভাবতে আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, গঙ্গা দেবী ছিলেন সেই সীমারেখার অনেক নীচে। আপনার সঙ্গে এই মধুর সম্পর্কটা তিনি অন্য উদ্দেশ্যে,—যেমন নিজের নিরাপত্তা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ধন-দৌলৎ, বাড়ি ইত্যাদির ব্যাপারে নিয়োগ করেছেন। ...আমার মনে হয়, তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য ও আধুনিক বেশ-ভূষা গ্রহণের দক্ষতাকে আপনি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব মনে ক'রে ভুল বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তিনি আদৌ আধুনিকা ও বুদ্ধিমতী নন, শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁর পক্ষে তা হওয়া সম্ভবও নয়। ডাক্তার হিসেবে আমার পরামর্শ হলো, আপনি তাঁকে ত্যাগ করুন।'

'কিন্তু আমি স্বেচ্ছায়ই তো ওকে বরণ ক'রে নিয়েছিলাম।'

'স্বাধীনভাবে বরণ ক'রে নিতে হলে নারীকেও সমান মর্যাদা সম্পন্না হওয়া প্রয়োজন। তখন যদি সে প্রেমের প্রতিদান দেয়, তা হলে সত্যিকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাস্তবিক পক্ষে, এরকম অবস্থায়, বন্ধন হয় আরো বেশি বাস্তব। এ সম্পর্কের মধ্যে বন্ধনের সন্দেহ থাকে না ব'লে তা গভীরতম ও অনুরাগপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্কেই পরিণতি লাভ করে। যে-কোন গভীর মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ তখন সবচেয়ে বিপর্যয়েই

পরিণত হয়। কিন্তু সে-সম্পর্ক ধরে রাখবার জন্য তখন তারা দু'জনেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি স্বীকারও করতে পারে।...'

'তুমি গঙ্গীকে আমার রক্ষিতা বলতে চাও—কারণ আমার সঙ্গে তার আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়নি বলেই তো?'

ঠিক সেই সময় নার্স ভরেথি ঘরে ঢুকলো চায়ের সরঞ্জামগুলো পরিষ্কার করতে। তার পেছনে পেছনে এল ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং।

'তাহলে তুমি কি মনে করো কিছুই করা যাবে না—' টুলীপ নিরাশ হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন। ব্যাপারটা যে গোপন রাখা দরকার সে-সম্বন্ধে তাঁর কোন খেয়ালই ছিল না।

'সব কিছুই করা যেতে পারে!' পিয়ারা সিং জোরের সঙ্গে বলে। পরিপূর্ণ আস্থায় তার সুন্দর মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, তার আঁটো-সাঁটো রেশমী সুট পরিহিত দীর্ঘ খেলোয়াড়ী দেহটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে সব কিছুই করতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতোই সে বলে যায়: 'নেপোলিয়ান বলেছেন, "অসম্ভব শব্দটা মূর্খদের অভিধানেই দেখতে পাওয়া যায়"।'

নার্স ট্রেটা নিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত আমি আর মুখ খুললাম না। তারপর যেই টুলীপের প্রশ্নের উত্তর দিতে যাব, অমনি ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং বলে উঠল: 'আমি একটা বিকল্প ব্যবস্থা স্থির করেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে নার্সের দিকে তাকিয়ে সে তার বাঁ চোখটা নাচাল।

'এই মুহূর্তে গঙ্গীকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলে খুব সম্ভব তিনি একগুঁয়েমির ভাব দেখাবেন।' কথাবার্তার মোড় ফেরাবার জন্য আমি বললাম: 'আর তাঁকে ফিরে পাওয়ার জন্য আপনার এই হাংলামো ভাব দেখানোটা কিন্তু তাঁকে আরো একগুঁয়ে ক'রে তুলছে। তাছাড়া, তিনি তো এখন নতুন প্রেমের গোলাপী নেশায় মশগুল—'

'আমি জেনে ব্যাটাকে খুনই ক'রে ফেলবো হুজুর!' পিয়ারা সিং আমার কথার মাঝে চিৎকার ক'রে ওঠে: 'চোর! হারামী ব্যাটা!'

'একটা কথা খেয়াল রাখবে,' পরাজিতের কণ্ঠস্বর টুলীপের: 'ও-ব্যাটা আজ নতুন সরকারের অংশ বিশেষ···ভাল কথা, পিয়ারা সিং, এডমিনিষ্ট্রেটারকে আমার কথা বলেছিলে? আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে সে?'

'সেই কথাই বলতে এসেছি, মহারাজ,' পিয়ারা সিং বলে: 'শ্যামপুরে নানারকম অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। শ্রীযুত পোপতলাল পণ্ডিত গোবিন্দদাস ও তাঁর মন্ত্রীদের পদচ্যুত করেছেন। আর শ্যামপুরের শাসনভার সম্পূর্ণ নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। কম্যুনিষ্টদের বিতাড়িত করবার জন্য রাজ্য-বাহিনীর সাহায্যে ভারতীয় আর্মি এসে পৌঁচেছে। এডমিনিষ্ট্রেটার নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। কিন্তু আজ তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত, তাই বললেন, কাল সকালে এখানে আসবেন।'

প্রচণ্ড ক্রোধে টুলীপ কেঁপে ওঠেন। ব্যর্থতার বিরক্তিতে তাঁর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। সামনে কুকুরের দল যেন ঘেউ ঘেউ করছে, সেগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই তিনি নিজে যেন গর্জন ক'রে ওঠেন: 'সবাই দূর হয়ে যাও! দূর হও! আমায় একা থাকতে দাও!'

আর তার পরেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মধ্যেই মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়েন। ভেতরে যে বেদনা তাঁকে কশাঘাত করছিল, সেটাকে উপড়ে ফেলে দেবার ইচ্ছাকৃত চেষ্টার দরুনই যেন তাঁর দেহটা বারে বারে কেঁপে ওঠে।

এরকম অবস্থায় তাঁকে একলা থাকতে দেওয়াই যে দরকার, তা আমি ঠেকে শিখেছি।

রাত প্রায় দেড়টা। আমি তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময় আমার ঘাড়ের ওপর একটা মৃদু চাপ পড়তেই আমার ঘুম আচম্‌কা ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি, নার্স ডরোথি টমাস আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কে ?' চমকে উঠে আমি চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠি।

'আমি—' ডরোথির গলার ভাঙা আওয়াজে মনে হলো সে যেন কাঁদছে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে আমার বিছানার পাশের আলোর স্থইচটা টিপলাম। দেখলাম, তার দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এক লহমার মধ্যেই বুঝতে পারলাম কি ঘটেছে। এতক্ষণে বুঝলাম, ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিংয়ের সেই বিকল্প ব্যবস্থার আচম্‌কা কথাগুলো টুলীপের অবচেতন মনে বেশ গভীর ভাবেই প্রবেশ করেছিল, তার সেই চোখের ইসারায় ডরোথিকে দেখিয়ে দেওয়া প্রায় নির্দেশ দানের কাজই করেছে…

আমি প্রায় যন্ত্র-চালিতের মতো জিজ্ঞেস করলাম: 'কি হয়েছে ডরোথি ? বসো !'

'ডক্টর, হিজ হাইনেসকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমি বারাণ্ডায় ঘুমিয়ে ছিলাম। সমস্তদিনের কাজের চাপে আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।…হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমার চেয়ারের হাতলের ওপর বসে আমার গালে হাত বুলোচ্ছে। ভাবলাম, বোধহয় স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু তাঁর মুখখানা আমার ওপর তখন ঝুঁকে পড়েছে। তিনি আমায় চুমু খাচ্ছেন ! বুঝতে পারলাম, মহারাজা। ভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম। মনে হলো, ইচ্ছে না থাকলেও চিৎকার ক'রে উঠবো। কিন্তু একটা বিশ্রী গণ্ডগোল স্থষ্টি হবে এই ভয়ে চিৎকার করতে পারলাম না। "কে ?

কে ?—" আমি চাপা কণ্ঠে বললাম: "চলে যান!" ভয়ে চোখ আমি খুলতে পারছিলাম না, যদিও তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে, এ মহারাজার কীর্তি। হঠাৎ যদি চোখ মেলে তাঁকে চিনে ফেলি, তিনি থতমত খেয়ে যাবেন। ফোঁস ফোঁস ক'রে তাঁর নিশ্বাস পড়ছে, তিনি আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। বুকটা আমার ভীষণভাবে কাঁপছে। তিনি আরো ঘন হয়ে আসতে লাগলেন। আমি সরে যেতে চেষ্টা করি। কিন্তু দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তিনি আমাকে পিষে ফেলছিলেন। "ছাড়ুন, ছাড়ুন, আমাকে দয়া ক'রে ওরকম করবেন না!" আমি প্রতিবাদ ক'রে বলি: "আমায় একটু ঘুমুতে দিন!" চোখের কোণ দিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করলাম। খরগোসের মতো আমি ভয়ে কাঁপছি। তাঁর মুখ চোখ জ্বলছে, নিশ্বাস আরো জোরে বইছে। সমস্ত দেহটা তিনি আমার ওপর চাপিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে তুলে নেবার চেষ্টা করলেন। কেউ এসে পড়বে এই ভয়ে আমি তখন আতঙ্কিত। আমি জানতাম তিনি আমাকে নিয়ে যাখুশী তাই করতে পারতেন আর আমিও নিন্দার ভয়ে চেঁচাতে পারতাম না। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হলো, তিনি যেন অন্ধ হয়ে পড়েছেন—আমার নীবিবন্ধে টান পড়ছে। আর তার পর···সাহসে ভর ক'রে, আমি দু'হাত দিয়ে তাঁকে ঠেলে ফেলে দিলাম।·· তিনি প্রতি-আক্রমণ করলেন না। তাঁর দিক থেকে নিশ্চয়ই আমার এ সত্যঘটনার স্বীকৃতি দিতেই হবে। তিনি কিন্তু এবার আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: "ঘুমোও, ঘুমোও ডরোথি, লক্ষীটি ঘুমোও।" তার পর তিনি চলে গেলেন। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। রুগী মানুষ, তাঁকে ঐভাবে ঠেলে ফেলে দিয়ে অন্যায়ই বোধহয় ক'রে ফেলেছি, এই আমার বারে বারে মনে হতে লাগল। তাঁর মনের অবস্থাটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তাঁর প্রতি একটা বেদনাবোধও আমার মনে জমেছে, তাঁর

স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ ক'রে গিয়েছেন, এজন্তে তাঁর প্রতি দুঃখও অনুভব করি। কিন্তু, ডক্টর, আমি আর কি করতে পারি? তাঁকে চলে যেতেই বলতে হলো। আমি নার্স আর নার্সদের এতে দুর্নাম! তাছাড়া আমার ধর্মে—আপনি জানেন ডক্টর যে আমি ক্যাথলিক—এ পাপ!…ডক্টর, এখন আমি কি করি? ভেবেছিলাম, এ তিনি কখনই করবেন না। আব আমার এত ভয় হয়েছিল!…'

'আচ্ছা, কেঁদো না ডরোথি। বারাণ্ডার একপাশে তোমার বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।'

'এতো রাতে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্ম আমি সত্যিই দুঃখিত ডক্টর। আপনার কাছেই আসতে হলো, কারণ আপনি ছাড়া বুঝবার মতো আর কেউই নেই এখানে। আমি যে চেঁচাইনি সেজন্ত আনন্দিত। তা হলে লোকজন সবাই জেগে উঠতো, কি বিশ্রী ব্যাপারটাই না হতো।'

'টুলীপের মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তুমি তাঁর সঙ্গে ওরকম ব্যবহার ক'রে ভালই করেছ ডরোথি। আমার মনে হয়, তিনি তোমার সম্বন্ধে নিজের মনে মনে একটা আকর্ষণ গড়ে তুলেছিলেন আর সেজন্তেই তোমার কাছে এসেছিলেন। অন্ম সময় হলে তিনি নিশ্চয়ই শেষ অবধি এগিয়ে যেতেন। তিনি যে অতটা যান নি তাতে আমি আনন্দিত। তাঁর সময় ভারী খারাপ চলেছে।…'

'আমার মনে হয় না যে তাঁর অজ্ঞাতসারে আমার বিছানাটা সরান সম্ভব হবে। আমি ওখানেই ফিরে যাই।'

'আচ্ছা, ঐ ছোট্ট কাউচটা আমার দরজার সামনে বারাণ্ডায় নিয়ে যেতে একটু সাহায্য কর তো। আমি ওখানেই শোব, একটু ডাকলেই জেগে যাবো।'

সু-গঠিত দেহ ডরোথির, যোগ্যা নার্স। সে শুধু কাউচটা বাইরে

আনতেই আমাকে সাহায্য করল না, আমার বিছানা পাততেও সাহায্য করতে চাইল। তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, এখন সে শান্ত, যদিও আশঙ্কার ভাবটা এখনও আছে···দেখে মনে হয়, একটা পাপ কাজের আশঙ্কা যেন তার অন্তর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে খুন ক'রে ফেলছে···

'কি ব'লে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব, ডক্টর!' সহজ সরল কণ্ঠে ব'লে উৎফুল্ল হয়েই সে চলে গেল। আশঙ্কার ভাবটা বিদ্যমান থাকলেও বারাণ্ডায় তার নাগালের মধ্যেই আমি ঘুমোব, এই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় তাকে এখন বেশ প্রফুল্লই দেখাচ্ছে। বাইরে ছোট্ট কাউচের ওপর আমি শুয়ে পড়লাম। ডরোথির এই ঘটনায় আমার মনের মধ্যে যে বিষম চাপ সৃষ্টি করেছে, তারি ফলে মাথাটা আমার ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। সে যে চিৎকার করেনি, টুলীপও যে অপযশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন, এতে বেশ স্বস্তিই অনুভব করলাম। তার পর ভাবলাম, যাতে এরকম হঠাৎ হঠাৎ কামনাতুর অবস্থা টুলীপের জীবনে ক্ষণকালের জন্যও আর না ঘটে, যেমন করেই হোক, তার ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। কারণ একেই তো টুলীপ আজ সর্বস্বান্ত, নিঃসঙ্গ ও অসুখী, তার ওপর যদি তিনি এখনও এইসব করতে থাকেন, তা হলে রাজ্যের মধ্যে তাঁর অবস্থা আরো বিশ্রী হয়ে দাঁড়াবে। তারপর আমার মনে হয়, পিয়ারা সিংয়ের রিপোর্ট যদি সত্য হয়, তা হলে অবস্থা একেবারেই চরমে পৌচেছে। কী যে করা যায়, তা আমি এখন নিজেই বুঝতে পারছি না। বোধ হয় টুলীপের পক্ষে একমাত্র উপায় পলায়ন, শ্যামপুর ছেড়ে চলে যাওয়া। ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের ফলে সঙ্কটটা সর্ব-ব্যাপক হলে অবশ্য টুলীপের পক্ষে কিছু কালের জন্য কিংবা দীর্ঘকালের জন্য সরে থাকলেই চলতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, গঙ্গীদাসীর এই অন্তর্ধানে—উদ্ধারের অপেক্ষায় অবলা

গদী যেন বসে আছে, টুলীপের তাই ধারণা—টুলীপ শ্যামপুর ছেড়ে যাবেন কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। আমার অন্তরে এক অজ্ঞাত সংগ্রামের ঝড় বয়ে যায়। আমি বেশ বুঝতে পারি যে, এই পরস্পর-বিরোধী চিন্তাগুলোর মধ্যে কোন সমাধানই সম্ভব নয়। এবং সেই সমস্যাগুলো হলো টুলীপের পক্ষে এই অসহনীয় পরিস্থিতি ...আবার লামাদের মতো তাঁর "শয্যা-পরিবর্তনের"ও দরকার—লামারা নাকি অমর, শুধু দেহ পরিবর্তনই করে, তারা মারা যায় না। মনের এ অবস্থায় ঘুমনো আমার পক্ষে সম্ভব হলো না, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমার মাথায় ভারী বোঝার মতোই চেপে বসেছিল; কিন্তু ভোর হওয়ার ঘণ্টা-খানেক আগে, শুধু অবসাদের জন্যই বোধ হয় স্বপ্নে-ভরা হালকা ধরনের নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

শ্রীযুত পোপতলাল জে. শাহ্ পরদিন সকাল ন'টায় যথারীতি প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। অনতিবিলম্বেই তাঁকে হিজ হাইনেসের সম্মুখে হাজির করা হলো।

তাঁর আসার আগে মানসিক উদ্বেগের জন্য টুলীপের অবস্থাটা সঙ্গীনই হয়েছিল। কারণ এডমিনিস্ট্রেটর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলে যে জটিলতার সৃষ্টি হবে, সে-সম্বন্ধে তিনি অস্পষ্টভাবে কিছুটা আন্দাজ করলেও, প্রকৃত অবস্থা যে কি দাঁড়াবে তা সঠিকভাবে বোঝেন নি। তাছাড়া, ডরোথির সঙ্গে তিনি যে প্রেমাভিনয় করেছেন, সেজন্য অপরাধের ভাবটাও তাঁর মনের মধ্যে ক্রিয়া করছিল। সকালে ডরোথির মধ্যে অদ্ভুত কোনকিছু আমি লক্ষ্য করেছি কিনা, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন। প্রশ্ন করার মধ্যেই তাঁর মুখের রঙও বদলিয়ে যায়—৯৯·৬° ডিগ্রী তাপের অস্বাস্থ্যকর রক্তিমাভা একেবারে

নীরস ফ্যাকাশে বর্ণে পরিণত হয়। জীবন্মৃত অবস্থাতেই তিনি অবসন্ন হয়ে শুয়ে ছিলেন।

শ্রীপোপতলাল কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করতেই টুলীপের চোখে ফুটে ওঠে একটা তীব্র ক্ষুব্ধ চাউনি। বিছানা থেকে কিছু দূরে একখানা উঁচু চেয়ারে এডমিনিষ্ট্রেটার বসলেন। বিচক্ষণের মতো নীরবতা অবলম্বন ক'রে শ্রীযুত শাহ্ জোড়হস্তে অভিবাদন জানালেন।

টুলীপকে দেখে মনে হয়, তিনি যেন ভয় ও সন্দেহের এক অতল গহ্বরে ডুবে যাচ্ছেন আর "যম" পোপতলালের নীরবতা তাঁর সেই অবস্থাটা যেন আরো ঘোরালো ক'রে তুলছে। কাজেই রাজপুত বংশোদ্ভব টুলীপ মৃত্যু-ভয়হীন রাজপুতের গর্ব নিয়েই রুখে দাঁড়ান। এডমিনিষ্ট্রেটারের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে তিনি বলেন :

'আমার মনে হয়, আপনি এসেছেন আমার সর্বনাশ ঘোষণা করতে।···আজ শ্যামপুরের কি অবস্থা করেছেন আপনারা? আমার ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের পর রাজ্যের এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী নই, দায়িত্ব আপনাদের।'

'মহারাজও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না,' শ্রীযুত শাহ্ উত্তর দেন : 'বর্তমানের অরাজকতা প্রাক্তন কুশাসনেরই পরিণতি। অত্যাচার! বেগার প্রথা! সর্বনেশে শিকার-প্রমোদ! বে-আইনী কর আদায়!— আপনার ভারত-ইউনিয়নে যোগদানের আগেই তো এ-সব ছিল। আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল কম্যুনিষ্টদের বড় সাঙ্গাত, ক্ষুধা!···না, হিজ হাইনেস, আপনি কিছুতেই দায়িত্ব এড়াতে পারেন না!···'

'কিন্তু আপনি ও প্রজামণ্ডল—আপনারা আসবার পর আপনারাই বা কি করেছেন?' উঠে বসে চিৎকার ক'রে টুলীপ বলেন : 'শোষণের বহর তো আপনাদের হাতে এসে আরো বেড়ে যাচ্ছে! আপনাদের গুজরাটী ও মাড়োয়ারী বেনিয়ারা আমার শ্যামপুরের প্রজাদের

চারদিক থেকে তাদের লোভের শুঁড় দিয়ে ঘিরে ধরবার জন্ম ছুটে আসছে!'

'আপাততঃ শুধু সৈন্তবাহিনীই আসছে,' শ্রীযুত শাহ্ বলেন: 'রাজধানীর বাইরে যে-সমস্ত ফুটোর সৃষ্টি হয়েছে তাতে ছিপি দেওয়াই আমার কাজ মহারাজ। রাজধানীর ওপর কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের হামলা রুখবার জন্ম আজই ভোর চারটায় ভারত-ইউনিয়নের স্থলবাহিনী রাজ্যের সৈন্তবাহিনী ও পুলিসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হিজ হাইনেস, আমি কাজ করতে চাই। যেমন করেই হোক্, আমাকে এই পচন রুখতেই হবে।'

'আপনাদের প্রজামণ্ডল অসাধু!' টুলীপ বলে ওঠেন: 'আপনার শাসন-ব্যবস্থা হলো...হুঁ! আমি জানি, চাকুরীর উমেদারী নিয়ে যত রকমের সব যা তা চলেছে—'

'সেইজন্মই তো নিজের হাতে সমস্ত শাসনভার গ্রহণ করেছি, হিজ হাইনেস!' শ্রীযুত শাহ্ বলেন: 'পণ্ডিত গোবিন্দ দাসের মন্ত্রিমণ্ডলীকেও দূর ক'রে দিতে হলো...'

ব্যর্থতার আক্রোশে-ভরা দৃষ্টি দিয়ে টুলীপ পোপতলালের দিকে তাকান।

'সর্দার প্যাটেলকে যখন বলেছিলাম যে, এইসব প্রজামণ্ডলের লোক অপদার্থ, তখন তিনি তা বিশ্বাসই করতে চান নি! এখন তিনি সৈন্তবাহিনী প্রেরণ করেছেন! আর আমি, শাসন করার জন্মই যার জন্ম, এ-সম্বন্ধে আমাকে কোন কিছুই বলা পর্যন্ত হলো না, অথবা আমাকে বিশ্বাসও করেন নি!...ক্ষমতা এখন বেনিয়াদের হাতে!...'

মহারাজার এইসব অপমানজনক কথা শুনতে শুনতে নিজের অবমাননাটা ঢেকে ফেলার উদ্দেশ্যেই শ্রীযুত শাহ্ ইচ্ছে ক'রেই শত্রুর ক্রূর দৃষ্টিতে টুলীপের দিকে তাকান। তারপর বলেন:

'মহারাজ, আপনাকে একটা কথা জানাতে হচ্ছে। আপনার অধিকার ও বিশেষ ধরনের সুযোগ-সুবিধেগুলো অব্যাহত রাখা হলেও, যাতে আপনি শাসন-ব্যবস্থায় কোনরকম হস্তক্ষেপ করতে না পারেন, সেই ভাবে আপনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য ষ্টেটস্-ডিপার্টমেন্ট আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

পোপতলালের এই চেপে চেপে কথা বলার ভেতরে ছিল ক্ষমতারই এক ভয়াবহ অগ্নিশিখা। লোকটি তাঁর মাংসল কালো কিন্তু সুশ্রী মুখখানা নিয়ে ব'সে ব'সে তাঁর ইচ্ছাশক্তিই যেন প্রয়োগ করছিলেন এই বিদ্রোহী, বেয়াড়া প্রিন্সকে অবনমিত ক'রে ভারতের 'বিসমার্ক'-এর হাতের ক্রীড়নক হিসেবে পরিণত করবার জন্য, টুলীপকে তাঁর বর্তমান অবস্থায় যোগ্য স্থানে নামিয়ে দেওয়ার জন্য।

টুলীপের মুখখানা আরো কালো হয়ে ওঠে। তাঁর অবমাননা এখন পূর্ণ, চেহারাখানা তাঁর ছন্নছাড়ার মতো হয়ে উঠেছে। সবই যে চলে গিয়েছে,—সব কিছু, প্রতিটি বস্তুর শেষ চিহ্ন পর্যন্ত! এখন নতুন শাসকদের কাছে নতি স্বীকার ক'রে, তাঁদের ইচ্ছার ক্রীড়নক হয়ে টিকে থাকারই ভাগ্যলিপি খুলে দেওয়া হয়েছে তাঁর সামনে, তা তিনি বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজ-প্রমুখ বা উপ-রাজপ্রমুখের উপাধিগুলো শুধু বসম্বদ ও জো-হুজুর রাজ-রাজড়াদের জন্যই সংরক্ষিত।

আর, তারপর, এতদিন যা চোখে পড়েনি, টুলীপের দুর্বলতার সেই আর-একটা দিকও আমার চোখে পড়ল। শ্রীযুত পোপতলালের কঠিন ও নির্মম শক্তি-লোলুপতার বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে লড়াই করছেন, তাও উপলব্ধি করলাম। পোপতলালের এই নতুন ক'রে ধাক্কা দেওয়ায় যে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, তাও বেশ দেখতে পেলাম। এতে যে তাঁকে কতদূর যন্ত্রনা দিচ্ছে, তাও আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, একটা আপস-মীমাংসার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে টুলীপের মধ্যে।

'দেওয়ান সাহেবকে একটু কফি দাও।' তিনি বললেন।

'না, হিজ হাইনেস। আমাকে এখুনি উঠতে হবে।' শ্রীশাহ্ শক্ত হয়ে বলেন: 'অনেক কিছু করনীয় কাজ পড়ে রয়েছে—'

'আমার স্ত্রীকে আপনারা ফিরিয়ে দিন!' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে হঠাৎ বলে ওঠেন টুলীপ: 'আপনারা আমার জীবনটাকে ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছেন।'

শ্রীযুত শাহ্ একটু থতমত খেয়ে যান এবং ক্ষণকাল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকেন। পরমুহূর্তে সামলিয়ে নিয়ে মৃদু ভাষায় বলেন:

'মহারাজ, ভুল বুঝেছেন। আমরা আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যাইনি!'

বেশ একটু সময় ধরে, দু'জনার মধ্যে চলে অবচেতন রাজ্যের ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড এক সংঘর্ষ। দু'জনেরই মুখে চোখে অদ্ভুত ধরনের তীব্র রঙের ছোপ ফুটে ওঠে।

'আপনারই আশ্রিত বুলচাঁদ তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে—'

টুলীপের এ ভাবে বলাটা হয়তো কতকটা ভদ্রতাহীন হয়েছে, তবু এই প্রকৃত অভিযোগের মুখে পোপতলাল জবাব দিতে পারলেন না। কাজেই আত্মপক্ষ সমর্থনের ভেকটা এবার ছেড়ে দিয়ে এবং স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ না করলেও টুলীপের নিকট যেন ক্ষমা প্রার্থনা হিসেবেই একটু নরম কণ্ঠে কিন্তু দৃঢ়ভাবে তিনি বলেন:

'মহারাজ, আপনার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই আপনার কাছে আমার এই অভিমত প্রকাশ করছি—আপনি ইউরোপে গিয়ে কিছুদিন অবকাশ গ্রহণ করুন এবং সুস্থ হয়ে উঠুন। বায়ু পরিবর্তনে আপনার যথেষ্ট উপকার হবে বলেই আমার মনে হয়।'

গম্ভীর প্রশ্নটা এভাবে সরাসরি এড়াবার প্রচেষ্টা দেখে টুলীপ আরো

কেঁপে যান। একটা নির্মম ধরনের আত্মচেতনা, তিনি যে এক সত্তাহীন অবস্থায় পরিণত হয়েছেন, এজন্ত একটা বিষম লজ্জা, তাঁকে ঘিরে ধরে। কারণ সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝতে পারেন যে, এডমিনিস্ট্রেটার গম্ভীর সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর না দিয়ে তাঁকে প্রকৃতপক্ষে রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ারই হুকুমজারি করছেন। মনের একটা তীব্র যন্ত্রনা-বোধ নিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন এবং ছাদের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন। তারপর হঠাৎ উন্মত্ত ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে তীব্র ঝাঁঝালো ভাষায় বলেন :

'বারে বারে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, আমার সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করা হবে, আমার গৃহ ও সম্পত্তি স্পর্শ করা হবে না। এখন বুঝতে পারছি যে, সমস্ত সন্ধি-চুক্তি ও সনদ একটুকরো কাগজ মাত্র। কোন কিছুই পবিত্র নয়, এমনকি কারুর মেয়েমানুষও নয়!'

'তাহলে তাকে শাসনে রাখা উচিত ছিল!' ক্রুদ্ধ পোপতলাল তীব্র আঘাতে উত্তরটা ছুঁড়ে দেন।

আবার সেই নীরবতা।

এক চরম পরিণতির দিকে এই কলহ গড়িয়ে চলেছে। আমি দেখি ও ম ২তাশার মধ্যে ডুবতে থাকি। আমি জানি শেষ পর্যন্ত এই কলহ মহারাজের উৎসাদনে পরিণত হবে। কিন্তু এদের মধ্যের এই নীরব অবস্থাটা ভারী বিশ্রী ধরনের। এদের ইচ্ছাশক্তির সংগ্রাম পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে যে কম্পনের সৃষ্টি করছিল, তা আমাকেও আশাহীন ও অবসন্ন ক'রে ফেলেছিল। আমার হৃদয়ের ভয়াবহ শূন্যতার মধ্যে আমি অনুভব করলাম, সমস্তই যেন শুকিয়ে গিয়েছে।

'আমি বুঝতে পারছি, মিঃ শাহ্‌, এখানে হিজ হাইনেস সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন না—' অবশেষে আমি মাঝে পড়ে বলি : 'বোধ হয়

তাঁর পক্ষে কিছু দিন ইউরোপে গিয়ে থেকে আসলেই ভালো হয়। আপনি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন ?'

'হ্যাঁ, ডক্টর শঙ্কর। যে করেই হোক, আমাদেরই তো ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি তো জানেন, হিজ হাইনেসকে আমরা সকলেই কিরকম শ্রদ্ধা করি। তাঁরও অবশ্য আমাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য। কিন্তু শ্যামপুরে আজ যে অসন্তোষের টগবগানি শুরু হয়েছে, তাও আপনাকে বুঝে দেখতে হবে। কম্যুনিষ্টদের অভিযানে যদি সামান্য শক্তিও বৃদ্ধি পায়, তাহলে এখানকার সমস্ত কাঠামোটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। এখন এই 'লাল ঝাণ্ডাওলাদের' পরাজিত ক'রে আবার শান্তি স্থাপন করাই আমাদের প্রধান ও আশু কর্তব্য। তাছাড়া, ভারত সরকার গণতন্ত্র সংস্থাপনের জন্য বদ্ধ-পরিকর। যেমন করেই হোক, গেরিলাদের প্রতিরোধ ক'রে আমাদের এই রাজ্যকে রক্ষা করতেই হবে। তা যদি না পারা যায়, তাহলে শ্যামপুরে আমাদের কিংবা মহারাজা সাহেবের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সর্দার প্যাটেল বারে বারে বলেছেন যে, তিনি দেশীয় রাজ-রাজড়াদের শত্রু নন…'

স্পষ্টতঃ আমাদের ওপর টুলীপের কোন নজরই ছিল না। তাঁর কপালে স্বেদবিন্দু জমে উঠেছে, চোখ দুটো রক্তের মতো লাল। তাঁর ঠোঁটের কম্পন দেখে মনে হলো, কোন রকমে তিনি চোখের জল ঠেকিয়ে রাখছেন। কপালে হাত দিয়ে তাঁর দেহের উত্তাপটা দেখবার ইচ্ছে হলো। কিন্তু পাছে তিনি ভেঙে পড়েন, এই ভয়ে হাত বাড়াতে সাহস হলো না। আমি নীরবে বসে রইলাম।

কক্ষের মধ্যে সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অবস্থা জমেই রইল।

হঠাৎ টুলীপ উন্মাদের মতো জোরে চিৎকার ক'রে উঠলেন :

'তোমাদের সকলকেই আমি খতম ক'রে ফেলব! নিশ্চয়ই করব! নিশ্চয়ই! গঙ্গীকেও! আর সেই শূয়োরের বাচ্চা বুলচাঁদকেও!…

আপাতত তোমার যা খুশী তাই করতে পার! কিন্তু আমার প্রজারা আমাকে ভালোবাসে! আমি জানি তারা আমাকে ভালোবাসে! তারা আমাকে ভুলবে না! তোমরা সব শয়তান, তোমরা সবাই তাই! তোমাদের আদর্শ হলো শুধু মুনাফা আর উৎকোচ আর দুর্নীতি!...'

'দয়া ক'রে একটু ঠাণ্ডা হোন, টুলীপ, একটু ঠাণ্ডা হোন!' তাঁর কাঁধটা আস্তে আস্তে স্পর্শ ক'রে আমি ধীর কণ্ঠে বলি।

তিনি জোর ক'রে আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে একবার জোরে ডুকরে কাঁদতে আরম্ভ করেন, সমস্ত দেহটা তাঁর কাঁপতে থাকে। হাত দিয়ে তিনি মুখখানা ঢেকে ফেলেন। চোখের জল রুখতে না পেরে এবং ফোঁপানিটাও চাপতে না পেরে তিনি বালিশে মুখখানা চেপে ধরেন।

আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম, পারলাম না কোনরকম সমবেদনার কথা বলতে। এ পাগলামো, হিষ্টিরিয়া রোগীর এ প্রলাপ সত্যিই অসহনীয়। টুলীপের এ ফোঁপানোর তিক্ততা আমার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করে। শক্তি সঞ্চয় ক'রে শ্রীযুত শাহকে যে অনুরোধ করবো এ-স্থান পরিত্যাগের জন্য, তাও পারছিলাম না। অবশেষে আমার মুখ খুলে গেল। মৃদু কণ্ঠে আমি বললাম:

'হিজ হাইনেসের অসুস্থতা যেন বাড়ছে...যদি তিনি এখন একলা থাকতে পারেন...'

শ্রীগোপতলাল আমার ইঙ্গিত বুঝলেন, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

এক সঙ্গে দু'ঘণ্টাও ঘুমুতে পারেন না টুলীপ—এই ঘুমুচ্ছেন, পর মুহূর্তে জেগে উঠছেন। এমনি করেই কেটেছে তাঁর শ্যামপুরের রাত্রিগুলো। গভীর চিন্তা তাঁকে সবসময়ে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। লণ্ডনে পৌছবার পরও, গঙ্গীর কাছ থেকে সাত হাজার মাইল দূরে এলেও গঙ্গী তাঁকে ছাড়ছে না।

এ অবস্থা যে খুব অস্বাভাবিক তা নয়। শ্যামপুরে যে আজ তিনি অপ্রয়োজনীয়। তাঁকে আর কেউ চায় না—না চায় এডমিনিস্ট্রেটর, না পাবেন তিনি তার গঙ্গীকে এই অবস্থাটুকু বুঝতেই তাঁর লাগল বেশ কিছু দিন। শেষ কয়েক মাস তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কেবল বুঝিয়েছি, চোখে আঙুল দিয়ে বাস্তব ঘটনা দেখিয়েছি। শ্রীগোপতলালের সেদিনের সেই কথার পর যখন লিখিতভাবে চিঠি এল তাঁর কাছ থেকে—বিনীত ভাষা হলেও তার নির্দেশ যে বেশ কঠিন—টুলীপ যখন তা বুঝলেন তখন আর বিদেশ যাত্রায় আপত্তি করলেন না। দেখলাম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কি গোপন পরামর্শ করলেন পিয়ারা সিংয়ের সঙ্গে। আমাদের বললেন, যদি গঙ্গীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় এই শেষ মুহূর্তে, তিনি তাকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে ক'রে, দরকার হলে জোর ক'রে নিয়ে যাবেন। পিয়ারা সিংয়ের সব গুপ্তচরই বিফল হলো, গঙ্গীকে পারল না তারা তার গোপনস্থান থেকে বের করতে। অবশেষে শ্যামপুর ছেড়ে আমরা রওনা হলাম বম্বের পথে এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাসনাল-এর ইওরোপগামী "মালাবার প্রিন্সেস" বিমান ধরতে।

দিল্লীর ট্রেনে চাপবার পর মহারাজার জ্বর কমল বটে, কিন্তু দেখলাম তিনি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন, এমন কি দশ পাও হাঁটতে

পারছেন না। অগত্যা আমাদের তখন দিল্লী থেকে হাওয়াই জাহাজে চেপে রওনা হতে হলে বম্বের পথে। বম্বে থেকে "মালাবার প্রিন্সেস"-এ চেপে আমরা সান্টাক্রুজ-এর বিমান বন্দর ছাড়লাম নরহোল্ট অভিমুখে। যাদের বিমান ভ্রমণ এই প্রথম, তাদের কাছে এ যাত্রা সত্যি মনমুগ্ধকর, যদিও পিয়ারা সিংয়ের পক্ষে দেহের তুলনায় বসবার স্থানটা অপ্রশস্তই ঠেকছিল। জেনিভার রক্তিম সুরা পান আর ইতালী ও সুইজ-আলপসের ওপর দিয়ে যাবার সময় মনোরম দৃশ্যাবলী আমাদের ও মহারাজাকে উৎফুল্ল ক'রে দিল বটে, কিন্তু বিরহী বিহঙ্গ টুলীপের কাছে যুদ্ধ পরবর্তী লণ্ডন মহানগরী মনটা দমিয়েই দিল যদিও মেফেয়ারে আমাদের জন্য ভাড়া-করা নয়নাভিরাম ফ্ল্যাটটা সত্যিই চমৎকার।

গ্রীক অর্থে আহম্মকের অবস্থাতেই পড়েছেন টুলীপ…একই ভাবনা-রাজ্যে তাঁর বিচরণ, শূন্য আঁখি, ভাঙা গাল, ভেঙে-পড়া দেহ—সবই যেন এক আশাহীন মানুষের প্রতিভূ। কিছুতেই তিনি ভাবতে পারছেন না যে গন্ধী তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারে। এ ঘটনা তাঁর কাছে একে-বারে অবিশ্বাস্য। গন্ধী যে নিম্ফোম্যানিয়াক, এ তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। রূঢ় ভাষায় গন্ধী-চরিত্র বর্ণনা করতে আমার ভদ্রতায় বাঁধে, তার নীতিবিবর্হিত চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে আমি থেমে যাই এবং তারই ফলে টুলীপ গন্ধী-চরিত্রের মধুর স্মৃতিগুলো কেবলই বলে যান।… আমিও ক্রমশঃই যেন এই বিরহ-বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে যে দুটো প্রাণী, তাদের প্রতি সমবেদনা উপলব্ধি করি। গন্ধী যে বারমুখ্যা, বারবনিতা—তার সেই মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিচার করেই তার পরিণতি ভেবে নেই, যেমন বিশ্লেষণ ক'রে গ্রহণ করি টুলীপের স্মরাতুর অবস্থাকে। গন্ধীর মধ্যেকার "জংলী" কামনাতুর অবস্থা তার বিশ্বাস-হীনতা, তার অতি নিচু ধরনের রুচিবোধ, লোভ,—এসব কিছুই ভ্রূক্ষেপ করেন না টুলীপ। গন্ধী যেন তাঁর দেবী, তাকে পাওয়ার জন্য তিনি অধীর, ব্যাকুল। এরকম

মোহাবিষ্ট ভাব সচরাচর দেখা যায় না। বেশ বুঝি যে, আমি ভাবপ্রবণ মন নিয়েই এদের এই দুর্বলতার বিচার করছি এবং তারই ফলে মানবচরিত্রের যত সব ভ্রষ্টতা নষ্টামী, সেই আদিম দৈহিক অত্যাচার থেকে মনের বিচিত্র বাসনা ও কল্পনা যা এদের চরিত্রে পরিস্ফুটমান, সেসব আমি না-মান না-মান করেও মেনে নিচ্ছি। এই অর্থে মানবচরিত্রের বিকৃত দিকটাই আমি যেন মেনে নিয়েছি, অর্থাৎ মেনে নিচ্ছি যে, স্নায়বিক রোগীর ইচ্ছাশক্তি মনের সেই আদিম অবস্থাতেই আঁকড়ে থাকতে চায়। অর্থাৎ মেনে নিচ্ছি যে, গজী তার মনের দিক থেকে যখন স্মরাতুর তখন তার স্বাভাবিক পরিণতি বারবনিতার জীবন, টুলীপও সেইভাবে কুকুরের মতো কামুকই থাকবেন।...একবার যে বারবনিতা হয়েছে, চিরকালই থাকবে সে সেই জীবনে, একবার যে স্মরাতুর হয়েছে তার স্মরজিৎ হবার উপায় নেই—এই তো স্বাভাবিক পরিণতি আমার এই না-মান না-মান ক'রেও মেনে নেওয়ার চিন্তাধারার!

একদিন পিকাডেলিতে হাঁটছি, এমন সময় হঠাৎ আমার নজরে পড়ল এক মধ্যবিত্ত ঘরের সুবেশা মহিলা বারলিংটন আর্কেডের শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বিরবির ক'রে বকছেন। চোখে তাঁর অর্থহীন বোকা দৃষ্টি। বুঝলাম স্নায়ুরোগী। আমাদের এ যুগে এই স্নায়ুরোগীর আধিক্য দেখে আমার মনে হয় আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার গলদের মধ্যেই এর কারণ নিহিত রয়েছে যার ফলে এই রোগীর সংখ্যা এমনি ক'রে ক্রমশঃই বাড়ছে এবং বাড়ছে প্রায় বহু দেশেই। যদিও আমি জানি, আমার এ অভিমত চিকিৎসকেরা অনেকেই মেনে নেবেন না।

এই মুহূর্তেই যেন আমি আবার নতুন ক'রে বুঝলাম যে, আমি টুলীপকে ভাল হতে স্যহায্য করতে পারি কি না-পারি সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, এ স্নায়ুরোগের রুগী যে তিনি হবেন তা নিশ্চিতই। জন্মকাল

থেকে যে অসম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন, এ রোগের মূল তো সেই ব্যবস্থার মধ্যেই। গঙ্গীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ির সময়েই এসে মিলেছে তাঁর সিংহাসন ত্যাগের সময়। এক হতভাগ্যকে যেন কি কি এক সর্বনাশী শক্তি গ্রাস করছে, শুধু তাই নয়, এ যেন গ্রীক ট্রাজিডির সমস্ত সামাজিক "নিয়তির" কেন্দ্রীভূত আক্রমণ, যার ফলে তিনি সদা ভেঙ্গে পড়ার অবস্থায় পড়েছেন, হয়তো ভেঙেও পড়বেন। কিন্তু অন্তরের এক দেদীপ্যমান শিখার জোরে তিনি সংগ্রাম ক'রে চলেছেন এবং এ সংগ্রাম তিনি ক'রে যাবেনও।

সাধারণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে টুলীপের এই অবস্থা আমি যে আগে একেবারেই বুঝিনি তা নয়, তবে বড়বেশী যেন গঙ্গীকে যুক্ত ক'রে আমি বিচার করেছি তাঁদের প্রবণতাগুলোকে, যেগুলোর উদ্ভব হয়েছে তাঁদেরই সামাজিক জীবনের মিলেমিশে চলার অভাব থেকে। তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক—সে-সম্পর্ক যাই হোক না কেন—এই সামাজিক ব্যবস্থারই তো সৃষ্টি। এ জিনিসটি আমি বিশেষ নজর দিয়ে দেখি নি আগে। শ্যামপুরের কোন্ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে এই সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা তো আমি জানি, আগামী দিনে এ পরিবর্তন যে আরও পূর্ণতা লাভ করবে, আমি তা বেশ স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পারছি।

বেশ গম্ভীর ভাবেই আমি ভাবছি এ নিয়ে। যে বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে বিচার ক'রে আমার এই ভাবপ্রবণতা জয় ক'রে সুষ্ঠু দৃষ্টিতে আমি দেখতে পারব সমস্যাটিকে, শ্যামপুর বাসের সময় সে-বাস্তব দৃষ্টির অভাব ছিল আমার মধ্যে। আর একটা কথা, টুলীপও তো শ্যামপুরের দায়দায়িত্ব থেকে এখন একেবারে মুক্ত, তিনি এখন খুশীমত চলতে পারেন। হয়তো এবার তিনি ভাল হয়ে উঠতেও পারেন যদি না তাঁর কঠিন ব্যাধি ইতিমধ্যে কঠিনতর হয়ে থাকে।

সুতরাং আমি গোড়া ধরেই শুরু করলাম। টুলীপ হলেন স্নায়ুরোগী। অদ্ভুত অদ্ভুত বাসনা-কামনা, আকাশচুম্বী কল্পনা, ভয় আর ভীতিপ্রদ পরিচয়-চক্রের মধ্যেই তিনি বাঁধা এবং এসবেরই মূলে থেকে গিয়েছে কোন-না-কোন শিশুবয়সের ভাব-প্রবণতা যা বয়সকালে পরিবর্তীত হয়ে আর পূর্ণতা পায়নি। এ পরিপূর্ণতার একটা তো গঙ্গীকেই ঘিরে উঠেছে এবং এটাকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি, কারণ আমরা এতদিন এই সম্পর্কটিকে প্রেম বলে ধ'রে নিয়ে সুরসুরি দিয়ে বাড়িয়েই এসেছি। আর এখন তো অসুস্থতার জন্য তিনি আমাদের সমবেদনাই দাবী করছেন।

সুতরাং আমি চেষ্টা করব টুলীপকে দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবার যে, তাঁর এই রোগ স্রেফ শিশু-মনের অপরিণত অবস্থারই নামান্তর। এবং মনের এই কাল্পনিক স্বর্গে নিজেকে ধরে রাখলে পূর্ণ মানুষ হিসেবে তাঁর কোন লাভই হবে না।

কিন্তু পরবর্তী দিন কয়েকের মধ্যেই আমার এ আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আমি দেখলাম যে টুলীপ তাঁর শ্যামপুরের জগৎ থেকে এখনও মুক্ত নন। প্রায়ই তিনি পিয়ারা সিংয়ের সঙ্গে কিসব গোপন সলা পরামর্শ করছেন। এবং বুঝলাম, এঁদের আলোচনার মূল হলো কি ভাবে গঙ্গীকে এখানে আনা যায়। এই সুদূর মেফেয়ারের ফ্ল্যাটে বসে শ্যামপুর-প্রাসাদে ষড়যন্ত্রের ঘুড়ির সুতো ধরে টানা এবং পরে ছাতের দিকে কুচক্রীর ঘন দৃষ্টিতে চেতনা ডুবিয়ে শুয়ে থাকা কিংবা সামনের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকা—এই তো হলো তাঁর এখনকার কাজ।

আমি ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে যে সব স্থানে ঘুরে বেড়াতাম, সেসব জায়গায় তাঁকে বেড়াতে নিয়ে গেলাম, যাতে তাঁর মন বিষয়ান্তরে স্থাপিত হতে পারে। তাঁকে নিয়ে গেলাম হ্যাম্পটন কোর্ট, কিউ গার্ডেন,

রিজেণ্ট পার্ক জু, গ্রেট রাসেল ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম, সাউথ কেনিংষ্টনের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট ম্যুজিয়ামে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝলাম যে টুলীপ সত্যিই দেহে ও মনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ফলে এসব স্থানে যাবার যে আনন্দ তা প্রায় নষ্টই হয়ে গেল।

এবং এরই মধ্যে রয়েছে তাঁর সেই বিরক্তিকর প্রশ্নগুলো: 'কি করবো বল দেখি ডাক্তার? আমার চিঠির জবাব দিলে না গঙ্গী! কি ক'রে সম্ভব হলো ওর পক্ষে, আমি ভেবেই পায় না। কি না করেছি ওর জন্যে?...হারামী বুলচাঁদ, দেখিয়ে দেবো তোকে, দু' একদিনের মধ্যে দেখিয়ে দেবো তোকে—আচ্ছা, ডাক্তার, তোমার কি সত্যিই মনে হয় গঙ্গী ঐ হারামীর সঙ্গে সত্যিই ঘর বেঁধেছে?'

উত্তর দিতে হতো আমাকে। আমি সান্ত্বনা দিতাম এই ব'লে যে, এ ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন, এভাবে ভাবাও ঠিক নয় তাঁর। 'নিজের সত্ত্বা বিলীন কেন? জীবনের কি পথ শুধু ওই? কত কিছু করণীয় কাজের কথা ভাবতে হয় টুলীপ—'

বাস্তবিক পক্ষে, দার্শনিক ভাবাপন্ন অধিকাংশ ভারতীয়ের মতো, ধৃষ্টতার সঙ্গে আমার বক্তব্যের মূল যুক্তিধারা এড়িয়ে গিয়ে তিনি আমার কাছে উল্টো প্রশ্ন করতেন: 'মানুষ যখন নিজেই নিজেকে চেনে না, তখন কি ক'রে সে আত্মস্থ হতে পারে বলতে পার? আর সবই যখন অস্থায়ী, অর্ধসত্য, তখন কি করেই বা পূর্ণ সত্য ও একমাত্র সত্য ব'লে কিছু বিশ্বাস করা সম্ভব? সত্যের সংজ্ঞা কি বলতে পার? কি তার ব্যাখ্যা?'

আমি তাঁকে বললাম যে, তিনি তো জানেন যে গঙ্গীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা বাস্তব, কিন্তু,—যদিও তাঁর সে-ভালোবাসার সংজ্ঞা নির্ণীত হয় নি, এবং তার বর্ণনাও সম্ভব নয়,—তবুও সে-ভালোবাসা একজনের সঙ্গে আর-একজনের ঘনিষ্ঠতাই তো প্রকাশ করছে।

আমার বক্তব্যের মূল কথাটি টুলীপ অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করলেন মনে হলো, তাঁর সেই ভেঙে-পড়ার ভাবটা একটু সামলিয়ে নিয়ে এবার যেন তিনি বুঝতে পারেন যে, যে-গোলমেলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁকে ঘিরে রয়েছে, তার মধ্যে তাঁর পৃথক কোন সত্ত্বা নেই, তাঁকে অবশ্যই সচেষ্ট হয়ে অন্যান্য মানুষের মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে চলতে হবে। কিন্তু তবুও তিনি ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ, কারণ—মহারাজা হওয়ার সুযোগ-সুবিধেগুলো থেকে আজ বিচ্ছিন্ন হলেও এখনও তিনি সেসব ভুলতে পারছেন না। তাই একলা থাকলেই তাঁর প্রলাপ শুরু হয়। এসব প্রলাপোক্তি শুনে সময় সময় মনে হয়, তাঁর সাধারণ বোধশক্তি বোধহয় পাগলামোর দিকে চলে যাচ্ছে।

এ অবস্থায় আমি তাঁকে নিয়ে বিভিন্নস্থানে বেড়াবার ব্যবস্থা ক'রে ফেললাম। নগরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় সকলে মিলে হৈ হৈ ক'রে একসঙ্গে খানা-পিনা করা, স্যাডলার ওয়েলস্ কম্পানীর "সোয়ান লেক ব্যালে" দেখা, সেখানে একমাথা সোনালী চুলের ময়রা সিয়ারারকে দেখা যাকে আমরা "রেড সু" নামক ফিল্মে দেখেছিলাম।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝলাম যে, টুলীপের এ সবে বাস্তবিকই কোন রুচি বা আকর্ষণ নেই। দেহে ও মনে তিনি সত্যিই এমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে, তাঁর কোন কিছু উপভোগ করবার ক্ষমতাও যেন নেই; তাই তাঁর স্নায়ুগুলোর ওপর কোনরকম চাপ না দিয়ে তাঁকে আস্তে আস্তে সেরে উঠবার সুযোগ ক'রে দেওয়াই আমার কর্তব্য মনে হলো।

কাজেই প্রতিদিন লাঞ্চের পর বিশ্রাম করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। চা-পানের পর কিছু সময় বেড়ানোর জন্য তাঁকে নিয়ে বেরোতাম হাইড পার্কে। অক্টোবরের দুর্বল সূর্যতাপ পার্ক লেনের প্রবেশপথের শারদীয়া তামাটে রঙের গাছের পাতার ওপর পড়েছে। আমরা

সেখানেই আমাদের গাড়িখানা রেখে নেমে পড়ি। বাতাসের মৃদু শীতলতা বেশ লাগে। আমরা দু'খানো চেয়ারে বসে বাইরের দৃশ্য গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। বেশ লাগে। দীর্ঘ নীরবতার পর টুলীপ শ্যামপুরের ব্যয়বহুল খুশীর জীবন, পোলো খেলা, শিকার ও গজীর সঙ্গে তাঁর সুখ লাভের পুরোনো কাহিনী শোনাতে শুরু করেন। শিশুর মতোই তিনি বলেন : 'ওকে আমার চাইই চাই। ওকে আমি চাই!'

বলতে বলতে আবার যেন তাঁর সমস্ত লালসা ও আসক্তি ফিরে এসেছে এই ভাবে তিনি বলতে থাকেন :

'তুমি জান, আমি গজীকে যেমন ভালোবাসি, মজনুও সেইভাবে লায়লাকে ভালোবাসতো। লোকে যখন বলে, "তার মধ্যে এমনকি বিশেষত্ব তুমি দেখলে?" তখন আমি মজনুর কথারই পুনরাবৃত্তি করতে চাই, যখন মজনুকে কে একজন জিজ্ঞেস করেছিল : "এমন কালো-কুচ্ছিৎ লায়লাকে কি ক'রে তুমি ভালোবাসতে পার—!" '

'মজনু কি বলেছিলো?' পুরোনো প্রেম-কাহিনীটি আমার জানা থাকলেও কথা-বার্তার স্রোত অব্যাহত রাখার উদ্দেশে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'মজনু বলেছিল, "তোমার অবশ্যই লায়লাকে দেখতে হবে মজনুর চোখ দিয়ে। তা না দেখতে পারলে এ ভালোবাসা বুঝবে না।" '

ক্ষণকাল থেমে থেকে তিনি আবার বলেন :

'আমি মজনুর মতো প্রেমিক হতে চাই ডাক্তার, কারণ, ঐরকম প্রেমের ভেতর দিয়েই মানুষ পারে ভগবানের সঙ্গে এক হতে। ভক্ত চণ্ডীদাসও তাঁর রামী ধোপানীর প্রতি প্রেমের জন্যেই সাধক হতে পেরেছিলেন, গজী আমার রামীর চেয়ে কম কিসে? যেখানে যাই অন্তর আমার ওকে চায় : আমার দেহটিও ওর জন্যে বেদনায় ভরে ওঠে, যেখানেই ও থাকুক না কেন, আমার মন সেখানেই ছুটে যায়।...'

'কল্পনার রঙীন স্বপ্নে ভর ক'রে সাবেকদিনের বীর-রাজার জীবন-কাহিনীতে আর ফিরে যেতে পারবেন না টুলীপ। আমার মনে হয়, আপনি আজ সত্যিই অসুস্থ।'

'হ্যাঁ,' নম্র ভাবেই তিনি স্বীকার করেন : 'আমি অসুস্থ। আমার মনও অসুস্থ।…'

এবার আমরা উঠে সার্পেন্টাইনের দিকে হাঁটতে থাকি। আর আমি নিজেকেও হাজারবার প্রশ্ন করি : গঙ্গীকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে না এনে দিতে পারলে তাঁকে নিরাময় ক'রে তোলা অথবা তাঁর বাসনার রাজ্যে গঙ্গী যে শিকড় গেড়ে বসে আছে, সেখান থেকে তার ছবিটা সরানো কী ক'রে সম্ভব? আমি তো জানি যে, গঙ্গী যদি টুলীপের কাছে ফিরেই আসে, তাহলে আবার শুরু হবে সেই পুরোনো খেলা… টুলীপকে নাচিয়ে কাঁদিয়ে একেবারেই ধ্বংস ক'রে ফেলবে সে-শয়তানী!

একদিন অক্টোবরের ভোর বেলায় বিছানায় বসেই জলযোগ গ্রহণ করছিলেন টুলীপ। হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে কাশী গিয়ে যোগী হবেন। এই ধারণাটা হঠাৎ তাঁর মাথার মধ্যে এসেছে বলেই আমার মনে হলো।

'আমাদের হিন্দু মতে যে চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা আছে, সেই অনুসারে একদিন সকলকেই সংসার ত্যাগ ক'রে দেবাদিদেব ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য জপতপ ও আরাধনায় আত্মনিয়োগ করতেই হবে। ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য থেকে আমি ইতিপূর্বেই পারিবারিক জীবনের গার্হস্থ্য-ধর্মে প্রমোশন পেয়েছি। গার্হস্থ্য-জীবনের সুযোগ-সম্ভাবনা থেকে যখন আমি বঞ্চিত, রাজ্য-শাসনের মাধ্যমে ভাল কাজ যে করব তার সম্ভাবনাও যখন নেই, তখন এই আশ্রমটা ডিঙিয়ে আমি সন্ন্যাসীই হয়ে যাব।'

'এত তাড়াতাড়ি!' রসিকতা ক'রেই আমি বলি। কিন্তু আমার

ঠাট্টায় তাঁর অন্তরে আঘাত লেগেছে মনে হওয়ায় আমি জিজ্ঞেস করি 'আপনি কি সত্যিই তাই চান? তাহলে "মক্ষীরানীর" কি হবে?'

'তুমি নিজেই একদিন বলেছিলে, প্রত্যেকেরই নিজেকে আবিষ্কার করা কর্তব্য। আমি ভগবানের দিকেই আমার মনকে সংস্থাপন করবো।'

'আমি বলেছিলাম, এই জগতের বিশৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তা এবং দিশেহারা অবস্থার মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান করার কথা। কিন্তু আপনি যদি সাধারণ জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝায় অতিষ্ঠ হয়ে থাকেন, আর ভগবানই আপনার একমাত্র উপাস্য বলে মনে হয়, তাহলে আপনি সংসার ত্যাগ করুন।...যদিও আপনি বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছেন কিনা, সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।'

'বুদ্ধ বলেছেন,' শান্তভাবেই বলতে আরম্ভ করেন টুলীপ :

"বাসনায় জন্মায় দুঃখ, বাসনায় জন্মে ভয়,
বাসনামুক্ত হওয়ার জন্যেই বাসনা কর
কারণ, সেখানে নেই দুঃখ, নেই ভয়।" '

'অবশ্য বুদ্ধ ঠিক কথাই বলেছেন। নিশ্চয়ই শক্তিমান পুরুষই এই আদর্শ অনুসরণের যোগ্য।' আমি বলি।

'আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আছে বলে মনে হচ্ছে—' বালিশ থেকে মাথাটা তুলে তিনি প্রশ্ন করেন।

'না, না টুলীপ,' আমি তাঁকে শান্ত করবার জন্য বলি, পাছে তিনি মনে করেন যে, তাঁর ওপর আমার আস্থা নেই : 'আমি শুধু এই মনে করছি যে, বাইরের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্কের বেলায় কি করা কর্তব্য, কোথায় যাওয়া দরকার, আর কিভাবেই বা আত্মসমাহিত হয়ে নিজেকে জানা যায়, তা ঠিক করা খুব সহজ নয়।'

'আমার প্রপিতামহ মহারাজা হনুমন্ত সিং, সম্পদ ও মান মর্যাদা সব দূরে ঠেলে ফেলে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।' সোজা হয়ে ব'সে টুলীপ

বলেন : 'তাঁর স্ত্রী, আমার প্রপিতামহী, ছিলেন অত্যন্ত ভক্তিমতি নারী, তিনি তাঁকে কাশী নিয়ে যান।...আচ্ছা, দৈহিক সুখ ও আনন্দ পরিত্যাগ ক'রে কাশী এসে আমার সঙ্গে বাস করা এবং যাতে আমরা দু'জনেই একসঙ্গে ভগবানের আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করতে পারি—এইভাবে আমি যদি গঙ্গীর কাছে লিখি, ও নিশ্চয়ই আমার কাছে চলে আসবে। অসিঘাটের কাছে গঙ্গার ধারে আমার একখানা বাড়ি রয়েছে—'

সংসার ত্যাগের তাগিদের মূল কারণটা এবার পরিষ্কার হলো। যেমন করেই হোক গঙ্গাদাসীকে পেতেই হবে, আর তাকে কাছে পেলে পার্থিব জীবন বিসর্জন দিতেও তিনি প্রস্তুত—অথবা দাম্পত্য সম্পর্কগুলো পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশায় তার কাছে সন্ন্যাসের লোভ দেখিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য টুলীপের এ একটা কৌশল মাত্র। তাঁর প্রপিতামহ কি জন্যে যে গদী ত্যাগ করেছিলেন, তা আমার জানা নেই। তবে রাজপ্রাসাদের কোন হীন ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটই এর কারণ হিসেবে আমার মনে বার বার উঁকি মারতে থাকে। মহারাজ হনুমন্ত সিং টুলীপের মতোই হয়তো এক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে পরে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় না দেখে কাশীবাসী হয়ে থাকবেন।

'যৌবনকাল থেকেই আমার প্রপিতামহ ছিলেন অত্যন্ত সাচ্চা ধরনের লোক,' অর্ধ নিমিলিত চোখে টুলীপ বলেন : 'আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন খুব কড়া মেজাজের মহারানী। যখন তিনি দেখলেন, স্বামী কঠোরহস্তে রাজ্য শাসন করতে পারছেন না, এবং সর্বদাই পূজো-অর্চনা নিয়েই মত্ত, তখন তিনি তাঁকে কাশী নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। তারপর তিনি নিজেই রাজ্য শাসন করতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে—'

মুখে তাঁর কথা আটকে যায়। কাজেই আমি কথা যুগিয়ে দিই : 'সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও শাসন করতে থাকলেন!' একটা ক্ষীণ হাসির রেখা আমার মুখে ফুটে ওঠে।

'ইউরোপীয় শিক্ষার ফলে তুমি এতে হাসির খোরাক পেয়ে থাকতে পার—' একটু যেন আঘাত পেয়েই টুলীপ বলেন : 'কিন্তু আমাদের দেশে এরকম ঘটতে পারে। গৌতম বুদ্ধও রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন।'

জনৈক ক্যাংড়া-চিত্রকরের আঁকা মহারাজা হনুমন্ত সিংয়ের অদ্ভুত চিত্রে তাঁর যে কলা-নৈপুণ্য ফুটে উঠেছিল, তা থেকে আমার মন কল্পনায় ভর ক'রে দূরে চলে যায়—। রাজসভার শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত ধরাবাঁধা মামুলী ধরনের চিত্র এখানা। দুর্বল, বেঁটে, এক মুখ দাড়ি, চোখে কুট চাউনি, দেহে মনিমুক্তাখচিত গাঢ় রঙের জমকালো রেশমী পরিচ্ছদ চাপানো, মাথায় শক্ত ক'রে বসানো পাগড়ী,—এই ছিল তাঁর চিত্রখানা—এবং তাঁর জীবন-কাহিনীটাও এতে বেশ ফুটে উঠেছিল। আর চিত্রটি দেখেই ক্লিওপেট্রার মতো এক রানী অথবা গজীর মতো এক বারমুখ্যার ছবিই ভেসে উঠেছিল আমার মনে, যে তাঁর অন্যান্য প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমাভিনয়ের পথ পরিষ্কার করার জন্যই স্বামীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো মহারানীর পেছনে অন্যান্য শক্তিও সক্রিয় ছিল,—হয়তো ছিল ভবিষ্যদ্বক্তা, অর্থ-পিশাচ, শাস্ত্র আর মন্ত্রের বুকনির ছদ্ম আবরণে রাজসভার যতকিছু অনাচার ও কলঙ্ক ঢেকে ফেলতে ওস্তাদ একদল ব্রাহ্মণ-পুরোহিত। আবার এদেরও পেছনে ছিল অভিজাতবর্গ—ফিউডাল সর্দার, গবর্ণর ও রাজপ্রাসাদের পরিচালকবর্গ। গম্বুজ ও কারাকক্ষ এবং উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত নিভৃত রাজনিকেতনে এরা সকলেই এমনভাবে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে পারতো, যা এই শয়নকক্ষের অপেক্ষাকৃত মুক্ত আলোকে নিছক কল্পনামূলক ও অবিশ্বাস্যই মনে হয়।

'তা হলে আমি এরকম জীবন যাপন করতে পারি না ব'লেই তোমার ধারণা?' আমার কাছ থেকে মৌখিক সমর্থন না পেয়ে টুলীপ জিজ্ঞেস করেন।

'এ সম্বন্ধে আর একটু চিন্তা করা দরকার,' আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাই। কারণ এই ধরনের কথা টুলীপকে তো আমি বলতে পারি না—যদিও তাই আমার বিশ্বাস, যে, মহারাজা হনুমন্ত সিংয়ের জীবনে ওরকম ঘটা সম্ভব ছিল। কারণ, দু'শো বছর আগে যখন শ্যামপুরের ইতিহাস বলতে শুধু বোঝাতো হিংসা, অনাচার ও অত্যাচার, এবং কুৎসিৎ ষড়যন্ত্র ঢেকে ফেলার জন্য পবিত্র বারি-সিঞ্চনই যখন ছিল একমাত্র পন্থা, তখন—আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি যে—রাজ্যের রাজা হঠাৎ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে তাঁর নিজেরই হিংসা-নীতি থেকে নিজেকে নির্বাসিত করছেন। যাঁর শাসনগুণে রাজপ্রাসাদ, মনিমুক্তাখচিত হস্তিযূথের আলোকমালা দীপ্ত শোভাযাত্রা ও অতিমাত্রায় বিলাস-ব্যসনের জোরালো ছায়ার অতি নিকটেই কলুষ, দারিদ্র্য ও রোগের মহাসাগর সুবিস্তৃত—যেখানে মানবীয় দুঃখ-কষ্টের অতল গহ্বরে দিশেহারা হয়ে দেশবাসী অবস্থান করছে,—যেখানে ভয়াল কুট চেহারার দুর্বল ও বেঁটে মানুষ এই মহারাজা হনুমন্ত সিং তাঁর বিরাট রাজ্যের অধিশ্বর, সেখানে নরনারী ও শিশুরা নিরাশাজনিত ধৈর্য নিয়ে, নেংটী পরে একমুঠ ভাতের জন্য গ্রীষ্মের খররোদে সারাদিন রক্তশূন্য দেহে পরিশ্রম করছে।...

দারিদ্র্য-পীড়িত দেশের এই দুর্গতির দৃশ্য হঠাৎ অবলোকন ক'রে তিনি হয়তো তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার সিদ্ধান্ত ক'রে থাকবেন। হয়তো অশরীরী দেবতাদের ভয়ে তাঁর কুসংস্কার ভরা মন হঠাৎ অতিমাত্রায় অভিভূত হয়ে থাকবে। অথবা, হয়তো তাঁর সর্বশেষ পত্নী, নিজের সঙ্কোচহীনতার জন্যে যিনি রাজ্যের শুয়োরাণী হয়েছেন, সন্তান জন্ম দেওয়া সম্বন্ধে স্বামীর পুরুষত্বে হতাশ হয়ে কাশীতে কোনও পাষাণী দেবীর সঙ্গে পঙ্গু স্বামীর বিয়ে দিয়ে কাশী বাসী ক'রে দেওয়ার মতলব এঁটে থাকবেন। এবং তারই মধ্যে গঙ্গাস্নান ও জপ-তপ এবং পবিত্র গঙ্গাতীরবাসী জাগ্রত দেবতার পূজারী পুরোহিত বা সাধুদের

কল্যাণে নিজের গর্ভে দেবসন্তান লাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করে থাকবেন।...কিন্তু এ তো গেল সাবেক দিনের কথা। টুলীপের এই সংসার ত্যাগের বাসনা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, একটা রোমান্টিক ভাব-ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগে মহারাজারা যতই পীড়িত হোন না কেন, সাধারণ লোকের সহানুভূতি আর তাঁদের দিকে বর্ষিত হবে না; সে-সহানুভূতি এখন শোষিত শ্রেণীর ওপর, যারা ঋণভার ও ব্যাধির দুর্বিসহ ভারে প্রপীড়িত হয়ে দিনাতিপাত করছে।

সন্ন্যাস-জীবনের জন্য ব্যাকুল বাসনায় টুলীপের মুখখানা, বিশেষতঃ আমার কাছ থেকে সমর্থন না পাওয়ার জন্য, বেশ একটু বিব্রত হয়ে ওঠে। আমার সমর্থন তিনি পাবেনই এই ছিল তাঁর ধারণা, কারণ, তাঁর কত আজে-বাজে কথাতেও তো আমি এতদিন সায় দিয়েই এসেছি।

'ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, তুমি নাস্তিক, ভগবানে বিশ্বাস নেই তোমার—' নৈরাশ্যে ভরা ক্ষীণ কণ্ঠে কথাটা বলে টুলীপ শুয়ে পড়েন। 'নাঃ, মিএ্যা মিথুই পরামর্শদাতা হিসেবে ভাল। তার কাছেই উপদেশ চেয়ে চিঠি লিখবো।'

'হ্যাঁ,' হাসি চাপতে না পেরে আমি বলি: 'এ সম্বন্ধে মিএ্যা মিথুর নির্দেশ গ্রহণ করাই ভাল।'

'ভগবানকে যদি অস্বীকার করো, তাহলে কিসে তোমার বিশ্বাস আছে ডাক্তার? আমরা কে? কোথা থেকেই বা আমরা এলাম?'

'আমি মনে করি যে, মানুষ কি, কি তার কর্তব্য, আর কোথায়ই বা তার পরিণতি, এই সমস্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে মানুষের মানসিক বিহ্বলতা ও চিন্তাধারায় যে জটিলতাই থাকুক না কেন, মানুষই হচ্ছে বিশ্বের চরম সত্য। মানুষের উপর আর কোন উচ্চতর ও অধিকতর মহিমান্বিত কিছু নেই—' নিজের বস্তু-নিরপেক্ষ কথাগুলোয় নিজেই অভিভূত হয়ে আমি থেমে যাই।

'কিন্তু পরম ব্রহ্মের ইঙ্গিত কিংবা ঐ জাতীয় অদৃশ্য নির্দেশের মতো কোন কিছু মানদণ্ড না থাকলে মানুষ ভাল কাজ করবে কি ক'রে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে টুলীপ জিজ্ঞেস করেন।

'মানুষ যদি নিজেকে একটু ভালভাবে জানতে পারে, জানতে পারে তার শক্তির কথা, তাহলে কি ক'রে জীবন যাপন করতে হবে এবং কাজ করতে হবে, তা সে নিজেই জানতে পারবে। কারণ, মানুষের মধ্যে শীলতা সম্বন্ধে সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে, আর এই শীলতা জিনিসটা মোটামুটিভাবে তার নিজের ও অন্যান্য মানুষের মঙ্গল কামনা থেকেই উদ্ভুত। মানুষ একাধারে আদর্শস্রষ্টা, আবার নিজেও এই সমস্ত আদর্শের অধীন। যে ধরনের বিবেক বুদ্ধির কথা আমি বলছি, তা হলো আমাদের নিজেদের ও অন্যান্য মানুষের জন্য আমাদের অন্তরের ভালোবাসারই বাণী; তা হলো মানুষের আত্ম-স্বার্থেরই অভিব্যক্তি এবং—' আবার বড় বড় কথা বলতে আরম্ভ করেছি! তাই নিজের মনে লজ্জিত হয়ে কথাটা অসমাপ্ত রেখেই চুপ ক'রে যাই।

'অদৃষ্টকে তুমি ভয় করো না?' টুলীপ প্রশ্ন করেন। কণ্ঠে তাঁর বিরক্তি।

'না।' টুলীপ তাঁর কথার ভেতরে যে উষ্মার ভাব প্রকাশ করে-ছিলেন, তারই ফলে বিতর্কে উৎসাহিত হয়ে আমি উত্তর দিই: 'মানুষকে অতিক্রম ক'রে কোন শক্তির অস্তিত্ব আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ নিজের জন্য সব কিছু স্থির ক'রে নিতে পারে। নিজের জীবনে কিছু লাভ করা বা হারানোর জন্য মানুষ নিজেই দায়ী!...'

'বেশ, তাহলে বলো, এমন কোন্ কষ্টিপাথর আছে, যাতে প্রত্যেক মানুষই নিজের কাজ যাচাই ক'রে নিতে পারে—' আমাকে বাধা দিয়ে

কিন্তু আমার বক্তব্য কতকটা মেনে নিয়েই টুলীপ বলেন: 'মানুষের মধ্যে কি কোন উচ্চতর জীবন নেই, যা—'

'আমি মনে করি, মানুষের স্বরূপটা হলো এই যে, সে সৃজনধর্মী ও প্রাণবন্ত। একমাত্র এই কষ্টিপাথরেই সে নিজের আচরণ যাচাই করতে পারে। সবচেয়ে সৃজনধর্মী হ'য়ে যখন সে নিজের এবং অপরের জীবনকে সমৃদ্ধ করবার জন্য নিজের শক্তি প্রয়োগ করে, বহুর মধ্যে যখন সে আত্ম-সমাহিত, তখনই প্রকাশ পায় তার সবথেকে সুন্দর রূপ।'

'এ তো আমাদের বেদান্তের বিরোধী ভাবধারা বলেই মনে হচ্ছে।'

'বেদান্তের মধ্যে নানা ধরনের দার্শনিক চিন্তাধারা রয়েছে। কেবল মাত্র ব্রহ্ম, পরম ব্রহ্মের ভাববাদী ইন্দ্রিয়াতীত ভাব-ধারণাই আছে তা নয়।···যাই হোক, বর্তমান যুগে যে কোন লোকের ধর্ম হবে সার্বজনীন, এবং তা সকলের পক্ষে যোগ্য হওয়া দরকার।'··· আমার কথাগুলো যে তাঁর ওপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে নি, তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তাই আমার মুখটা নত হয়ে পড়ে।

টুলীপ যেন হতভম্ব হ'য়ে পড়েন। তাঁর পূর্বপুরুষদের যাগ-যজ্ঞ-বহুল ধর্মের তুলনায় আমার বক্তব্যের মধ্যে যে উচ্চতর কিছু রয়েছে, তা তিনি অস্পষ্টভাবে হলেও যেন বুঝতে পারেন। আর নিজে যে-যোগী-জীবন যাপনের জন্য উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেজন্য তিনি মনে মনে একটু বিরক্তিও বোধ করেন।

'বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক ডাক্তার—' চিত হয়ে শুয়ে অস্পষ্ট কণ্ঠে টুলীপ বলেন: 'তা হলে, তোমার মতে, ভালো-মন্দ ব'লে কিছু নেই!'

'চলতি নীতিশাস্ত্রের কথায় বলতে গেলে ভাল ও মন্দ বলে কোন বস্তুই নেই। শুধু আছে প্রজ্ঞা ও অজ্ঞতা। সমস্ত জীবন ধরে আমরা শুধু অনিশ্চয়তা, সন্দেহ ও অসামঞ্জস্যের চোরাবালির ওপরেই বাস করছি। আর আমাদের নিজস্ব প্রকৃতির গহনে রয়েছে উত্তরাধিকার

সূত্রে পাওয়া এক বিরাট অন্ধকার। কাজেই এই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অশুভ বলে পরিচিত বস্তুর বিরুদ্ধে নৈতিক ক্রোধ জাগ্রত করতে হলে হিংসা ও ঘৃণাকে ধর্মের ছদ্ম আবরণে ঢেকে ফেলতে হয়।' আমার বক্তৃতার তরঙ্গ যেন তাঁকে অভিভূত ক'রে ফেলে। তাঁর ওপর আমার বক্তৃতার প্রভাবটা এখনও বুঝতে পারি না। কাজেই তাঁকে আরও বেশি ক'রে আয়ত্বে ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রে বলি :

'হীনবীর্যতা, কোন কিছু করবার অনিচ্ছা, এবং নিজের জীবনে কোনরূপ সৃজনধর্মী উদ্দেশের অভাবই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ।'

'কিন্তু আমার জীবন যে এখন একেবারে কর্মহীন।' তিনি স্বীকার করেন। 'সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য হওয়ার ফলে এখন কী-ই বা আমি করতে পারি ?' নিজের অন্তরের চাপা দুঃখে তাঁর ঠোঁট দু'টো কেঁপে ওঠে। কথা বলতে আর তিনি পারেন না। তাঁর দু'চোখ ভরে অশ্রু জমা হয়ে ওঠে।

'আমার নিজের হাতে গড়া দুঃখের জন্য তুমি আমাকে ঘৃণা কর, তাই না ডাক্তার ?' কম্পিত স্বরে আবার তিনি বলে যান।

'না না,' তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বলি : 'এ আত্ম দুঃখ আপনার পক্ষে ভালই হবে হিজ হাইনেস, আত্ম নিপীড়নের ভেতর দিয়েই আপনাকে এগোতে হবে, তবেই আপনি জীবন-মহাসাগরে সাঁতরাবার শক্তি সংগ্রহ করতে পারবেন।'

'কিন্তু আমি কোনদিনই শক্তিশালী ও দৃঢ় চরিত্র লাভে সক্ষম হবো না।'

'অত নিরাশ হবেন না টুলীপ। পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ার মধ্য দিয়েই মানুষের আবার শক্তি আরহণও ঘটে। সেইজন্য যে-ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব-ভেঙ্গেপড়া স্বীকার ক'রে নেয়, তার পক্ষে আবার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভের একটা আশা থাকে, তবে দৃঢ়তা থাকা চাই।'

তিনি যেন আবার তাঁর মনের অন্ধকারে ডুবে গিয়েছেন এই ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকেন। কিন্তু তাঁর চোখ দু'টো দেখে আমার মনে হয়, তিনি যেন নিজেকে তুলে ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত স্রোত তাঁকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত করছে বা ঘূর্ণির ভেতর আটকে রাখছে, তার মধ্য দিয়ে তিনি সেরে উঠতে সক্ষম হবেন কিনা, তা এখনও ভবিষ্যতের ব্যাপার।

'আগুন জ্বলে,' তিনি বলেন: 'কিন্তু তিক্ততা ও অনুশোচনার ছাইয়ের মধ্যে তা চাপা পড়ে থাকে। এতো বেশী অসুখী ও নিঃসঙ্গ মনে করছি আমি, মনে হয়, মরে গেলেই যেন বাঁচতাম!'

একটু আগে, কথা-বার্তার প্রথম দিকে, মনে মনে যে রকম বিশ্লেষণ করেছিলাম, তার সমর্থন পেয়ে আমি যেন একটু হকচকিয়েই গেলাম। তাঁর জীবনের ভস্মরাশির মধ্যে জীবনের দীপ্তি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, আমার এ বিশ্লেষণ যেন ঠিকই হয়েছে মনে হলো।

'ও ভাবে কথাবার্তা বলবেন না টুলীপ,' আমি বললাম: 'জীবন নিজে নিজেই প্রভাব বিস্তার ক'রে চলে।'···

জীবন প্রভাব বিস্তার করেই এগিয়ে চললো···তবে আমি যেমনটি মনে করেছিলাম সেভাবে নয়, পিয়ারা সিংয়ের নির্দেশিত পথেই টুলীপের জীবন-ধারা এগিয়ে চলতে আরম্ভ করল!

আমাদের সুদীর্ঘ দার্শনিক কথোপকথনের পরেরদিন বিকেলে টুলীপ পিয়ারা সিং ও আমাকে নিয়ে ব্যারটস-এর দোকানে কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য গেলেন। হিজ হাইনেস প্রসঙ্গতঃ পারী নগরে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন একবার। সেই পারী যাত্রার উপলক্ষেই আমরা কিছু টয়লেট কিনতে চাই। গাড়ি থেকে নেমে আমরা সুইং-

ডোরের ভেতর দিয়ে দোকানে প্রবেশ করলাম। সুবিশাল ষ্টোরগুলোর অপেক্ষাকৃত কম জন-বহুল অংশে যে জনস্রোত চলে, আমরা সম্পূর্ণ ভাবে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রয়োজনীয় অল্প কয়েকটি জিনিস কিনে ফেললাম। কিছুদিন হলো সর্বদাই একটা অবসাদের ভাব টুলীপের ওপর জমাট বেঁধে আছে, আর তার ফলে, আগেকার মতো বেহিসেবী ভাব এখন তাঁর নেই, কাজেই আমাদের কেনা কাটা তাড়াতাড়িই হয়ে যায়। তারপর আমি প্রস্তাব করলাম রেস্তোরাঁয় গিয়ে চা-পানের জন্য। কিন্তু টুলীপের হঠাৎ মনে পড়ে একটা টাইম-পিস্ ঘড়ি কেনার কথা। হাত-ঘড়ি বলে তিনি ব্যবহার করতে পারছেন না।

ষ্টোরের বিভিন্ন তলায় কেনাকাটার সময় আমি বেশ লক্ষ্য করি যে পিয়ার সিংয়ের দিলদরিয়া মেজাজটা স্কুল-কিশোরীদের মতো অল্প-বয়স্ক খরিদ্দার ও তরুণী দোকান-পরিচারিকাদের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আর সে নিজেও আমাকে এক ফাঁকে বলল যে, ওদের প্রায় আজানু নগ্ন সুগঠিত পা গুলো তাকে মুগ্ধ করেছে। কথাকলি-নৃত্যের কলাকৌশলের মতো টুলীপের সঙ্গে ইঙ্গিতে-ইসারায় কি যেন একটা গুপ্ত কোডের সৃষ্টি করেছে সে, তার সাহায্যে তারা দু'জনেই প্রণয়রসের চোরা উৎসাহ-উন্মাদনা উপভোগ করে। আমাকে এড়িয়েই চলে তাঁদের এই গুপ্ত খেলা।

দোকানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্য দিয়ে ভেতর যাওয়া-আসা করা, প্রতিটি নারীদেহের সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নিরিক্ষণ ও ইঙ্গিতে তার লালসা-পূর্ণ বিশ্লেষণের পর ঘড়ি-বিক্রি বিভাগে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের মনোভাব বেশ উগ্র হয়ে ওঠে। কাউন্টারের পেছনের তরুণী বিক্রেতাটি ভেনাস ন্থ মিলো বা গঙ্গাদাসী না হলেও সোনালী রঙের ছিপছিপে সুন্দরী তন্বী। সে ইচ্ছে করেই তার

মাথার চুলগুলো এমন ভাবে গুছিয়ে রেখেছে যে, মাথাটা ঘোরাবার সচেতন মাধুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐ কেশমৌলি ছড়িয়ে পড়ে কপালে।

'আপনার জন্যে কি করতে পারি, স্যার?' সপ্রতিভ কণ্ঠে মেয়েটি বলে। তার ফেকাশে গালে প্রণয়াগ্নির একটু রক্তিম আভাও যেন ফুটে ওঠে।

'সবকিছুই—' পিয়ারা সিং তার স্বভাবসিদ্ধ নোংরামির সঙ্গেই বলে।

দোকানী-মেয়ে একটু মুচকি হাসে; তবে লজ্জায় লাল হয়ে যায় তার গণ্ড, আর পিয়ারা সিংয়ের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অপেক্ষাকৃত সংযত টুলীপের দিকে সে তাকায়।

টুলীপ তার দিকে ফিরে তাকান, এক লহমার জন্য চার চোখের মিলন হয়। যেন একটু লজ্জিত হয়েছেন এই ভাবেই বলেন:

'আমরা কয়েকটা টাইম-পিস দেখতে চাই মিস, ট্র্যাভ্‌লিংয়ের জন্য ভাঁজকরা-কেসের মধ্যে যেগুলো রয়েছে, তারি একটা।'

হঠাৎ যেন মেয়েটির কি হলো, সে মুহূর্তকাল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখমণ্ডল হাতির দাঁতের মতো ফেকাশে হয়ে যায়, ফলে, তার সাটিনের ব্লাউজের কলারের পাশে সস্তা ব্রোচের উপর তার নাক ও নরম গলায় পাউডারের দাগগুলো পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তেই অন্য কারোর সাহায্য যেন তার দরকার, এইভাবে চকিতা হরিণীর মতো সে এপাশ ওপাশ করতে করতে ঈষৎ কেঁপে ওঠে।

বেঁটে, টাক-মাথা, ফিট্ ফাট্ পোশাক পরা ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজার দোকানী-মেয়েটির কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছে যেন বুঝতে পেরেই, অভিজ্ঞ বিপণি-সহায়কের মোলায়েম দেহভঙ্গি নিয়ে মন্থর গতিতে কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে আসে। অন্যান্য দোকানী-মেয়েদের খপরদারীর ভার এ লোকটির ওপর। 'খরিদদার সবসময়েই মনিব—' এই হলো তার নীতি। তার পেছনেই আসে কক্ কক্ করতে করতে

কালো পোশাক পরা শুকনো আমচুরের মতো চেহারার ঢ্যাঙা এক বুড়ী মুরগী : চোখের প্রশ্ন তার কণ্ঠের ফিসফিসানিতে ভাষা পায় :

'মিস্ উইদার্স, ভদ্রলোকরা কি চাইছেন ?'

এই সমস্ত ফিসফিসানিতে ভীত হয়ে টুলীপ অর্ধ-নিমীলিত চোখে ক্ষীণকণ্ঠে বলে ওঠেন :

'কিছুই না, কিছুই না।'

'হিজ হাইনেস মহারাজা সাহেব একটা টাইমপিস চান।' টুলীপের উপাধিটা ঘোষণা করলে অবস্থাটা আবার আয়ত্তের মধ্যে আসবে বুঝতে পেরে ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং বলে ওঠে, কারণ, সাধারণ একজন দোকান-পরিচারিকার মুখ-মণ্ডলে কিছুটা দিশেহারার ভাব সৃষ্টি করার অধিকার যে মহারাজা ও তাঁর এডিকং-এর আছে, তা সকলেই এমনকি সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য।

'হিজ্ রয়াল হাইনেসকে একটা টাইমপিস্ দেখাও, জুন।' হাত ঘষতে ঘষতে টুলীপকে অভিনন্দন জানিয়ে ম্যানেজার বলে। তারপর শুকনো মুরগীর দিকে তাকিয়ে যোগ দেয় : 'সব ঠিক আছে, মিস্ এট্কিন্সন্। আমি মহারাজা সাহেবকে দেখা-শুনো করছি।...'

'আচ্ছা, মিঃ ড্রেক।' ঈষৎ মাথা ঝাঁকিয়ে মিস্ এট্কিন্সন্ চামড়ার পণ্যদ্রব্যের কাউন্টারের পেছনে দণ্ডায়মান একদল দোকানী-মেয়ের দিকে চলে যায়। জুন যে-অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, তাই নিয়ে তারা তখন ফিস ফিস ক'রে কথা বলছিল।

জুনের মধ্যে তখন ভয় বিভীষিকা অথবা প্রেম সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, না, লাঞ্চ হিসেবে একটু স্যাণ্ডুইচ ও এক পেয়ালা কফি পান ক'রে সারাদিন কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, তা আমি জানি না। হঠাৎ সে কাঁপতে কাঁপতে মাথা দুলিয়ে, চোখ দু'টো বুজে সামনের কাউণ্টারে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায়।

'স্মেলিং-সল্টস্!' চাপা গলায় মিঃ ড্রেক বলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে কাউন্টারের পেছনে গিয়ে মেয়েটিকে দু'হাতে তুলে ধরে তাকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দেয়, আর চামড়ার পণ্যদ্রব্যের কাউন্টারের পেছন থেকে একটি বালিকা স্মেলিং-সল্টের শিশিটা তাড়াতাড়ি মিস্ এট্‌কিন্সনের হাতে তুলে দেয় এবং শিশিটা হাতে নিয়ে সেও এসে পড়ে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসে টুলীপও ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে মিঃ ড্রেককে বলেন।

'মেয়েটির হঠাৎ কি হলো?' বীরের মতো পিয়ারা সিং জিজ্ঞেস করে। এমনকি টুলীপকেও দু'এক পা অতিক্রম ক'রে গিয়ে সে জুনকে বাতাস দিতে আরম্ভ করে। 'ডক্টর শঙ্কর, একবার একে দেখো তো!'

স্মেলিং-সল্ট নাকে ধরার পর মিস্ উইদার্স চোখ মেলে চায়, কিন্তু অর্ধস্ফুট কান্নার সঙ্গে চোখ দু'টো আবার বুঁজে ফেলে। তার ঠোঁট দু'টো তখন কাঁপছে।

'জুনি, কি হয়েছে?' দোকানের অন্য এক কাউন্টার থেকে ছুটে এসে একজন ব্যস্ত যুবক প্রশ্ন করে। আমাদের তিন জনের দিকেই সে কট্‌মট্ ক'রে তাকায়।

'ঠিক আছে মিঃ কামিংস্, ঘাবড়িও না।' মিঃ ড্রেক যুবককে বলে।

ইতিমধ্যে জুন চোখ মেলে জোড়া-ভুরুর মধ্য দিয়ে তাকায়, তার ঠোঁটের দু'কোণে সলজ্জ ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে:

'কেমন যেন হঠাৎ মাথাটা গুলিয়ে উঠল।'

'সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, জুন, অসুখ তোমার সেরে গিয়েছে,' প্রবোধ দিয়ে মিঃ ড্রেক বলে।

স্ফীত মুখ, মুদিত চোখ, আর মাথাটা নাড়তে নাড়তে মেয়েটি কিছুক্ষণ বসে থাকে, তারপর উঠে দাঁড়ায়।

'আমি হলে, মিঃ কামিংস্, আমি এক্ষুনি ওকে বাড় পৌঁছে দিতাম।' মিঃ ড্রেক বলে।

'অসুস্থা তরুণীকে পৌঁছে দেবার জন্য আমার গাড়িটি ব্যবহারের অনুমতি দিন—' অত্যন্ত ইচ্ছাকৃত শালীনতাপূর্ণ ভাব-ভঙ্গিতে টুলীপ বলেন: 'আমার এডিকং এই তরুণ ও তরুণীকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

এমন কর্তৃত্বপূর্ণ করুণার সাথে তিনি এই কথাগুলো বললেন যে, কথাগুলোকে রাজকীয় অনুজ্ঞা আবার অনুরোধ দুই-ই বলা চলে। আর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাতও হতে পারে না, কারণ টুলীপের কণ্ঠে ফুটে উঠেছে তরুণীর প্রতি ভব্যতাযুক্ত ব্যস্ততা আবার সেই সঙ্গে রয়েছে এক অদ্ভুৎ নির্লিপ্ততা।

মিঃ ড্রেকের ভ্রূ-যুগলের মধ্যে একটি ভ্রূকুটির ভাব দেখা গেলেও 'খরিদ্দার সব সময়ই মনিব' এই বিশ্বাসে অভ্যস্ত লোকটি মৃদু হেসে নতি জানায় এবং মিস জুনকে উঠে বসবার জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে যায়:

'এখন ওঠো তো লক্ষ্মীটি···এখন তাহলে···'

যে ভাবে তিনি প্রতি পদক্ষেপেই রাজাগিরি ফলিয়ে চলতেন, ঠিক সেই ভাবেই অভিনয়-প্রতিভা দেখিয়ে হিজ হাইনেস হুকুম দেন পিয়ারা সিংকে: 'এই তরুণী ও তার বন্ধুকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এস তো। আমরা একটা ট্যাক্সী নিয়ে ফিরব'খন।'

'জী, হুজুর,' সামরিক কায়দায় 'অ্যাটেন্সন' ও সালাম জানিয়ে ক্যাপ্টেন পিয়ার সিং বলে।

তন্বী উইদার্সের মুখমণ্ডলে উত্তেজনার কম্পন স্পষ্ট দেখা যায়। অশ্বশাবকের মতো আনন্দে নাসিকা ধ্বনি ক'রে সে মাথাটা তোলে।

মিঃ কামিংসের হাবভাব দেখে মনে হয় সে জুনের তরুণ প্রেমিক। লোকটার চোখে ফুটে ওঠে একটা দিশেহারা ভাব আবার পরক্ষণেই

দেখা যায় ক্রোধের রেখা। জুনের এই "মা'রাজার" প্রস্তাবটি এমন উৎসাহের সাথে লুফে নেওয়াটা তার কাছে অদ্ভুতই মনে হয়।

টুলীপের চোখেও একটা দীপ্তি দেখা যায়, সচেতন কমনীয়তার সঙ্গে তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে মিঃ ড্রেককে বলেন :

'টাইমপিস দেখবার জন্য আমি আর-একদিন আসবো।'

আমার অনুমান হয়, এই পরিস্থিতির রোমাঞ্চটা তাঁর হৃদয়ের ওপর রীতিমত রেখাপাত করেছে।

তিনি আর জুনের দিকে ফিরে তাকান না, এবং এই ভণ্ড ঔদাসীন্যের ভাবটা বজায় রেখে করিডরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে যান, ওখানেই লিফটগুলো ওঠানামা করছিল।

'বেচারী বালিকা!' ডিপার্টমেণ্টের পরিচারিকাদের ফুসফাস আলোচনার জটলা অতিক্রম করার পর টুলীপ আমাকে বলেন।

'মেয়েটার মুখখানা বেশ সুন্দর, যদিও অন্যান্য ইংরেজ মেয়েদের মতো ওর বুকখানা চ্যাপ্টা···'

আমি বুঝতে পারলাম তিনি ইতিমধ্যেই ঐ মেয়েটির সঙ্গে প্রেমাভিনয় শুরু করার মতলব আঁটছেন। অনুমান করলাম তাঁর জীবনের অতৃপ্ত বাসনার পুরোনো আলোড়নগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। এই ধরনের জীবনে সমস্ত নারীই শাশ্বত-শিকারী পুরুষের নতুন শিকারের ভূমিকায় অবতীর্ণা। এই অভিযানের বিরুদ্ধে মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে, কিন্তু তেমনি একটু স্বস্তিও বোধ করি এই মনে ক'রে যে, এই রকম ছোট-খাটো প্রেমাভিনয়ে জড়িয়ে পড়লে গঙ্গাদাসীর মোহটা হিজ হাইনেসের মধ্যে কিছুটা হ্রাস পাবে।

ব্যাপারটা কিন্তু ছোট-খাটো প্রেমাভিনয়ে পরিণত হলো না।

ব্যারটস-এর দোকানে যে ঘটনা ঘটল তারপর প্রথমদিন থেকেই টুলীপ মিস জুন উইদার্সের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়লেন। নারী

অপহরণের ব্যাপারে তিনি তো প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদ। নিছক সহজাত প্রবৃত্তিবশেই তিনি মহানুভবতা প্রদর্শন করেছিলেন আর সেই সঙ্গে ঐ তরুণীর ঠিকানার সন্ধান নেওয়ার জন্যেই পিয়ারা সিংকে জুন ও তার যুবক বন্ধুটির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন এবং পরদিনই জুন যে সময় কাজে বেরিয়ে যায়, সেই সময়ে এডিকং-এর মারফত তার বাড়িতে লাল গোলাপের একটা তোড়া পাঠালেন। কার্ডের পেছনে তিনি তাকে ঐ দিন নৈশ ভোজনে দয়া ক'রে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানালেন যে, ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। কার্ডে অবশ্য তাঁর উপাধি ও খেতাব সহ পূর্ণ ঠিকানারও উল্লেখ করা ছিল, আর তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, এই সমস্ত উপাধি নিশ্চয়ই মেয়েটির ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। উপাধির বহরটা ছিল এই রকম :

"লেফটেনাণ্ট জেনারেল হিজ হাইনেস ফর্জন্দ-ঈ-খাস-ঈ-দৌলত-ঈ-ইংলিশিয়া মনসুর-ঈ-জামান। আমীর-উল-উমরাহ্‌ মহারাজাধিরাজ শ্রী ১০৮, স্যার ভিক্টর এডোয়ার্ড জর্জ, দলীপ কুমার বাহাদুর, কে. সি. এস. আই., কে. সি. আই. ই., ডি. এল. (বেনারেস), মহারাজ অব শ্যামপুর।"

টুলীপ নিপুণ ভাবেই কাজ করেন। কারণ, আমি বেশ বুঝতে পারি যে, মেয়েটির ঐ মূর্ছা যাওয়া আর দামী রোলস্‌-রইসে চেপে একজন সুদীর্ঘ সুপুরুষের সঙ্গে বাড়িতে ফেরা—দোকান-পরিচারিকা হিসেবে একজন মহারাজার সঙ্গে তার এই রোমাঞ্চকর সাক্ষাতের পর মিস জুন উইদার্স-এর মনটা হয়তো, দোকানের কাউণ্টারে একজন প্রিন্সের এই অদ্ভুত আচরণের মধ্যে আরো কিছু যে থাকতে পারে—এই আশার রঙীন অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সহকর্মীদের চাওয়া-চাওয়ি আর ফিসফিসানির মধ্যে তাকে সারাদিন মানসিক

উত্তেজনা চেপেই কাজ করতে হয়। তার মূর্ছা যাওয়ার মধ্যে ওরা একটা নির্দিষ্ট ছল-কৌশল ও মহারাজার চোখে নতুন প্রেমের সূচনাই সুনিশ্চিভাবে দেখতে পেয়েছিল। কাজেই বাড়িতে এসে সে যখন দেখল কতগুলো সুন্দর মনমাতানো ফুলের তোড়া, মহারাজার আসক্তির সবচেয়ে বড় নিদর্শন কতকগুলো গোলাপ তার জন্য অপেক্ষা করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নৈশ-ভোজের আমন্ত্রণ, তখন সে মোটেই বিস্মিত হলো না। এবং বব্ কামিংসের প্রতি তার আকর্ষণ, একমাত্র ঢিলে সান্ধ্যকালীন পরিচ্ছদের ওপর প্রয়োজনীয় কোটের অভাব, আর এই রকম দুঃসাহসের পরিণতির আশঙ্কা (মা-বাবা কি বলবেন ?) ইত্যাদির জন্য প্রাথমিক সংকোচবোধের পর, যান্ত্রিকভাবে কাজকর্মে অভ্যস্ত দোকান-পরিচারিকার একঘেয়ে শুষ্ক হৃদয়-বৃত্তিগুলো শেষপর্যন্ত তাকে একবার ঝাঁপিয়ে পড়তেই প্রলুব্ধ করল।

ঐদিন সন্ধ্যায় পিয়ারা সিংয়ের সঙ্গে জুন এল। আমি ছিলাম হল ঘরে। ডাকে দেওয়ার জন্য দরোয়ানের হাতে কয়েকখানা চিঠি দিচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম ওদের আসতে।

একরাশ সোনালী চুল মাথায় তার ছোট্ট মুখখানা ও ছিপ-ছিপে দেহভঙ্গি গার্বোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল···সুইডেনে প্রথম জীবনে ঐ বিশ্ব-বিখ্যাত ছায়াচিত্র-তারকাও বোধহয় এই রকমই দেখতে ছিলেন। তিনিও ছিলেন প্রথম জীবনে দোকান-পরিচারিকা। তবে জুনের মধ্যে গার্বোর আত্মপ্রত্যয় নেই। তাকে যখন অভিবাদন জানালাম, তখন তার ছোট হাত দু'খানা কাঁপছিল। তার গালের লাল আভাটাও যেন উবে গিয়েছিল, আর তার চোখ দু'টো মেফেয়ারের ফ্ল্যাটের সু-উচ্চ পরিবেশের মধ্যে আতঙ্কগ্রস্ত ছোটপাখীর মতোই ছটফট করছিল।

আমার অনুমান, লিফ্‌টম্যানের ইউনিফর্মে অবাক হয়ে, এমন কি

ভীত হয়েই মেয়েটি আত্ম-সচেতন ভাবে লিফটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ, বোধহয় তার অন্তরে জাগছিল একটি কথাই যে, লোকে নিশ্চয়ই বলবে, একটিমাত্র উদ্দেশ্যে, মাত্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তুমি, ইংরেজ তনয়া কুমারী জুন, তুমি মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

লিফট থেকে যখন আমরা নামলাম, তখন কার্পেট-মোড়া করিডরে কেউ নেই। মেয়েটি আমাদের ভেতর দিয়ে প্রায় অলক্ষ্যে থাকবার চেষ্টা করতে করতে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করল।

গত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় টুলীপ আজ বেশ যত্নের সঙ্গেই সাজসজ্জা করেছেন। ছোট বন্ধ কলার, কালো কোট ও সাদা করডুরয় ব্রীচেসে তাঁকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছিল।

জুনের ক্ষীণ করপল্লবখানা তুলে ধরে দিলদরিয়া পোলিস কায়দায় তিনি চুম্বন করলেন, ফলে জুনের গাল দুটো লাল হয়ে উঠল। টুলীপ লক্ষ্য করলেন তা, এবং অপরিচয়ের শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে জুনের মনে স্বস্তির ভাব আনার জন্য কুশলী অভিনেতা টুলীপ কথা বলতে আরম্ভ করলেন :

'মিস উইদার্স, তুমি এসেছ দেখে আমি সত্যই আনন্দিত। আমি মনে করেছিলাম তুমি ভয় পাবে—আমি শুনেছি যে, মহারাজাদের সব মেয়েরাই বলে ভয় করে, ভয়াবহ জন্তু বলে মনে করে। এসো, বসো। দেখি, তোমার কোট খুলে দিই। ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিং, মিস্ উইদার্সকে সাহায্য করো তো।...ও হলো আমার এডিকং, শিখ, মিস্ উইদার্স, আর এদের এই চাষাড়ে জাতের হাবভাব ইউরোপীয় জীবনের রীতিনীতিতে একেবারেই অভ্যস্ত নয়। ওর বিশ্রী ধরনের উচ্চারণটা লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই। চাষার ঘরের ছেলে তো! কিন্তু আমাদের ডক্টর শঙ্কর তোমাদের এই ইংল্যাণ্ডেই ছিলেন অনেকদিন, ইংরেজী কেতা-

কায়দায় উনি অভ্যস্ত।…আচ্ছা, কি খেতে চাও বলো তো? কোন্ মদ খেতে তোমার ইচ্ছে?'

'যা কিছু একটা হলেই হলো।' টুলীপের অনর্গল বক্তৃতা শুনতে শুনতে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে মিস জুন।

বসবার ঘরেই আমরা যে ছোট-খাটো 'বার' সৃষ্টি করেছিলাম, টুলীপ হঠাৎ একটানা কথাবার্তা বন্ধ ক'রে তার দিকে চলে যান।

'ককটেল মেশাবো, না, একটু শেরী হলেই চলবে মিস—?' নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে টুলীপ জিজ্ঞেস করেন।

'শেরীই দিন।' মোটের ওপর ককটেলের এমনকি শেরীর জগতেও এ দোকানী-মেয়ের আনাগোনা অত্যন্ত সীমিত। বংশধারা, পরিবেশ, আর দোকান-পরিচারিকার অল্প বেতনের দিক থেকে এক গেলাশ বিয়ারই তার পক্ষে যথেষ্ট।

'বেশ আরাম ক'রে ব'সো—' মেয়েটির কুণ্ঠা কাটিয়ে দেবার জন্যে টুলীপ বলেন।

সলজ্জ হাসির সঙ্গে চোখ দু'টো আনত ক'রে, তারপর মুখ তুলে তাকায় মেয়েটি তাকেই অপহরণের জন্য রচিত রঙ্গ-মঞ্চের দিকে।

'পিয়ারা সিং অবশ্য হুইস্কীই চালাবে,' টুলীপ বলেন। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন: 'আর হ্যারি, তুমি কি খাবে?'

'আমিও একটু হুইস্কীই খাবো', এই বলে আমি মদ পরিবেশনের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই, পিয়ারা সিংও এগিয়ে আসে।

লক্ষ্য করলাম যে জুন একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে, তার অবস্থা সিংহের গহ্বরে ছাগশিশুর মতো, ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। যে

চেয়ারে সে বসেছিল, ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সেই চেয়ারের হাতলটা চেপে ধরে সাইড-বোর্ডের ওপর একটা টবে সংরক্ষিত গ্লাডিয়ালির লম্বা ডাঁটাগুলির দিকে অর্ধ উন্মুক্ত মুখখানা তুলে যেন সে সাহায্যের জন্য অন্ধ আবেদন জানাচ্ছে।

'লজ্জা করো না, মিঃ উইদার্স।' এক গেলাস শেরী হাতে ক'রে নিয়ে জুনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে টুলীপ বলেন: 'এই যে, নাও... তোমার ডাক নামটা কি?...আমার ডাক নাম টুলীপ...তোমার মা তোমাকে কি বলে ডাকেন?'

'জুন,' শেরীর গেলাসটা টুলীপের হাত থেকে গ্রহণ করতে করতে মৃদু কণ্ঠে সে বলে। মুহূর্ত পরে তার গাল রক্তিম হয়ে ওঠে, কালো ভোমরার ফ্রেমে-আঁটা পিঙল আঁখি দুটি তুলে সে তাকায় তার ভাবী প্রণয়ীর পানে।

'আমার মনে হয়, জুন মাসে জন্মেছ বলেই তোমাকে সবাই জুন বলে ডাকে।' এগিয়ে আসতে আসতে টুলীপ বলেন।

'কি ক'রে আপনি জানলেন যে আমি জুন মাসে জন্মেছি!' বিস্মিত চোখ তুলে টুলীপকে জিজ্ঞেস করে মেয়েটি, ভাবে, তার ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে বুঝি টুলীপ।

টুলীপ এগিয়ে গিয়ে জুনের চেয়ারের হাতলের ওপরে বসে পড়েন এবং মেয়েটির চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকেন।

আমি অপাঙে দৃষ্টি ফেলে দেখি যে, মেয়েটি তার দিকে চেয়ে আছে ...দেহটা তার নিথর, নিস্তব্ধ, ধীর, শান্ত। এবং এও বুঝতে পারি যে, পরস্পরের কাছে কি যে তারা চায়, তা তারা দু'জনেই বুঝতে পেরেছে, যদিও তার গালের রঙ থেকে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে মেয়েটি কুমারী এবং সে কখনই বিনা সংগ্রামে আত্ম সমর্পণ করবে না।

'দেখি তোমার হাত।' সৌখীন হস্তরেখাবিদের ভঙ্গিতে টুলীপ বলেন।

'আপনি তাহলে হাত দেখতে জানেন?' ছেলেমানুষের মতো সহজ-বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর মেয়েটির।

আমি বেশ বুঝতে পারছি, সাধারণ তরুণ ইংরেজরা যে রকম হয়, এমেয়েটিও সেই ধরনেরই বোকা বোকা। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের সম্বন্ধে এরা অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের ভাব-ধারণা পোষণ করে। সাপ, বাঘ, মহারাজা আর কালো নেটিভ্‌দের সম্বন্ধে নানারকমের রোমহর্ষক গাল-গল্প এদের মধ্যে প্রচলিত। ছেলেবেলায় যেসব সল্পমূল্যের রোমহর্ষক বই পড়ে ও শোনে, তা থেকেই এইসব ধারণা মনে বাসা বেঁধে থাকে। আর এখন সে নিজেই একজন ভারতীয় মহারাজার সঙ্গে প্রেমাভিনয়ের আশায় তার তরুণ দেহে যথেষ্ট রোমাঞ্চ অনুভব করছে।

'বাঃ, তোমার হার্টলাইনটা তো ভারী সুন্দর—!' মেয়েটির সহজ প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে টুলীপ বলেন। আর চোখে দুরভিসন্ধির চাহনি হেনে তিনি তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসেন: 'দেখি, দেখি—ও বাবাঃ, তোমার দেখছি নয়টি ছেলে মেয়ে হবে!'

মাথা দুলিয়ে জুন হো হো ক'রে হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঋজু হাত খানা টুলীপের হাত থেকে টেনে নেয়।

'আরে, আরে, হাত খানা দাও!' কথাটার দু'রকম অর্থ আরোপ করেই বলেন; তারপর আবার যোগ দেন; 'তোমার ভাগ্য-রেখা সম্বন্ধে তো কোন কথাই বলিনি এখনও!'

জুন তার হাতখানা বাড়িয়ে দেয় হিজ হাইনেসের হাতের মধ্যে।

'সুন্দর ছোট্ট হাত তোমার, ফুলের মতো নরম।' নিজের হাতের মধ্যে ধরে মৃদু চাপ দিয়ে টুলীপ বলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন: 'হ্যারী, তুমিও এ-বিষয় আমাকে একটু সাহায্য করতে পার।'

বোকা মেয়েটি যেন লজ্জিতই হয়ে পড়ল, তার রক্তিম গণ্ডে

অরুণিম আভার ছোপ খেলে গেল, ওষ্ঠে ফুটে উঠল স্মিত বোকা হাসি। টুলীপের সান্নিধ্যে সে অভিভূত হয়ে চোখ নামিয়ে নিজের হাঁটুর ওপর নত হয়ে তাকাল আর সেই সঙ্গে কেমন এক অজানা আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের চেয়ারের হাতলটা আর-এক হাতে দিয়ে চেপে ধরল।

শেষ পর্যন্ত টুলীপ ডান হাতের অস্পষ্ট ইসারায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে জিজ্ঞেস করেন: 'আর এক গেলাস দিই?'

'হাইনেস্, আমি এবার উঠছি—' এদের একা থাকতে দিলেই অবস্থাটা সহজ হবে মনে ক'রে আমি বললাম।

'না, না,' টুলীপ বলেন: 'এসো, আমরা সবাই আর-একবার পান করি। আর আমাদের খাবার দিতে বলো।' বলতে বলতে তিনি নিজেই গেলাসে মদ ঢালবার জন্য উঠে দাঁড়ান।

'হুজুর, আপনি বসুন। আমিই আনছি—' পিয়ারা সিং বলে, কারণ সে এই মিলন-বৈঠকটিকে একটু লঘু অবস্থাতেই দেখতে চায় এবং তার মধ্য দিয়ে তরুণীটির সঙ্গে টুলীপের যোগসূত্র স্থাপনটাও দ্রুত হোক এই তার ইচ্ছা।

'আচ্ছা, যাও, নিয়ে এস—' মৃদু হেসে টুলীপ পিয়ারা সিংয়ের প্রস্তাবে সায় দেন। তারপর মিস জুনের দিকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে ঝুঁকে পড়ে চুপি চুপি বলেন: 'আমি অত্যন্ত অসুখী মানুষ। তুমি কিন্তু আমাকে ভয় পেয় না···দেখছো তো, আমি—'

খাবার দেয়ার জন্য পরিবেশককে ডাকতে আমি বেল টিপ্‌বার জন্য উঠে গিয়েছিলাম ব'লে টুলীপের শেষ কথাটা শুনতে পেলাম না। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, জুনের মুখে সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল এবং মিষ্টি হাসিতে মুখখানা তার দীপ্ত হয়ে উঠল।

'কি হয়েছে আপনার?' জুনকে মৃদু নিশ্বাস ফেলে ধীর কণ্ঠে বলতে

শুনলাম। টুলীপের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে, চোখে তার স্মিত দীপ্তি।

মাথা নিচু ক'রে টুলীপ নীরবে বসে থাকেন, এই নীরবতা যেন তাঁর হৃদয়ের ওপর দুর্বিসহ পাথরের মতন চেপে বসে আছে। জুন করুণাময়ী হয়ে ওঠে, ধীরে ধীরে তাঁর জামার আস্তিন ধরে বলে :

'কি হয়েছে আপনার ?'

এই সময় পিয়ারা সিং জুনকে ছোট এক গেলাস শেরী দিল, টুলীপ ও আমাকে দিল বড় এক-এক পেগ হুইস্কী।

শ্রীমতী জুনের করুণার ছোঁয়া পেয়ে স্মরাতুর টুলীপ যেন বন্ধন মুক্ত হয়ে উঠতে চান। সজল চোখে তিনি জুনের হাতে একটু মৃদু চাপ দেন। অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করবার জন্য তিনি কথা খুঁজে বেড়ান।

'আমি সিংহাসন হারিয়েছি, কিন্তু তাতেও ক্ষতি ছিল না। শুধু, শুধু, যে-মেয়েটাকে আমি ভালোবাসতাম, সে যদি আমাকে ত্যাগ না করতো।'

জুন আরও করুণাময়ী হয়ে ওঠে···তার মুখের ভাব দেখে মনে হয় যে টুলীপের দিকে কখন নিজের অজান্তেই সে ঝুঁকে পড়েছে। টুলীপ যে ভালোবাসতে পারেন, তা তিনি প্রকাশ করেছেন। জুনের ওষ্ঠ দু'টো তখনও দৃঢ়ভাবে সংস্থিত, কারণ, যেহেতু আর-একটি মেয়ের বিরহে যখন এ লোকটি অস্থিরচিত্ত, তখন তিনি অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসবেন কিনা, তার মনে যেন এই সন্দেহ মাথা উঁচিয়ে উঠছে। তার অনুভূতিগুলো যেন হঠাৎ তাকে বিঁধতে থাকে, টুলীপের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

'ছেড়ে গেলো কেন ?'

দৃষ্টির ইসারায় টুলীপ পিয়ার সিং ও আমাকে কক্ষ পরিত্যাগ

করে চলে যেতে বললেন। আমি যখন প্রথম তাঁকে এ প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম তখনই তাঁর বিদায় দেওয়া উচিত ছিল!

'জানিনা, কেন ও-রকম করলো।' মনের চিন্তার সরব প্রকাশই যেন হলো টুলীপের এই ইংরেজ তরুণীর কাছে: 'সকলের শ্রদ্ধা, এমনকি সিংহাসনের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ ক'রে আমার জীবনের সব কিছু তাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে-মেয়ে···নাঃ, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। তখন যে কতো ভালোবাসতাম, কেউ কোনদিন তা জানতে পারবে না। মেয়েটি ছিল স্বার্থপর—স্বার্থপর এবং বিপথগামিনী। আমাদের ডাক্তারের ভাষায় শিজোফ্রেনিয়া ব্যাধিগ্রস্ত—'

'সে আবার কি?' খোলা মনে জুন জিজ্ঞেস করে।

'একরকম দ্বিধা-বিভক্ত মন।' আমি বুঝিয়ে বলি। এতে মানুষের মনের একটা অংশ অপর অংশটার অস্তিত্ব জানতে না পেরে আলাদা ভাবে চলতে থাকে—অথচ তার মন তখন শতধা বিচ্ছিন্ন।'

'ডক্টর জেকীল আর মিঃ হাইড!' উৎসাহের সঙ্গে জুন বলে: 'ও হো, আমি এ জানি··'

'হয়তো হৃদয় বলে তার কোন বস্তুই ছিল না।' টুলীপ আবার বলেন: 'কারণ, তারপর তাকে ফিরে পাবার জন্য কত চেষ্টাই না করেছি।' তিনি কাঁপতে থাকেন, চোখ দু'টো তাঁর স্থির হয়ে যায়।

'মেয়েদের আমি সম্মান করতাম, বন্দনা করতাম, আর এখন মেয়েদের ওপর আমি আস্থা প্রায় হারিয়েই ফেলেছি।'

'মেয়েদের সম্বন্ধে ও-ভাবে ভাববেন না।' টুলীপের বাহুতে মৃদু স্পর্শ ক'রে জুন বলে।

টুলীপের চোখে ফুটে ওঠে একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টি, দেখে মনে হয় যেন তাঁর এই বাসনার উদয় হয়েছে যে, এই সুন্দরী অতিথি যখন গলেই গিয়েছে, তখন তার কাছে মনের সব দুঃখের কথা ব'লে তার পায়ে

লুটিয়ে-পড়েন। আমার দিকে তাকান একবার। কিন্তু আমি স্থান ত্যাগ ক'রে উঠে পড়েছি। পিয়ারা সিংয়ের দিকে এগিয়ে তার হাত ধরে বেরিয়ে যাবার জন্য বলি :

'চলো, আমরা গিয়ে খাবার দিতে বলি।'

লক্ষ্য করি, ভাবী প্রণয়ীরা নিঃসঙ্কোচেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে টুলীপ আবার গঙ্গাদাসীর আলোচনা জুড়ে দেন। আমার মনে হয়, কুমারী জুন উইদার্সের সঙ্গে প্রেমাভিনয়ের সাফাই খুঁজছেন তিনি। সন্ধ্যাবেলার ঐ ব্যতিক্রম যে গঙ্গাদাসীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কোনরূপ ক্রটি নয়, তা আমাকে বোঝাবার জন্যেই যেন তিনি এখন একথা বললেন, এই সাফাই গাওয়ার পেছনে তাঁর একজাতীয় মর্ষকামী মনের বেদনাবোধও হয়তো থাকতে পারে ; বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রাগ, দুঃখ ও বিরহ যন্ত্রণা এবং সঙ্গে সঙ্গে এই তিক্ততা দূরে সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পুরাতন ক্ষতগুলোর ওপরে হাত বুলিয়ে একরকমের অতিমাত্রায় তুষ্টিলাভও একে বলা যেতে পারে। বোধহয়, হৃদয়ের ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটে বসানোর জন্য পুরোনো ভাড়াটাকে দূর ক'রে দেওয়ার স্পৃহা থাকতে পারে এর মধ্যে। কারণ, বন্ধনহীন অবস্থায় না থাকলে, কারুর পক্ষেই সহজে প্রণয়-মত্ত হওয়া সম্ভব নয়। নতুন প্রতিমার বোধনমন্ত্র আওড়াবার আগে সাবেক বিগ্রহকে ভেঙ্গে ফেলা কিংবা বিসর্জন দেওয়া দরকার, তা যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ পক্ষে নিরাপদ দূরত্বে তাকে সরিয়ে রাখা যে প্রয়োজন।

'আজ সকালের ডাক এসেছে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন টুলীপ।

'না।' টাইমস-এর পাতা উল্টোতে উল্টোতে আমি উত্তর দিই।

নিজের পরস্পর বিরোধী ভাবধারাগুলোর অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করার আগে আমাদের মধ্যে ব্যবধানটা দূর করার জন্য টুলীপ

ক্ষণকালের জন্য ইতস্ততঃ করেন। ভাবাবেগের ভয়াবহ প্লাবনের পূর্বে তাঁর মুখখানা সঙ্কুচিত দেখায়। আমার গম্ভীরভাবে খবরের কাগজে মনোনিবেশ তাঁকে নিশ্চয়ই বিরক্ত করছিল, এবং তা বুঝলাম তাঁর বিছানায় গড়াগড়ি দেওয়া দেখে। কিন্তু আমার নির্লিপ্ততায় তাঁর মনের অসন্তোষ ভাবটি তিনি প্রকাশ করছিলেন না। কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর চব্বিশ ঘণ্টার বক্-বকানিতে একমাত্র আমিই কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ করি না। আমার ওপর অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য তিনি ইচ্ছে করেই বিরক্তির ভাব প্রকাশ ক'রে একটা হাই তুলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন। তারপর অন্তরের গভীরতম প্রদেশর বিশৃঙ্খল ভস্মস্তূপের মধ্য থেকে তিনি হঠাৎ বলে ওঠেন :

'ডাক্তার, বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে, একটা খবরও ও পাঠাচ্ছে না কেন!'

'কারণ বোঝা তো খুব কঠিন নয়। প্রথমতঃ তিনি লেখাপড়া জানেন না। যদি তিনি লিখতেনও, তাতে আপনি আরও বেসামাল হয়েই পড়তেন। কারণ, আপনি মুখে না-না করলেও গঙ্গাদেবী ইতিমধ্যে আপনাদের মধ্যেকার সম্পর্কটাকে অন্যভাবে দেখতে আরম্ভ করেছেন ...আমি জানি না কোন্‌টা বেশী বিপত্তিকর, তাঁর চিঠি লেখাটা, না, না-লেখাটা।'

'যদি ভাল মনে ওর নিজের অবস্থাটা আমাকে জানাতো আমি তাই মেনে নিতাম।'

'আমার মনে হয়, আপনাকে যদি চিঠি লিখতে চাইতেন গঙ্গাদেবী, তাহলে তিনি ফিরে আসবার খিড়কীর দোরটা উন্মুক্তই রাখতেন। কারণ বলতে পারছি না, তবে আমার একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যখন আসবেন তখন আর আপনি বসে থাকবেন না, জুন কিংবা অন্য কেউ আপনার জীবনে তখন আসন

ঝিমিয়ে বসে যাবে। আর যে-কাজ তিনি করেছেন, তাতে আপনার মন তাঁর দিকে আর ফিরেও তাকাবে না। সুতরাং ইংরেজরা যেমন বলে—দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করা,—এখন তাই করা ছাড়া অন্য কিছু করবারও নেই আপনার।'

'কিন্তু আমি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে পারছি না, আমি চাই ভালোবাসতে আর ভালোবাসা পেতে। আমি চাই ওকে। যদি বলো গঙ্গী অসুস্থ, ওকে নিশ্চয়ই সুস্থ ক'রে তুলতে হবে। ওর জন্য নিজেকেই আমি দায়ী মনে করি ডাক্তার, জানি না ওর মনে কি হচ্ছে, যদি শুধু জানতাম, সুখে আছে ও, সত্যিই সুখী, তা হলে স্বস্তি বোধ করতাম।...'

'আমি বুঝতে পারছি যে, আপনাকে হিতোপদেশ দিয়ে কোন লাভ নেই। মানুষ সহ্য করতে পারে আর এই সহ্য করাও কষ্টভোগেরই নামান্তর। তবুও মানুষকে তাই সইতেই হয়...'

এই স্বীকারোক্তিতে আমার শেষ কথাটার জন্য টুলীপ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন ব'লে মনে হলো।

'আমি হচ্ছি সুখ-দুঃখে উদাসীন সন্ন্যাসী।' তিনি বলেন।

'আর তা সত্ত্বেও আপনি মাত্র গত রাত্রিতে কুমারী জুনকে ধরবার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন!' রীতিমত তিক্ততার ঝাঁঝ আমার কণ্ঠে ফুটে উঠল।

টুলীপ তাড়াতাড়ি আলোচনার মোড় ফিরিয়ে অধীরভাবে বলেন:

'জুনকে আমি ভালোবাসি না, তবে সমস্ত মেয়েদের প্রতি আমার মনে যে সর্বগ্রাসী স্নেহ ও প্রীতি রয়েছে, আমি ওকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। শ্যামপুরের প্রজাদের যে কতো ভালোবাসতাম, তা তো আর তুমি জান না! তাদের দুঃখে কষ্টে আমার প্রাণ কাঁদতো, তাদের জন্য আমি বেশি কিছু করতে পারতাম না, তবে সব সময়েই মনে

করতাম যে, গলিত কুষ্ঠ রোগীর পাশে বসেও যদি তার ক্ষতগুলোর উপশম করতে পারি।···আর গঙ্গী আমার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদন না করলেও আমি ওকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতাম—'

এই কথা বলেই তিনি হঠাৎ বিছানায় শুয়ে পড়েন। অর্থহীন কথা আর কি। কেমন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব চোখে পড়ে।

তাঁর নবলব্ধ সাধুগিরির বক্তৃতার বুদ্‌বুদ্‌টা উড়িয়ে দেব, না, নীরব থেকে তাঁর অলীক-ধারণাগুলোকে প্রশ্রয় দেব, সে-সম্বন্ধে কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না। সমস্ত নারীর জন্য তাঁর সহানুভূতির কথা যে স্রেফ নাটকীয় ভাবে বলা, সে তো সহজবোধ্য, কারণ যিনি "শ্যামপুরের অত্যাচারী রাজা", যিনি ছিলেন বে-আইনী কর আদায়ের প্রতিভূ, যিনি ছিলেন তাঁর রাজ্যের বিশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থার বিধিসিদ্ধ শাসক এবং নিজের খেয়ালখুশী মতো প্রজাদের আবেদন-নিবেদনে সাড়া দিতেন যিনি, তাঁর পক্ষে একরকম সেণ্ট ফ্রান্সিস্ বনে যাওয়াকে আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কীই বা বলা যায়!

'গঙ্গাদাসীর জন্য আপনার যতটা আকুতি, অন্যান্য লোকের বেলায় ততটা বোধ করেন কিনা, সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে,' পাছে তিনি বিরক্ত হন, এই ভয়ে কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গেই আমি বলি : 'বোধ হয় আপনি নিজেকে শ্যামপুর প্রজাদের মা-বাপই মনে করতেন, কারণ, প্রজাদের কাছে নিজেকে মা-বাপ বলে জাহির করতে হবে—এই চিন্তা-ধারার মধ্য দিয়েই তো আপনি বড় হয়ে উঠেছেন; কিন্তু লোকে আপনাদের এই সমস্ত ভাব-ধারণা বুঝতে না পেরে শেষপর্যন্ত আপনাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আর গঙ্গাদেবী যদি কোনদিন আত্ম-দান ক'রে না থাকেন তার জন্যেও তো আপনিই দায়ী, কারণ আপনি শুধু আপনার বাসনারই চরিতার্থতা সাধন করেছেন, মানুষ হিসেবে সেই মেয়েটিকে তো পাবার চেষ্টা করেন নি। আপনি তো জানেন, আপনি চান শুধু

যৌন-সম্ভোগ। গত-রাত্রে আপনি যে-ভাবে জুনের দিকে তাকাচ্ছিলেন ···আমার ভয় হচ্ছে, আপনি আত্মবঞ্চনা করছেন টুলীপ!'

'বোধহয় তোমার কথাই ঠিক ডাক্তার,' তিনি দোষ স্বীকার ক'রে বলেন: 'কিন্তু গঙ্গী যখন ছিল, তখন অন্য কোন মেয়েমানুষের ওপর তো দৃষ্টি আমি দিই নি।'

'আমি স্বীকার করছি, যে-ভাবে গঙ্গাদেবী আপনার বাসনা চরিতার্থ করেছেন, অন্য কোন নারীই তা পারে নি। কিন্তু তিনি যদি আর সে-জীবন যাপন করতে না চান, কেন তাঁকে দুষবেন? আর আপনিও সেই জন্যেই তাঁর ওপর ক্ষেপে গিয়েছেন! এখন আপনি আপনার সেই আসক্তিটা সর্বব্যাপ্ত প্রেমের সু-উচ্চ দর্শনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন! সমস্ত জিনিসটা বিচার বিশ্লেষণ করলে এর কি অর্থ হয় টুলীপ? এর অর্থ হয়: বেশ্যা মা ও গুণ্ডা পিতার জন্য গঙ্গী যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকেন, তা হলে আপনার মনও হাজারো রকমের স্নায়বিক দোষে ব্যাধিগ্রস্ত। তা যদি না হয়, কখনই তিনি আপনাকে এরকমভাবে ভূতের মতো পেয়ে বসতে পারতেন না, আপনিও অতটা ডুবে যেতেন না।'

'আমি জানি ডাক্তার, যে আমি অসুস্থ।' ক্ষীণকণ্ঠে টুলীপ বলেন।

'আমি জানি না, আপনি ছেলেবেলায় সে-রকম ভালোবাসা পেয়েছেন কিনা।' তাঁর অতিমাত্রায় নারীতে আসক্তির মূল আবিষ্কারের আশায় আমি এরকম অনুমানে সাহসী হয়েই বলি।

'খুব বেশি নয়—' নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য ও অবনত মনে করছেন এইভাবে তাকিয়ে থেকে তিনি বলেন। অন্তরের গভীরতর প্রদেশ থেকে বেশ কিছু বের ক'রে এনে আমাকে শোনানো তাঁর অভিপ্রেত নয়, এই ভাবেই হঠাৎ তিনি নীরব হয়ে পড়েন।

এই ভাবে হৃদয়হীন হয়ে দোষ উদ্‌ঘাটন করা আর আমার পক্ষে উচিত নয়, এই ভেবে আমি আবার কাগজখানা হাতে তুলে নিই।

'আমি তাহলে কি করবো ?' দীর্ঘ সময় ধরে উভয়েই নির্বাক থাকার পর টুলীপ আমাকে জিজ্ঞেস করেন। এই সময়ের মধ্যে আমার মনে হয়, তাঁর বিশৃঙ্খল মনের অবস্থাটা যে আমি সমর্থন করছি না, তা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

'আপনার ও গঙ্গীর মধ্যে সব রকমের সম্পর্ক চুকে গিয়েছে, একেবারেই শেষ হয়ে গেছে—এই বাস্তব সত্যটা—অসহনীয় হলেও—আপনাকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। এখন একমাত্র আপনার আশা-ভরসা হলো জুনের বন্ধুত্ব।...'

টুলীপ আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।

পরবর্তী কয়েকদিন টুলীপ ও জুন উইদার্সে'র যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ ঘটে। দু'জনেরই সৌভাগ্য বলতে হবে যে আমাদের ফ্লাটে জুনের প্রথম শুভাগমনের দু'দিন পরেই সপ্তাহের শেষ এসে পড়ে, আর দু'জনেই পল্লী অঞ্চলে দীর্ঘ সময় ধরে মোটরে ঘুরে বেড়ায়।

কুমারী জুন একাধারে লাজুক মেয়ে, এমনকি সন্ত্রস্তও, আবার সেই সঙ্গে কিছুটা বন্যও বটে। সাধারণ ভাবে তার অন্তর্নিহিত পেটিবুর্জোয়া সম্ভ্রমবোধ দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত, কারণ, অধিকাংশ মহারাজাই লম্পট ব'লে পরিচিত, আর এ নিয়ে তার নিজের লোক এবং অপরেও নিন্দা-আলোচনা করবে—তাও সে জানতো ; কিন্তু তার জীবনের আর-একটা গুপ্ত স্তর আছে। সেখানে এই যোগাযোগটা গতানুগতিক রাজনীতি-গুলোকে আড়াল ক'রে কতকগুলো রোমাঞ্চপূর্ণ গুপ্ত আবেগেরও সৃষ্টি করেছে। জীবনের এই গুপ্ত স্তরটিকে বলা যেতে পারে "প্যাগান" অংশ ; মাইকেল আর্লেন এটাকেই হয়তো তাঁর "চিসেলহার্স্ট মাইণ্ড" নামে অভিহিত করতেন।

যেদিন সন্ধ্যায় জুন প্রথম মেফেয়ারে আসে, সেদিন টুলীপ জুনের

চেয়ারের হাতলের ওপর এসে বসেছিলেন, মেয়েটির নরম দেহের স্পর্শ লেগেছিল তাঁর হাতে। সে-স্পর্শে জুনের দেহটা কেঁপে উঠেছিল পাখীর মতোই, যে-পাখী খাঁচায় পুরবার সময় ক্রুদ্ধ হলেও পরবর্তীকালে যে তাকে আটক করেছিল, তাকেই গান শোনায়। এখন দেখছি এদের চুম্বন আর স্পর্শাতুর অবস্থায় পরস্পরের দেহলীন হয়ে শুয়ে-বসে থাকতে। দেখছি টুলীপ যেন রয়েছেন অচেতন অবস্থায় আর জুন একেবারে নিশ্চল…চোখ দু'টো তার বোজা…যেন সে দিচ্ছে না, শুধু গ্রহণই করছে। তাছাড়া, মাসের পর মাস ধরে ব্যর্থতার সঞ্চিত আগুনে উন্মত্ত ও অনিয়ন্ত্রিত কামায়নে পাগল হয়েই টুলীপ তার কাছে এসেছিলেন, আর ঐ কামায়নই আচম্বিতে চুম্বনেই পর্যবসিত হয়েছে। জুন বিস্ফারিত চোখে টুলীপের দিকে চেয়ে সোফার ওপর শুয়ে থাকে। সূর্যের পরশে যেন গোলাপের পাপড়ি খুলে গেছে। তা সত্ত্বেও জুনের দেহ যেন কতকটা নিস্তরঙ্গ, ঢেউ ওঠে না, আর আমি বেশ উপলব্ধি করতাম, টুলীপ ইচ্ছে করেই ওর সঙ্গে অতি নম্র ব্যবহার করছেন, কারণ তাঁর ভয় যে পাছে তাঁর ভারতীয় প্রকৃতির মাত্রাহীন জীবনীশক্তি ইংরেজ তরুণীটিকে অভিভূত ক'রে শেষপর্যন্ত বিতাড়িত ক'রে বসে।

তাদের মধ্যে বেশ তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব জমে ওঠে। আর "বুদ্ধির" জীবনে যে-জিনিস্‌টা তারা সমান উপভোগ করছে, তা হচ্ছে রেডিও-গ্রামের একটানা সুর। এতে দু'জনারই প্রেম উচ্চতর ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই প্রেম পারস্পারিক হলেও উভয়ের প্রণয়ের মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য ছিল,—এবং তা হলো জুনের নিষ্ক্রিয়তা আর টুলীপের অতিমাত্রায় সজীবতা।

তবে আমি এটা জানতাম যে, তাঁর ঘোলাটে মন নিয়ে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। 'পীরিতির জন্য একটা ভারতীয় তরুণী যোগাড় ক'রে দাও', আমার কাছে মনের গোপন কথা প্রকাশ করবার

সময় তিনি ঐ কথা প্রকাশ ক'রে ফেলতেন। আমি বুঝি যে, গঙ্গীর মোহ এখনও তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। জুন উইদার্সের সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে প্রেম করার সময় বিপরীত ধারণা হিসেবে প্রায়ই ঐ মোহ তাঁকে অভিভূত করতো। মনে হয়, তাঁর দেহটা নানান রকম চরম-ভাবেই গঙ্গীর সঙ্গে আবদ্ধ ছিল, এদিক দিয়ে আর কারুর পক্ষে সে-অভাব পূরণ করবার নয়, এমন কি জুন অপেক্ষাকৃত উষ্ণ-অনুভূতির মেয়েও যদি হতো, তা হলেও এই অভাব সে পূরণ করতে পারতো না। আজ এই মুহূর্তে জুনকে তিনি তাঁর সর্বস্ব দিতে চাইলেও, সেটা মোটেই তাঁর জীবনের প্রকৃত স্রোত-প্রবাহ নয়, শুধু কাম ও কর্ম-শক্তিরই চিহ্ন। কারণ, নিজের মধ্যেই তিনি যেন একটা বিরাট ঘূর্ণাবর্তে আটকে পড়েছেন। তার উপরিভাগটা সফেন ঘূর্ণাবর্ত হলেও তা ভেতরে ভেতরে বহুদূরবর্তী অভিজ্ঞতার সংক্ষুব্ধ কেন্দ্রগুলোয় গিয়ে পৌচেছিল। ঐ সমস্ত কেন্দ্রের শক্তিশালী আকর্ষণ তাঁকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে যেন জেলীর মতোই পিচ্ছিল এঁটেল মাটিতে পরিণত করেছিল। সেইজন্য উন্মত্ত প্রেমের চুম্বন ও আদর-সোহাগে জুনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললেও, তাঁর মনটা ছিল কুৎসিৎ ও তিক্ততায় পরিপূর্ণ। ফলে তিনি মদের পর মদ গিলে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাইতেন, কারণ তাঁর সত্যিকারের চাওয়া তো অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতোই অলীক এবং তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নাগালের বাইরে। জীবনের এই স্বাদ পূর্ণ করা এখন তাঁর পক্ষে স্বপ্নাতীত।

'কেমন আছেন?' দীর্ঘ দিবানিদ্রার পর টুলীপ যখন একদিন অপরাহ্ণে ঘুম থেকে উঠে বসেছেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি।

'মাসের পর মাস ধরে অনিদ্রার ঘাটতি পূরণের জন্য প্রত্যেক দিন লাঞ্চের পর ঘুমনোর অভ্যেসের ফলে, জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধানটা বেশ বুঝতে পারছি আমি।' ধীর কণ্ঠে তিনি বলেন।

আমি বুঝলাম, তিনি আমার প্রশ্নটা এড়াতে চাইছেন।

'আপনি এখন তো ভালই আছেন টুলীপ—কি বলেন ?'

'বেশি সুখী হয়েছি কিনা, জানি না কিন্তু বিজ্ঞ হয়েছি।' তিনি বলেন। এবং ভেতরের অনুভূতিগুলোর ওপর নজর দেওয়ার জন্যই যেন তিনি থেমে যান। তারপর আধা-বিরক্তি ও আধা-রসিকতা ক'রে বলেন : 'কে একজন বলেছে, যদি তোমার হৃদয় ভেঙ্গে থাকে, তাহলে তার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা হচ্ছে আবার তা ভেঙ্গে ফেলা !'

আমি হেসে ফেলি, কিন্তু মনে হয়, আমার এই হাসির মধ্যে একটা আলগাভাব লক্ষ্য ক'রে তাঁর মুখটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

'সত্যিই ডাক্তার, পিয়ারা সিং যখন বলেছিল যে, গঙ্গীর বদলে আমার অন্য কাউকে চাই, তখন কিন্তু সে ঠিক কথাই বলেছিল, তবে আমি প্রথমে তা বুঝতে পারি নি।'

আলোচনার মোড় ঘুরাবার জন্যে আমি ইচ্ছে করেই দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করি :

'আমার মুখে সুখের কথা শোভা পায় না টুলীপ। আমার মতে, সুখ বলতে যদি কোন কিছু থাকে, তা প্রধাণতঃ মানসিক উদ্বেগ দূর করার ওপরেই নির্ভর করে।'

'আমারও ঐ মত। এখনও মনের ভেতরে একটা দংশনের তীব্র জ্বালা অনুভব করি, অনেকটা দাঁতের ব্যথার মতো—। জীবনে কি যেন হারিয়ে ফেলেছি মনে কেবল এই কথাই বার বার উঁকি দেয়… মনে হয়, গঙ্গী চলে যাওয়ার পর আমার মধ্যে একটা কিছু যেন চিরদিনের জন্য মরে গিয়েছে। খুব সম্ভব ওভাবে আর ভালোবাসতে পারব না আর কাউকে। মনে হয়, যখন যেমন তখন তেমন—সেই ভাবেই জীবনের আনন্দ উপভোগ করা উচিত।'

'আপনার পক্ষে অপেক্ষা করলেই ভাল হতো টুলীপ—' কতকটা

নৈতিক উপদেশ হিসেবেই আমি বলি : 'কত ভাল ভাল মেয়ে আছে—, তাদের যে কেউ আপনার সঙ্গে—'

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে টুলীপ মাথাটা একদিকে কাৎ ক'রে আমার দিকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলেন :

'তোমাকে তো আমি বলেছি যে, মেয়েদের সম্বন্ধে আমি একটা সিদ্ধান্তে পৌচেছি : ওরা সব বদমায়েস লোকদেরই পছন্দ করে। যখন আমি ছিলাম বন্য তরুণ, তখন যে-কোন মেয়ে-মানুষকে ইচ্ছে করলেই নিতে পারতাম।···আমার মনে হয়, খারাপ কিছুর দিকেই ওদের যত আকর্ষণ—'

আমি কাষ্ঠহাসি হেসে আলোচ্য বিষয়টির মোড় আবার ফেরাবার চেষ্টা করি।

টুলীপকে বিরক্ত বলে মনে হলো। কাজেই আলোচ্য বিষয়টার মধ্যে হাসি-ঠাট্টার মিশাল দেবার চেষ্টা করি।

'আর দেখুন, আগের দিনে ইউরোপে মেয়েদেরই বা কি স্থান ছিল! তাকে কেউ জিজ্ঞেস করতো না, তার মতামতের মূল্য দিত না কেউ, তাদের ইচ্ছা ও অভিমতের জন্য প্রতীক্ষা করার কথা ভাবতোও না কেউ, তাদের নেওয়া হতো। ...আর আমার মনে হয়, সমাজে নারী যখন পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করবে, একমাত্র তখনই এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। প্রেম তখন পারস্পরিক লেন-দেনের সম্পর্ক হবে, তখন পুরুষ ও নারীর ভেদাভেদ থাকবে না, নারী তখন থাকবে না শুধু মাত্র যৌনভিত্তিক হয়ে। নর-নারী তখন নিবিড় ভাবেই একসঙ্গে বাস করবে, আর তাদের সম্পর্কও স্থায়িত্ব লাভ করবে, দাতা-গ্রহীতার ভাবটাও থাকবে না, তখন বিবাহিত জীবনে বিচ্ছেদ উভয়ের কাছেই একটা সাংঘাতিক বিপর্যয় বলে মনে হবে। আর এরই ভেতর দিয়ে নতুন মূল্যমানেরও সৃষ্টি হবে, যাতে দম্পতি বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে,

না, তার বাইরে, এই প্রশ্নটি তখন অবান্তরই মনে হবে। তখন তাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক কর্মের ভিত্তিতে প্রেম-ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ওপর দণ্ডায়মান সৃজনধর্মী কিনা—প্রশ্নটা এই দৃষ্টিতেই দেখা হবে। বর্তমানে আমাদের বুর্জোয়া সমাজে লোকে এই ভিত্তিটা মেনে নেওয়ার ভান করলেও প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষা করেই চলে, কিন্তু নতুন ধরনের সমাজে—'

' "বুর্জোয়া"—ঐসব শব্দগুলো বলো না তো,—ও কথাগুলো আমি সহ্য করতে পারি না।' আমাকে বাধা দিয়ে টুলীপ বলেন।

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিলের ওপর থেকে একটা সিগারেট নিয়ে আগুন ধরান। আমি যা বললাম তাতে, জীবনে যা কিছু তিনি করেছেন, তা অস্বীকার করা হয়েছে ব'লে তিনি আমার কথার পাল্টা জবাব দেবেন বলেই মনে হয়। শান্ত অবস্থায় আমি যা বলি, তাই তাঁকে মেনে নিতে দেখেছি। কিন্তু সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হলে তাঁর নিজের কাছে প্রশ্ন করবার জন্য আমি চেষ্টা করলেই তাঁর মনে অশুভ বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, আর তিনি পাল্টা আক্রমণ ক'রে বসেন। তাঁর আত্ম-শুদ্ধির কাছে গঙ্গী যে-ভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতো, আমার নীতি-বাগীশতাতেও তাঁর মধ্যে তেমনি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে দেখতে পাচ্ছি। আমার কথা অস্বীকার করার জন্য একটা বিদ্বেষে তাঁর চোখ দু'টো যেন জ্বল্ জ্বল্ করে। আমার বিরুদ্ধে রাগটা চেপে রাখার জন্য তিনি ক্ষণকাল নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

তাঁকে সাহায্য করা বা নিজের কাছে সাফাই দেওয়া সম্বন্ধে হতাশ হয়ে মাথা নত ক'রে আমি বসে থাকি।

হঠাৎ যেন তিনি আমার মুখের আহত অবস্থাটা দেখতে পান। করুণা প্রদর্শনের সুস্পষ্ট আকুতি নিয়েই তিনি আমার দিকে মুখ ফেরান।

'আমাকে ঘৃণা ক'রো না ডাক্তার। দয়া ক'রে আমাকে শান্তি

দিও না।' আর তারপর, চোখের জল যাতে আর কেউ দেখতে না পায়, এইভাবে তিনি নিজেকে শক্ত রাখতে চেষ্টা করেন।

আমি অনুমান করি যে, কুমারী জুন উইদার্সের সাহচর্যে বিস্মৃতির যে স্বল্পস্থায়ী সময়টা তিনি উপভোগ করেন, সেইটুকু ছাড়া টুলীপের মন থেকে অতীতের জন্য অনুশোচনা, বর্তমানের জন্য অপরাধবোধ এবং ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ দূর করার আর কোন উপায়ই নেই।

জুনের সঙ্গে টুলীপের এই মুহূর্তগুলোকে কিন্তু আংশিকভাবে বিস্মৃতির মুহূর্ত বলা যায় না। কারণ, জুনের বাবা-মা মেয়ের এইভাবে বেশি রাত পর্যন্ত বাইরে থাকায় আপত্তি জানায়, আর তার প্রণয়ী ব্যারট-এর তরুণ বন্ধু কার্জন ষ্ট্রীটের আশেপাশে ঘোরাফেরা ক'রে ইদানিং জুনের বিশেষ অসুবিধে ঘটাতে আরম্ভ করেছে।

কাজে কাজেই, যদিও স্প্যানিশ হাঙ্গেরিয়ান ফরাসী গ্রীক ও ভারতীয় রেস্তোরাঁয় টুলীপ তাকে যে-সমস্ত খানা-পিনা এবং বণ্ড ষ্ট্রীট ও বার্কলি স্কোয়ারের সৌখীন দোকানগুলো থেকে ভালো ভালো পোশাক ও তার পছন্দমতো গান-বাজনার সাজসরঞ্জাম যোগাচ্ছিলেন, তাতে জুন তার কুমারী-সুলভ নিস্পৃহতার ভাব কিছুটা শিথিল করলেও, এই সমস্ত আদর-আপ্যায়নের মধ্যে যে কামজ ভাবটা ছিল, তাতে কিন্তু সে লজ্জাবোধই করতো।

আর, এই অতিমাত্রার সক্রিয় অন্তরঙ্গ জীবনের সৌন্দর্যের ভেতরেও জুনের হাবভাবে সামান্য একটু আড়ষ্টভাব যেন টুলীপ লক্ষ্য করেন। এবং এই প্রেমাভিনয় নিতান্তই সাময়িক বলেই তাঁর মনে হয়।

তবুও জুনের সঙ্গে নতুন প্রেমের উৎসাহ-উন্মাদনার ভেতরেই টুলীপের বাইরের জীবন গড়িয়ে চলে। দরিদ্র প্রণয়িনীকে হরেকরকম উপঢৌকন-উপহারের গোলক-ধাঁধায় জড়িয়ে ফেলার যে চেষ্টা ক'রে

থাকে বড়লোক প্রেমিক, টুলীপও তাই শুরু করেছেন পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু অন্তরের গভীরে ইংরেজ বালিকার সঙ্গে তাঁর এই প্রেমের খেলার জন্য তাঁকে বেশ ভীতই মনে হয়। আমার মনে হয়, গঙ্গীর সংসর্গে যে চরম আনন্দ তিনি পেতেন, তার এক মধুরাবেশ তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখত। আর গঙ্গীর গাঁদা ও গোলমোহর ফুলের দীপ্তবর্ণের কাছে সলজ্জ জুনের ঈষৎ গোলাপী রঙ অনেকটা ম্লান। তাছাড়া জুনের আড়ষ্ট ভাবটা তাঁর কাছে যেন কতকটা একঘেয়ে মনে হয়। ইংরেজ মেয়েটির মধ্যে রয়েছে প্রথম প্রণয়ের সলজ্জ নম্রতা আর মৌনভাব। জুনের অনেক কিছুই যেন তিনি পাচ্ছেন না, তাঁর নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে জুনের দেহ-সৌষ্ঠবের অনেকখানি এবং তারই ফলে অবস্থাটা ভদ্রতার স্তরেই থেকে যায়। টুলীপ আমাকে বলেন, হৃদয়ে তিনি এই আশাই পোষণ করেন যে, তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান ও দৃশ্য এই মেয়েটিকে দেখাবেন, ধন-সম্পদে পূর্ণ ক'রে দেবেন জুনের জীবন, তাকে নিয়ে যাবেন পৃথিবীর সর্বত্র। কিন্তু টুলীপের উৎসাহী প্রকৃতির সঙ্গে এই ফ্যাকাশে বিবর্ণ মেয়েটি যে তাল রেখে চলতে পারবে—তা কিন্তু আমার মনে হয় না, মনে হয় না যে তার দীপ্ত চাউনির অন্তরালে যে-অন্তর্লোক রয়েছে তা কোনদিন মুখর হবে।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে, কোন রেস্তোরাঁ বা সিনেমায় ঢুকবার সময়, অথবা গাড়ির ভেতরে হাত ধরাধরি অবস্থায়, কিংবা অধিক রাত্রিতে খাবার গ্রহণের সময় আমি বার বার লক্ষ্য করেছি যে, টুলীপ যেন আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছেন। কিন্তু নিরুত্তাপ জুন যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে—একজন ভারতীয় হিজ হাইনেসের কাছে এভাবে আত্ম-বিক্রয়ের অপমান ও অপরাধের জন্য পৃথিবীর কঠোর দৃষ্টি যেন তার ওপর নিবদ্ধ—একটা তীব্র আলো যেন তার সারা অঙ্গে কি খুঁজে দেখছে, আর জুন যেন কি একটা আশংকায় অভিভূত হয়ে পড়েছে।

টুলীপ অতঃপর একটা সূক্ষ্ম কৌশল প্রয়োগ করেন। জীবন সম্বন্ধে জুনের মতামত জানবার সহজ সরল পথ অর্থাৎ সোজাসুজি ভাষায় কথা বলা, তা এবার তিনি ছাড়লেন; স্নেহ-ভালোবাসার মাত্রাটা তিনি দিলেন বাড়িয়ে, এবং মনের ঘোরালো অবস্থাটা ভুলবার জন্ত তিনি অতিমাত্রায় নাটকীয় ভাবপ্রবণতার আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, এই ধরনের প্রণয়লীলায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্ত কুমারী জুন আগুনের মতো জ্বলে উঠল। তার ভেতরে যে শীতল ভাবটা ছিল, তা যেন গলে গেল এবং কানায় কানায় ভরিয়ে দেবার জন্তই সে যেন নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে তুলে ধরছে। তার চারদিকে যে কি ঘটছে, তা বুঝবার মতো শক্তি ও মনের অবস্থা তার নেই···তা সত্ত্বেও প্রেমে অভিভূত হওয়ার আশায় বিবসনা হয়ে জুন নিজেকে ছেড়ে দিল। টুলীপের জন্ত একটা কামনার ঝোঁক ধীরে ধীরে তার মধ্যে মাথা উঁচিয়ে উঠতে থাকে। তাঁর দেওয়া প্রাতটি জিনিস, এমন কি তিনি যদি গোটা জগৎটাই তার হাতে তুলে দেন, তা গ্রহণ করবার জন্ত সে তাঁর মুখের দিকে নিজের ঈষৎ উন্মুক্ত মুখখানা তুলে ধরে। টুলীপের গালটা কিংবা চিবুকটা মৃদু করস্পর্শে তার নিজের মুখের দিকে আকর্ষণ ক'রে জুন তার অন্ধ মনটাকে আনন্দোদ্ভাসিত ক'রে ফেলে। আর এইভাবেই তারা এগোতে থাকে এক চরম বাসনার রাজ্যে···

কিন্তু, হায়, যে-মুহূর্তে তারা দু'জনে এমনিভাবেই এগোতে থাকে পরস্পরের দিকে, ঠিক সেই মুহূর্তে টুলীপের মনে হঠাৎ যেন একটা নৈরাশ্যের উদয় হয়। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, জুন যেন কিছু নয়, গঙ্গা-দাসীর বৃহত্তর বাস্তবতার সামনে এই মেয়েটি সামান্ত সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। গঙ্গাদাসীর স্মৃতি তাঁকে পিষে ফেলছে, তাঁকে ঘিরে ফেলে ঘুরোচ্ছে, তাঁকে খুন ক'রে ফেলছে, বিধ্বস্ত করছে।

টুলীপের এই হতাশা জুন বুঝতে পারে বৈ কি। টুলীপ জুনকে আদর করছেন, অনুরাগ নিয়েই আদর করছেন, তাঁর অনুরাগ কথায় ও স্পর্শে মুখরও বটে, কিন্তু তার মধ্যে নেই সেই আসল প্রাণটুকু··· নেই উদ্যম·· ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে জুন টুলীপের জন্য···কিন্তু না, হতোদ্যম টুলীপ যেন মৃত।···ইতিমধ্যে জুন তার সম্বিত ফিরে পেয়েছে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে নিজের বেশ ও নখবিন্যাসে মন দিল, তাতেই যেন সে খুশী · নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার অবসর পায় সে এই ব'লে যে, পাপকর্ম তো সত্যিই সে করেনি, সুতরাং তার মনের সুপ্ত অপরাধ ভাবটা যে মাথা উঁচিয়ে উঠছিল, তা নিরসন হবার সুযোগ পেল।

প্রথমে আমি মনে করতাম, টুলীপের মানসিক অবস্থাটা প্রধানতঃ গঙ্গীর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় আনন্দ লাভের স্মৃতি আর জুনের সঙ্গে তাঁর লুকোচুরি প্রেমাভিনয়ের বৈসাদৃশ্যের জন্যেই বোধহয় ঘটছে। আরও মনে করেছিলাম, শারদীয় আবহাওয়ার শৈত্য ও সৌরকিরণের ক্রমবর্ধমান অভাব বোধহয় তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু এইরকম মানসিক অবস্থা তো প্রায়ই ঘটছে আজকাল, আর এও লক্ষ্য করছি যে, পিয়ারা সিংয়ের সঙ্গে তাঁর গুপ্ত আলোচনা বেশ ঘনঘনই চলছে ইদানিং, অথচ এই লোকটির সঙ্গে তাঁর মনের মিল যে একটা খুব আছে তা নয়, তার সঙ্গে কোন গোপন কথা বলার মতো অবস্থা টুলীপের আগে কখনই ছিল না। বোধ হয় জুনকে আর ভাল লাগছে না এবং তাই নতুন শিকারের জন্য পিয়ারা সিংয়ের সঙ্গে তাঁর এই সলাপরামর্শ। হঠাৎ একদিন আমার কানে এল যে, কতকগুলো গুপ্তচর নিয়োগ সম্পর্কে দু'জনের মধ্যে কি ফিস ফিস পরামর্শ চলছে। আমাদের শ্যামপুর ত্যাগের পূর্বে পিয়ারা সিংয়ের হাতে এই চর নিয়োগের ভার দেওয়া হয়েছিল। শ্যামপুরে গঙ্গাদাসীর গতিবিধির ওপর নজর রাখার

জন্ম এরা নিযুক্ত হয়েছিল। আমাকে অবশ্য এসবের কিছুই বলা হয় নি।

টুলীপ যে আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি, সেজন্য যে একেবারে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলাম না তা নয়, কারণ, এই সর্বপ্রথম আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর মধ্যে এমন একটা দুর্জ্ঞেয় দিক আছে যার প্রকাশ আমার কাছে কোন দিনই হয় নি। এদের ষড়যন্ত্রের চেহারা যে কি হ'তে পারে তা আমি মনে মনে বুঝবার চেষ্টা করি এখন।

সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে তাঁরা কিন্তু সতর্ক হয়েই চলেন ; আমিও আর ওর মধ্যে নাক গলাতে চাইলাম না, শুধু টুলীপ যখন পিয়ারা সিংয়ের ওপর চটে যান, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তীব্র প্রভুত্বব্যঞ্জক গলা-ফাটানো চিৎকারে গালিগালাজ আরম্ভ করেন, তখন আমিও বিরক্ত হয়ে পড়ি।

'আমি তোমাদের সকলেরই ওপর প্রতিশোধ নেব—' হঠাৎ একদিন তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন : 'তোমাদের কাউকে আমি বিশ্বাস করি না! তোমরা আমাকে শেষ ক'রে ফেলেছ! তোমরা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছ! তোমরা সবাই, তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ! তোমরা সবাই, তোমরা সবাই, সবাই—যারা মুখে আমার অনুগত ব'লে বার বার চেঁচিয়ে আমাকে "হাইনেস" "হাইনেস" বলে ডাকো···তোমরা কেউই আমাকে চাও না! সব ফাঁকা, আমার চারদিকে নাকি কত বন্ধু! অথচ প্রকৃত বন্ধু একজনও আমার নেই—কাজের বেলায় আমার এমন একজন বন্ধুও নেই যে অন্ততঃ আমার পাশে এসে দাঁড়াবে...'

কতকটা ভণ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ করেই আমি প্রতিবাদ করি। কিন্তু যাই হোক্, আমার প্রতিবাদ কিংবা পিয়ারা সিংয়ের অনুরক্তির খোলাখুলি ভাষণ, কিছুতেই তাঁর মনের তিক্ত ভাবটা দূর করতে

পারে না। ঐ তিক্ত ভাবটা ক্রমেই টুলীপকে পেয়ে বসে। আর নিজের মনের মাঝেই বলতে থাকেন :

'বোকা! মস্ত বোকা আমি! আমি নিজে তোমাদের বিরুদ্ধে সতর্ক হইনি কেন? এ রকম যে ঘটবে, আমার এ পরিণতির কথা আগে ভেবে দেখিনি কেন? কি বোকামিই না করেছি! উঃ, যদি শুধু, যদি শুধু ...'

রাত্রিতে ভীষণ কষ্টভোগ করেন টুলীপ, বোবায়-ধরা অবস্থায় সারা দেহে তপ্ত ঘাম নিয়ে তিনি জেগে ওঠেন।...

টুলীপ স্নায়বিক দৌর্বল্যের জন্য অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন, কেমন একটা উদাসীন ভাব তাঁকে ঘিরে ধরেছে। আবার তারই সঙ্গে যোগ হয় মিস জুনের সঙ্গে তাঁর ইদানিং কালের প্রণয় লীলার উত্তেজনা, সঙ্গে সঙ্গে চলে প্রলাপোক্তি...কতকগুলো অসম্পূর্ণ মানসিক বিরোধের বহিঃপ্রকাশই হলো এই সমস্ত প্রলাপবাক্য। আর তারপর, হঠাৎ, কুয়াশাচ্ছন্ন এক সকালে এমন একটা ব্যাপার ঘটল,—আমাদের হিজ হাইনেসের অদৃষ্টে যা এ পর্যন্ত ঘটেছে, সে-সবের মতো অবশ্যম্ভাবী হলেও—এটাকে যেন এক অন্ধ অদৃষ্টের আকস্মিক পরিণতি, আবার সেই সঙ্গে স্বাভাবিক সংঘাত বলেই মনে হয়।

সি.আই.ডি.-র একজন লোক নিজেকে ইনস্পেক্টর ওয়ার্ড ব'লে পরিচয় দিয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের দাবী জানাল এবং কোনো একটা বিশেষ বিষয়ে পরামর্শের জন্য ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিংকে তার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যেতে বলল। "হিজ হাইনেস, মহারাজা টুলীপ সিংজীর" সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যও সে অনুরোধ জানাল।

টুলীপ ছিলেন তখন বাথরুমে। কাজেই পুলিস ইনস্পেক্টর অপেক্ষা করতে থাকে।

আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগে পুলিসের এই আগমনের

সঙ্গে শ্যামপুরের কোন ভয়াবহ ঘটনা জড়িয়ে থাকবে এই আশংকাতে আমি বিহ্বল ও হতভম্ব হয়ে পড়ি, তা সত্ত্বেও আমি সাহস ক'রে পুলিস অফিসারকে তার আসার কারণ জিজ্ঞেস করি।

চ্যাপ্টা-মুখো বিরাট-দেহী ইন্‌স্পেক্টর ওয়ার্ড আর কোন কথাই বলতে চাইল না।

এতে আমার উদ্বেগের গভীরতর স্তরগুলোও অলোড়িত হতে থাকে। টুলীপ ও পিয়ারা সিংয়ের মধ্যে গোপন আলোচনা আমার অজ্ঞাতসারেই ঘটেছিল, তবুও এই "কানাঘুষো" যখন প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম, সেই সময় আমার মনে একটা অকল্যাণের ইঙ্গিত সাড়া দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে আমি উদাসীন হয়ে চলেছি ব'লে আমার মধ্যে যে অপরাধ-বোধ সুপ্ত ছিল, মনের সেই গভীর স্তরে এখন আলোড়ন উপস্থিত হলো।

ভাগ্য-বিপর্যয় যে কিভাবে আত্ম-প্রকাশ করে তাতো জানা থাকে না, কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করার মধ্যে থাকে সবচেয়ে ভয়াবহ ও দম-বন্ধ-করা একটা যন্ত্রণার ভাব। নিজের মনের এই সমস্ত অসামঞ্জস্য দূর করা সম্পর্কে যে দৌর্বল্য ও কাপুরুষতা আমি দেখিয়েছি, তার জন্য আজ আমি অনুতপ্ত। এবং আজ এই মুহূর্তে আমার এইসব মানসিক গোলযোগের মধ্যে অতিমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।

টুলীপ শয়নকক্ষে ফিরে এলেন। আমি তাঁর পদধ্বনি শুনলাম। ড্রেসিংরুমে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন ইন্‌স্পেক্টর যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, তা তাঁকে বলবার জন্য শয়নকক্ষে আমি প্রবেশ করলাম।

আমার বিবর্ণ মুখ দেখে তিনি বলেন উঠলেন :

'কী ডাক্তার, শ্যামপুর থেকে কোন দুঃসংবাদ এসেছে কি ?'

মনে হলো, বিপর্যয়ের ইঙ্গিতটা যেন তাঁর কাছে ইতিপূর্বেই পৌঁছে গিয়েছে।

'পিয়ারা সিং কি করেছে?' নিশ্বাস-রুদ্ধ কণ্ঠে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

'তা হলে বুলচাঁদ বোধ হয় খুন হয়েছে—' টুলীপ আপন মনেই চাপা কণ্ঠস্বরে বলে ওঠেন। এবং কাঁপতে কাঁপতে বিছানার ওপর বসে পড়েন।

এক লহমার মধ্যে সমস্ত ঘটনার দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সমস্ত গোপন কানাকানিই এখন স্পষ্ট হয়ে গেল। শ্যামপুর থেকে চলে আসার আগেই তাঁরা বুলচাঁদকে খুন করবার জন্য ষড়যন্ত্রজাল বিছিয়ে এসেছেন। তাঁদের গোপন কানাকানির মূলে যে এই ষড়যন্ত্র ছিল তাতে আর এখন সন্দেহ রইল না। আর টুলীপ যে মুন্সী মিথন লালকে আমাদের সঙ্গে আসতে দেন নি, শ্যামপুরে রেখে এসেছেন, আমার সন্দেহ হয়, তার কারণও এই ষড়যন্ত্র; এবং পিয়ারা সিংয়ের কাছে মুন্সীজীর লেখা চিঠি-পত্র আমাকে যে দেখানো হতো না, তার কারণও এতক্ষণে আমার কাছে পরিষ্কার হলো। শ্যামপুরে এ বিষয়ে কতদূর কি হয়েছে, তার বিবরণী নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত চিঠিতে লেখা থাকতো। কাজেই এই হচ্ছে সে-সবের পরিণতি এবং নৃশংস পরিণতিই বটে! বুলচাঁদের জন্য যে ঠিক আমি দুঃখিত তা নয়, কারণ লোকটা ছিল অত্যন্ত দুর্জন। তবে নিজের অজান্তে নিজেও যে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি, এই অনুভূতির জন্যই আমি নিজের জন্যে দুঃখ অনুভব করি। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমার অজান্তে আমি অংশ গ্রহণ করেছি, তার স্বরূপটা নিজের কাছেও স্বীকার ক'রে না নেয়ার জন্য আমার নিজের দুর্বলতায় লজ্জিত হয়ে পড়ি।

চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পড়ি আমি, মনে হয়, ভেতরে যেন আমার কোন বস্তু নেই, যেন নির্জীব। সহানুভূতি বা ঘৃণা, কোনটাই প্রকাশ করার মতো একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোল না। যা

ঘটে গেল, তা উপলব্ধি ক'রে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম কোন নাটকীয় শক্তি নয়, শুধু স্নায়ুগুলো হঠাৎ শক্ত হয়ে আবার শিথিল হওয়ার জন্য ভেতরে কি যেন একটা আমাকে আঘাত করতে থাকে। কোন কিছুই গ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই—ধীরে ধীরে এমনি একটা মনের অবস্থা আমার মধ্যে আসন বিস্তার করতে থাকে।

টুলীপকে দেখে মনে হয়, তিনিও যেন এই ধাক্কায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর মুখটা সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। একমুহূর্তের জন্য তিনি উপরের দিকে চেয়ে দেখেন···মনের ভেতর তাঁর যে ঝড় বয়ে চলেছে, তার প্রতিচ্ছবি হিসেবে শয়নকক্ষে যেন কেবল বিশৃঙ্খলাই দেখতে পান। ক্ষণকাল মাত্র, কিন্তু তারপরই তিনি মাথা নত করেন।

'পুলিস-ইন্স্পেক্টর অপেক্ষা করছে।' একটু পরে আমি আবার বলি।

'উঃ, ঐ কসবীটাকে কি ঘৃণাই না করি!' যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসছে এই স্বগতোক্তি তাঁর ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলা দিয়ে: 'দেখ, আমাকে দিয়ে ও কি না করালে! ও আমার আত্মাকে খুন করেছে···হ্যাঁ, আমিও পাল্টা খুন করলাম! নিষ্ঠুর, শয়তানী, কুত্তি! শুধু আমাকে ছেড়ে গেল, আমাকে ছাড়ল···আমাকে নিয়ে সন্তুষ্ট না থাকতে পেরে এক পাল কুকুর পেছনে পেছনে নিয়ে দৌড়ল!···আর ঐ কুত্তা বুলচাঁদ, ও ব্যাটাও তো বিশ্বাসঘাতক! ··আরে, আমি তো একটা পুরুষ মানুষ! শুধু সেইজন্যেই আমাকে একটা কিছু করতে হলো! কুত্তা, হারামী ব্যাটা, বুলচাঁদ—, এর বেশি আর কি আশা করতে পারিস্ তুই···!'

'আশা করি, আপনার নিজের বাঁচার প্রয়োজনেই সি.আই.ডি. পুলিসের কাছে এসব কথা বলবেন না।' অবশেষে আমি বলি।

টুলীপের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে যায়। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে: 'আমি তার সঙ্গে দেখাই করবো না।'

'আচ্ছা টুলীপ, আমি তাকে তাই বলছি।'

'আমাকে গ্রেফ্‌তার করবার জন্য কি ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছে?'

'না, তা মনে হয় না।'

'তা হলে, তাকে যা হয় লিখে জানাতে বলো। আর পিয়ারা সিংকে গ্রেফ্‌তার করবার জন্যও যদি ওয়ারেন্ট না থাকে, তাহলে তাকে এ-নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ কর।'

শয়নকক্ষ থেকে কোন রকমে বের হ'য়ে আমি ইনস্পেক্টর ওয়ার্ডকে বলি যে, এইমাত্র হিজ হাইনেসের স্নান শেষ হয়েছে, তাঁর শরীরটাও বিশেষ ভাল নয়, তাই ইনস্পেক্টর কিজন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি তা জানতে চাইছেন। টুলীপকে গ্রেফ্‌তার করবার জন্য বাস্তবিকই কোন ওয়ারেন্ট আছে কিনা, তা জানবার জন্যই আমি এইভাবে কথা বললাম। পিয়ারা সিং ইতিমধ্যে কক্ষে প্রবেশ করেছে।

'আচ্ছা, আমি আবার দেখা করবো।' ইনস্পেক্টর ওয়ার্ড বলে। তার চওড়া লাল মুখখানা আরও রুক্ষ রক্তিম হয়ে উঠে। 'ভদ্রলোক কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করলেই ভাল করতেন।'

'তাঁকে গ্রেফ্‌তার করার জন্য কোন ওয়ারেন্ট আছে কি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'হ্যাঁ,' ইনস্পেক্টর সোজাসুজি আমার চোখের দিকে চেয়ে বলে: 'তা ওয়ারেন্টেরই মতো।'

আবার পুলিস সম্পর্কে বিভীষিকা আমাকে পেয়ে বসে। কারণ, ইনস্পেক্টর ওয়ার্ডের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে একটা পুলিসী আত্মার দুর্গন্ধ, নরকের একটা তীব্র ঝাঁঝ যেন বের হচ্ছে। তাহলে এই পাপ-কার্যে আমিও কি শেষকালে জড়িয়ে পড়লাম? এই নরকের কটাহে আমিও যেন ডুবে যাচ্ছি, এক অতল গহ্বরে আমিও যেন নেমে পড়ছি—।

'আচ্ছা, বিদায়!' কৃত্রিম ভদ্রতার ভাব দেখিয়ে ইনস্পেক্টর বলে।

এবং পিয়ারা সিংকে এগিয়ে যাবার ইসারা ক'রে নিজেও কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি টুলীপের শয়নকক্ষে ফিরে যাই। এখনও তিনি শয্যাপ্রান্তে বসে আছেন। আপন মনেই তিনি বক্‌ছেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'ও আমাকে কেন এমন পাঁকের মধ্যে টেনে নামাল? কি জন্য ও বুলচাঁদকে পছন্দ করল? আমি··আমি শুধু চেয়েছিলাম—আচ্ছা, কোন মেয়েকে ভালোবাসায় দোষ কোথায়? আর ওতো আমাকে ভালোবাসতোও। তাই তো ও আমায় বলতো···ওঃ, কেন ও আমাকে এমন অবস্থায় ঠেলে ফেলল?'

'আচ্ছা, কি ব্যাপারটা ঘটেছে বলুন তো টুলীপ?'

'আত্মহত্যা করবো ডাক্তার? কারুর জীবন যদি শূন্য হয়ে যায়, আর শুধু হিংসা দিয়ে সে ঐ শূন্যতা পূরণ করে, তাহলে নিজের হাতে নিজের জীবনের অবসান ঘটানো কি তুমি যুক্তিযুক্ত মনে করো?'

'হুঁ, ঠিক-বেঠিক বলতে পারব না। তবে অন্য কারুর জীবন নয়, এ অবস্থায় হয়তো নিজের জীবনের অবসান নিজে ঘটাতে পারে অনেকে।'

'আমি একা থাকতে পারি না যে। আর এসব ঘটবার পর, গঙ্গী আরও একগুঁয়ে হয়ে যাবে, কিছুতেই আর ও ফিরবে না আমায় কাছে।'

'যাকগে, সে-মেয়ের কথা ভুলে যান টুলীপ।' বিরক্ত হয়েই আমি বলি: 'আপনি শুধু ওকে চান আর চান···কিন্তু অবস্থাটা তো এখন ও-মেয়ের নাগালেরও বাইরে। একটা লোক খুন হয়েছে। আর এখন, আপনার ইচ্ছে না থাকলেও, সেই পাপ-চক্রটা ছুটছে। আর সাবেক দিনের অবস্থা ফিরে আসবে না টুলীপ—'

'আমি যে একেবারে শেষ হয়ে গেলাম,' টুলীপ বলেন: 'আচ্ছা, এসব কি খবরের কাগজে বেরোবে?'

আমি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকি, তারপর বলি : 'ইণ্ডিয়া-হাউসে ফোন ক'রে হাইকামিশনারের সঙ্গে একবার দেখা করবো।'

উন্মাদের জমাট-বাঁধা দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর দেহটা যেন ভয়ের তুহিন-শীতলতায় একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। মনের ভয় ও অপরাধ-বোধের এক প্রতিচ্ছবি হয়ে তাঁর মুখখানা যেন স্তব্ধবাক হয়ে আছে।···

জেরা করার নাম ক'রে ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিংকে কেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার কারণ কি, ইণ্ডিয়া-হাউস তার কোন খোঁজ-খবর রাখে কিনা, তা জানবার জন্য টেলিফোন করছি, এমন সময় হিজ হাইনেসের ডাক এল। ইণ্ডিয়া-হাউসের একজন সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমাকে ফোনে বলা হলো। ঠিক সেই মুহূর্তে টুলীপ আমার হাতে ইণ্ডিয়া-হাউসের একখানা চিঠি দিলেন। চিঠিতে তাঁকে সংক্ষেপে জানানো হয়েছে যে, শ্যামপুরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের সেক্রেটারী শ্রীবুলচাঁদ সন্দেহজনক পরিস্থিতির মধ্যে খুন হওয়ায় যে সরকারী তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাতে হিজ হাইনেস ও তাঁর কর্মচারীদের সাক্ষ্য-দানের প্রয়োজন হতে পারে। সেইজন্য, ভারত সরকারের স্টেটস-ডিপার্টমেণ্ট হিজ হাইনেসকে অবিলম্বে ভারতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। পরের দিন হিজ হাইনেস ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা যাতে এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল-এর "মোগল প্রিন্সেস" বিমানযোগে যাত্রা করতে পারেন, তার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করা হয়েছে।

নরম বিনয়ী ভাষায় লেখা এই সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা নীরবেই গ্রহণ করলেন টুলীপ। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিছানা ছেড়ে পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন পরে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাতে মোচড় দিয়ে

কপালে করাঘাত করতে করতে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'হায় অদৃষ্ট! কেন এই অভিশপ্ত জীবন আমার? কেনই বা আমার জন্য শুধু অবমাননার পর অবমাননা! হায় ভগবান, কী আঘাতই না পাচ্ছি! প্রায় গ্রেফতার অবস্থাতেই দেশে ফিরবার জন্য যে এই হুকুম! কি অপমান! কার নির্দেশে আমি এ বোকামি ক'রে বসলাম? কেন, কেনই বা এরকম করলাম? ওরা সব নরকের আগুনে পুড়ে মরুক! ও-ই বা কেন…'

এবং নিজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ক'রে, নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ ক'রে তাঁর আত্ম বিলাপ চলতে থাকে।

'হায়, কেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়লাম,' ক্রন্দনের স্বরে তিনি বলেন। আর তারপর আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলেন: 'বাবা আমাকে বলেছিলেন, "কপালে অনেক ভালোবাসা জুটতে পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো।—কখনও মূর্খ নারীর প্রেমে পড়ো না, কারণ তা করলে, তোমার সুরুচি ও বুদ্ধিবৃত্তিরই অপবাদ ঘটবে না, যখন ঐ রকম মেয়ে মানুষের লোভে পড়বে, তখন কিছুতেই তাকে বাগে রাখতে পারবে না। সে-মেয়ে কালে ক্ষমতা-প্রয়াসী হয়ে দাঁড়াবে, আর নিজের নীচ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তোমাকে সে ধ্বংস ক'রেও ফেলবার চেষ্টা করবে। তবে এসব মেয়ের সঙ্গে সময় সময় বাস করতে পার বটে, কিন্তু স্থায়ী জীবন-যাপন তাদের সঙ্গে ককৃখনও নয়। ইন্দ্রিয়ের তাড়না দেহেই ধরে রাখবে, খেয়াল রাখবে, তা যেন কখনও মন ও মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। দু'একজনের চেয়ে অনেকের সঙ্গে প্রণয় করাই বাঞ্ছনীয়। বয়স-কালে রাজার মতো প্রেম-ভালোবাসা বিলি ক'রো, এতে বৃদ্ধ বয়সে অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হতে হবে না।" আর আমি বাবার এই উপদেশই ভুলে গেলাম…!'

বিকৃত ধরনের কিন্তু পূর্ণমাত্রায় অর্থবহ কথা তিনি যে এমন সুস্পষ্ট ভাবে বলে চলেছেন, তা যেন বিশ্বাস করতে না পেরেই এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কারণ, তাঁর প্রাথমিক হিষ্টিরিয়ার সময় আমার মনে হয়েছিল, তাঁর অস্তিত্বটাই যেন একেবারে বিপন্ন হয়ে পড়েছে, চারদিক থেকে ক্রম-বর্ধমান চরম নিয়তি তাঁর আত্মাকে পিষে ফেলে তাঁর সত্বাকে যেন মহাশূন্যে বিলীন ক'রে দেবে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের চাপে তাঁর কপালটা ভারাক্রান্ত, মনে হয় যেন তিনি তাঁর অহমিকা ও বংশ-গৌরবের শেষ পরিখায় আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকেই পুনরায় আক্রমণের জন্য চেষ্টা করছেন। সেই জন্যই পিতার উপদেশবাণী স্মরণ ক'রে নিজেকে তিরস্কৃত করার তাঁর এই প্রচেষ্টা। কারণ, সাধারণ মানুষের ভাষা তাঁর রাজকীয় মনের কাছে যে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, এ মনোভাবটা তখনো তাঁর মধ্যে রীতিমত অটুটই রয়েছে। বিশ্লেষণটা ঠিকই করেছি, কারণ শিগ্‌গিরই তাঁর রাজকীয় সত্তাকে শ্যামপুরের সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করার জন্য তিনি চেষ্টা করতে থাকেন।

'ওঃ! এসো, এসো, আমার অদৃষ্ট দেবতা! আমাকে আবার শ্যামপুরে নিয়ে যাও! ওঃ, আবার, আবার আমার ষ্টেট, আমার রাজ্যে ফিরে যাব! ওঃ, এসো, আবার আমরা যেখানকার মানুষ সেখানে, আমার প্রজাদের কাছে ফিরে যাই! লণ্ডনের এই মহাশূন্য থেকে চলো আমরা চলে যাই, এখানে আমার মাথায় ধাক্কার পর ধাক্কা খেয়ে আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছি। হিমেল, ভয়াবহ, লণ্ডন! হায়! এখানে নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে হয়। এখানে তুহিন-শীতল বাতাসে দেহটাও জমে যায়, শরীরটা চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ে! নিজেকে হত্যাকারীর মতোই মনে হয়। সবকিছু নগ্ন, একেবারে নগ্ন!...আমি কিন্তু বুলচাঁদকে হত্যা করিনি! নিজের হাতে এসব আমি করিনি। আমার

হাত দু'খানা নিষ্কলুষ!···শুধু, জানি না, কেন নিজেকে এত হীন মনে করছি। গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেছি···মাথাটা বড্ড ব্যথা করছে··· আমাকে কিছু ওষুধ দাও, দেবে না ডাক্তার? আর বলো, এখন কি করবো—সমস্তই কি খবরের কাগজে উঠবে? এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালে কি কোন ফলই পাওয়া যাবে না? দু'চার দিনের জন্য প্যারিসে যাওয়া যায় না কি? আর পিয়ারা সিং? '

তাঁর মনের এই সঙ্কুচিত অবস্থা দেহেও বিস্তার করতে শুরু করেছে। চোখ দু'টোয় তাঁর অদ্ভুত দীপ্তি। ঐ দীপ্তি আমাকে সত্যিই ভীত ক'রে দেয়। আমি নীরবে তাঁকে লক্ষ্য করতে থাকি, ঐ দৃষ্টির সাংঘাতিক শূন্যতা আমার শ্বাসরোধ ক'রে একেবারেই অসহায় ক'রে ফেলে। টুলীপ যে অচিরেই নিজের ওপর সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে একেবারে বেসামাল হয়ে পড়বেন—তাঁর এই কথার মধ্য দিয়ে তাই তো প্রকাশ পাচ্ছে। মনের এই বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেই দেখি তিনি মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। দু'বার এরকম করতে গিয়ে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে তিনি বিছানার ওপর আড়া-আড়ি ভাবে পড়ে গিয়ে বলতে আরম্ভ করেন:

'এতে ব্যথাটা কমে যাবে ডাক্তার, তাই না? আমি যোগ-অভ্যাস করবো? শিরাসন? তোমরা কেমন ক'রে ওটা করো! ও-ও-ও না! মনে হয়, যেন সম্বিত ফিরে পাচ্ছি, নিজের আত্মার একটিমাত্র সত্তায় উপনীত হচ্ছি। এখন আর ব্যথা নেই···হায়! মাথাটা তবুও ব্যথা করছে! ওঃ, এসো, শ্যামপুরে এসো··এসো, তাহলে এসো, চলো আমরা যাই···'

সেই অবস্থায়ই তিনি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন, তাঁর মুখ দিয়ে গেঁজলা বের হতে থাকে।

টুলীপকে দেখে সত্যিই মন ভেঙে যায়। তাঁকে তুলে বিছানার

ওপর টান ক'রে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করি যাতে তিনি ঘুমোতে পারেন। তাঁর কোমরটা জড়িয়ে ধরে তুলবার চেষ্টা করি।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি শক্ত হন এবং আমার হাত দু'টো ছাড়াতে চেয়ে চিৎকার ক'রে ওঠেন: 'না, না, শ্যামপুরে যেতে চাই না। না-না—চোর, বিশ্বাসঘাতকের দল! আমার নিজের কথার প্রতিধ্বনি আমি আর শুনতে চাই না! আমি তোমাদের বলছি, আমিই হলাম শ্যামপুরের মহারাজা! তোমরা কি আমায় দেখে ভয় পাও না?… তুমি কে? ইংরেজ? পোলিটিক্যাল রেসিডেণ্ট? না সাহেব, তোমার কথা আমি আর শুনতে চাই না!…যাও! তোমার মুখখানা পুড়ে যাক!…আমাকে ধাক্কা দিও না…নিজের পথ দেখো!…'

আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলছেন, তাঁর মুখ দিয়ে যে-সমস্ত কথা বেরুচ্ছে, তার অর্থ তিনি আর বুঝতে পারছেন না, তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন।

জোর ক'রেই তাঁকে তুলে ধরলাম, তিনিও আমাকে লাথি মারতে থাকেন আর হাত দিয়ে ধাক্কা মারতে থাকেন। তাঁকে কোনমতে বিছানার ওপর ফেলে দেবার চেষ্টা করছি, দেখি তিনি পাথরের মতো শক্ত হয়ে আমাকে নিয়ে মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। জমাটবাঁধা ঘৃণায় তাঁর চোখ দু'টো তখন প্রখর, তাঁকে সামলাতে না পেরে আমিও বোকার মতো মেজাজ হারিয়ে ফেললাম। কাজেই কঠোর ভাবেই সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে তাঁকে আবার তুলে বিছানার উপর ছুঁড়ে দিলাম।

এবার তিনি আর উঠতে পারলেন না। যে-শূন্যতার মধ্যে তিনি পিছলিয়ে পড়ছিলেন, তার থেকে উঠবার জন্যই যেন তাঁর ঠোঁট দু'টো কেবল কাঁপতে থাকে।

'আমি আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দেবো। ঘুমোতে চেষ্টা করুন।'

'আমি আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দেবো—!' তিনি আমারই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেন : 'ঘুমোতে চেষ্টা করুন!' তোতাপাখীর মতো আমারই কথাগুলো বিদ্রূপ মাখানো কণ্ঠস্বরে পাগলের মতো আওড়াতে থাকেন।

'আমি উড়তে পারি,' হঠাৎ বিরবির ক'রে তিনি বলেন : 'আমি উড়তে পারি ডাক্তার! উড়তে পারি নিজের পাখার ওপর···!'

এবং তিনি উঠে পড়েন, বাহু দু'টো প্রসারিত ক'রে, উড়ন্ত পাখীর পাখার মতো ঝট-পট ক'রে নাড়তে থাকেন··· আবার তিনি পড়ে যান, মাথাটা তাঁর বিছানার নীচের দিকে হেলে পড়ে।

তাঁকে ঠিক ভাবে বিছানায় বসিয়ে দেবার জন্য আমি ধরলাম। কিন্তু আবার তিনি আমাকে ঠেলে ফেলতে চেষ্টা করেন, ধারালো নখ দিয়ে আমার হাতের বন্ধনটা খুলে ফেলেন। কোথা থেকে যেন এক আশ্চর্য রকমের শক্তি তাঁর মধ্যে এসে পড়ে। পাগলের নির্মম উন্মাদনায় আমাকে ঠেলে ফেলে দেন তিনি। তারপর তাঁর আহত মনের ঘোরালো বিশৃঙ্খলার ভেতর থেকে হঠাৎ একটি চলতি গানের লাইন জোর গলায় প্রলাপের মতো গাইতে আরম্ভ করেন :

'ও আমার বিদেশী বঁধু রে, কোথায় তুমি গেলে···'

সপ্তমে ওঠা পাঞ্জাবী গানের বিশ্রী ধরনের জোর দেওয়ার কায়দায় আমার কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে, শীঘ্রই বোধহয় গোটা বাড়ির লোকজন টুলীপের শয়নকক্ষে ছুটে আসবে। কাজেই তাঁর কোমর ধরে ধস্তাধস্তি করেই আমি তাঁকে রূঢ় ভাবে জোর ক'রে শুইয়ে দিলাম। শক্ত ক'রে-ধরা আমার বাহুর নীচে অবসন্ন অবস্থায় তিনি ভয় পেয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে এমন অসংলগ্ন ভাবে কথা বলতে থাকেন যার মধ্যে প্রথম ও শেষ স্মৃতিগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কতকগুলো কথার অরণ্য সৃষ্টি হতে থাকে। মুখ দিয়ে তাঁর ফেনা বের হতে

থাকে। তিনি হঠাৎ আমার কান কামড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করেন। উপায়ান্তর না দেখে আমি তাঁকে একটা চপেটাঘাত ক'রে বসি। তিনি আবার শান্ত ও নীরব হয়ে যান। মুহূর্তপরে আবার শুরু করেন কান্না ও গান, এমনকি উঠবার জন্যও আবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। উপায় না দেখে একখানা বিছানার চাদর টেনে তাঁকে খাটের সঙ্গে বেঁধে ফেলি।

বন্ধনাবস্থায় টুলীপ পড়ে থাকেন…ক্লান্ত… তবুও আবার হাসছেন, গান করছেন…অসংলগ্ন কথার ফুলঝুরি…বিভ্রান্ত স্মৃতির কুয়াশা… সব কিছু তাঁর হারিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে মুছে, ডুবছে আর ভাসছে…তারই টুকরো টুকরো হাসির খিলখিল আওয়াজ আর কথার বুদবুদ…একটি সত্তার অবলুপ্তি আবার মুহূর্তে সেই লুপ্ত শূন্য স্থানে পুরোনো স্মৃতির অস্পষ্ট উন্মেষ…সব কিছু নগ্ন, সব কিছু আদিম বিভীষিকার মতো…

চতুর্থ খণ্ড

"মোগল প্রিন্সেস"-এ চেপে মাত্র আটাশ ঘণ্টার আকাশ-ভ্রমণ এই লণ্ডন ও বম্বের আকাশ-পথটুকু। কিন্তু টুলীপকে নিয়ে কি ক্লান্তিকরই না ঠেকছে আজকের এই ভ্রমণ। অবস্থা তাঁর আরও খারাপ হয়েছে। মেফেয়ারের ফ্লাট থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর প্রলাপোক্তি। তাই এখন পরিণত হয়েছে কর্কশ কণ্ঠের সঙ্গীতে আর মাঝে মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে মারামারিতে, যার ফলে অন্যান্য যাত্রীর কাছে এখন সত্যিই তিনি বিরক্তিকর হয়ে উঠেছেন, এবং বাধ্য হয়েই তাঁকে বেল্ট দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে হয়েছে। আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে ক্যাপ্টেন পিয়ারা সিংকে আমাদের সঙ্গে যেতে দেওয়া হয়েছে। বম্বে বন্দরে নেমেই পুলিসের হাতে তাকে আত্মসমর্পন করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হীথ্রোতে পাশপোর্টের ঝামেলা চুকোবার সময় সে-ই মহারাজাকে সামলিয়ে চলছিল। পরে টুলীপ শুরু করলেন চিৎকার এবং সেই সঙ্গে শুরু হলো তাঁর অতিমাত্রায় হাত-পা ছোঁড়া। ফলে তাঁকে বেল্ট দিয়ে বাঁধতেই হলো, বিশেষ ক'রে তাঁর নির্ঘুম রাত্রির চিৎকার তো অসহ্যই হয়ে উঠল। তাঁর ঐ দেহে এত শক্তিই বা কোথা থেকে এল! আমি এবং পিয়ারা সিং দু'জনে মিলেও তাঁকে তাঁর চেয়ারে বসিয়ে রাখতে পারি না; চোখ দুটো তাঁর জ্বলছে জ্বলন্ত কয়লার মতো, কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা তাঁর নিজেকে মুক্ত ক'রে নেবার!

হীথ্রো বিমান বন্দরে জনৈক গোঁফওলা ইংরেজকে দেখে তাঁর সে কি ক্রোধ!—এ রকম হিষ্টিরিয়ার প্রকাশ তাঁর মধ্যে আমি আগে কোন দিন দেখি নি। তার দিকে তাকিয়ে জিভ ভেঙিয়ে তিনি থুতু ছিটোতে

থাকেন আর হিন্দুস্থানীতে তাকে গালাগাল করেন 'নিমকহারাম' ব'লে। "ওয়েটিং রুম" থেকে তাঁকে জোর ক'রে প্লেনের দিকে নিয়ে যাওয়া কি দুঃসাধ্যই যে হলো আমার ও পিয়ার সিংয়ের। এবং প্লেনে উঠেও শ্বেতাঙ্গ দেখলেই তাঁর এই উন্মত্ততার প্রকাশ একইভাবে চলতে থাকল। এমন কি "মোগল প্রিন্সেস"-এর এংলো-ইণ্ডিয়ান সেবিকা,— সেও টুলীপের এই আক্রমণ থেকে রেহাই পেল না। এখানেই তো শেষ নয়, এরপর তাঁর আক্রমণ চলল সমগ্র মানব জাতির ওপরেই। শুধুমাত্র মাঝে মাঝে যখন পাঞ্জাবী প্রেমগীতি "হীর রাঞ্ঝা" থেকে বিরহ গান—

"ওগো হীরে, তোমায় ভালোবেসে
অঙ্গে নিলেম তুলে পথের ধুলো—"

তিনি গাইলেন, তখনই মাত্র তাঁর এই উন্মত্ততা স্তিমিত থাকে।

আমি চেষ্টা করলাম যাতে তিনি এই প্রেমগীতিতেই মেতে থাকেন। তাঁর প্রলাপোক্তি ও উন্মত্ত ব্যবহারে আমি সত্যিই লজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম। ভয়ও হচ্ছিল প্লেনের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহার শুরু না ক'রে দেন, আবার কাউকে মেরে না বসেন। দেখলাম আমার কথায় কাজ হলো বটে কিন্তু গান তিনি শুরু করলেন অতি উঁচু পর্দায়। গান তো নয় কাংস্যকণ্ঠের চিৎকার। আমিও তাই তাড়াতাড়ি নীচু গলায় তাঁর সঙ্গে গান শুরু করি এবং এতে বোধ হয় তাঁর উৎক্ষিপ্ত মনটাও একটু নরম হয়। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। নীরন্ধ্র রজনীর অরণ্য থেকে হঠাৎ যেন এক শার্দুল গর্জন ক'রে উঠল :

'ডাক্তার, ডাক্তার, আমি হলাম শ্যামপুরের মহারাজা দলীপ কুমার। এই শুয়োরের বাচ্চা ডাক্তার, বুঝতে পারছিস আমার কথা?—আমি রাজা, আমি মহারাজা। আমাকে এভাবে ধরে রেখেছিস তোরা! ছাড় ছাড়, যেতে দে আমায়! আমার কাছে কেউ তোরা আসবি না, এমন কি ঐ বড়লাটও আসতে পারবে না···ঐ ধোবীটা আমাকে

ছুঁলো কেন? আমি তো রাজা! আমার কথা বুঝেছিস? আমি হলাম মহারাজা দলীপ কুমার, ওরে নিমকহারাম বুঝলি!...'

'আঃ টুলীপ চুপ, চুপ! আপনি ছেলেমানুষ নন...!' দৃঢ় কণ্ঠেই আমি বলি, ক্রোধের রেশও আমার কণ্ঠে ফুটে ওঠে: 'বোকা সাজা আপনার পক্ষে উচিত নয় টুলীপ।'

টুলীপ যেন নরম হন এ কথায়, কিন্তু মুখে চোখে ফুটে ওঠে একটা ধূর্ততার ছাপ। তিনি জিজ্ঞেস করেন: 'আমি কি অসুস্থ ডাক্তার?'

'আপনার অন্ততঃ শান্ত হয়ে বসা উচিত।'

ইতিমধ্যে তাঁর সেই ক্ষণিকের শান্তভাব কোথায় উড়ে যায়, তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন আবার: 'খবরদার! খবরদার! চোর! চোর! হেই তোমরা সাবধান, তোমাদের চারদিকে সব ডাকাত, গুণ্ডা!'

সহানুভূতি মাখানো কণ্ঠে আমি বলি: 'একটা গান গাইবার চেষ্টা করুন না টুলীপ?

'গান গাইবার চেষ্টা করুন না!' আমার কথা নকল ক'রে তিনি আওড়াতে থাকেন, কণ্ঠে ফোটান আমার মতোই সহানুভূতির কণ্ঠস্বর।

তাঁর বাঁ হাতখানা আমার হাতে নিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে আমি বলি: 'গান টুলীপ।'

টুলীপ হঠাৎ চেঁচিয়ে শুরু করেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের শিখ সৈনিকদের সেই গান:

'ওগো পণ্যা মেয়ে, পণ্যা মেয়ে
নাগড়া ফেলে হিল তোলা জুতো পরে
কোথায় চলেছ তুমি ধেয়ে!
ওগো পণ্যা মেয়ে হরনাম কাউর,
এবার শুধু আমার তুমি,
নও তুমি আর কাউর।

এ গান শুনে যাত্রীরা হাসে আর পিয়ারা সিংয়ের পুরোনো দিনের স্মৃতি উথলিয়ে ওঠে। সে মাথা নেড়ে চেঁচিয়ে ওঠে 'বাঃ, বাঃ' ব'লে।

কিন্তু হঠাৎ টুলীপ থেমে যান, তাঁর চোখ দুটো কঠিন হয়ে ওঠে, তারপর অঙ্গভঙ্গী সহকারে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন :

'কেয়া কহেঁ হ্যাঁয় তেরি, মেরি পিয়ারে জান!···

নাচে নাচে নাচে আমার প্রাণ—!'

তারপর আবার শুরু হয় প্রলাপোক্তি, আবার সেই আজে বাজে কথার জঙ্গলে নিজেকে হারিয়ে ফেলা। যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ মৃদু হাসে কিন্তু হো হো ক'রে আর কেউ হাসে না, হাসবার সাহসও নেই। আমি বসে আছি পাশে, একটা তীব্র কষাঘাত যেন চলেছে এই নীদ্রাহীন দিন-রাত্রির একঘেয়ে চিৎকার-প্রলাপোক্তির মধ্য দিয়ে আমার দেহ ও মনের ওপরে। টুলীপের ওপর করুণা জাগছে, আবার একটা কঠিন ভাবও আমার মনে মাথা উঁচিয়ে উঠছে। নিজের মনের দিকেও আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি : সত্যিই তো, এ আমি নিজের জন্ম কি করছি! কোন এক স্থানে এঁকে আজ ছেড়ে দিয়ে আমি নিজেকে মুক্ত ক'রে নেব, নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতেই হবে। এবং এইভাবে ভাবতে ভাবতে আমার এই সর্বপ্রথম মনে হলো পুনার উন্মাদ-আশ্রমের কথা। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটি তীব্র অন্তর্দাহ যেন আমাকে ভেতর থেকে পুড়িয়ে দিল, আমি ঘামে প্রায় নেয়ে উঠলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের প্লেন কায়রো বিমান বন্দরে নামল। এখানে প্লেনে তেল নেবে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত প্লেনটিকে ঝাড়-পোছ করা হবে, সব যাত্রীকে নীচে নামতে হবে। কি একটা সাংঘাতিক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেই না আমরা পড়লাম এখন টুলীপকে নিয়ে। মিশরীয় পুলিসরা—প্রত্যেকই যেন রাজা ফারুকের থেকেও

এক-এক জন বড় ফারুক—কিছুতেই টুলীপকে প্লেনে থাকতে দিতে রাজী হলো না। নিজের অনিশ্চিত অবস্থার জন্যে দুর্ব্বল ব্যক্তি যেমন অভদ্র খিটখিটে মেজাজের হয়, এদের অবস্থাও এখন ঠিক তেমনি ধরনের। আমাদের পাশপোর্ট, জিনিসপত্তর অনুসন্ধান করবার ব্যাপারেও এদের সেই পরিচয় আমরা পেলাম। সেই বন্ধনমুক্ত অবস্থায় নিজেকে পেয়ে টুলীপ যেন এক দৈত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। হাত-পা ছুঁড়ে, হৈ চৈ চিৎকার করতে করতে পাগলা কুকুরের মতো তিনি আমাকে ও পিয়ারের সিংকে কামড়ে দিলেন। আর তাঁর সেই শ্রীমুখের যে ভাষা—তা উল্লেখ করতেও ভদ্রতায় বাঁধে। তাঁর সেই চিৎকারে বিমান-বন্দরের লোকজন আমাদের ঘিরে এসে দাঁড়াল আর তাদের দিকে টুলীপ থুতু ছিটোতে আরম্ভ করেন, চোখে তাঁর উন্মাদ-দৃষ্টি। তাঁকে কঠিন ভাবে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আমি ও পিয়ার সিং দু'জন মিশরীয় "ফারুকের" সাহায্যে ওয়েটিংরুমের দিকে নিয়ে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে টুলীপ নরম হয়ে যান, প্রত্যুত্তরে যেন ভদ্র নম্র ব্যবহার তিনি দাবী করছেন আমাদের কাছেও। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি সেই পাগলামো ভাব ঠিক পুরোমাত্রায়ই রয়েছে। পুনার উন্মাদাশ্রমেই তাঁকে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত মনে মনে ক'রে ফেললাম। বোধহয় "শক্ ট্রিটমেণ্টে" তাঁরা রাখবেন টুলীপকে। এই সাময়িক নম্র ব্যবহারের মধ্যেই আমি টুলীপকে একটা ইনজেকশন দিয়ে দিলাম এবং ফলে পরবর্তী ঘণ্টা আটেকের বিমান-ভ্রমণের মধ্যে তিনি নিঝুম অবস্থাতেই সীটে পড়ে রইলেন। কিন্তু বম্বের কাছাকাছি যখন আমরা এসে গেলাম, তখন তিনি সেই নিঝুম অবস্থা কাটিয়ে উঠে বসলেন। আবার শুরু হলো চিৎকার। এবার চিৎকারের মধ্যে ফুটে উঠল এক করুণ শঙ্কা-বিজড়িত ক্রন্দন…কে যেন তাঁকে মেরে ফেলছে… করুণকণ্ঠে তিনি অনুরোধ করছেন তাঁকে না-মারবার জন্ত, ক্ষমা ভিক্ষা

করছেন ; এবং পরমুহূর্তে ঘাতকের কঠিন হিংস্র ভাষায় চেঁচিয়ে উঠছেন এই বলে যে,—হ্যাঁ মরতেই হবে, মরতেই হবে তাঁকে।

প্লেনের সমস্ত যাত্রীরা একই কণ্ঠে, একই মানুষের দ্বারা দুইটি ভিন্ন চরিত্রের এই নাটকীয় কথপোকথনে একেবারে অভিভূত হয়ে শুনছিল। এমন সময় প্লেন নামতে শুরু করল, তারাও নামবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

প্লেন থেকে নামবার সময় টুলীপ একেবারে শিশুর মতো হয়ে যান। কিছুতেই তিনি নামবেন না। প্রথমে কাঁদতে আরম্ভ করেন, পরমুহূর্তে শুরু করেন অশ্রাব্য পাঞ্জাবী ভাষায় খিস্তি গালাগাল, আমাদের অনুরোধ-উপরোধ কিছুই তাঁর কানে প্রবেশ করে না, করুণা আর ক্রোধের অপূর্ব মিশ্রিত ভাষায় উন্মাদের প্রলাপ চলতে থাকে তাঁর মুখ থেকে।

আমাদের এই প্লেনেই যাত্রী ছিলেন মিঃ এশলে গিবসন নামক জনৈক ধনী ইংরেজ লেখক। তিনি ভারতে এসেছেন প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর নিতে। কিছুদিন ইংলণ্ডে অবসর গ্রহণ ক'রে আবার তিনি ফিরেছেন ভারতে। বিমান-বন্দরে তাঁকে নিতে তাঁর মোটর এসেছে। আমাদের অবস্থা দেখে তিনি তাঁর গাড়িখানা আমাকে দিতে চাইলেন, যাতে আমি মহারাজকে সোজা পুনায় নিয়ে যেতে পারি। তারপর যখন তিনি জানতে পারলেন যে, পিয়ারা সিংকে বম্বের পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে, তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতেই উঠতে বললেন। তিনিও সঙ্গী হলেন। এই অচেনা লোকটির ভদ্রতা-বোধে সত্যিই আমি বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। বিশেষ ক'রে উন্মাদ টুলীপকে নিয়ে একলা সেই দূরের পথ পাড়ি দেওয়া সত্যিই আমার কাছে ভীতিপ্রদই লাগছিল। সমস্ত বিমান পথটি টুলীপকে নিয়ে আসতে যে ক্লান্তি আমাকে ঘিরে ধরেছিল, তাতে

একলা আবার এই পুনায় যাওয়া আমার কাছে সত্যিই দুঃস্বপ্নই মনে হচ্ছিল।

কিরকিতে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন সূর্য উঠেছে। প্রত্যূষের স্নিগ্ধ হাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের মোটর পুনায় প্রবেশ করল। প্রতিক্রিয়াপন্থী ফাসিস্ট হিন্দু সংগঠন "রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘের" প্রভাব এ শহরে যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও, এখনও সৈনাবাসের আবহাওয়া, পোলো, পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত সুদৃশ্য বাংলোয় মদো ব্রিম্পসদের কথা মনে করিয়ে দেয়। বুইক গাড়িখানা শর্ শর্ গতিতে ছুটে চলেছে যারবেদার দিকে। মাঝে মাঝে উন্মাদাশ্রমের নিশানা জেনে নেবার জন্য আমাদের গতি শ্লথ করতে হচ্ছে। নদীটা পেরোবার পরই দেখলাম বিখ্যাত যারবেদা জেল। সেখানে বন্দী থেকেছেন কত রাজবন্দী। তারপরই উন্মাদাশ্রম। আমরা অনেক আগেই পৌঁছেছি। উন্মাদশ্রমের অধ্যক্ষ এখানে আসেন বেলা দশটায়। সুতরাং দরোয়ানের কাছে আমরা তাঁর বাংলোর হদিস জেনে নিয়ে সেখানে গেলাম।

বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে ক্যাপ্টেন ভগৎ-এর। অমায়িক ও সহানুভূতিশীল ভদ্রলোক, এতটুকু কেতাদুরস্তভাব নেই তাঁর। তাঁর প্রাতঃভোজনে তিনি আমাদের আহ্বান জানালেন। একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম। কেন জানি না, ক্যাপ্টেন ভগৎ-এর সামনে আসবার পরেই টুলীপ অনেকটা শান্ত হয়েছেন।

মিঃ গিবসন ও আমি দু'জনেই বিস্মিত হয়ে উন্মাদ মহারাজার উপর অধ্যক্ষের এই প্রভাব লক্ষ্য করলাম। ইংরেজ ভদ্রলোক বারান্দায় বসে শরীরের আড়মোড়া ভাঙছিলেন আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন চারধারের সুদৃশ্য মনমাতানো কেয়ারীর মধ্যে সাজানো ফুল। মিঃ গিবসনকে দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করছিলেন টুলীপ : কেমন একটা

অবিশ্বাসের চাউনি যেন ফুটে উঠছে তাঁর চোখে···যেন তিনি অবচেতন মনে বুঝতে পারছিলেন যে তাঁকে মানব-সমাজের শত্রু হিসেবে গণ্য করেই সকলের সংস্পর্শের বাইরে রাখবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সহজ বুদ্ধি আর পাগলামো—এ দুইয়ের মধ্যে যেন ক্ষণকালের জন্য তিনি দোলা খেতে থাকেন। ভয় এবং ঘৃণার ঝটিকা-প্রকাশ যে হবেই হবে টুলীপের মধ্যে, তা বুঝেই খেতে খেতে আমি অস্বস্তিতে সময় কাটাই। আমাদের এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে তাড়াতাড়িই রেহাই দিলেন ক্যাপ্টেন ভগৎ। তিনি আমাদের নিয়ে চললেন উন্মাদ আশ্রমের দিকে।

মোটর থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে টুলীপ এক অট্টহাসিতে গড়িয়ে পড়েন। সমস্ত শরীর সাপের মতো এঁকিয়েবেঁকিয়ে চিৎকার করতে থাকেন আর সেই সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়ে মারমুখো হয়ে ওঠেন। আমার মনে হয় তিনি যেন বুঝতে পারছেন যে, যদি এই আশ্রমে একবার প্রবেশ করা যায় তবে হয়তো আর কোনদিনই এর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরোন যাবে না। এবং সেইজন্যই তাঁর এই আপত্তি ভাষা পাচ্ছে এই হতাশ-সুরের চিৎকার ও ক্রন্দনে।

পথের দুধারের ফুলের কেয়ারী আর শাদ্বলের ওপর দিয়ে আমার দৃষ্টি চলে গেল দূরের সুউচ্চ প্রাচীর-ঘেরা ব্যারাক-বাড়ির দিকে। এবং মুহূর্তে অনির্দিষ্ট দিনের জন্য বন্দী-জীবনের কথা আমার মনে ভেসে উঠল—কতদিন থাকতে হবে এখানে, কেউ বলতে পারেব না। পাগলদের চিৎকারের মধ্যে একজন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে পাগল না হয়ে কতদিন থাকা সম্ভব? উন্মাদের আমিত্ব-বোধের ওপর এই বন্ধন আরোপের প্রয়োজন যে আছে তা স্বীকার করেও আমার মনে জাগে এই কথাটি যে, টুলীপ,—সূর্যবংশের রাজপুত যোদ্ধারাজার বংশধর দলীপ কুমারের আমিত্ব-বোধ এই উন্মাদাশ্রমের এত বন্ধনের

ভূমণ্ডলে অত সহজে একটি ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হবে কতদিনে!
ক্যাপ্টেন ভগৎকে আমি জিজ্ঞেস করলাম :

'হাসপাতালের বাইরে হিজ হাইনেসের জন্যে কি একটা আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব ?'

আমার মনের কথা যেন বুঝেছেন অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ। রাস্তার বাঁ দিকে প্রায় একশ গজ দূরে একটি ছোট্ট বাড়ি দেখিয়ে তিনি বললেন :
'বোধহয় করা যেতে পারে।'

'আমরা তাহলে হেঁটেই যাব।' ক্যাপ্টেন ভগৎ-এর কথার উত্তরে ব'লে আমি টুলীপকে বললাম : 'টুলীপ, চলুন যাই এই হোটেলেরই ও পাশের অংশে···সুন্দর সাজানো ঘরখানা দেখে আসি।'

আমার এই বানানো গল্প শুনে মিঃ গিবসনের ঠোঁটের কোণে একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে। তিনি এগিয়ে এসে টুলীপের একখানা হাত আলতো ক'রে তুলে নেন নিজের হাতে; নরম ক'রে ধরলেও দৃঢ়বদ্ধ ভাবেই ধরেছেন, যেভাবে গাড়িতে সমস্ত পথটা তিনি হিস হাইনেসের হাতটা চেপে এসেছেন।

টুলীপ নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের হাতে, তিনি হাঁটতে হাঁটতে চললেন আমাদের সঙ্গে।

একটি মাত্র কক্ষ সম্বলিত এই সব ছোট ছোট ন্যাড়া বাংলোগুলো সত্যিই অভাবের মূর্ত ছবি। কিন্তু তবুও, ক্যাপ্টেন ভগৎ বললেন, ক্রমবর্ধিত রোগীর স্থান সঙ্কুলান হয় না এতেও।

এই ব্যবস্থা দেখে আমার মনে একটা অনুভূতি জাগে, সত্যিই কি কুৎসিৎ নির্মম ব্যবস্থাই না রয়েছে আমাদের ভারতীয় জীবনে যার ফলে মানুষের পাগল না হয়ে উপায় নেই। আমার মনের এ চিন্তা নতুন নয়, আগে অনেকবার হয়েছে, বিশেষ ক'রে ডাক্তারী পাশ ক'রে আমি যখন বিলাত থেকে দেশে ফিরি তখন থেকেই আমার এই চিন্তা।

আমাদের দেশটা যেন এক অন্ধকারের মধ্য দিয়েই চলেছে···দারিদ্র্য, কুসংস্কার, কত প্রতিবাদ—পুরুষানুক্রমের এটা-নয়-ওটা-নয়-এর অদ্ভুৎ সংযম—এ সবকিছু যেন মারমূর্তি ধরে মুখোমুখী দাঁড়াচ্ছে মানবজীবনের প্রতিমুহূর্তে বিকশিত কতসব নতুন সম্ভাবনার। নতুনের সামনে দাঁড়িয়ে সে যাচ্ছে ফিরে তার প্রাচীন হিংস্র সংস্কারের শম্বুকের খোলার মধ্যে। কিন্তু অন্তর্লোকে তার সংঘাত চলেছে প্রতি মুহূর্তে, তার সাবেক সমাজের আমিত্ব ধাক্কা খাচ্ছে তীব্র ভাবে, পথ না পেয়ে সে-কল্পনাহত চেতনা মাথা খুঁড়ছে কুসংস্কারের প্রাচীরে, আর তারই ফলে তিক্ত আশাহত পলায়নপর মানুষটি তখন খিটখিটে মেজাজ নিয়ে ছোটে নিজের আত্মস্বার্থের দহে ডুবতে, পরিণতি তখন তার স্নায়ুরোগ আর উন্মাদনায়! সমস্ত ভারতবর্ষটাই যেন এক পাগলা-স্থানে পরিণত হতে চলেছে, এক জগৎ-জোড়া উন্মাদাশ্রমের অংশ যেন আমাদের এই ভারতবর্ষ, যেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকেদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম ক'রে নতুন মূল্যমান সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, যাঁরা এই জগৎজোড়া উন্মাদাশ্রমের নিয়মাবলী মেনে নিয়ে পাগলের জীবনে আবদ্ধ থাকতে অস্বীকার করছেন, তাঁরাই শুধু স্থিরবুদ্ধির প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁরাই মানবজীবনের মূল্যমান নির্ধারণের দিক নির্দেশ করছেন। এমন কজনকে পাওয়া যাবে যাঁরা এই পরমাণু যুগের বহুকিছুই অনাবিষ্কৃত, অগঠিত, অনাগত আবিলতা ও হীনাবস্থার মধ্যে মানবসত্তার কি অর্থ, কোথায় চলেছি আমরা—এসবের মূল সমস্যাটি হৃদয়ঙ্গম ক'রে চলতে পারেন?···

উন্মাদের প্রলাপোক্তি ও ক্রোধ প্রদর্শনের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে অতি তৎপরতার সঙ্গে ক্যাপ্টেন ভগৎ কক্ষের মধ্যে টুলীপকে নিয়ে গেলেন। পরিষ্কার কক্ষ, একখানা লোহার খাট, একটা টেবিল ও একখানা চেয়ার মাত্র রয়েছে ঘরে।

কক্ষের বাইরে ছোট্ট প্রাঙ্গণটা তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা। টুলীপ সেদিকে তাকিয়ে থাকেন, তাঁর চোখের আতঙ্ক ভাবটা যেন গলে গেল সেই তেঁতুলের ছায়ার স্পর্শে। চোখের পাতা দুটো তাঁর ভারী হয়ে আসছে। তিনি বসে পড়লেন সেই লোহার খাটেই। ক্লান্তিতে মাথাটা তাঁর ঝুঁকে পড়েছে, যে দুইটি মনের অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনি ভুগছিলেন, এই মুহূর্তে তাও যেন একটি ধারায় গলতে আরম্ভ করেছে। পরিচারক তাঁর জুতো-জামা ছাড়িয়ে দেবার জন্য এগোতেই তিনি তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। ক্যাপ্টেন ভগৎ আস্তে আস্তে তাঁর মাথায় মৃদু স্পর্শে হাত বুলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে টুলীপ ধীরে ধীরে নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়লেন। মাঝে দু'একবার তিনি জোর ক'রে তাকান, মাথাটাও তুলবার চেষ্টা করেন, যেন তিনি বুঝবার চেষ্টা করছেন, এ কোথায় তিনি এসেছেন। কিন্তু নিদ্রার তীব্র আকর্ষণে তিনি ঢুলে পড়লেন।

আমাদের দিকে ক্যাপ্টেন ভগৎ তাকিয়ে বলেন: 'আপনাদেরও বিশ্রামের প্রয়োজন। নেপিয়ায় হোটেলে সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বিকেল সাড়ে চারটার সময় আমার সঙ্গে চা খাবেন, সেখানেই বসে এঁর ইতিহাসটা শুনে নেব।'

বিকেলে আমরা আবার ক্যাপ্টেন ভগৎ-এর বাংলোতে এলাম চায়ের নিমন্ত্রণে। অতি সাধাসিধে ব্যবস্থার মধ্যে এই চায়ের টেবিলের ধারে বসে আমি হিজ হাইনেস দলীপ কুমারের জীবনের গত তিন বছরের ইতিবৃত্ত শোনালাম উন্মাদাশ্রমের অধ্যক্ষকে; টুলীপের অল্প-বয়সের দু'চারটে ঘটনাও সেই সঙ্গে জানালাম যেগুলো তাঁর জীবন-গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে ব'লে আমার মনে হয়েছে। টুলীপের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে আমি ব্যাখ্যা করতে বসিনি, আমি শুধু বলে গেলাম

তাঁর জীবনের ঘটনাগুলো। আমার কাছে এই ভাবে বলাই সঠিক মনে হয়েছে এবং ক্যাপ্টেন ভগৎ-এর দু'একটা প্রশ্ন করার ধরন দেখে আমার মনে হলো যে, তাঁর কাছে আমার এই ভাবে ঘটনার ইতিবৃত্ত দিয়ে যাওয়াই ঠিক হয়েছে। আর বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করলাম, অধ্যক্ষও হলেন কাজের লোক, বাস্তব বুদ্ধির হাতে-কলমে লোক, এবং তিনি এই সমাজ-জীবনে মানুষকে আপেক্ষিক উন্মাদ হিসেবে ধরে নিয়েই তাঁর উন্মাদ-আশ্রমের সব রোগীদের একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত করবারই চেষ্টা করেন। একজন বিশেষ রোগীর বিশেষ জীবন-ছক বর্ণনা করতে গিয়ে আমি বেশ বুঝতে পারি কতখানি যত্ন ও বিচার দরকার হয় এক-এক জন রোগীকে নিয়ে, আর বিশেষ ক'রে যখন রোগের ভিত্তি এক্ষেত্রে নৈতিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক। বর্ণনা করতে গিয়ে আমি শ্রোতাদু'জনের কাছেই এই অসুবিধার কথা স্বীকার করি। মিঃ গিবসন আমাকে বললেন:

'আপনি বরং মহারাজার জীবনীটা লিখেই ফেলুন। অধ্যক্ষের পক্ষেও তা হলে সুবোধে হবে এবং অন্যান্য লোকদের কাছেও এটা বেশ হৃদয়গ্রাহী হবে।'

বেশ নম্রভাবে ক্যাপ্টেন ভগৎও আমাকে বললেন লিখতে, যদিও আমি বেশ বুঝতে পারি যে এই লোকটি, যাঁকে এত হরেক রকম মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকদের নিয়ে কালাতিপাত করতে হয়, যে তাঁর এই লিখতে বলাটা অনেকটা হুঁ-হাঁ ক'রে যাওয়ার মতোই বোধহয়। সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার জন্যই যেন তিনি বলে গেলেন: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাজে লাগতে পারে বটে!'

বোধহয় এই আলাপনই আমার মনে এই বই লেখার প্রেরণা জোগাল। প্রত্যেকেরই অন্ততঃ জীবনে একখানা বই লেখা উচিত—এই চলিত কথাটা ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও আমার মনে হয়েছে যে, যদি গত মাস-কয়েকের ঘটনাবলী আমি না লিখে ফেলি, যদি এসবের

একটা পরিপ্রেক্ষিত আমি খুঁজে না পাই, তবে কোন কিছুই আর আমি সহজ সরল ভাবে গ্রহণ করতে পারব না। ইদানিং আমার মনে হয়েছে যে, আমার চরিত্রে একটা জিনিসের অভাব রয়েছে—এবং সেটা টুলীপের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে আমি যেভাবে জড়িয়ে পড়েছি তার থেকেও বেশ স্পষ্ট ভাবে বুঝেছি যে, আমার জীবনে একটি জিনিসের বড় অভাব রয়েছে এবং তা হলো আমার মনের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য। অন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত কাগজের পিঠে লিখলেই নিজের অন্তর্লোকের অসামঞ্জস্য মিটে যাবে—একথা আমি মোটেই ভাবছি না, তবে এই ইতিবৃত্ত লেখার মধ্য দিয়ে নিজের মনের গুরুভার যে অনেকটা হ্রাস পাবে, তা আমার মনে হলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম অধ্যক্ষকে: 'হিজ হাইনেস সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন ক্যাপ্টেন? তিনি কি ভাল হয়ে উঠবেন?'

আমার এ প্রশ্ন যে অর্থহীন, তা প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝি। হ্যাঁ কিংবা না দিয়ে উত্তর দিলেন অধ্যক্ষ, তিনি বললেন:

'দিন কয়েক লক্ষ্য ক'রে দেখি, তারপর বলব আপনাকে।'

আমার মতনই মিঃ গিবসনও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছেন। তাঁর মধ্যে যে লেখকটি সুপ্ত রয়েছে, তা এবার মুখর হয়ে উঠল। একজন ইংরেজের চাপা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে এড়িয়ে গিয়ে তাঁর মধ্যেকার লেখক সাহসে ভর ক'রে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন ভগৎকে:

'আপনি যখন পরীক্ষা করেন কোন রোগীকে, সেসময় কি আমাদের উপস্থিত থাকতে অনুমতি দিতে পারেন ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ, থাকতে পারেন বৈ কি। কিন্তু ভাল লাগবে না আপনাদের এবং বুঝবেনও না বিশেষ কিছু। প্রথমতঃ, এই রোগীরা আয়ত্তের বাইরে। দ্বিতীয়তঃ, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা বিশেষ কিছু হতে পারে না যতক্ষণ না শক দেওয়া যায় এবং যতক্ষণ না রোগী অর্থবহ কোনকিছু বলতে শুরু

করে। এবং অবশেষে রোগী যখন কথা বলতে শুরু করে, তখন সে আবোল তাবোল অনেক কিছুই বকে যায়। রোগীর জীবনেতিহাস বিচার-বিশ্লেষণ করবার পর তার মধ্য থেকে বিশেষ কথাটি ধরে নিতে পারা চাই।'

'এই রকম পরীক্ষার পর আপনি কি ভাবে বিশ্রাম পান অধ্যক্ষ?' বাগানের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মিঃ গিবসন প্রশ্ন করেন।

স্মিত মুখে অধ্যক্ষ বলেন: 'চিন্তার লুকোচুরি বা পলায়ন ধরতে পারা সত্যিই খুব মুস্কিল। মনের রোগী যারা তারা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মুহূর্তে মুহূর্তে দৌড়ে যেতে থাকে। তাদের চিন্তার শেষ নেই কারণ একটি চিন্তাকে আড়াল করবার জন্যই তারা ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাস্রোতে মনটাকে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু চিন্তার বাস্তব-ভিত্তির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকে, কিংবা সেই বাস্তব-ভিত্তিতেই তার চিন্তাস্রোতকে টেনে আনতে হয়। শিজোফেরেনিক যে, তাকে কিন্তু সহজে তার সমস্যার মধ্যে ধরে আনা যায় না। এখানে একটি যুবক ছিল কিছুদিন। তার ধারণা সে হলো একজন মনীষী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে সে মনীষী হওয়ার উন্মাদনার মধ্য দিয়েই আত্মহত্যা করা থেকে বেঁচেছিল—এ কথা সে স্বীকার করেছিল। আমি তার চিন্তাস্রোতকে বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে নিয়ে এলাম। সে বুঝল যে সে মনীষী নয় বটে তবে ভবিষ্যতে মনীষী হবার আশা সে রাখে।'

'বাঃ, একটা হাসি-ঠাট্টার অনুভূতি তো আছে ছেলেটির!' আমি বললাম।

'বোধহয় এইটেই তাকে বাঁচিয়েছে।' মিঃ গিবসন বললেন।

'তাই বটে।' ক্যাপ্টেন ভগৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন: 'যদি এই হাসি-ঠাট্টার অনুভূতিটা নষ্ট হয়ে যায়—যা বাস্তব জীবনের ঘাত-

প্রতিঘাতে বহু লোকের জীবনেই শেষ হয়ে যায়—তখন আর নিরাময়ের আশা বিশেষ থাকে না।'

'তা হলে হিজ হাইনেসের আশা আছে,' আমি বলি : 'কারণ তাঁর জীবনে হাসি-ঠাট্টার অনুভূতি যদি নাও থেকে থাকে, তবে ভাঁড়ামিটা কিন্তু ছিল।'

ইচ্ছে করেই আমাদের আলাপনের সূত্রটা এইভাবে ঘুরিয়ে আনলাম এবং এর মধ্যে চা-পর্বও শেষ হয়ে গেল। আমরা ক্যাপ্টেন ভগৎ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে এলাম। আমি যখন ইচ্ছে তখন মহারাজাকে দেখতে যেতে পারব—এই রকম একটা বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে আমি হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিনই মিঃ গিবসন ফিরে যেতে চাইলেন কিন্তু আমি অনুরোধ করলাম আরেকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করতে। ইতিমধ্যে মিঃ গিবসনও চাইলেন একবার মহারাজাকে দেখতে। চায়ের আসর থেকে ফেরবার পথে আমরা আর গেলাম না, গেলাম পরদিন বেলা ১০টায়।

আমাদের প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে টুলীপ গোলমাল আরম্ভ করলেন। দেখলাম তিনি শিরাসন করেছেন আর সেই সঙ্গে সমানে থুতু ছিটোচ্ছেন। পরিচারকরা তাঁকে জোর ক'রে বিছানায় শুইয়ে চাদর দিয়ে বেঁধে রেখেছে, তবুও তারই মধ্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চাদর ছিঁড়ে ফেলে বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে তাঁর দুই 'লাচ্ছি' মেয়েকে নিয়ে পাঞ্জাবী অশ্লীল সঙ্গীত···কম বয়সের লাচ্ছি মেয়েটাই বলে যত গোলমালের মূল!

কে জানে এই ছোট-খাট লাচ্ছি মেয়েটাই হিজ হাইনেসের অন্তর্লোকের কোন্ অভিজ্ঞতায় দোলা জাগাচ্ছে? গঙ্গা দাসীর সঙ্গে এই লাচ্ছিনীর কি যোগাযোগ আছে? তাঁর এই ছাড়া ছাড়া স্মৃতিগুলোকে কি তিনি এইভাবে প্রতিরূপক নামের মধ্যে দিয়ে তুলতে

চাইছেন ? না. এ হলো তাঁর বিস্মৃতির অতল থেকে কোনো অজানা কারোর মাথা উঁচিয়ে ওঠা ? শূন্য দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকেন, পরমুহূর্তে এক লহমার জন্যে দৃষ্টি তাঁর কঠিন হয়ে ওঠে কণ্ঠে থাকে সেই নাচ্ছি মেয়ের জন্যে অশ্লীল গান, আবার তারই মধ্যে ফুটে ওঠে হতাশার একটানা সুর, কোথায় যেন হারিয়ে যান মুহূর্তের মধ্যে, তারপরই আবার গর্জে ওঠে দ্বেষ-হিংসার বজ্রনাদ, মুহূর্তে তা লয় পায় এক কোমলতা মাখানো হৃদয়ানুভূতির প্রায়-বিগলিত ভাষায়— ভিন্নমুখীন চরমানুভূতির প্রকাশ হতে থাকে এইভাবে। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ যেন চলেছে তাঁর অন্তরে, তাঁর 'আমি' যেন ভেঙে ভেঙে প্রকাশ পাচ্ছে এক অন্তর্দাহের মধ্য দিয়ে। যত অনাচার অত্যাচার তিনি করেছেন, বল্গাহীন কামনা-বাসনার রথে চেপে তাঁর 'আমি' যেভাবে এতদিন চলে এসেছে, আজ যেন ক্ষণে ক্ষণে তা চাইছে মুক্তি। বুলচাঁদকে হত্যা করবার যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, তাই যেন তাঁর অন্তরের দৃঢ় বন্ধনটাকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে গিয়েছে। তিনি বোধহয় চাইছেন আবার স্থির-বুদ্ধির জগতে ফি'রে আসতে। কিন্তু নিজের শতধা বিভক্ত মনটাকে আয়ত্বে আনবার ক্ষমতা আজ আর তাঁর নেই। সত্যিই মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য···অদ্ভুৎ উন্মাদ-দৃষ্টি সম্বলিত চোখ দুটো তাঁর বসে গেছে, চোখের চারধারে যেন কালির কুয়ো, মুখটা লম্বাটে, ভাঙা, শুকনো ঠোঁট আর দুই কষ ফেঁটে গেছে, দাঁতের মাড়ি ফুলে উঠেছে, উস্কোখুস্কো চুল, পারেন না শুয়ে থাকতে, নিদ্রাহীন দিবস-রাত্রি, ক্লান্তির জড়িমা সর্বদেহে, কিন্তু তবুও কি উদ্যম, সহজ মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াবার কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা! কিন্তু, না, পারেন না। তিনি তো বন্দী, চাদর দিয়ে বাঁধা বিছানার সঙ্গে!

বুঝলাম মহারাজার এই অপরিবর্তনীয় নতুন প্রতিষ্ঠিত শনৈশ্চরাব-গাঢ় ভীতিপ্রদ রাজত্বের মধ্যে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অর্থহীন। নিজের

ব্যক্তিত্বকে পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি যে আপ্রাণ সংগ্রাম করছেন তাঁর ভঙ্গুর দেহ ও মন নিয়ে, তাঁকে তাঁর সেই একক সংগ্রামের মধ্যে রেখে আমরা নীরবে কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে বাইরে চলে এলাম।

মোটরে চেপে আমরা ফিরছি। দু'জনেই নিশ্চুপ, টুলীপের উন্মাদাবস্থা আমাদের ওপর যেন চেপে বসেছে। যারবেদার পল্লী অঞ্চলের মাটির সোঁদা গন্ধ আমাদের নাক দিয়ে প্রবেশ করছে।

মিঃ গিবসনের কণ্ঠ হতে হঠাৎ বের হলো একটি বিক্ষুব্ধ লাতিন কথা। আমার অক্ষমতা জানিয়ে বললাম :

'আমার লাতিন জ্ঞান বড়ই কম।'

তিনি তাঁর লাতিন কথার অনুবাদ ক'রে বললে : 'প্রেমের কোনো দাওয়াই নেই।' বলেই তিনি শূন্য দৃষ্টিতে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ আবাব জিজ্ঞেস করলেন আমাকে :

'আচ্ছা, আপনি ভাগ্য বিশ্বাস করেন ?'

আমার মনে হলো মিঃ গিবসন সাধারণ ভাগ্য-বিশ্বাসী ভারতীয় মনের দিকে যেন আকর্ষণ অনুভব করেই এই প্রশ্ন করলেন। আমি উত্তর দিলাম :

'আপনি যদি কারুর বুদ্ধিভ্রংশের সঙ্গে হঠাৎ কোন ঘটে-যাওয়া পরিস্থিতিকে মিলিয়ে ভাগ্য কথাটা ব্যবহার ক'রে থাকেন, তা হলে সেই অর্থে কথাটাকে মেনে নেওয়া যেতে পারে ; না হলে কথাটার কোন মানেই নেই।'

'তার অর্থ, আপনার মতে মিঃ বুলচাঁদের খুনের সংবাদটা স্রেফ মহারাজার মানসিক অবস্থার সঙ্গে হঠাৎ মিলে-যাওয়া ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে, মহারাজার উন্মাদাবস্থার কারণের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই।'

'তাই বটে, দ্বিধা বিভক্ত মন নিয়েই চলছিলেন হিজ হাইনেস। উন্মাদাবস্থা তাঁর মনের পক্ষে আশ্রয় বিশেষ। এই আশ্রয়ের জন্যে তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন অনেকদিন ধরেই। বুলচাঁদের খুন এটাকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র।'

আমার কথা শুনে মিঃ গিবসন যেন কিছুটা মর্মাহতই হলেন। তিনি যে ভাবে আলোচনার গতি আশা করেছিলেন, তা না হতে দেখে একটু যেন বিরক্ত হলেন।

মুহূর্তকাল আমরা নীরব রইলাম। খারবেদা ও পুনার মধ্যের নদীর পুলটা আমরা পার হয়ে গেলাম; চারধারের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মুহূর্তের জন্যে সমস্ত তর্ক-আলোচনা স্তব্ধ ক'রে দিয়ে আমাদের মন টেনে নিল। শুষ্ক নদীর বিস্তৃতির মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ের সান্নিধ্যে এসে আমার মনে ইচ্ছা জাগল কিছুক্ষণের জন্য পুনার এই মিঠে রোদে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকতে। আমার নজর পড়ল মিঃ গিবসনের ওপর। দেখলাম, তাঁর মুখের বর্ণ কিছুটা পাণ্ডুর দেখাচ্ছে, ঠোঁটের কোণদুটো চেপে বসেছে, নিশ্বাস বইছে দ্রুতবেগে। দেখে আমার মনে হলো, তিনি যেন কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু কিভাবে সহজে সে-আলোচনা শুরু করা যায়, তাই যেন ভাবছেন। কিছুক্ষণ পর বেশ একটু জোর দিয়েই তিনি বলে উঠলেন :

'আপনারা ভারতের আধুনিকরা যেন বিজ্ঞানের ওপর বড় বেশী আস্থাশীল হয়ে উঠছেন। কি বিরাট নৃতত্ত্বকেন্দ্রীক সভ্যতাই না পাওয়া যাচ্ছে আপনাদের দেশে...'

'কিন্তু শতাব্দ কিংবা সহস্রাব্দ ধরে এক সভ্যতা জীবিত থাকলেও বর্তমানের প্রয়োজনের সঙ্গে তা তো খাপ নাও খেতে পারে। মিঃ গিবসন, প্রাচীনের থেকে জীবন-শক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু পুরোনো কৃষ্টির শব বহন ক'রে তো জীবনপথে চলা যায় না। সাবেকী

ঐতিহ্যের রক্ষক বলে যাঁরা জাহির করেন, তাঁরাই পুরোনোর যূপকাষ্ঠে যে প্রায়ই নতুনের বলির ব্যবস্থা করেন আর সেই সঙ্গে মুখে আওড়াতে থাকেন প্রাচীনের মন্ত্র…'

আমার কথা শুনে মিঃ গিবসন আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন, তাঁর গাম্ভীর্য দেখে মনে হলো যেন তিনি বিরূপই হয়েছেন আমার ওপর। একদল তরুণ বুদ্ধিজীবি ইংরেজ আছেন যাঁরা বিজ্ঞানের গতি দেখে, মম, হাক্স্‌লে, হার্ড এবং আমাদের ভগবানের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা একদল অধ্যাপকের মতোই "পাশ্চাত্য বস্তুবাদের" বিরুদ্ধে "প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতায়" আস্থাশীল ব'লে ঘোষণা ক'রে থাকেন। মিঃ গিবসনকেও যেন সেই তরুণ চিন্তাবীরদেরই একজন বলে মনে হয়। ডারউইনে আস্থা নেই এঁদের, এঁরা বিশ্বাস করছেন ভারতীয় 'যোগ', হাত-দেখা এবং ওই জাতীয় নানা ধরনের তুক্‌তাক ও কঠোর জীবনাভ্যাসে, যদিও পার্থিব জীবন ও টাকাপয়সার ব্যাপারে এঁদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাধারণ জ্ঞান রীতিমত টনটনে। আমি তো আজ পর্যন্ত একজন ইউরোপীয় যোগী দেখলাম না যাঁর প্রচুর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স্‌ না আছে। পাশ্চাত্য সমাজে জীবন-সংগ্রাম ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে লেলিয়ে দিয়েছে, সেখানে বাবা যায় ছেলের বিরুদ্ধে, মা আর মেয়ে দাঁড়ায় মুখোমুখী—এমনই এক নৈরাশ্যপূর্ণ সঙ্কীর্ণ স্নায়ু-উৎপীড়ক টাকা-আনা-পাই ভিত্তিক পশ্চিমী সভ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে এঁরা এক স্বপ্নের "আত্মা"-র অনুসন্ধান করতে থাকেন, যার নাম তাঁরা দিয়েছেন সজীব অনুভূতি সম্পন্ন পৌত্তলিক প্রাচ্য। আর আজ এশিয়ায় যৌবনশক্তি সেস্থলে বিরাট সংখ্যক জীর্ণ দীন মানুষের জন্য নতুন জীবন-প্রেরণায় চালিত হয়ে কুসংস্কার, ভেল্কীবাজী, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ভোলতেয়ার ও দিদেরো, বেন্থাম ও মিল, স্পেন্সার ও কোমতে থেকে কার্ল মার্ক্সের

সমাজ-বিজ্ঞানের বাণী গ্রহণ করছে। ইংরেজ ভদ্রলোকের মনোবস্থাটাকে কিছুটা শান্ত করবার বাসনায় আমি বললাম :

'আত্মা ও দেহকে আলাদা ক'রে বিচার করা কিন্তু খুব বুদ্ধির পরিচয় নয় মিঃ গিবসন। প্রথমটাকে মুখ্য ব'লে ধরলে আধ্যাত্মিকতার পথটা পরিষ্কার হয়। তার ফলে নির্বিচারে সব কিছু মেনে নেওয়া, জীবনের বিচ্ছিন্নতাকে গ্রহণ ক'রে দুঃখ কষ্ট ও নিয়তিকে স্বাভাবিক ব'লে স্বীকার করতে হয়; আর দ্বিতীয়টার ওপর জোর দিলে দেহবাদ এসে যায়। কিন্তু আসল কথাটি কি? আসলে দুটোকে ভিত্তি ক'রেই তো মানুষ, শুধু দেহ ও আত্মাই নয়, আরও অনেক কিছুর সমষ্টি নিয়েই মানুষ। এবং পূর্ণসত্ত্বা মানুষ কখনও এই "আত্মা" ও "বস্তু"-র দ্বৈতবাদের মূঢ়তা স্বীকার করতে পারে না।'

'বোধহয় জীবনক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাচীন মতবাদই বেশ ব্যাপকভাবে প্রজ্যোয্য। এই হিন্দু মানবতাবাদই আমার পছন্দ, যেমন বলা হয়েছে : সমুদ্র কেন? মানুষের চাই মাছ, তাই মাছের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্র; মানুষের তৃষ্ণার জল চাই, তার জন্যেই তো বৃষ্টি; তমিস্রা রজনীর আঁধার কাটানোর জন্যই না আকাশের নক্ষত্র।' অনেকটা পরীক্ষাচ্ছলে মিঃ গিবসন যেন কথাগুলো বলেন।

'আধুনিক অর্থে হিন্দুধর্ম কিন্তু মোটেই মানবতাবাদী নয়। মিঃ গিবসন, ভাবুন দেখি একবার এদের বক্তব্যটা : বিরাট ব্রহ্ম—মানুষের কল্পনায় যার ঠাঁই মেলে না এমন যে ভগবান—তারই মরীচিকাময় বাস্তবকে মায়া নামে অভিহিত ক'রে তারই টানাপ'ড়েনের এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে বাস করছে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলোর পরমাণুর মতো কীট-সদৃশ এক জাতীয় হীন জীব—সেই জীব বলে এই মানুষ!'

'হিন্দুধর্ম যদি বিশ্বমানবীয় নাও হয়, তবে অন্ততঃ মানব-প্রকৃতি-বেত্তা ব'লে স্বীকার করতে হবে।' একটা চাপা গোঁ যেন ফুটে উঠল

মিঃ গিবসনের কণ্ঠে। বুঝলাম তিনি তাঁর স্বমতই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছেন।

আমি আর উত্তর দিলাম না। নেপিয়ার হোটেল আর কতদূর তা বুঝবার জন্য বাইরে তাকালাম। ইংরেজ ভদ্রলোক বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। ক্ষণকাল পরে জোর ক'রে হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন :

'আপনি বম্বেতে মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে কিন্তু প্র্যাকটিস শুরু করবেন ডাঃ শঙ্কর। আমিও হয়তো একসময় আপনার রোগী হতে পারি!'

মিঃ গিবসনের এই আধা-গম্ভীর আধা-হাস্যকর কথা শুনে আমি না হেসে পারলাম না। 'ভেবে দেখব'খন মিঃ গিবসন। তবে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আমাদের আবার দেখা হবে।' আমি বললাম।

'নিশ্চয়ই। আমি "তাজে" আছি, আপনার কিন্তু আমার সঙ্গে একদিন লাঞ্চে নিমন্ত্রণ রইল।'

'ধন্যবাদ, নিশ্চয়ই যাবো। আপনি যে এতটা কষ্ট সহ্য করলেন!—কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব মিঃ গিবসন—!'

আমার এই অতিরিক্ত ভদ্রতা-প্রকাশে ভদ্রলোক রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়েন। বিদায় জানিয়ে তিনি মুখখানা আমার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিলেন। ড্রাউভারকে নির্দেশ দিলেন : 'বম্বে—'

কফি আনতে বলে আমি হোটেলের লাউঞ্জে বসলাম। সকাল থেকে যেসব ঘটনা ঘটল তা একবার মনে মনে আলোচনা করতে চাইলাম আমি। কিন্তু এভাবে বসে ভাবতে গেলে দেখা যায় যে ঘটনা পরম্পরা সাজিয়ে গুছিয়ে কিছুতেই ভাবনাকে সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। কফি নিয়ে এল বেয়ারা। তার সেই দাস-জনোচিতভাবে আগমন দেখেই আমার মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল শ্যামপুরের কথা। ভারতবর্ষেই শুধু মনিব ও

ভৃত্যের মধ্যে এই বিশ্রী ধরনের অসম্মানজনক সম্পর্ক দেখা যায়। এখানকার ভৃত্য যেন ক্রীতদাস। এ যেন সেই প্রাচীন রোমানদের সময়কার মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক। আমার বিরক্তি ভাবটা লুকোবার জন্ম আমি নেপিয়ার হোটেলের সুন্দর সাজানো বাগানের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেই কি পারা যায় চিন্তার হাত থেকে পালাতে? সবাই যে হেথায় এই দরিয়ায় আটকা প'ড়ে হাবুডুবু খায়। আমার মনের মধ্যে যেন একটা ঘণ্টাধ্বনি বাজছে, তারই কাংস্য আওয়াজ আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে বারে বারে বলছে: আমি এতদিন এই যে কতকিছু ক'রে এলাম মহারাজাদের জন্যে, আজ সেসব ভেঙে পড়ছে, ধ্বংস হয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। গুঁড়িয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকারময় হতাশার গহ্বরে কিংবা একটা উন্মাদ-ব্যবস্থায়, ভেঙে পড়ছে অত্যাচারীর কবরে।

ক্ষণকালের জন্ম আমি নিজের জন্ম করুণা অনুভব করলাম। নিজেকে দোষী বলে মেনে নেবার বিরুদ্ধে মন আমার তর্ক শুরু করল এই ব'লে যে, আমি তো আমার শ্রম ও সেবার মূল্য হিসেবে পারিশ্রমিক নিয়েছি, আর আমার ঋণের টাকাও শোধ দিতে হয়েছে এই ভাবে চাকুরী ক'রে এবং এই ভবিষ্যৎ জেনেই তো আমি এখানে কাজ করেছি। কিন্তু আমি তো বুঝি এ ঠিক ব্যাখ্যা নয়, স্রেফ নিজের সঙ্গেই নিজেরই চাতুরী। আমি তাই গা-ঝাড়া দিয়ে বসে সিদ্ধান্ত করলাম যে, নিজেকে যদি দোষী মনে না ক'রে থাকি, অন্ততঃ এখন থেকে তাই মনে করতে হবে। আমাকে ঘিরে ধরে রেখেছে এই যে বিষাক্ত অত্যাচারী কাপুরুষের জগৎ, তার বিরুদ্ধে আমার সত্তা বিদ্রোহী হয়ে উঠল, তার থেকে বেরিয়ে আসবার জন্ম মন আমার আকুল হয়ে উঠল।

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল সেদিনের সংবাদপত্র। দেখলাম হায়দ্রাবাদের হিজ এক্সলটেড হাইনেস নিজাম বাহাদুরকে অতি শীঘ্রই সম্মানিত করা হচ্ছে তাকে তার রাজ্যের রাজপ্রমুখ হিসেবে নিয়োগ ক'রে।

সত্যিই আমাদের দেশের কংগ্রেসী গণতন্ত্রীদের কাজকর্ম দেখে বাহ্‌বা দিতে হয়! যে-লোকটা ভারত-ইউনিয়নে যোগ দিতে অস্বীকার ক'রে অর্থ জোগান দিয়ে ধর্মান্ধ মুসলিম ঝটিকা-বাহিনী রেজভীর রাজাকরদের সৃষ্টি করল এবং ভারত সরকারের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী মার্চ না করা পর্যন্ত যে ভারত-ইউনিয়নে যোগ দিল না, আজ তারই সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে তারাই যারা দু'দিন আগেও নিজামের স্বাধীন রাজা হিসেবে থাকার বাসনাকে ধিক্কার দিয়েছিল, ধিক্কার দিয়েছিল তার ব্যক্তিগত লোভ ও অহমিকাকে আর তার সেই শাসন-ব্যবস্থাকে যা কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিল গাঁয়ের কৃষকের ঘাড়ে অত্যাচারের জোয়াল রেখে। বুড়ো শৃগাল এখনও হায়দ্রাবাদে তার উচ্চাসনে বসে আছে আর তার সেদিনকার সাকরেদ, বন্ধু, ধূর্ত রেজভী দাঁড়িয়েছে কাঠগড়ায়! কি আর বলা যাবে! এদিনে প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বজনপোষণ, আত্মতুষ্টি, দুর্নীতি—এগুলোরই তো জয়জয়কার!

খবরের কাগজে আরেকটি সংবাদের ওপর আমার নজর পড়ল। যারবেদা, নাসিক ও সবরমতি জেলে রাজবন্দীরা অনশন করেছেন। জেলের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে রাজবন্দীদের ভাগ ক'রে রাখবার নীতির বিরুদ্ধে এবং বাইরে তাদের পরিবারের জন্য কোনরকম ভাতা সরকার দিচ্ছেন না ব'লে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য কিছু কিছু দাবী নিয়েই তাঁদের এই সংগ্রাম।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল শ্যামপুরের সেই কিষাণনেতা রাজবন্দীর কথা। তাঁদের জন্য কিছুই আমি করতে পারি নি। তাঁরা কি তাঁদের

সেই অনশন ধর্মঘট তুলে নিয়েছেন? তাঁরা যে মুক্ত হয়েছেন কিংবা তাঁদের দাবী নতুন সরকার বাহাদুর মেনে নিয়েছেন, তা নিশ্চয়ই হয় নি। তাহলে কি এখনও সেই রাজবন্দী জেলে ধুকছেন?

শূন্য দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে রইলাম। একটা অবসাদ, কিছু করতে না পারার জন্য একটা দোষী মনোভাব, একটা অন্তর্জ্বালা আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রইল। কিন্তু এই অন্তর্পীড়ন দূর করেই আমাকে দাঁড়াতে হবে। টুলীপ সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা যদি লিখে ফেলি তবে তার মধ্য দিয়েই আমার জীবনদর্শনে যে ভুল ভ্রান্তি রয়েছে তা হয়তো আমি ধরতে পারব। জীবনে এই যে সমঝোতা ক'রে চলবার নীতি আমি গ্রহণ করেছিলাম গত কয়েক বছর হলো, তারই স্বাভাবিক পতন তো হবে এইভাবেই। হয়তো এই ভুল বোঝার মধ্য দিয়েই আমার মনের সর্বভয় ও দুর্বলতা দূর ক'রে দিয়ে আমি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আরও এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে। বদ্ধ জলাশয়ে পড়ে থাকা সত্ত্বেও আমার মনে এখনও মানুষের প্রতি সমবেদনা ও প্রীতি তো লুপ্ত হয়ে যায় নি। মানুষের প্রতি আমার দরদের জন্য, মানবতার প্রতি আমার স্বাভাবিক ও সাহজিক আকর্ষণের জন্যেই আমার গত কয়েক বছরের এই বদ্ধ জলাশয়ের জীবন থেকে উঠে আমি নিশ্চয়ই যেতে পারব আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে।

সুতরাং আমার কর্তব্য পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি ফিরে যাব আবার সেই শ্যামপুরেরই অরণ্যে। আমি চেষ্টা করবো প্রতিটি ঝোপ-ঝাড়ে ঢুকতে। হয়তো চারধারের নিষ্প্রাণ অন্ধকার আমাকে হতাশার মধ্যে ঠেলে দেবে। তবুও আমি লেগে থাকব, যাব এগিয়ে পূর্ণোদ্যমে আমাদের নুয়ে-পড়া লোকেরা যেখানে আজ সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। সংগ্রাম করবো আমি আর সেই সংগ্রামের

মধ্য দিয়েই তো জীবনের প্রতি প্রীতি-ভালোবাসা জন্ম গ্রহণ করে।...

পরদিন সকালে আমি যখন আবার গেলাম টুলীপকে দেখতে, মনে হলো তিনি যেন আমাকে আবছা চিনতে পারছেন। হঠাৎ হিংস্র হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'আমি তোমাকে খুনই ক'রে ফেলব—' সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো অশ্রাব্য খিস্তি।

দরজায় এপাশে আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে বললাম : 'টুলীপ! টুলীপ!...' কণ্ঠে আমার সমবেদনা।

আমার প্রতি হঠাৎ কেন এই হিংস্র আক্রমণ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি কারণ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করলাম। বোধহয় পুরোনো স্মৃতির দু'একটা রেশ তাঁর মনের ওপর দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ চলে যায় এবং তারই জের হিসেবে এই মুহূর্তে আমাকে শত্রুর দলে তিনি ফেলছেন। তাঁর শত্রুর তালিকায় তো থাকছে সর্দার প্যাটেল, শ্রীযুত পোপতলাল, পণ্ডিত গোবিন্দদাস, বুলচাঁদ, গঙ্গী প্রভৃতি।

হিজ হাইনেসের এ অবস্থায় তাঁকে তো কোন ভাবে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বুঝতে পারি, এ হলো স্রেফ ভাব-প্রবণতা। বরং তাঁর সামনে এ ভাবে বসে বসে বোধহয় টুলীপের আরোগ্য হবার পক্ষেই আমি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছি।

আমি বেরিয়ে এলাম এবং ক্যাপ্টেন ভগৎ সিং-এর কাছে বিদায় নিয়ে পুনা ছেড়ে চলে যাবো বলে ঠিক করলাম।

ক্যাপ্টেন ভগৎ-এর অফিসে আমি প্রবেশ করলাম। কেরানী বাবু আমাকে তিনখানা চিঠি দিলেন। অধ্যক্ষ অত্যন্ত ব্যস্ত রয়েছেন, তাই চিঠিগুলো দেখবার জন্য আমি কেরানী বাবুর পাশেই বসলাম। খামগুলো উদগ্রীব হয়েই খুলে ফেললাম। বাদামী

কাগজের খামখানা দেখে বুঝলাম, নিশ্চয়ই শ্যামপুর সরকারের কোন সরকারী ফতোয়া হবে। শ্রীবুলচাঁদের হত্যামামলায় ১০ই জানুয়ারী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির হবার জন্য সমন। দ্বিতীয় চিঠিখানা আমার নামেই লেখা, মুন্সী মিথনলালের। তৃতীয়খানা অপরিচিত হস্তাক্ষর।... মুন্সীজীর চিঠিতে জানলাম যে তিনি জেলে আবদ্ধ আছেন এবং তাঁকে জামিনও দেওয়া হয় নি।

তৃতীয় চিঠিখানা লিখেছেন মহারানী ইন্দিরা দেবী। ছোট্ট চিঠি। তিনি পুনায় আসছেন তাঁর প্রিয় স্বামীর দেখাশোনা ও সম্ভাব্য পরিচর্যা করবার জন্য। আমি তাঁর থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে তিনি বাধিত হবেন।

চিঠিখানা শেষ করবার আগেই দেখি ক্যাপ্টেন ভগৎ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণে বেরোবেন এখন তিনি। আমি যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি, তা তিনি খেয়াল করেন নি। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। অধ্যক্ষের মুখে ব্যস্ততার চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে আমি সংক্ষেপে সেরে নেবার জন্য বললাম :

'ক্যাপ্টেন ভগৎ, আমি এসেছি আপনার কাছে বিদায় নেবার জন্য। আজই দুপুরে আমি শ্যামপুরে রওনা হতে চাই।'

অধ্যক্ষ আমার করমর্দন ক'রে বললেন : 'ও! আমি একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি। কে এক মহারানী জানিয়েছেন যে তিনি এখানে আসছেন তাঁর স্বামীর পরিচর্যা করতে। আপনি বোধহয় সে-সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেন।'

'হ্যা, তিনি আমাকেও চিঠি দিয়েছেন। মহারাজা দলীপ কুমারের মহারানী ইন্দিরা দেবী। ইনিই হলেন আসল মহারানী।'

'আপনি কিন্তু মহারানীকে জানাবেন যে তিনি সপ্তাহে একবার মাত্র তাঁর স্বামীকে দেখতে পারবেন।' ক্যাপ্টেন ভগৎ বললেন।

'হ্যাঁ, আমি তাঁকে জানাব। টেলিগ্রামও করব আর চিঠিও দেব। আর আমরা নিশ্চিন্ত যে আপনি যখন প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করছেন…'

'হ্যাঁ নিশ্চয়।' ক্যাপ্টেন ভগৎ উত্তর দিলেন। তাঁর দৃষ্টি এরই মধ্যে এ স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে গিয়েছে, এবং তিনিও বেরোবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। আমি বললাম :

'আপনি যা করছেন তার জন্য সত্যিই আমি অনুগৃহীত ক্যাপ্টেন।'

আমি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম।

তাড়াতাড়ি এবং মুহূর্তের জন্য আমার হাতখানা একটু চেপে ধরে তিনি কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলেন।

আমিও উন্মাদআশ্রমের পথ বেয়ে ধীরে ধীরে গেটের বাইরে এসে অপেক্ষারত ট্যাক্সীতে উঠে বসলাম। ভাবছি কি অপরূপ নারীর এই প্রীতি ও প্রেম…স্বার্থহীন মহান প্রেম…দয়িত যদি নরকেও যায় সে-প্রেম যেন যায় সঙ্গে সঙ্গে দয়িতকে উদ্ধার করতে।